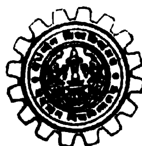
নরহরি চক্রবর্তী : জীবনী ও রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড : আলোচনা ও পরিশিষ্ট

ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা
অধ্যাপক, শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যামহাপীঠ
কামারপুকুর, হুগলী



বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান

প্রথম প্রকাশ : ১১ নভেম্বর ১৯৫৮

প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী

প্রকাশক : রথীন্দ্রকুমার পালিত
পাব্লিকেশন্‌স্‌ অফিসার
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

মুদ্রক : অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
জ্ঞানোদয় প্রেস
৫৫বি, কবি সুকান্ত সরণি
কলিকাতা ৭০০ ০৮৫

আচার্য্য ডক্টর হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

মুখবন্ধ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ্রীমান মিহির চৌধুরী কামিল্যার গবেষণাগ্রন্থ 'নরহরি চক্রবর্তী : জীবনী ও রচনাবলী' প্রকাশিত হলো। প্রেসের নানা জটিলতার জন্যই বইটি দুখণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে।

শ্রীমান মিহির বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অনুসন্ধিৎসু একনিষ্ঠ গবেষক। বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্য-শাস্ত্রে অসাধারণ কৌতূহল নিয়ে তিনি এ-কাজে ব্রতী হন। সুদীর্ঘ দিন নানা স্থানে অনুসন্ধান করে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর এই বিস্মৃতপ্রায় বৈষ্ণব কবির একটি পরিপূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করেছেন, বহুকাল পূর্বে মুদ্রিত ও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কিছু পুঁথির সাহায্যে কবির সমগ্র রচনাবলীর মূল্যায়ন করেছেন। নরহরি ছিলেন একাধারে বৈষ্ণব কবি, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও জীবনীকার। তাঁর সমান ভাবুক, রসিক, পণ্ডিত, সঙ্গীতজ্ঞ, বাদক, সুরকার ও সাধক সেকালে বিরল ছিল। শ্রীমান মিহির তাঁর গ্রন্থে এই দিকগুলি সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করেছেন।

প্রথম খণ্ডে সবাপেক্ষা আকর্ষণীয় হলো কবির গুরুপরম্পরা, কর্ম ও সাধনা। কবির নবাবিষ্কৃত 'আত্মজীবনী' ও 'কবিজীবনী' থেকে এই অজ্ঞাত তথ্যগুলি গৃহীত। নরহরির নামান্তর ঘনশ্যাম। তাই নরহরি ও ঘনশ্যাম ভণিতার যেখানে যত পদ ছিল, লেখক সেগুলিকে বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে সংগ্রহ ও বিচার করে চক্রবর্তীর অকৃত্রিম পদাবলী নির্ণয় করেছেন। ফলে এতদিন ধরে নরহরি সরকার, ঘনশ্যাম কবিরাজ ও ঘনশ্যামদাসের সঙ্গে নরহরি-ঘনশ্যাম-চক্রবর্তীর পদ বিচারের যে জটিলতা ছিল, এই গ্রন্থ প্রকাশে তার অবসান ঘটতে পারবে। তাঁর নবাবিষ্কৃত পুঁথিগুলি সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন সংযোজন বলে বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয় খণ্ডে কবির সমগ্র পদাবলী ও গ্রন্থাবলীর বিচার বিশ্লেষণ, সেগুলিকে বিষয়ানুসারে সাজিয়ে কবির মৌলিকত্ব ও কৃতিত্ব প্রদর্শিত হয়েছে। গ্রন্থাবলী থেকে সেকালের রাষ্ট্রব্যবস্থা, জনজীবন, শিক্ষাদীক্ষা, ধর্মকর্ম, সংগীত-নৃত্য-নাট্য-চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে। এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এগুলি থেকে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক উপাদানসমূহের যাথার্থ্য নির্ণীত হয়েছে।

এ জাতীয় গবেষণা শ্রমসাধ্য, জটিল এবং বিশেষ বিশ্লেষণী দক্ষতার অপেক্ষা রাখে। প্রাচীন বৈষ্ণব মহাজনেরা নিজেদের পরিচয় পরমানন্দ মাধবের শ্রীচরণতলে বিলোপ করে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিলোপী মনো-ভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু এর ফলে ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাজ অনেক দুরূহ হয়ে পড়ে। অত্যন্ত আনন্দের কথা, শ্রীমান মিহির এই দুরূহ কাজে নিজের কঠিন পরিচয় রেখেছেন এবং সাফল্যের কষ্টিপাথরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। শ্রীমান মিহিরের গবেষণা নিছক সৌখিন মজদুরী নয়, এর পেছনে তথ্যনিষ্ঠা, অনুসন্ধিৎসা, শ্রমশীলতা, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ শক্তি এবং সর্বোপরি সাহিত্যে গভীর রসানুভূতি বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী-কমিশনের আনুকূল্যে এই গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। ইতিমধ্যেই এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয়ে এটি পরিপূর্ণাঙ্গ হলো। আমি আশা করি সাহিত্যরসিক, পাঠক, গবেষক এবং অন্যান্য সুধীজনের আনন্দ বর্ধন করতে এই গ্রন্থ নিশ্চিতরূপে সাহায্য করবে।

পরিচায়ন

অধ্যাপক ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যার "নরহরি চক্রবর্তী : জীবনী ও রচনাবলী" বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় দুই খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থ ডঃ চৌধুরী কামিল্যার গবেষণা-নিবন্ধ, যার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে দুই নরহরি, শ্রীচৈতন্য-পরিকর শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর এবং চৈতন্যোত্তর যুগের সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের নরহরি চক্রবর্তী। উভয়েই খ্যাতিমান্। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় 'গৌর-নাগর ভাবে'র আদি প্রবর্তক এবং গৌরাঙ্গ-লীলাবিষয়ক পদের প্রথম রচয়িতা শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর, পরবর্তী যুগের পদকর্তা, পদসংকলয়িতা, জীবনীকার, ঐতিহাসিক, সঙ্গীত ও ছন্দঃশাস্ত্রে পারদর্শী, বৃন্দাবনবাসী সুপকার নরহরি চক্রবর্তী দুই-ই বৈষ্ণবযুগের ইতিহাস চেতনায় স্ব স্ব মহিমায় বিরাজিত রয়েছেন। চণ্ডীদাস সমস্যা সম্পর্কে এ বিষয়টি স্মরণের যোগ্য। এই নরহরি ঘনশ্যাম-নরহরি। ইনি 'ক্ষণদা'-কার সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য ও দার্শনিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য জগন্নাথ চক্রবর্তীর পুত্র। ঘনশ্যাম নামের আরও দুজন পদকর্তা একাকার হয়ে যান নি। তাঁরা ঘনশ্যাম কবিরাজ (গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র) এবং ঘনশ্যাম দাস। ডঃ চৌধুরী কামিল্যা নরহরি চক্রবর্তীর প্রসঙ্গে ইতিহাস-বিজ্ঞানী এবং পদাবলী সাহিত্যের রসগ্রাহী হিসাবে এই কবি-চতুষ্টয়ের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সতর্ক ও নিপুণভাবে বিচার ও আলোচনা করেছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবযুগের দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ শ্রীনিবাস নরোত্তম ও শ্যামানন্দ ঠাকুর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক ধারণার জন্যে আমরা নরহরি চক্রবর্তীর নিকট ঋণী। তাঁর ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাস শ্রীচৈতন্যযুগ এবং চৈতন্যোত্তর-যুগের উপর প্রচুর আলোকসম্পাত করে। তাঁর গীতচন্দ্রোদয় পদসংকলনের মূল্যবান গ্রন্থ। তাঁর সংগীত ও ছন্দঃশাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীর মূল্য অসাধারণ। ডঃ চৌধুরী কামিল্যা নরহরির জীবনী ও রচনা সম্বন্ধে প্রশংসনীয় বিচারবুদ্ধি

ও রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি স্বল্পালোকিত ও বহু-বিতর্কিত যুগকে ভাবী পাঠক ও গবেষক সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন। আমি তাঁর গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

নিবেদন

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় 'নরহরি চক্রবর্তী : জীবনী ও রচনাবলী' দুখণ্ডে প্রকাশ করলেন। কোন্ অভিলাসে কেমন করে আমার এই গবেষণা গ্রন্থটি রচিত, প্রথম খণ্ডেই সে কথা নিবেদিত হয়েছে। প্রমাণ প্রয়োগ যুক্তিতথ্যের সমাবেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিত গ্রন্থের বাণিজ্যিক কদর হয়তো উল্লেখ্য হবে না, কিন্তু বিপুলা পৃথিবীর বুকে নিরবধি কালের মধ্যে ভবভূতির মতো আমিও হয়তো একদিন আমার সহৃদয়কে খুঁজে পাবো।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নরহরি চক্রবর্তী এক বিচিত্র প্রতিভা, এক বিস্ময়কর কবি। বৈষ্ণববিদ্যার সকল দিক প্রকাশে তাঁর সমান মনীষা বোধ হয় দুর্লভ। তিনি শুধু কবি নন, তিনি একনিষ্ঠ ভক্ত, বিরল শ্রেণীর সাধক, এবং একাধারে বৈষ্ণব ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, জীবনীকার, বৈষ্ণব-বন্দনার লেখক, তীর্থপরিক্রমার গাইডগ্রন্থের স্রষ্টা, পদাবলী সংগ্রাহক, বিখ্যাত ব্যক্তিদের চিঠিপত্রের আদি সংকলক। তিনি অলৌকিক ছন্দোবিৎ, কুশলী আলংকারিক, বিচক্ষণ পণ্ডিত ও সতর্ক গবেষক। বৈষ্ণব সংগীত নৃত্য নাট্য বাদ্য অঙ্গাভিনয়—ভারতীয় বিদ্যার প্রায় সকল বিষয়েই তিনি গ্রন্থ লিখেছেন। তার উপরে তিনি নিপুণ সমাজবিজ্ঞানী, সব বিষয়ে তাঁর কৌতূহল, চারদিকে তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি। আজ দুশো বছর পরে তাই তাঁকে নিয়ে অনন্ত জিজ্ঞাসা, তাঁর রচনাবলী নিয়ে জটিল সমস্যা।

ইতিপূর্বে প্রকাশিত এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল এহেন এক স্মরণীয় বৈষ্ণব কবি নরহরির জীবন-তথ্য এবং গ্রন্থাবলী ও পদাবলী সংগ্রহ। বর্তমান দ্বিতীয় খণ্ডে আছে সেই বহু শ্রমসাধ্যে সংগৃহীত রচনাবলীর পুংখানুপুংখ বিচার বিশ্লেষণ অলোচনা ও সমালোচনা। তাই শুধু প্রেসবিভ্রাটের জন্যেই নয়, বিষয় বিন্যাসের দিক থেকেও বইটির খণ্ডীকরণ দরকার ছিল।

প্রথম খণ্ডে চারিটি অধ্যায়। প্রথমেই আছে কবির 'জীবন-প্রসঙ্গ'। নানা স্থান অনুসন্ধান করে নবাবিষ্কৃত পুথি, মুদ্রিত গ্রন্থ ও প্রচলিত লোককথা প্রভৃতির সতর্ক অনুধাবনে ও নানা প্রমাণ প্রয়োগে এই জীবনীটি রচিত। নরহরি জন্মেছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার রেঞাপুরে। তাঁর জীবৎকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক

পর্যন্ত। পিতার নাম জগন্নাথ চক্রবর্তী। বৈষ্ণবাচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য এই জগন্নাথও ছিলেন অনন্যসাধারণ সাধক ও উদাসীন ভক্ত। নরহরির গুরু নৃসিংহ চক্রবর্তী, পরমগুরু নন্দকুমার। এঁরা শ্রীনিবাসাচার্যের শাখাভুক্ত। কবি বিবাহ করেন নি, কম বয়সেই বৃন্দাবনে চলে যান। সেখানে শ্রীগোবিন্দের সেবা পূজা, তাঁর ভোগ রান্না, নাম গুণাদি কীর্তন তাঁর নিত্যকর্ম ছিল। শাস্ত্রালোচনা ও গ্রন্থরচনা যেন তাঁর সহজাত গুণ ছিল। সময় সময় তিনি তীর্থ পরিক্রমায় বেরুতেন। নানা ভক্তজনের সঙ্গে মিশতেন, জগৎ-জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন। বহু ভাষা জানতেন, বহু বিষয় পড়তেন। কাব্য দর্শন ইতিহাস ব্যাকরণ ভাষা ছন্দ অলংকার সংগীত নৃত্য নাট্য বাদ্য আঙ্গিকাভিনয় প্রভৃতি দেশীয় বিদ্যার এমন কোনো দিক নেই যাতে তাঁর গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল না।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁর এ যাবৎ মুদ্রিত আটটি গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হয়েছে 'গ্রন্থ-পরিচিতি' নামে। এগুলির প্রতিপাদ্য বিষয়ও লক্ষ্য করবার মতো। গ্রন্থগুলি হলো—১. 'ছন্দঃসমুদ্র' (ছন্দোবিজ্ঞান), ২. 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি' (স্বরচিত গৌরগীতি সংকলন), ৩. 'ভক্তিরত্নাকর' (বৈষ্ণব ইতিহাস ও শ্রীনিবাসাচার্যের জীবনী), ৪. 'নরোত্তমবিলাস' (বৈষ্ণব ইতিহাস ও নরোত্তম ঠাকুরের জীবনী), ৫. 'গীতচন্দ্রোদয়'-'পূর্বরাগ' (বিভিন্ন কবির পদাবলী সংগ্রহ), ৬. 'সংগীতসারসংগ্রহ' (সংগীত নৃত্য নাট্য বাদ্য অঙ্গাভিনয় সম্পর্কান্বিত গ্রন্থ), ৭. 'নামামৃতসমুদ্র' (বৈষ্ণবদের বন্দনা গ্রন্থ), এবং ৮. 'পদ্ধতিপ্রদীপ' (বৈষ্ণবদের নিত্যকর্ম পদ্ধতি বিষয়ক)। আমাদের আলোচনায় আমরা এই গ্রন্থগুলির পুথি ও মুদ্রিত গ্রন্থের সংবাদ দিয়েছি, পাঠান্তর ও অতিরিক্ত পাঠ দেখিয়েছি, রচনাকাল নির্ণয় করেছি, এদের গঠনশৈলী, গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য, সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু ও সংকলিত মহাজন পদাবলী বিষয়ে আলোচনা করেছি।

'নবাবিষ্কৃত পুথি' নামক তৃতীয় অধ্যায়ে নানা প্রমাণ প্রয়োগে নিম্নোক্ত তিনটি পুথিকে নরহরির রচনা বলে গ্রহণ করেছি—১. 'গৌরপরিকরগণের সূচক' (গৌরাঙ্গের পিতামাতা ও পরিকরবৃন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা), ২. 'গীতচন্দ্রোদয়'-'মঙ্গলাচরণ' (পূর্বোক্ত গীতচন্দ্রোদয়ের প্রারম্ভাংশ), এবং ৩. 'নবদ্বীপ পরিক্রমা' (নবদ্বীপ পরিক্রমণের সংক্ষিপ্ত গাইড)।

চতুর্থ অধ্যায় 'পদাবলীসংগ্রহ'। এ পর্যন্ত আমরা নরহরির অকৃত্রিম রচনা

হিসেবে ১৬২৫টি পদ সংগ্রহ করেছি। এই প্রসঙ্গে কবির ‘নরহরি’ ও ‘ঘনশ্যাম’—এই দুই নামের যেখানে যত পদাবলী ছিল, সেগুলিকে আমরা একত্রিত করেছি। নরহরি সরকার, ঘনশ্যাম কবিরাজ, ঘনশ্যাম দাস ও সহজিয়া নরহরির পদের সঙ্গে আলোচ্য ঘনশ্যাম-নরহরি চক্রবর্তীর পদের পার্থক্য নির্ণয় করার কিছু বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখিয়েছি। এইভাবে কবির একটি যুক্তিসঙ্গত, তথ্যসমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণাঙ্গ জীবনী রচিত হয়েছে এবং তাঁর সমগ্র রচনাবলীর সঙ্গে সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।

বর্তমান দ্বিতীয় খণ্ডের তিনটি অধ্যায়ে আছে সেই রচনাবলীর সর্বাঙ্গীন আলোচনা এবং কবির নবাবিষ্কৃত পুথিগুলির অনুলিপি। পঞ্চম অধ্যায়ে তাঁর ‘পদাবলীর সাহিত্যমূল্য’—বিষয়বিন্যাসরীতি, বিষয়বস্তু, প্রকাশভঙ্গী, কবিত্ব, রসবস্তু, ভাষা ছন্দ অলংকার নির্ণয় এবং এগুলি থেকে কবির জীবনসাধনার পরিচয়। ‘গ্রন্থাবলীর সাহিত্যমূল্য’ নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে সেকালের সমাজজীবনের ইতিহাস, গৃহীত হয়েছে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক উপাদান এবং বৈষ্ণব সংগীত বিজ্ঞানের পরিচিতি। সবশেষে ‘পরিশিষ্ট’ অধ্যায়ে কবির আত্মজীবনী, অন্যের লেখা কবিজীবনী, কবির নবাবিষ্কৃত ১৪১টি পদ ও কিছু নতুন পাওয়া গ্রন্থের অনুলিপি প্রদত্ত হয়েছে। এইভাবে নরহরি চক্রবর্তী সম্পর্কে পূর্ণায়ত চিন্তা ও তাঁর রচনার একটি পরিপূর্ণ আস্বাদন লাভ করা গিয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থের সমগ্র গবেষণাকর্ম ডঃ বিজিতকুমার দত্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ করেছি। আর যাঁদের অফুরন্ত মমতায় গ্রন্থটি রচিত হয়েছে, প্রথম খণ্ডেই তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে। এই খণ্ডের সংগীতাংশটি রচনায় ভারতীয় সংগীতের ঐতিহাসিক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজের উপদেশ গ্রহণ করেছি, অলংকার নির্ণয়ে অধ্যাপক ডঃ শ্রীরামজীবন আচার্যের পরামর্শ লাভ করেছি। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল পুথির পাঠোদ্ধারে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। আমার পরম সৌভাগ্য যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ শ্রীরমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁর অনন্ত কর্ম-ব্যস্ততার মাঝেও অত্যন্ত মমত্ব নিয়ে এই গ্রন্থের ‘মুখবন্ধ’ লিখে দিয়ে আমাকে পরিপূর্ণ সমৃদ্ধি দান করেছেন। আমার দুর্লভ সৌভাগ্য যে, বৈষ্ণব সাহিত্য শাস্ত্রের পরম বিবুধ অধ্যাপক পিতামহ-আচার্য্য শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী শারীরিক অসুস্থতা ও বহুবিধ কাজের মাঝেও পরম স্নেহে ‘পরিচায়ন’ লিখে দিয়ে

আমাকে অনুগৃহীত করেছেন। এঁদের শ্রীচরণে আমার বিনীত প্রণাম জ্ঞাপন করি। আর যাঁদের অন্তহীন সাহায্যে এ গ্রন্থ রচিত, তাঁরা হলেন কলকাতার হরষিত মিশনের সম্পাদক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং প্রতিষ্ঠাতা শ্রীনরেন্দ্রকেশরী রায়।

নানা বিভ্রাটের মধ্যেও গ্রন্থটির স্বাভাবিক প্রকাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন বিভাগের আধিকারিক শ্রীরথীন্দ্রকুমার পালিত এবং তাঁর সহকর্মী-বৃন্দের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় আমি অভিভূত। এঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই॥

সূচীপত্র

[প্রথম খণ্ডে প্রথম থেকে চতুর্থ অধ্যায় সন্নিবেশিত]

পঞ্চম অধ্যায়

পদাবলীর সাহিত্য মূল্য

পদাবলীর বৈচিত্র্য

নরহরি চক্রবর্তী রচিত ষোল শতাধিক (মোট ১৬১৮টি) পদাবলীকে বিষয়বস্তু ও কাব্যভাবনার দিক থেকে প্রধানতঃ চার ভাগে বিভক্ত করা চলে :

(ক) বন্দনা ও সূচক পদ,
(খ) গৌরাঙ্গ (নিত্যানন্দ-অদ্বৈত) বিষয়ক পদ,
(গ) গৌর-নাগরী পদ,
(ঘ) রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ।

(ক) বন্দনা ও সূচক পদাবলী :

গুরু বন্দনা

ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে গুরুবাদ স্বীকৃতি লাভ করে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেই তা অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভক্ত-সমাজে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, গুরু ভগবান ও ভক্তের মিলন সেতু। তাঁর কৃপা লাভ হলেই ভবযন্ত্রণার নিবৃত্তি ও সাধনায় সিদ্ধি লাভ। সুতরাং কায়মনোবাক্যে গুরু সেবা পরিচর্যা করাই শিষ্যের কর্তব্য। অন্যদিকে গুরু-বিমুখের কোনোকালেই নিস্তার নেই।

এই ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রায় প্রত্যেক বৈষ্ণব কবিই গুরু বন্দনার সংস্কৃত শ্লোক বা পদাবলী কিংবা ভাষায় রচিত পয়ারাদি দিয়ে গ্রন্থ আরম্ভ করেছেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'স্তবামৃতলহরী'তে সাধারণভাবে গুরু বন্দনা ও কবির আপন গুরুপরম্পরার বন্দনামূলক অনেকগুলি স্তবক দেখা যায়।[১]

নরহরি চক্রবর্তীর গ্রন্থে গুরু বন্দনার পদ ১৪টি,—'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'র প্রথম কিরণে ১২টি[২] এবং 'গীতচন্দ্রোদয়' পুথির মঙ্গলাচরণে ২টি[৩]। বলা বাহুল্য

১ গুরু বন্দনার সংস্কৃত শ্লোক ৯টি। বিশ্বনাথের আপন গুরুপরম্পরা, রাধারমণ থেকে শ্রীচৈতন্য পর্যন্ত প্রত্যেকের উপর ৯টি করে সংস্কৃত শ্লোক। স্তবামৃতলহরী।

২ গৌরচরিত্রচিন্তামণি (হরিদাস দাস সং) : ১-১২ নং পদ।

৩ বরাহনগর পাঠবাড়ীর পুথি (নং ২৫৩৪।৩) : পত্র ১, ২ক ; ১, ২ নং পদ।

এগুলিতে কবি কোথাও আপন গুরুর নামোল্লেখ করে তাঁর বন্দনা করেন নি। গুরু সম্পর্কে সেকালের সাধারণ ধারণাটিই এগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। গুরুদেবের অলৌকিক মহিমান্বিত চরিত্র, তাঁর অনন্যসাধারণ ক্ষমতা, শিষ্যের প্রতি তাঁর কারুণ্য, তাঁর প্রতি শিষ্যের কর্তব্য এবং গুরুবিমুখের দুর্দশা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নানা প্রসঙ্গ এগুলিতে লক্ষ্য করা যায়।

কবি বলেন, গুরু

"জগৎত্রয় বন্দ্য প্রচার নিচয় ভয়তারক।
তারক পতিসম সর্বসুখদ শুভকীর্তি অগম্য মহামন হারক॥
সুন্দর ধীর উদার সদাদ্ভুত করুণার্ণব গুণগণ মনরঞ্জন।
গৌরকৃষ্ণ-রসদান-দক্ষ দুঃখনাশক কল্পবৃক্ষকৃত গঞ্জন॥[৪]

কবির মতে, গুরু 'পতিতবন্ধু', 'শরণাগত রক্ষক', 'বিপদমর্দন', 'অতিদুর্গম ভব ভয় ভঞ্জনয়া', তাঁর 'নির্মলচরিত্র', তিনি 'নিরুপম ভাব বিভূষণ ভূষিত সুন্দর বর মুদবর্দ্ধনয়া'। কবীন্দ্রগণ তাঁর 'মহামহিমা' নৃত্যগীতবাদ্যযোগে কীর্তন করেন, বেদ পুরাণে তারই সাক্ষ্য আছে।

সুতরাং সেই গুরুর নিত্য সযত্নসেবা করাই শিষ্যের একমাত্র কর্তব্য। তাঁর 'শ্রীপদসেবন', 'মধুরমূর্তি চিন্তন', 'নিত্যদর্শন', 'গুণকীর্তন' করলেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটে। রতি দৃঢ় হলে ভক্তের সকল দুঃখ দূর হয়, সর্ব অভিলাষ পূর্ণ হয়, সমৃদ্ধি ঘটে ও শান্তি পাওয়া যায়। গুরুচরণ শিষ্যের কাছে তাই শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

সংসারে কিন্তু গুরু বিমুখেরও অভাব নেই। সেজন্যে সতর্ক-কবি বলেন:

"শ্রীগুরুচরণ বিমুখ অতি দুর্মতি তাকর পরশ স্বপনে নাহি চাও।"

কবি যেন সকল ভক্তকে সাবধান বাণী শোনান—

"যদি কোন ভাঁতি তাক মুখদরশনে বচন শ্রবণ অরু পরশিয়ে গাত।
তৈখনে মম যুগ নয়ন অন্ধ পুন কর্ণবধির অনু তনু হউগাত॥"

কবির প্রার্থনা—

"হরি হরি হেন দিন হোয়ব আমার।
শ্রীগুরুদেব চরিত গুণ অদ্ভুত নিরবধি চিন্তব হৃদয় মাঝার॥"...
"শ্রীগুরুচরণামৃত কব পিয়ব উর আনি।
অদ্ভুত অধরামৃত কব ভুঞ্জব সুখ মানি॥

৪ গৌরচরিত্রচিন্তামণি, (হরিদাস দাস): ১ নং পদ (১ম কিরণ)। পৃঃ ১।

সুন্দর পদ পংকজ-রজ মাধব কব গায়।"......
এবং "দেহ নিরত সুচারু চরণ সরোজ নিকট নিবাস হে॥"

পূর্ববর্তী মহাজন ও মহান্ত বন্দনা

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত ছাড়াও নরহরি চক্রবর্তী রচিত প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-মহাজন ও মহান্তদের প্রশস্তিমূলক ৫৮টি পদ পাওয়া গিয়েছে। মহাজনদের মধ্যে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দদাস কবিরাজ, জ্ঞানদাস; মহান্তদের মধ্যে বল্লভ ভট্ট, গদাধর ভট্ট, গদাধরদাস, গদাধর পণ্ডিত, গৌরীদাস, কাশীশ্বর, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, লোকনাথ, হৃদয়চৈতন্য, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরূপ, সনাতন, গোপালগুরু, শ্রীবাস, গতিগোবিন্দ, হেমলতা ঠাকুরাণী, হরিরামাচার্য, রামকৃষ্ণাচার্য, গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী, রসিক মুরারি, রামচন্দ্র কবিরাজ; এবং একাধারে মহান্ত ও মহাজনদের মধ্যে শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ, নরহরি সরকার প্রমুখের বন্দনাগীতি রচনায় নরহরি চক্রবর্তী বৈষ্ণব কবিতার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য আসন দাবী করতে পারেন। এ ছাড়া চৈতন্যপরিকরদের যুক্তভাবে বন্দনার পদ ৫টি ও যুক্তভাবে মহাজন বন্দনার পদ ২টি। উল্লেখযোগ্য যে, আর কোনো বৈষ্ণব কবির নামে (এককভাবে) এতগুলি ব্যক্তি সম্পর্কে এত অধিক সংখ্যক বন্দনা পদ মেলে নি।

কাব্যভাবনার বিচারে এই পদগুলিকে আমরা দুটি পৃথক পর্যায়ে গ্রহণ করতে পারি। যে সমস্ত পদে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের কেবলমাত্র ভাব-জীবনের পরিচয় আছে, ঘটনাবলীর কোনো উল্লেখ নেই, সেগুলিকে আমরা সাধারণ ভাবে 'বন্দনা' পদ বলছি। আর যে সকল পদে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের ভাব-জীবনের পরিচয় গৌণ এবং তাঁদের জীবনের বিভিন্ন সময়ের নানান ঘটনা প্রকাশিত, সেগুলিকে আমরা আলোচনার সুবিধার জন্যে 'সূচক' (বা 'শোচক') পদ বলছি।

এই হিসেবে সাধারণ বন্দনাপদ ২২টি। তন্মধ্যে শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দ প্রশস্তি ৩টি করে, নরোত্তম প্রশস্তি ২টি এবং বল্লভ ভট্ট, গদাধর ভট্ট, গদাধরদাস, গদাধর পণ্ডিত, গতিগোবিন্দ, হরিরামাচার্য, রামকৃষ্ণাচার্য, গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী,

রসিক মুরারি, শ্রীবাস, রামচন্দ্র কবিরাজ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দদাস কবিরাজ, নরহরি সরকার প্রমুখ ১৪ জনের ১টি করে বন্দনাপদ ১৪টি।[৫]

নরহরির বন্দনা-পদের বৈশিষ্ট্য :

১। বন্দনা কবিতা রচনায় নরহরির বিশেষ প্রবণতা ছিল। সংখ্যার বিপুলতা দেখে তা প্রমাণিত হয়।

২। পদগুলি অধিকাংশই আয়তনে ক্ষুদ্র।

৩। নরহরি ইতিহাস সচেতন কবি। তথ্যের সমাবেশ তাঁর অধিকাংশ পদে। কিন্তু এই পদগুলিতে তথ্য বা ঘটনা বলে কিছু নেই। উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের বহিরঙ্গিক জীবনকে সম্পূর্ণ বর্জন করে কবি তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। অন্যত্র কবি উপাদান সংগ্রহের জন্য উন্মত্তবেগে নানাস্থানে বিচরণ করেছেন, এখানে তাঁর কল্পনার বেগ অন্তর্মুখী। উদ্দিষ্ট ব্যক্তির অন্তর্লোকের রহস্যঘন চিত্র অংকনেই তিনি আনন্দিত।

৪। নরহরি শিল্পসচেতন কবি। কিন্তু এই পদগুলিতে তাঁর শিল্পবুদ্ধি সক্রিয় নয়। ছন্দ অলংকারের ঘনঘটা এখানে প্রশমিত। তার পরিবর্তে এগুলিতে কবির শান্ত ও দাস্য ভক্তির সংযত ও নম্র প্রকাশ। তাঁর ভাবুক কোমল রসদৃষ্টি ও আন্তরিক বিনয়ের প্রকাশ। উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি তাঁর

---

৫ শ্রীনিবাস—জয় শ্রীনিবাস আচার্য আনন্দময় (গৌ. চ. চি. পৃঃ ৯), জয় জয় গুণমণি (ভক্তি. পৃঃ ৬৩৫)। জয় শ্রীনিবাস আচার্য জগতজনজীবন (ভক্তি. পৃঃ ৬৩৫)। শ্যামানন্দ—শ্যামানন্দ কৃপাময় (গৌ· চ. চি. পৃঃ ১০)। জয় জয় সুখময় (ভক্তি. পৃঃ ৬৪৪)। জয় শ্রীদুঃখিনী (ভক্তি. পৃঃ ৬৪৬)। নরোত্তম—জয়তু শুভমণ্ডিত (ভক্তি. পৃঃ ৬৪১)। জয় শ্রীনরোত্তম পরম উদার (ভক্তি. পৃঃ ৬৩৫)। বল্লভভট্ট (গৌ. চ. চি. পৃঃ ৮)। গদাধর ভট্ট (গৌ. চ. চি. পৃঃ ৯)। গতিগোবিন্দ (গৌ. চ. চি. পৃঃ ১০)। গদাধর দাস (গৌরপদ তরঙ্গিনী, পৃঃ ৩০১)। গদাধর পণ্ডিত (গৌরপদ তরঙ্গিনী, পৃঃ ৩০০)। হরিরামাচার্য (গৌ. চ. চি. পৃঃ ১২)। রামকৃষ্ণাচার্য (গৌ. চ. চি. পৃঃ ১৩)। গঙ্গানারায়ণ (গৌ. চ. চি. পৃঃ ১৩)। রসিক মুরারি (গৌ. চ. চি. পৃঃ ১৩)। শ্রীবাস (গৌরপদ তরঙ্গিনী পৃঃ ৩০১)। রামচন্দ্র কবিরাজ (গৌ. চ. চি. পৃঃ ১১)। কৃষ্ণদাস (গৌ. চ. চি. পৃঃ ৯)। গোবিন্দদাস কবিরাজ (ভক্তি. পৃঃ ৬৩৪)। নরহরি সরকার (গৌরপদ তরঙ্গিণী পৃঃ ৩০৩)॥

পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। ফলে তাঁর কবিচিত্তের একটি বিশেষ অনুরাগ এগুলিতে অভিব্যক্ত।

৫। উদ্দিষ্ট ব্যক্তিরা সকলেই নিষ্কিঞ্চন বৈরাগী। তাঁদের প্রত্যেকের জীবনই সরলরেখার মতো। সেজন্যে এই পদগুলির প্রধান বক্তব্য এক রকমের। প্রায় সকলের সম্পর্কেই কবির মন্তব্য—'বিপুলগুণ মণ্ডিত', 'পুলক কম্পাদি' প্রভৃতি 'ভাবাবেশাবিষ্ট', 'রাধা' বা 'কৃষ্ণ' বা 'গৌরাঙ্গ 'সেবা'রত, 'সংকীর্তনপটু', 'সুবিগ্রহ সেবাকারী', 'জগজনমনরঞ্জনকারী', 'পরম উদার', 'ভক্তিদায়ক', 'দয়াল' ও 'সর্বত্র বিদিত করুণাময়'। অর্থাৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামটির স্থলে হরিরামাচার্য, বা হরিরামাচার্যের নামটির পরিবর্তে গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী বসিয়ে দিলেও পদগুলির বিষয় মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ থাকে। অন্য কথায়, এক একটি পদে এক এক জন ব্যক্তির কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য এ পদগুলিতে খুঁজে পাওয়া যায় না। বন্দনা যেন এখানে প্রাসঙ্গিক, আচার্যদের দিব্য-জীবনের ভাষ্যই এখানে মুখ্য কথা।

পরিকর ও কবিদের যুক্তভাবে বন্দনার ৭টি পদে[৬] নামের তালিকা ছাড়া অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। কোথাও কোথাও দু একটি তথ্য কারো কারো প্রসঙ্গে উল্লিখিত মাত্র॥

সূচক ('শোচক') পদ

তিরোভূত বৈষ্ণব আচার্য, মহাজন ও গৌরাঙ্গ পরিবারের মুখ্য ব্যক্তিদের স্মরণার্থে বন্দনাত্মক অথচ জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনা অবলম্বনে দীর্ঘ পদ রচনাতেও নরহরি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এ পর্যন্ত তাঁর রচিত অনুরূপ পদ মিলেছে ২৯টি।

বরাহনগর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরের খণ্ডিত ২৬১২ নং পুথিতেই ১৭টি[৭]—শচীমাতা, জগন্নাথ মিশ্র, বিশ্বরূপ, গদাধর দাস, গদাধর পণ্ডিত, গৌরীদাস,

---

৬ যুক্তভাবে পরিকর বন্দনা: জয় গৌর গোবিন্দ আনন্দ (গৌরচরিত্রচিন্তামণি পৃঃ ৫। কৌন বরণব গৌর পরিকর (ঐ পৃঃ ১৪), গৌরভক্ত অনন্ত নিত্য (ঐ পৃঃ ১৫), জয় গৌর-চন্দ্র প্রিয় (গীতচন্দ্রোদয় পুথি পত্র ৫ক), গৌরগোবিন্দ পরিকর অতি উদার (ঐ পত্র ৬ক)।

যুক্তভাবে কবি বন্দনা: জয় প্রভু প্রিয় কবি পরম উদার (গী. চ. পুথি পত্র ৮ক) জয় জয় কবিবর পরম প্রচার (ঐ পত্র ৮খ)॥

৭ দ্রঃ পরিশিষ্ট 'ক'।

কাশীশ্বর, গোবিন্দ ঘোষ, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, লোকনাথ, হৃদয়চৈতন্য, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, রসিক গোঁসাই, শ্রীরূপগোস্বামী, সনাতন গোস্বামী ও গোপালগুরু সম্পর্কে লিখিত।

'ভক্তি রত্নাকরে' আছে—৩টি[৮] : শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ সম্বন্ধে রচিত।

'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে পাই ১টি[৯] : হেমলতা ঠাকুরাণী সম্পর্কে লেখা। এবং 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে সংকলিত আরো দুটি নতুন পদ[১০] : জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস কবিরাজ সম্পর্কে।

অধুনাপ্রাপ্ত কবির 'গীতচন্দ্রোদয়' মঙ্গলাচরণ পুথিতে অনুরূপ পদ আছে ৬টি, জয়দেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সম্পর্কে। প্রত্যেকের সম্পর্কে ২টি করে।[১১]

পাঠবাড়ীর ২৬০৯ নং এবং ২৬১২ নং পুথিতে এই পদগুলিকে সূচকপদ বলা হয়েছে।[১২] ২৬১২ নং পুথিটি খণ্ডিত বলে গ্রন্থটির নাম জানা যায় নি। গ্রন্থ মন্দিরের অধ্যক্ষ এই পুথির নাম দিয়েছেন "গৌর পরিকরগণের সূচক"।

আচার্য ডঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় এই জাতীয় পদকে "শোচক" পদ বলে অভিহিত করেছেন।[১৩]

শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য রাধাবল্লভদাস এই সূচক পদ প্রথম রচনা করেন। ১৭শ শতাব্দের প্রথম দিকে রূপ-সনাতন ও রঘুনাথ দাসের তিরোভাব-তিথিতে তাঁদের জীবনচরিত স্মরণার্থে সূচক পদগুলি কীর্তন করে শোনানোর রীতি চালু

---

৮ 'ভক্তি-রত্নাকরে' এই তিন আচার্য সম্পর্কে একাধিক পদ আছে। কিন্তু নিম্নোক্ত তিনটি পদেই তিন ব্যক্তির জীবন কাহিনী সংকলিত হয়েছে। অন্যগুলিতে তাঁদের ভাবজীবনের মাধুর্য প্রকাশিত।

১। শ্রীনিবাস—এ মোর জীবনপ্রাণ পরম করুণাবান (মঠ ২য় সং পৃঃ ৬৩৯)।

২। নরোত্তম—ও মোর করুণাময় শ্রীঠাকুর মহাশয় (ঐ পৃঃ ৬৪০)।

৩। শ্যামানন্দ—ও মোর পরাণবন্ধু শ্যামানন্দ (ঐ পৃঃ ৬৪৫)।

৯ পৃঃ ১১।

১০ ২য় সং, পৃঃ ৩১৩, ৩২০।

১১ বরাহনগর পুথি নং ২৫৩৪।৩, জয়দেব (পত্র ৬ক, ৬খ), বিদ্যাপতি (পত্র ৬খ, ৭ক); চণ্ডীদাস (পত্র ৭ক, ৭খ)।

১২ ২৬০৯ পুথিতে 'লোকনাথ' অংশে (পত্র ৫ক)।

১৩ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম অপরার্ধ, ৪র্থ সং) পৃঃ ৫৫, ৯৯।

হয়। রাধাবল্লভ দাসের ভণিতায় ৮টি স্থচক বৈষ্ণবদাসের 'পদকল্পতরু'তে এবং এই ৮টি ছাড়াও আরো ৩টি পদ 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে সংকলিত হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর 'সনাতন গোস্বামীর স্থচক' নামক গ্রন্থটি বৈষ্ণব সমাজে সমাদর লাভ করেছিল।

বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতকের অনেক বৈষ্ণব কবিই স্থচক পদ রচনা করেছেন। গৌরপদতরঙ্গিণীতে প্রেমদাসের ৩টি, শিবানন্দ বা শিবাইদাসের ১টি, কানু দাসের ১টি, পাপিয়া শেখরের ১টি, উদ্ধবদাসের ৫টি, রায় শেখরের ১টি, রাজবল্লভের ১টি, বল্লভদাসের ২টি, মনোহরের ২টি পদ সংকলিত দেখা যায়।

নরহরির সূচক পদের বৈশিষ্ট্য ঃ

এক। গুর্বাদি বন্দনার মতো স্থচক পদ রচনাতেও নরহরির সবিশেষ উৎসাহ ছিল। মনে হয়, তিনিই সচেতনভাবে গৌর-পরিবার ও পরিকরদের প্রত্যেকের উপর স্থচক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। গৌরাঙ্গের পিতা জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী, জ্যেষ্ঠ সহোদর বিশ্বরূপ, ঈশ্বরপুরীর শিষ্য গৌরগোবিন্দ বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাতা কাশীশ্বর, বাসু-মাধব ঘোষের ভ্রাতা কবি কীর্তনীয়া গোবিন্দ ঘোষ, গদাধরের শিষ্য বক্রেশ্বর, গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়চৈতন্য, বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য মকরধ্বজ বা গোপাল গুরু, হেমলতা ঠাকুরাণী ও শ্যামানন্দ প্রমুখ ৯ জন গৌরপরিকরের স্থচক নরহরি ছাড়া অন্য কোনো কবি রচনা করেছিলেন বলে জানা যায় না।

দুই। পদগুলির কোনো কোনোটি সুদীর্ঘ, ৬০-৯৬ চরণের ত্রিপদীও আছে।

তিন। নরহরির স্বভাবজাত ঐতিহাসিক চেতনা এই পদগুলিতেও পরিস্ফুট হয়েছে। উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনের কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন তথ্য এগুলিতে খুঁজে পাওয়া যায়। তবে রাধাবল্লভ দাস ও মনোহরদাসের স্থচকেও সে তথ্যের অনেকগুলিই আছে। তবুও নতুন ঐতিহাসিক তথ্য কম নয়। আসলে নরহরি 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাসে' ১৬শ-১৭শ শতাব্দীর বৈষ্ণব-ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে সচেতনভাবে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, যা বিস্তারিতভাবে তাঁর উক্ত দুই গ্রন্থে পাওয়া যায়, স্থচকে পাওয়া যায় তারই সংক্ষিপ্ত রূপ। তবে তাঁর রচিত জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের স্থচকে প্রাপ্ত নতুন তথ্য অন্যত্র উল্লিখিত হয় নি।

নতুন তথ্য

১। লোকনাথ সূচকে নরহরি বলেছেন, লোকনাথই প্রথম বাঙালী বৈষ্ণব, যিনি চৈতন্য আজ্ঞায় সর্বপ্রথম বৃন্দাবনে বসতি স্থাপন করে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব তত্ত্বকে প্রচার করেন। তাঁর অনেক পরে সুবুদ্ধি মিশ্র, শ্রীরূপ, সনাতন, গোপাল ভট্ট প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্যেরা বৃন্দাবনে আগমন করেছিলেন।

২। চণ্ডীদাস সূচক-এ নরহরি নানোরবাসী বাসুলীসেবক চণ্ডীদাসের সাধনসঙ্গিনী 'ধুবিনী'র প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। ধুবিনীর সম্পর্কে এটাই প্রাচীনতম উল্লেখ।

৩। জ্ঞানদাস সূচকে নরহরি বলেন, জ্ঞানদাস চিরকুমার ছিলেন।

'আকুমার বৈরাগ্যেতে রত বাল্যকাল হৈতে
দীক্ষা লৈলা জাহ্নবার পাশ।'

প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলাম এ জন্যে যে, সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও "জ্ঞানদাস বিবাহিত ছিলেন" বলে মনে করেন।[১৪] নরহরি চক্রবর্তীর জীবৎকালে জ্ঞানদাস এতটা সুখ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে, নরহরি বলেন,

অদ্যাপি কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাস কবি নামে
পূর্ণিমাতে হয় মহামেলা।
তিনদিন মহোৎসব আসেন মোহান্ত সব
হয় তাঁহাদের লীলাখেলা॥

সাহিত্যরত্ন মহাশয় এই সংবাদ পেয়ে এক সময় জ্ঞানদাসের জন্মভিটা পরিদর্শনেও গিয়েছিলেন। নরহরি বলেন, খেতুরী উৎসবে জ্ঞানদাস তাঁর বন্ধু 'বাবা আউলে'র সঙ্গে উপস্থিত হন।[১৫]

---

১৪ জ্ঞানদাসের পদাবলী, (ক. বি.), পৃঃ (ভূমিকা) ৪।

১৫ সূচকে নরহরি লিখেছেন : "মদনমঙ্গল নাম রূপে গুণে অনুপাম আর এক উপাধি মনোহর। খেতুরীর মহোৎসবে জ্ঞানদাস গেলা যবে বাবা আউল ছিল সহচর।" এ থেকে বোঝা যায়, 'মদনমঙ্গল' নামক এক ব্যক্তির অন্য উপাধি 'মনোহর'। কিন্তু এই 'মদনমঙ্গল-মনোহরে'র সঙ্গে 'বাবা আউলে'র সম্পর্ক বোঝা যায় না। স্বাভাবিকভাবে মদনমঙ্গল মনোহরকে বাবা আউল বলে প্রতীতি জন্মে।

'গৌরপদ তরঙ্গিণী'তে (২য় সং) ৩১৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত রাধাবল্লভের পদে জ্ঞানদাসকেই "মঙ্গল-

৪। হৃদয়চৈতন্য সূচকে শ্যামানন্দের গুরু ও গৌরীদাস-শিষ্য হৃদয়চৈতন্যের চরিত্র ও জীবন-কথা বর্ণনা করতে গিয়ে নরহরি একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এই হৃদয়চৈতন্যের প্রসঙ্গ কোনো চৈতন্যচরিত গ্রন্থে বা বৈষ্ণব-বন্দনাতেও মেলে নি। সেজন্যে ঘটনাটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করা দরকার।

বাল্যকালে হৃদয় গদাধরের আশ্রয়ে থাকতেন। গৌরীদাস গদাধরের নিকট হৃদয়কে গ্রহণ করে (ভিক্ষা করে) গৃহে আনেন ও দীক্ষা দেন। একদা গৌরীদাস হৃদয়কে একাকী বাড়ীতে রেখে প্রবাস গমন করেন। পূর্ব প্রচলিত ও নির্ধারিত উৎসবের দিন যতই ঘনিয়ে আসে, গুরুর অনুপস্থিতিতে হৃদয় ততই বিচলিত হন। অবশেষে তিনি গুরুর হয়ে যথাস্থানে নিমন্ত্রণাদি করেন।

বাড়ী ফিরে গৌরীদাস শিষ্যের এই কাজে এমনই ক্ষুন্ন হন যে, হৃদয় বিতাড়িত হন। ক্রন্দনরত হৃদয় গঙ্গাতীরে নাম জপ করতে আরম্ভ করেন। এমন সময় কোনোও 'ভাগ্যবান ব্যক্তি' উৎসবের সামগ্রী এনে হৃদয়কে দিয়ে যান। হৃদয় গুরুকে খবর পাঠান। কিন্তু গুরু আরো বেশী ক্রুদ্ধ হন।

অগত্যা হৃদয় অসাধারণ পরিশ্রম করে গঙ্গাতীরেই যথারীতি উৎসব আরম্ভ করেন। উৎসবে গৌরীদাসের নিত্য পূজিত বিগ্রহ দুটিও (গৌর-নিতাই) নৃত্য করেন। গৌরীদাস মন্দিরে বিগ্রহ না দেখে, তা যে হৃদয়ের কাজ তা অনুমান করে হৃদয়কে শাস্তি দিতে আসেন। এসে বিগ্রহ দুটির নৃত্য দর্শনে তিনি আশ্চর্যান্বিত হন। এবং হৃদয়কে বুকে টেনে নেন।

উল্লিখিত 'বিগ্রহের নৃত্য' অংশ ব্যতীত বাকী ঘটনা হৃদয়ের জীবনে সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নয়। নরহরির কালে শ্যামানন্দের গুরু হৃদয়ের সম্পর্কে এই নৃত্য বিষয়ক অসম্ভব ধারণাও ভক্ত মানুষের মনে সৃষ্ট হওয়া সম্ভব।

ঠাকুর' বলা হয়েছে। নরহরি নিজেও 'ভক্তি রত্নাকরে' (১৪শ তরঙ্গ) কান্দড়া গ্রামকে-'মঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয়' বলেছেন। এই 'মঙ্গল' জ্ঞানদাসের উপাধি নাও হতে পারে, মঙ্গল ও জ্ঞানদাস দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব নয়।

'বীরভূম বিবরণে'র ৩য় খণ্ডে (পৃঃ ১৬১-১৬২) আছে, আউলিয়া মনোহর ও জ্ঞানদাস দুজনে বন্ধু, কাঁদড়াবাসী। 'চৈতন্যচরিতামৃতে', 'ভক্তিরত্নাকরে' ও 'নরোত্তমবিলাসে' জ্ঞানদাসের সঙ্গে মনোহরের নাম একত্রে উল্লিখিত। এ থেকে মনোহর ও জ্ঞানদাসের বন্ধুত্ব হয়, কিন্তু মদনমঙ্গল যে মনোহর তা প্রমাণিত হয় না। অর্থাৎ মদনমঙ্গল ও বাবা আউল একব্যক্তি কিনা বলা কঠিন। আপাততঃ অন্য প্রমাণাভাবে মদনমঙ্গল-মনোহরকে বাবা আউল বলে গ্রহণ করতে হয়।

৫। গোপালগুরু শ্রীমকরধ্বজ সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্যই এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নি। দেবকীনন্দনের বৃহৎ বৈষ্ণব বন্দনায়[১৬] মাত্র ৪টি চরণে তাঁর বন্দনা আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬৫৫ সংখ্যক কৃষ্ণদাস ভণিতাযুক্ত "গৌরগণোদ্দেশ" নামক পুথিতে গুরুগোপালের কথা আছে। কিন্তু নরহরিই সর্বপ্রথম জানালেন যে, গোপালগুরুর নাম মকরধ্বজ, এঁর গুরু বক্রেশ্বর। এই মকরধ্বজ মকরধ্বজ কর হওয়াই সম্ভব। যার বন্দনা বৃন্দাবনদাসের ও দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনায়,[১৭] শ্রীজীবের নামে আরোপিত সংস্কৃত বৈষ্ণব বন্দনায়, চৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে, কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যের পঞ্চদশ সর্গের ১০৬ সংখ্যক শ্লোকে ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে (পৃঃ ১৪৫) পাওয়া যায়।

নরহরি বলেন, কোনো একটি বিশেষ কর্ম সম্পাদনের জন্য শ্রীচৈতন্য স্বয়ং তাঁকে 'গুরু' আখ্যায় ভূষিত করেন :

'গোপাল প্রভুর প্রতি শিক্ষাদিল এক রীতি প্রভু প্রেমাবেশে ঢুলি ঢুলি।'
কহে সভে বারে বারে আজি হৈতে গোপালেরে ডাকিবে গোপাল গুরু বুলি॥

কিন্তু কবি গোপালের এই উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকর্মটির উল্লেখ করেন নি। অন্যত্র উল্লেখের অভাবে তা জানবার উপায় নেই।

নরহরির অন্যান্য সূচক পদে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু এই সংক্ষেপ কর্মও এমন সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়েছে যে, যা অপরাপর সূচককারদের পদে দেখা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ সনাতন গোস্বামীর সূচকটি গ্রহণ করা যায়।

সনাতন সম্পর্কে বল্লভদাস ও মনোহরের ভণিতায় ২টি করে সূচক পদ 'পদকল্পতরু'তে সংকলিত হয়েছে। নরহরির সূচকের বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে এগুলির তুলনা করলেই নরহরির কৃতিত্ব বোঝা যায়। নরহরির সূচকের বিষয়—

'সনাতন কুমারদেবের পুত্র, দক্ষিণ দেশাধিপতি মুকুন্দদেবের পৌত্র, রূপের জ্যেষ্ঠ সহোদর॥

১৬ বরাহনগর পাঠবাড়ীর পুথি নং ৮০১ (১৭১৯ শকের অনুলিপি) গোপালগুরুর "বক্রেশ্বরাষ্টকম্" নামক ছুটি পুথি পাঠবাড়ীতে আছে নং ১৪০, ৬৭৭ (সং-পুথি)। ভক্তিরত্নাকরে (২য় সং গৌড়ীয় মঠ, পৃঃ ৩৭৫) নরোত্তমের সঙ্গে গোপাল গুরুর মিলন বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থে গোপাল গুরুর শ্লোকও উদ্ধৃত হয়েছে।

১৭ বৈষ্ণববন্দনার ছুটি বই-ই এককালে অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর সম্পাদনায় মুদ্রিত হয়েছিল।

তিনি পাতসার উজির ॥

(চৈতন্যের প্রভাবে রূপের রাজকার্য থেকে পলায়নের পর) সনাতন বন্দী হন। রূপের পত্র পেয়ে তিনিও পলায়নের পথ খোঁজেন। যবন রক্ষীকে ৭ হাজার মুদ্রা দিয়ে তিনি এক রাত্রে গঙ্গাপারে পলায়ন করেন। দিনরাত্রি পায়ে হেঁটে তিনি পাতড়া পর্বতের সানুদেশে এক 'ভুঁআ'র (ছুইমানি নাম) গৃহে ওঠেন। ভুঁআ আশ্রয় দেয়। তাকে 'দুষ্ট' জেনে সনাতন তাঁর ভৃত্য ঈশানের কাছে রক্ষিত ৭টি স্বর্ণমুদ্রা ভুঁআকে দেন। ভুঁআ তাঁকে ৪ জন লোক সহ পর্বত পার করে দেয়। সনাতন তখন ঈশানকে বিদায় দিয়ে হাজিপুরে শ্রীকান্তের বাসায়, সেখান থেকে কাশীপুরে চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে আসেন ॥

চন্দ্রশেখরের গৃহেই চৈতন্যের সঙ্গে তাঁর পুনর্বার সাক্ষাৎ ঘটে। চৈতন্য স্বহস্তে সনাতনের 'অঙ্গধূলা' মুছে দেন। সনাতনের দেহে ভোটকম্বল দেখে চৈতন্য কিছুটা ক্ষুণ্ণ হন। সনাতন তখন গঙ্গাস্নানে গিয়ে ভোট-কম্বল এক গৌড়ীয়াকে দিয়ে তার ছেঁড়া কাঁথা গায়ে নিয়ে ফেরেন ॥

প্রভু সনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠান। সনাতন মথুরায় সুবুদ্ধি মিশ্রের ঘরে আসেন। সুবুদ্ধি বলেন যে, কিছু আগেই সেখানে শ্রীরূপ এসে প্রভুর দর্শনে গেছেন। বৃন্দাবনে এসে সনাতন লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করেন। রূপের সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটে। ভাগবতামৃতাদি গ্রন্থ লিখেন, নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করেন; মাধুকরী দ্বারা, ফলাদি ভক্ষণে ও বিগ্রহ সেবায় দিনাতিপাত করেন ॥

বল্লভদাসের সূচকে পাই—

তরু ২৩৬১ সংখ্যক—রূপের বৈরাগ্যকালে সনাতন বন্দীশালায় বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় অতি কষ্টে ব্যাকুলচিত্তে অবস্থান করেন। এমন সময় রূপের পত্রী আসে।

তরু ২৩৬২ সংখ্যক—সনাতন পাতসার উজির। শ্রীরূপের পত্র পেয়ে বন্দীশালা থেকে পলায়ন করে কাশীপুরে গৌরাঙ্গের সঙ্গে মিলিত হন। তাঁর ছেঁড়াবস্ত্র, মলিন অঙ্গ, আঙুলে নখ, মাথায় চুল, গলায় ছিন্ন কন্থা, দন্তে তৃণ। চৈতন্য দরবেশকে কোলে তুলে নেন। সনাতনের গায়ের ভোটকম্বল চৈতন্য দেখেন। লজ্জিত সনাতন গৌড়ীয়াকে ভোট দান করে

ছেঁড়া কাঁথা নিয়ে পুনরায় চৈতন্যচরণে উপনীত হন। রাধাকৃষ্ণ-নাম-মাধুরী শিক্ষা দিয়ে সনাতনকে প্রভু বৃন্দাবনে পাঠান। বিচ্ছেদকাতর সনাতন বৃন্দাবনে এসে মাধুকরী ও ফলমূল দ্বারা জীবন রক্ষা করেন। তরুতলে বাস করেন। রাধাকৃষ্ণ বলে ক্রন্দন করেন। ৫৬ দণ্ডে তাঁর গৌর ভাবনা, স্বপ্নে তিনি রাধাকৃষ্ণ দর্শন করেন॥

মনোহরদাসের সূচকে আছে—

তরু-২৩৬৬—সনাতন সকল সুখ সম্পদ ত্যাগ করে চৈতন্যচরণ সার ভেবে বৃন্দাবনে বাস করেন। লুপ্ততীর্থ প্রকাশ, গোবিন্দ সেবা, ভাগবতের অর্থ-বিচার, লীলা গ্রন্থ রচনা, বৃন্দাবনে ভ্রমণ তাঁব তখনকার কাজ ছিল॥

তরু-২৩৬৭—রাধাকৃষ্ণ সাধক, বৈরাগী সনাতন বৃন্দাবনে বাস করেন। গোপাল ভট্ট রঘুনাথ প্রভৃতিব সঙ্গে মিলিত হন। যুগলভজন ও গৌরগুণ-গান তাঁর নিত্যকর্ম॥

সুতরাং সহজেই বোঝা যায় যে, নরহরি যথার্থ ঐতিহাসিকের মতো সনাতনের পূর্ণাঙ্গ জীবনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। আর কিছু কিছু তথ্য দিয়েছেন বল্লভ ও মনোহর। বল্লভ ও মনোহর সনাতনের ভাবজীবনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, নরহরি তাঁর তথ্যনিষ্ঠ জীবনীর উপর মনোনিবেশ করেছেন।

এমনিভাবে নরহরি শ্রীরূপ, গৌরীদাস, কাশীশ্বর, বক্রেশ্বর, ভট্ট রঘুনাথ, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি সূচকে তাঁদেব জীবনের তথ্যনিষ্ঠ পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। নরহরির ঐতিহাসিক সংস্কার যে সে যুগে সকল কবি অপেক্ষা বেশী ছিল, সূচকগুলিই তার প্রমাণ।

চার। নরহরির কোনো কোনো সূচকে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির চরিত্রমাহাত্ম্য ও হৃদয়বত্তার চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে। শচীমাতার সূচকে পাই, গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগী হয়েছেন। শচীর তখনকার নিষ্ঠুর মর্মযন্ত্রণা ও বাঁধভাঙ্গা ব্যাকুলতা কবি শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মতো তুলে ধরেছেন :

ছটফট করে তনু প্রাণত্যাগ করে জনু স্থির হৈতে নারে একক্ষণ।
নদীর প্রবাহ পারা দুনয়ানে বহে ধারা ফুকারিয়া কর এ ক্রন্দন॥
দুই হাথ মাথে করি ডাকে অতি উচ্চ করি হা হা প্রাণ নিমাই বলিয়া।
অনাথিনী জননীরে কেমনে ছাড়িলে মোরে নিপট কঠিন তোর হিয়া॥

কাহারে করিব রোষ আপন করম দোষ নহিলে কি হয় হেন কাজ।
না দেখি তোমার তরে কেমনে রহিব ঘরে বিহি শেল দিল বুক মাঝ॥
ও মুখ পূর্ণিমা শশী মধুর মধুর হাসি কে মোরে ডাকিবে মা বলিয়া।
কহি সুমধুর কথা কে ঘুচাবে মন বেথা ঘরে রব কাহারে দেখিয়া॥

এই বর্ণনার মধ্যে অনুপ্রাস নেই, অলংকার নেই, কষ্ট কল্পনাও নেই, কিন্তু দুই চারিটি কথায় কবি শচীর জননী হৃদয়ের পরিচয়টি প্রকাশ করেন। মাতৃপ্রাণের স্নেহস্পষ্ট আতুরতা, তাঁর অন্তঃস্থলের গভীর দীর্ঘশ্বাস যেন পাঠক সহজেই অনুভব করে। তাই শচী মায়ের এই ছবিটি বড় মর্মান্তিক, বড় হৃদয়বিদারক।

নরহরির সাধারণ বন্দনা ও সূচক পদগুলি পাঠ করে মনে হয় যে, বন্দনা-পদে কবি ভক্তজীবনের বস্তুরসকে গৌণ করে তাঁদের অধ্যাত্মভাব ব্যঞ্জনাকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। আর সূচকপদে ভক্তের ভক্তি রাজ্যে পৌছানোর পূর্বাভাসরূপে জীবনকাহিনী বিবৃত করেছেন। বন্দনা পদে তিনি শ্রদ্ধাবনত বৈষ্ণবভক্ত, সূচকে তথ্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক ও গবেষক। এক সময় তিনি বহির্লোকে বিচরণ করেন, অন্য সময় অন্তর্লোকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। কখনো তিনি জীবন তথ্য খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত, কখনো জীবনের রসাস্বাদে আত্মহারা। তাই বন্দনাপদে সমস্ত গতানুগতিকতা, পৌনঃপৌনিকতা সত্ত্বেও নরহরির নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ধরা পড়ে, আর সূচকে পাওয়া যায় উদ্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব॥

পদাবলীর অবলম্বিত প্রধান বিষয়

বৈষ্ণব কবিদের পদ রচনার প্রধান বিষয় দুটি—রাধাকৃষ্ণলীলা এবং গৌরাঙ্গলীলা। নরহরিও এই দুই বিষয়ের উপর অসংখ্য পদ রচনা করেছেন। তাঁর 'ভক্তি রত্নাকর' ও 'গীতচন্দ্রোদয়ে' ('মঙ্গলাচরণ' পুথি ও মুদ্রিত 'পূর্বরাগ') উভয় বিষয়ের পদ আছে। 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে প্রধানতঃ গৌর-বিষয়ক পদাবলী সজ্জিত হয়েছে।

১। **'ভক্তি রত্নাকর'** মূলত আখ্যান কাব্য। শ্রীনিবাস এবং সেই সঙ্গে নরোত্তম, রামচন্দ্র ও শ্যামানন্দের জীবনী বর্ণনাই এখানে কবির মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই আখ্যানেরই পরিপ্রেক্ষিতে এ গ্রন্থে পদাবলী সজ্জিত। বলা বাহুল্য, পদগুলি সংযোজিত না হলেও প্রতিপাদ্য বিষয়ের কোনো ক্ষতি হতো না।

সাধারণ পয়ারে কবি যে তথ্য পরিবেশন করেছেন, তাকেই রসসমৃদ্ধ বা গীতময় করবার উদ্দেশ্যেই পদগুলি সংকলিত হয়েছে। বর্ণিত বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি পূর্বজ কবিদের পদাবলী প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করেছেন। তখন নিজের অসংখ্য পদের কিছু কিছু তার সঙ্গে জুড়ে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারেন নি।

এই গ্রন্থে তাঁব উভয় ভণিতার উভয় বিষয়ক পদের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৯ এবং ১৭৮। রাধাকৃষ্ণলীলার পদ আছে গ্রন্থটির ৫ম তরঙ্গে ৪৩টি ও ১৩শ তরঙ্গে ৬টি। গৌরাঙ্গলীলার পদ আছে ১২শ তরঙ্গেই ১৭৮টি। ৫ম তরঙ্গের বর্ণনীয় বিষয় রাঘব গোস্বামীর সাহায্যে শ্রীনিবাসাদির বৃন্দাবন পরিক্রমা। শ্রীজীবের নির্দেশে রাঘব গোস্বামী তাঁদের কৃষ্ণলীলার প্রতিটি স্থানে নিয়ে গেছেন এবং প্রতিটি স্থানের সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী, পুরাবৃত্ত, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করেছেন। তাঁর সেই বর্ণনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাঁরই মুখে এই রাধাকৃষ্ণ লীলার পদগুলি প্রকাশিত হয়েছে। তেমনি ১৩শ তরঙ্গে বীরচন্দ্র প্রভুর বৃন্দাবন ভ্রমণ কালে বাসুদেবের লীলাস্থলীর পরিচয় প্রদানে রাঘবেবই মুখে উল্লিখিত ৬টি পদ বিবৃত হয়েছে। আবার ১২শ তরঙ্গের মুখ্য বিষয় ঈশানেব তত্ত্বাবধানে শ্রীনিবাস নরোত্তম রামচন্দ্রের নবদ্বীপ মণ্ডল পরিভ্রমণ। ঈশান তাঁদের গৌর-লীলার প্রতিটি স্থানের পরিচয় প্রদানকালে উল্লিখিত পদগুলি প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ কাহিনীর টানেই 'ভক্তিরত্নাকরে'র পদগুলি সজ্জিত হয়েছে।

সেজন্যে পদগুলি পালাবদ্ধ হিসেবে সাজানো হয় নি। বিশেষ করে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলিতে কোনো রকম ধারাবাহিকতা নেই। বৈষ্ণব পদাবলীতে সাধারণতঃ পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মিলন, বিরহ ও ভাবসম্মিলন—এই ভাবে পদ সজ্জিত হয়েছে। এতে লীলার একটা আদি-মধ্য-অন্ত্যরূপ খুঁজে পাওয়া যায়; পাঠক বা শ্রোতার মনেও কাহিনী সবিশেষ উপভোগ্যতা লাভ করে। কিন্তু 'ভক্তিরত্নাকর' পালাবদ্ধ রসকীর্তনের গ্রন্থ নয়, পদ সংকলিত হলেও বিশুদ্ধ পদাবলী সংকলন নয়। এখানে প্রধান কাহিনী বা বক্তব্যবিষয়কে পুষ্ট করার জন্যেই পদগুলির আনয়ন। সুতরাং উপন্যাসের উপকাহিনীর মতো মূল কাহিনীকে পুষ্ট করাতেই এগুলির সার্থকতা, এগুলির সামগ্রিক পালাবদ্ধরূপের প্রয়োজন হয় নি। যেখানে যে পদটি হলে

কাহিনীটি সুন্দর হয়, সেখানে সেই ভাবের পদ সংযোজিত হয়েছে। কাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষার দিকে নজর দিয়ে পদসংযোজনা—কবির লক্ষ্য নয়। সেজন্যে এ গ্রন্থের ৫ম বা ১৩শ তরঙ্গের রাধাকৃষ্ণলীলা পদগুলি পালাবদ্ধরূপ গ্রহণ করতে পারে নি। পদগুলিকে শিরোনাম দিয়ে সাজালেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে—

৫ম তরঙ্গ—শ্রীকৃষ্ণের রাধাকুণ্ডের শোভা দর্শন : শ্রীরাধার গোষ্ঠ গমনরত কৃষ্ণের রূপ দর্শন। নানাবেশধারী কৃষ্ণের রাধার সঙ্গে মিলন (স্বয়ং দৌত্য) : রাধার জন্মোৎসবলীলা : রাধাকৃষ্ণের রূপ ও নৃত্য—রাস, শয়ন, ঝুলন, মিলন : বলরামের শোভা ও নৃত্য।

১৩শ তরঙ্গ—রাধা ও কৃষ্ণের জন্মতিথি উৎসব : উভয়ের অভিষেক।

পালাবদ্ধ রস কীর্তন হিসেবে ১২শ তরঙ্গের গৌরাঙ্গ পদাবলীর মধ্যে একটি কাহিনী গত ঐক্য ও সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। নিমাই-এর জন্ম নবদ্বীপে। কবি সর্বপ্রথম একটি পদে নবদ্বীপের বন্দনা করেছেন। তারপর পদগুলিকে পাশাপাশি সাজিয়ে পাই—

জন্মলীলা : বাল্যলীলা : চূড়াকরণ, অন্নপ্রাশন, যজ্ঞসূত্রধাবণ : বিবাহ—প্রথমবার—লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে গৌরাঙ্গের প্রথম সাক্ষাৎ, বিবাহের অধিবাস, স্ত্রীআচার, বরগমন, বরসজ্জা, বিবাহ-অনুষ্ঠান, বধূসহ বরের গৃহে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি। দ্বিতীয়বার বিবাহ—অনুরূপে অধিবাস থেকে বরের প্রত্যাগমন পর্যন্ত : গৌরাঙ্গের নগরভ্রমণ : সংকীর্তন : নৃত্য ও ভাবাবেশ, অভিষেক : অষ্টকালীয় নিত্যলীলা : সন্ন্যাস গ্রহণ।

গৌর-লীলায় পরিকরদের মধ্যে প্রধান ভূমিকা অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের। এই তরঙ্গে এঁদের সম্পর্কে বেশ কিছু পদ সজ্জিত :

নিত্যানন্দের জন্ম, বিবাহ, বসুধা ও জাহ্নবার অধিবাস, নিত্যানন্দের নৃত্য ও রূপ। অদ্বৈতের জন্ম, নৃত্য, রূপ ও ভাবাবেশ।

২। 'গীতচন্দ্রোদয়ে' পালাবদ্ধ ভাবে পদাবলী সজ্জিত। কীর্তনের উদ্দেশ্যেই গ্রন্থটি সংকলিত। এর 'মঙ্গলাচরণ' পুথিটিতে নিম্নোক্ত ক্রম পাওয়া যায়—

গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী—প্রভুর অপরূপ রূপের বর্ণনা : রাধাভাবাকুল

গৌরাঙ্গের বিবিধ চিত্র (মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা অভিসারিকাদি)। প্রসঙ্গতঃ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের বিবিধ ভাব প্রকাশ।

রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী—উভয়ের রূপ বর্ণনা।

৩। **'গীতচন্দ্রোদয় পূর্বরাগ'** গ্রন্থের ক্রম—

শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্বরাগ (গৌরদর্শনে নায়িকাদের পূর্বরাগ)

শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ: শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ। 'এই তিন পূর্বরাগই উজ্জ্বল-নীলমণিতে নির্দিষ্ট রীতি অনুসারে বর্ণিত—(দর্শন, শ্রবণ : দশ দশা)।

নদীয়া নাগরী বিষয়ক পদ।

৪। **'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'**তে গৌর বিষয়ক পদাবলীর ক্রম—(নবদ্বীপলীলা)

শয়নবিলাস : শয্যোৎথান : ভক্তাবলী বেষ্টিত বিলাস : গৌর প্রতি বৃদ্ধদের প্রেমোৎকর্ষ : বাৎসল্যবতীদের স্নেহ ('বাল্যলীলা') : নদীয়া-নাগরী বিষয়ক পদ। অষ্টকালীয় নিত্যলীলা।

প্রসঙ্গতঃ রাধাকৃষ্ণের স্বয়ংদৌত্য বিষয়ক পদ॥

(খ) গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী

প্রভুর নবদ্বীপ লীলার প্রকাশ: শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলার সাক্ষী হিসেবে মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ-মাধব-বাসু ঘোষ, নরহরি সরকার, বংশীবদন প্রমুখের নাম করা যায়। এঁরা চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী ও লীলাপ্রচারক কবি। এঁদের রচনা পাঠ করে কিংবা ভক্ত মুখে গৌরলীলা শ্রবণ করে পরবর্তীকালের কবিরা চৈতন্য বিষয়ক পদাবলী বা জীবনী গ্রন্থগুলি রচনায় ব্রতী হন। বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ, লোচন, কৃষ্ণদাস প্রমুখ জীবনীকারদের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। নরহরি চক্রবর্তীর রচনায় বিশেষতঃ গৌর পদাবলীতে এই সমস্ত পূর্বজ কবিদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এমনকি অনেক পদে তিনি পূর্ববর্তী কবিদের পদাবলীর হুবহু অনুসরণ করেছেন। বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে তাঁর পদাবলীতে সবচেয়ে বেশী প্রভাব আছে বৃন্দাবনদাস, নরহরি সরকার, গোবিন্দদাস, যদুনন্দনদাস, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের।

দ্বিতীয়তঃ, নবদ্বীপলীলার পদাবলীতে কাহিনীগত ঐক্য থাকায়, কেবলমাত্র পদগুলির উপর নির্ভর করেই গৌরচরিত্রের বিকাশ ও পরিণতির একটা ইঙ্গিত মেলে। জন্ম থেকে নীলাচলগমন পর্যন্ত কাহিনীটির মধ্যে গৌর-জীবনীর

অধিকাংশ তথ্যই আছে, যেগুলি বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতেও পাওয়া যায়।

তৃতীয়তঃ, শিল্পকর্ম বিচারে নরহরি সর্বত্র সমান নৈপুণ্য দেখাতে পারেন নি। তবে বাস্তবধর্মী চিত্র অংকনে, অলংকারের নূতনত্বে এবং ছন্দ ও সুরের বৈচিত্র্যে তাঁর পদগুলি উপভোগ্য হয়েছে। পদগুলিতে কৃত্রিমতাও ধরা পড়ে মাঝে মাঝে। কষ্ট কল্পনা, প্রথানুগত্য, সাহিত্যিক পালোয়ানী ইত্যাদি বিষয়গুলিও দুর্লক্ষ্য নয়।

গৌরাঙ্গের জন্মলীলা

'ভক্তিরত্নাকরে' গৌরাঙ্গের জন্মলীলা বিষয়ক ৭টি পদ আছে। বৃন্দাবনদাস, এমন কি বাসু ঘোষের রচনাতেও দেখা যায় যে, তাঁরা গৌরলীলাতে কৃষ্ণলীলা আরোপ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণই যে গৌররূপে আবির্ভূত, সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই চৈতন্যোত্তর যুগের পদকারবৃন্দ পদাবলী রচনা করেছেন। বৃন্দাবন দাস তো গৌরাঙ্গলীলাকে কৃষ্ণলীলারই ছাঁচে ঢেলেছেন। নরহরি চক্রবর্তীও এই ধারণার অনুবর্তী ছিলেন। তবে জন্মলীলা পদাবলীতে এই ধারণা কিঞ্চিৎ প্রশমিত।

ফাগুন পূর্ণিমা শুভক্ষণে।
পুত্র প্রসবিয়া শচী চাহে পুত্রপানে॥
তিলে তিলে কত উঠে চিতে।
কনক নবনী ভ্রমে নারে পরশিতে॥
কত না যতনে কোলে করে।
পুত্রের জনম জানাইয়া মিশ্রবরে॥ (ভক্তি. পৃঃ ৪৯০)

তখন জগন্নাথ মিশ্র—

কত সাধে চলয়ে ধাইয়া।
না ধরে ধৈরজ চান্দ মুখে নিরখিয়া॥
লইয়া আপন প্রিয়গণে।
করয়ে মঙ্গল কর্ম পুত্রের কল্যাণে॥ (ঐ পৃঃ ৪৯০)

এর মধ্যে অসাধারণত্ব বা অলৌকিকত্ব কিছু নেই। সংসারের আর দশ জন শিশুর মতোই গৌরচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। জনক জননীর সাধারণ হৃদয়াবেগ

সাধারণভাবেই বর্ণিত হয়েছে। নরহরি বলেন, জন্মকালে চন্দ্রগ্রহণের অস্পষ্ট অন্ধকারে সারা নবদ্বীপে জনসমূদ্রে একটা বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। বাইরে গ্রহণান্ধকারে দেশবাসী সংকীর্তনে মত্ত। সূতিকাগৃহে শচীমাতা নবজাতককে কোলে নিয়ে হৃষ্টচিত্তে বসে আছেন। শিশুর জন্ম সংবাদ পেয়েই নবদ্বীপবাসী

বালক দেখিতে ধায় চারিভিতে কেহ না ধরয়ে ধৃতি।
গ্রহান্ধকারে কে চিনে কাহারে অসংখ্য লোকের গতি॥

(ঐ, পৃঃ ৪৯০)

কিন্তু শিশুর দর্শনার্থীরা শূন্যহাতে আসেন না। শচী-জগন্নাথের পুত্র জন্মেছেন, তাঁকে দেখতে আসছেন সীতাদেবী, মালিনী দেবী ও অসংখ্য পুরনারী।

নদীয়ার পুরনারী আইসে সারি সারি
লইয়া থালি ভরি দ্রব্য বহু। (ঐ, পৃঃ ৪৯১)

কোনো রকম তত্ত্ব আরোপ না করেই কবি দেখিয়েছেন, তখন কেবল নদীয়ার পথে ঘাটেই সংকীর্তন রোল ওঠে নি, জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীতেও নৃত্যগীত বাদ্যের আসর বসেছিল। ভাট নাটের জয়ধ্বনি ও বেদধ্বনিতে গৃহপ্রাঙ্গণ মুখরিত হয়েছিল। শুধু নদীয়ার পুরবাসীরাই নয়,

দশদিক হইল উজল।
পশুপক্ষী বৃক্ষলতা প্রফুল্ল সকল॥

এবং মহানন্দে অদ্বৈত আচার্য তখনো গঙ্গাতীরে হুংকার করে চলেছেন।

এই বর্ণনার মধ্যে অবশ্যই গৌরব আছে। জগন্নাথ মিশ্রকে কবি মোটামুটি সঙ্গতি সম্পন্ন রূপে চিত্রিত করে পরিবেশটিকেও জমিয়ে তুলেছেন।

কিন্তু কবি শেষ পর্যন্ত ধৈর্য রক্ষা করতে পারেন নি। একবার বলে ফেললেন, দেবতারাও স্বর্গলোক থেকে এই নবজাত শিশুকে 'স্তুতি-নতি' করছেন (ভক্তি. পৃঃ ৪৯০)।

বাল্যলীলা

নরহরির স্বরচিত বাল্যলীলার পদ আছে 'ভক্তিরত্নাকরে' ৬টি, 'গৌরচরিত্র চিন্তামণি'তে ১৬টি ও 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে ১টি, মোট ২৩টি। গৌরাঙ্গের বাল্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও নরহরির পদগুলি উপভোগ্য। শিশু নিমাইর এক অপরূপ স্নিগ্ধ চিত্র কবি এই ভাবে প্রকাশ করেছেন :

একদিন জগন্নাথ শিশু পুত্রকে কোলে নিয়ে 'চান্দমুখে' চুম দিচ্ছেন। তখন

নিমাই বাপের কোল হৈতে।
ভঙ্গি করি নাময়ে অঙ্গনে বেড়াইতে॥
হামাগুড়ি বেড়ায় অঙ্গনে।
সোনার নূপুর বাজে সুচারু চরণে॥
চলিতে হেরই উলটিয়া।
চলন মাধুরী মিশ্র দেখে দাঁড়াইয়া॥ (ভক্তি. পৃঃ ৪৯২)

এই বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মতো। পড়তে পড়তে মনে হয়, মিশ্রবরের সঙ্গে কবিও যেন স্বয়ং উপস্থিত হয়ে বালকের হামাগুড়ি দিতে দিতে বারংবার পিছন ফিরে দেখা ও পুনরায় হামাগুড়ি দেওয়ার মধুর ছবিটি কৌতুকের সঙ্গে উপভোগ করছেন। কিন্তু তার পরবর্তী অংশ বাৎসল্যরসে আরো বেশী উজ্জ্বল।

শচীমাতা পুত্রকে 'হাটন' শিক্ষা দেন :

মৃদু মৃদু কহেন হাসিয়া।
ধরো মোর অঙ্গুলি আসিয়া॥
শুনি সুখে নদীয়ার শশী।
মায়ের অঙ্গুলি ধরে হাসি॥
ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়ায়।
দুই চারি পদ চলি যায়॥
ছাড়িয়া অঙ্গুলি পড়ে ভূমে।
শচী কোলে লৈয়া মুখ চুমে॥
কোলে চড়ি চরণ দোলায়।
বাজয়ে নূপুর রাঙ্গা পায়॥
আঙ্গুলে কচালি স্তন পিয়ে।
নাহি যে উপমা তায় দিয়ে॥ (ভক্তি. পৃঃ ৪৯৩)

গৌরাঙ্গের হামাগুড়ি দেওয়া ও হাঁটা শিক্ষার অনুরূপ চিত্র পদাবলী সাহিত্যে খুব কমই আছে। মুরারি গুপ্তের 'শচীর আঙ্গিনা মাঝে' ও বাসু ঘোষের 'মায়ের অঞ্চল ধরি' ইত্যাদি দুটি পদের সঙ্গেই বর্তমান পদ দুটির তুলনা

চলে। গৃহকে অবলম্বন করে বাঙালীর আটপৌরে জীবনযাত্রা ও পারিবারিক জীবনের উজ্জ্বল চিত্র এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

শচীমাতা পুত্রকে নৃত্য শেখান। হাত ভর্তি ক্ষীর ননী সর্ দেন। নারীমণ্ডলীর মাঝে বসে শিশু 'হরি হরি' বোল বলেন। করতালি দেন।

নরহরি সৃষ্ট শচীমাতা যাদবেন্দ্র-বলরামদাস অংকিত যশোদার মতোই বাৎসল্যের প্রতিমূর্তি। সদা দুরন্ত নিমাই চঞ্চল বালকদলের সঙ্গে সর্বদা ঘরের বাইরে চলে যান। মায়ের হৃদয় পুত্রের অমঙ্গল আশংকায় টনটন করে। 'পরাণের পরাণ নীলমণি'কে তাই নানাভাবে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা, কখনো তাঁর পিতার নামে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন, কখনো অনুরোধ উপরোধ করেন। যাদবেন্দ্র-বলরামের সুরেই নরহরি শচীমায়ের আকৃতি স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করেছেন—

আরে মোর সোনার নিমাই।
আপনার ঘর ছাড়ি না যাবে পরের বাড়ী বসিয়া খেলাবে এক ঠাঁই ॥
শিশুগণ খেলাইতে আসিবে তোমার সাথে এথাই রাখিবে তা সভারে।
যখন যে চাও তুমি তাহা আনি দিব আমি কিসের অভাব মোর ঘরে ॥
যদি কেহ কিছু কয় তারে দেখাইহ ভয় বাপের নিষেধ জানাইয়া।
চঞ্চল বালক মেলে বাড়ির বাহিরে গেলে প্রাণ কি ধরিতে পারে হিয়া ॥
তিলেক আঁখের আড়ে পরাণ রহে না ধড়ে নরহরি জানে মোর দুখ।
মায়ের বচন ধর ঘরে বসি খেলা কর সদা যেন দেখি চাঁদ মুখ ॥

(ভক্তি. পৃ: ৪৯৪)

এখানে শচীমাতা বড় বেশি স্নেহময়ী, বড় বেশি সজীব। পুত্রের প্রতি এই স্নেহাতিশয্য স্বাভাবিক ভাবেই দৃষ্টিকটু বলে মনে হয় না। আট আটটি সন্তানকে হারিয়ে একমাত্র নয়নের মণি নিমাইকে তাই ব্যথাতুরা জননী নয়নকোণে ধরে রাখতে চান। নিমাই বাইরে যাবে না, অপর ছেলেরাই আসবে তার বাড়ীতে খেলা করতে—কাতরা মায়ের প্রাণ তো এমনি করে উঠবেই। এই জননী প্রাণেরই অপরূপ প্রকাশ যাদবেন্দ্রের বিখ্যাত পদে—'আমার শপতি লাগে না যাইও ধেনুর আগে পরাণের পরাণ নীলমণি'।

এ পর্যন্ত শিশু নিমাই-র চিত্রে ও চরিত্রে কোনো রকম তত্ত্ব বা অলৌকিকত্ব নেই। কিন্তু শচী-জগন্নাথ-নন্দন তো কবির কাছে শুধু মানব সন্তানই নন।

তাঁর দৃষ্টিতে 'ত্রেতায় কৌশল্যাদেবী, দ্বাপরে যশোদা'-ই তো 'কলিযুগে শচী ভাগ্যবতী' এবং যিনি রাম, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই তো কলিতে গৌরাঙ্গ-রূপে অবতীর্ণ। বৃন্দাবনদাস গৌরাঙ্গলীলাকে কৃষ্ণলীলার ছাঁচে ঢেলে সাজিয়ে ছিলেন। নরহরি চক্রবর্তী শিশুর চরিত্র অংকনে 'ভক্তিরত্নাকরে' লৌকিকতা রক্ষা করলেও 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'র ৬ষ্ঠ কিরণে শিশুকে ভাগবতের কৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন করেই দেখেছেন। ব্রজের বাৎসল্যবতী রমণীবৃন্দের সর্বোত্তম স্নেহ যেমন যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের উপর ছিল, নবদ্বীপের মাতৃকুলের সর্বোত্তম স্নেহ ছিল তেমনি শচীনন্দনের উপর।[১৮] এই গ্রন্থের একটি পদে কবি সে কথা স্মরণ করেছেন: মিশ্রগৃহে উপনীত নবদ্বীপের বৃদ্ধা রমণীকুল শিশুকে দেখে বলাবলি করেন—

> "কেহ বলে ওগো কুলের প্রদীপ নিমাই গুণের রাশি।
> আমাদের আঁখি সফল করিতে প্রকট হৈয়াছে আসি॥…
> "কেহ বলে ওগো আর শুন কিছু না বুঝি মনের গতি।
> নিজ সুত হইতে শতগুণ স্নেহ উপজে ইহার প্রতি॥
> কেহ বলে ওগো ঘর তেয়াগিয়া আসিয়ে ইহার তরে।
> তিলেক ছাড়িযে যাইতে না জানি পরাণ কেমন করে॥…
> "কেহ বলে ওগো যে বল সে বল বিধিরে এতেক চাই।
> জনমে জনমে এ বালকে যেন নত্থায় দেখিতে পাই॥ (পৃঃ ৬০-৬১)

ধীরে ধীরে কবি শিশু নিমাই-র উপর কৃষ্ণের বাল্যলীলার ঘটনাগুলি দেখাতে চেষ্টা করেন। শিশু নিমাই-র দুর্ললিত ভাব ও পাড়া-প্রতিবেশীর উপর উপদ্রব করবার চেষ্টা, ক্রন্দনরত শিশুর হরিনাম শ্রবণে সান্ত্বনা, ননী খেয়ে নিজেকে গোপতনয় বলে ঘোষণা, সর্পশিরে শয়ন, চরণচিহ্নে ধ্বজবজ্রাংকুশাদি প্রকাশ, অসুর দমনের অনুরূপ দুই চোরকে দমন, উচ্ছিষ্ট হাঁড়ির উপর বসে মাকে তত্ত্ব কথা বলা ইত্যাদি।[১৯] এই সব বর্ণনা একান্তভাবেই গোপাল লীলার অনুবর্তী। এই বর্ণনায় বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে'র আদি খণ্ডের (২য়, ৩য়) ঘনিষ্ঠ প্রভাব বর্তমান।

১৮. 'তস্মাৎ প্রিয়তম স্বাত্মা সর্বেষামপি দেহিনাম্'—শ্রীমদ্ভাগবত (স. রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন) ১০।১৪×৫৪।

১৯. গৌ. চ. চি. (৬ষ্ঠ কিরণ) ও গৌরপদ তরঙ্গিণীর (পৃঃ ৫১) পদ।

ছু একটি পদে নরহরি জননী চিত্রটিও অপরূপ ভাবে অংকন করেছেন। নিমাই-র চাঞ্চল্য প্রশমনের জন্যে একদিন শচীমাতা দেব-পূজার নৈবেদ্য প্রস্তুত করলেন। মায়ের অলক্ষিতে নিমাই এসে নৈবেদ্য খেতে খেতে বললেন, 'মুই দেবের দেবতা গো মোরে না পূজহ কি লাগিয়া'। তখন—

হায় হায় করি শচী দাবাড়িয়া যায় গো মনেতে পাইয়া বড় ভয়।
ব্যাকুল হইয়া চিতে বিচার করয়ে গো পাছে বা নিমাইর কিছু হয়॥

একমাত্র পুত্র। তারই কল্যাণার্থে যে দেব পূজার নৈবেদ্য, তা যদি দেবসেবার আগেই সেই পুত্র খেয়ে ফেলে, তখন কি কোনো মায়েরই মন স্থির থাকতে পারে? অমঙ্গল আশংকায় মায়ের ধড়ে যেন প্রাণ থাকে না।

বিবাহ

গৌরাঙ্গের বিবাহ সম্পর্কিত পদ ৫১টি। পদগুলি 'ভক্তিরত্নাকরে'র। এত অধিক সংখ্যক পদ এ গ্রন্থের অন্য কোনো বিষয়কে অবলম্বন করে সৃষ্টি হয় নি। এমন কি সমগ্র বৈষ্ণবপদসাহিত্যে গৌর বিবাহের এতগুলি পদ অন্য কোনো কবির নামেও মেলে না। লোচনের কাব্যে বিবাহের সাড়ম্বর অনুষ্ঠান আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা দাম্পত্যজীবনের দিকে মোড় নিয়েছে।

গৌরাঙ্গের প্রথমবার লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে ও দ্বিতীবার বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে বিবাহ হয়। এই দুইবারের বিবাহ উপলক্ষে কবি একই রীতিতে পদ সজ্জিত করেছেন। প্রাক্-বিবাহ অনুষ্ঠান, অধিবাস, স্ত্রীআচার, বরগমন, বরের রূপ, বিবাহ, বাসরসজ্জা, বরের বধূসহ গৃহে প্রত্যাবর্তন। লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে গৌরাঙ্গের প্রথমদর্শনও কবি সুচারুরূপে বর্ণনা করেছেন।

এ দেশে বিবাহ উৎসবে কুলনারীদেরই প্রাধান্য। অন্যান্য স্ত্রীআচার ছাড়া বরকে হলুদ মাখানো থেকে বাসর ঘরের কৌতুকালাপ পর্যন্ত তাদের ব্যস্ততার সীমা থাকে না। বাসর সজ্জায় কুলনারীদের কৌতুক বর্ণনায় নদীয়া-নাগরী-ভাবের অন্যতম প্রচারক নরহরি চক্রবর্তীর পদগুলি উপভোগ্য হয়েছে :

গোরা গুণমণি প্রাণপ্রিয়াসহ বিলসয়ে সে যে বাসর ঘরে।
কুলবধূগণ ঘন ঘন করু গতাগতি কত কৌতুকভরে॥
কেহ নানা ছল করি পরিহাস করে হাসি হাসি মনের সুখে।
কেহ গোরা করকমলে তাম্বুল দিয়া কহে দেহ লক্ষ্মীর মুখে॥
কেহ গোরাবিধুবদনে তাম্বুল দিতে চিতে বহু বাঢ়য়ে প্রীতি।

কেহো পরশের সাধে বাঁধে কেশ আউলাইয়া নারে ধরিতে ধৃতি ॥
কেহো বিশ্বম্ভর কোলে লখিমীরে বসাইয়া চারু ভঙ্গিতে চাহে।
(ভক্তি. পৃঃ ৫০৬)

গ্রামীন পরিবেশের এই কৌতুকালাপ কবি যেন প্রত্যক্ষদর্শীর মতো বর্ণনা করেছেন। বরবেশী গৌরাঙ্গের দেহসুষমা বর্ণনাতেও তিনি যেন পঞ্চমুখ হয়েছেন। বরসজ্জা থেকে বরের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত প্রত্যেকটি কবিতাতেই কবি যেন অন্য ঘটনাকে তুচ্ছ করে তাঁর দেহের সৌন্দর্যই দর্শন করেছেন। বরবেশী গৌরাঙ্গের চমৎকার একটি বর্ণনা :

নদীয়ার শশী রসিক শেখর শোভে ভালো শুভ বিবাহ বেশে।
চর্চিতাঙ্গ চারু চন্দন তিলক অর্ধচন্দ্রাকৃতি ললাট দেশে ॥
নানা পুষ্পময় বিচিত্র মুকুট শিরে সে না ছান্দে কে নাহি ভুলে।
আঁখে কাজরের রেখা নব কুলবতী সতীগণে না রাখে কুলে ॥
শ্রুতিমূলে মণি মকর কুণ্ডল ঝলকয়ে কিবা গণ্ডের ছটা।
সুমধুর হাসি মাখা মুখখানি নিছনি পূর্ণিমা-চান্দের ঘটা ॥
সূত্রে বাঁধা ধান্য দূর্বাদি সুন্দর হেমদরপণ দক্ষিণ করে। (ঐ, পৃঃ ৫১৩)

কীর্তন, নৃত্য ও ভাবাবেশ

শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্তন, নৃত্য ও ভাবাবেশ বর্ণনায় নরহরি যেন অক্লান্তকর্মা কবি। এই বিষয়ে 'ভক্তিরত্নাকরে', 'গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণে' এবং 'পূর্বরাগে' শতাধিক পদ আছে। ভক্ত সঙ্গে গৌরাঙ্গের সংকীর্তন মত্ততা, নৃত্যোন্মদনা ও বিবিধ সময়ের বিচিত্র ভাবাবিষ্ট অবস্থা নরহরি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। খোল করতাল মৃদঙ্গ মন্দিরার ঘনঘোর ধ্বনি, পরিকরবর্গ ও ভক্তবৃন্দের সম্মিলিত করতালি ও উচ্চ রবে হরিনাম উচ্চারণ, অসংখ্য দর্শনার্থীর ভিড়, আর এ সবের মাঝে নয়ন মনোহর তপ্তকাঞ্চন বর্ণ দীর্ঘদেহ গৌরাঙ্গের অপরূপ নৃত্য—শব্দের পারিপাট্যে, ছন্দের হিল্লোলে, বক্তব্যের বলিষ্ঠতায় কবি যেন আমাদের প্রত্যক্ষগোচর করান :

আজু কি আনন্দ সংকীর্তনে।
নাচে গৌরনিত্যানন্দ পরম আনন্দ কন্দ প্রিয় পারিষদবৃন্দ সনে ॥
নাচে বোলে ভাল ভাল বাজে খোল করতাল সভে মহাবিহ্বল প্রেমায়।
নদীর প্রবাহ পারা সভার নয়নে ধারা কেহ কেহ পড়ে কারু গায় ॥

কেহ বা পুলক ভরে হুংকার গর্জন করে কাঁপে কেহ থির হৈতে নারে।
কেহ কারু পানে চায়া দুইবাহু পসারিয়া কোলে করি ছাড়িতে না পারে॥
কেহ কারু পায়ে ধরে পদধূলি লয় শিরে কেহ ভূমে গড়াগড়ি যায়।
প্রভু ভৃত্য এক রীতি দেখি নরহরি অতি আনন্দে প্রভুর গুণ গায়॥
(ভক্তি. পৃঃ ৫২৯)

পদটির মধ্যে গৌর নিত্যানন্দ ও পারিষদবৃন্দের নৃত্যরত অবস্থাটি বিশদভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ কালেও হরি কীর্তনে বৈষ্ণব মণ্ডলীর মাঝে অনুরূপ চিত্র লক্ষ্য করা যায়। গৌর নিত্যানন্দ না হোক, তাঁর সমকালের বৈষ্ণবদের নৃত্যদর্শন করেই কবি বর্তমান পদটি লিখেছেন, ফলে প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা ও আবেগ স্পষ্ট অনুভূত হয়।

নৃত্যরত গৌর সুন্দরের অপরূপ রূপ কবিকে কিভাবে আকৃষ্ট করেছিল, অসংখ্য পদে তারই পরিচয় আছে। গোবিন্দ ঘোষ, রামানন্দ বসু প্রমুখের পদেও নৃত্যবিদ গৌরাঙ্গের রূপ বর্ণনাই সমধিক প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু গৌরাঙ্গের নৃত্যকালীন বিভিন্ন অবস্থায় কৃষ্ণলীলার নানান তাৎপর্য আবিষ্কার নরহরির মতো চৈতন্যোত্তর কবির পক্ষে সাধারণ কবিত্বের কথা নয়।

নৃত্যরত গৌরাঙ্গের রূপ বর্ণনার একটি সুন্দর পদ ঃ

'নাচত শচীতনয় গৌর সুন্দর মনমোহনা।' (ভক্তি. পৃঃ ৫৫৭)

গৌরাঙ্গের প্রতিটি অঙ্গের সৌন্দর্য বর্ণনা, রূপদক্ষ কবির যেন প্রাণখোলা কীর্তন।

প্রত্যক্ষদর্শী কবিরা গৌরাঙ্গের ভাবাবেশ বর্ণনা করেছেন। তাঁদেরই পন্থানুসরণে নরহরির পদরচনা। বৈষ্ণব কবির বিশ্বাস যিনি দ্বাপরে কৃষ্ণ, তিনিই কলিতে চৈতন্য। কৃষ্ণলীলায় ঝুলন, দোল, রাস, মান, দান প্রভৃতি যে সব ঘটনা ঘটেছিল, আবেগবিহ্বল প্রেমিক কবিরা চৈতন্যের মধ্যে সেই ভাবাবেশ আবিষ্কার করেছেন।

নরহরির পদেও এই সব বিষয়ের উল্লেখ আছে। রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের প্রণয়লীলাই যেন গদাধর-গৌরাঙ্গের মধ্যে প্রকাশিত। তাই নৃত্যকালে গৌরাঙ্গ—

ললিত ভুজ তুলি গরজে হরি বুলি পুরুব প্রেমরসে ভাসয়ে।
কত না বারে বারে নিরখি গদাধরে মধুর মৃদু মৃদু হাসয়ে॥

(ভক্তি. পৃঃ ৫৬৪)

কিংবা, গৌরাঙ্গ—

পণ্ডিত গদাই ঘন পানে চাই রাধিকা বলিয়া ডাকে॥
দাস গদাধর করে দিয়া কর উলসে পুলকে গা।
মৃদু মৃদু ভাসে কিবা রসে ভাসে কিছু না পাইলু থা॥ (ঐ পৃঃ ৫৬৫)

গৌরসুন্দরের রাস রস বিলাস :

ফাগু খেলত গৌরকিশোর।
বনি বেশ বিশেষ উজোর॥…
গহি করে কাঞ্চন পিচকারী।
বর বরষত কেশর বারি॥
ঘন উড়ায়ত আবির গুলাল।
সুরপুর পরশত মহী লাল॥ (ঐ পৃঃ ৫৮৩)

শ্রীবাস গৃহে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে মহাপ্রভুর নৃত্য বর্ণনা : প্রভু পরিকরদের সঙ্গে গোপবেশে নৃত্য করেছেন—প্রত্যেকের মাথায় 'নটপটীপাগ' ও 'কুসুম-পল্লব', বাহুতে 'বলয়', কটিতে 'নব বসন', কাঁধে দধিদুগ্ধের বিচিত্রবর্ণা ভাণ্ড, হাতে 'লগুড', হলদী-দধি-ঘৃত সুশোভিত অঙ্গনে সকলে 'হি হি' শব্দ করতে করতে নৃত্যে মগ্ন।

ভাণ্ড দধি যুত চিত্র বহুক ঃ কান্ধে করু করে লগুড় কাহুক ঃ
ভঙ্গি সঙ্গে চলি হলদি দধি ঘৃত ঃ পংক অঙ্গনে শোহয়ে।
হি হি শবদ উচারি ঘন ঘন ঃ বিপুল পুলকিত তরল তনুমন ঃ
করত সুললিত নৃত্য নিরুপম ঃ নিখিল ভুবন বিমোহয়ে॥

(ভক্তি. পৃঃ ৫৭৮)

গৌর সুন্দরের রূপ

নরহরি চক্রবর্তী সৌন্দর্য বিলাসী কবি। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের তিল তিল সৌন্দর্য সমাহারেই তাঁর গৌরাঙ্গ তনুর সৃষ্টি। কবি যত কিছু সৌন্দর্য সঞ্চয়

করতে পেরেছেন, তাকেই সুবিন্যস্ত করে গৌর রূপের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। 'ভক্তিরত্নাকর', 'গীতচন্দ্রোদয়' (মঙ্গলাচরণ ও পূর্বরাগ) এমন কি 'গৌরচরিত্র-চিন্তামণি'তে—সর্বত্রই তিনি গৌর রূপের বর্ণনায় মুখর। সাধারণ ভাবে রূপ সৌন্দর্য বর্ণনার পদগুলি ছাড়া যেখানেই তিনি সুযোগ পেয়েছেন, সেখানেই গৌরাঙ্গের অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন। ভাবে ভাষায় ছন্দে অলংকারে এই পদগুলি তাঁর পাঠককে বড় মুগ্ধ করে। যেমন—

বিহরত সুর সরিত তীর : গৌর তরুণ বয়স থির :
তড়িত কনক কুমকুম মদ : মর্দন তনু কাঁতি।
মদন কদন বদন চান্দ : নিখিল তরুণী নয়ন ফান্দ :
হসত লসত দশন বৃন্দ : কুন্দ কুসুম পাঁতি ॥
অঞ্জনঘন পুঞ্জ বরণ : কুঞ্চিত কচ ধৈর্য হরণ :
বেশ বিমল অলকাকুল : রাজত অনুপাম।
ভাল তিলক ঝলক অতি : ভাঙ্ ভুজগ মঞ্জুল গতি :
চঞ্চল দিঠে অঞ্চল রস : রঞ্জিত রস ধাম ॥
কুণ্ডল শ্রুতি গণ্ড কলিত : কণ্ঠহি বনমাল রণিত :
বাহু বিপুল বলয়াকর : কোমল বলিহারি।
পরিসর বর বক্ষ অতুল : নাশত কত কুলবতী কুল :
ললিত কটি সুকৃশ কেশরী গরব খরব কারী ॥
জগমগ যুগ জানু তরুণ : অনুণাবলি কিরণ চরণ :
কমল মধুর সৌরভ ভরে : ভকত ভ্রমর ভোর।
করুণাঘন ভুবন বিদিত : প্রেম অমিয়া বরষত নিত :
নরহরি মতি মন্দ কবহু পরশত নহি থোর।

(ভক্তি. পৃঃ ৫৫৫। গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ পত্র ৩৩ ক-খ)

কবি মানস নেত্রে যা প্রত্যক্ষ করেছেন, রূপ-রসিকের নিকট তা অপ্রত্যক্ষ রাখেন নি। পদগুলির মধ্যে ভক্ত কবির আত্মপ্রাণের সৌন্দর্য পিপাসার চরিতার্থতা ঘটেছে। গৌরাঙ্গ বিশ্ব মানুষের কাছে অবতারকল্প মহাপুরুষ, কবির কাছে সৌন্দর্য দেবতা, যাঁর সৌন্দর্যে পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য হার মানে। নরহরি সজ্ঞানে সৌন্দর্য বস্তুটির অনুশীলন করেছেন, তাঁর ব্যবহৃত অলংকারে গতানুগতিকতা আছে, শব্দ চয়নে যদুনন্দন বলরাম গোবিন্দদাসের প্রভাব

আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও পদগুলিতে আশ্চর্য ব্যঞ্জনা সঞ্চরিত হয়েছে। ভক্ত-মণ্ডলীর মাঝে ভাবাবিষ্ট গৌরাঙ্গের অপরূপ একটি চিত্র—

ভাবে গর গর গৌরসুন্দর ভকত মণ্ডলী মাঝেরে।
কনক ভূধর গরবহর তনু বিপুল পুলক বিরাজ রে॥
বিবিধ সুঘটন নটন পণ্ডিত তালে পদতল লোল রে।
মদন মরদন বদনে ঘন ঘন ভণই হরি হরি বোল রে॥
অধম দূরগত পতিত পামরে হেরি ধরি করি কোরে রে।
প্রেমে অতি উমতাই অবিরত সিচই লোচন লোরে রে॥
হরই বলি কলি কলুষ পলছনে ঐছে নহু অবতার রে।
দাস নরহরি পহুক করুণ বিলাস ভুবন বিথার রে॥

(গীতচন্দ্রোদয়, মঙ্গলাচরণ পত্র ৩২ক)

ভাবাবেশের বিবিধ চিত্র পাই 'গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ' পুথিতে এবং এর 'পূর্বরাগ' অংশে। পদগুলিতে তথ্যের সঙ্গে বৈষ্ণব তত্ত্ব মিশে আছে। শ্রীগৌরাঙ্গের ভাববিগ্রহটি সৌন্দর্যময় করে প্রকাশ করতে কবি সমর্থ হয়েছেন। চৈতন্যকে তিনি যেমন কলি কলুষনাশী, পতিত-অধম-দুর্গতোদ্ধারক পুরুষ রূপে অংকন করেছেন, তেমনি তিনি যে রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ, কখনো রাধা ভাবে, কখনো কৃষ্ণ ভাবে আক্রান্ত এবং আত্মভাবাস্বাদনে উন্মুখ—ভাবাবস্থার সেই পূর্ণাঙ্গ বর্ণন ও তাত্ত্বিক উপস্থাপনেও তাঁর সাফল্য অনস্বীকার্য।

পূর্বেই লিখিত হয়েছে যে, 'গীতচন্দ্রোদয়ের' 'মঙ্গলাচরণ' ও 'পূর্বরাগ' অংশদ্বয় মাত্র পাওয়া গেছে। এই গ্রন্থের পদসজ্জায় নরহরি শ্রীরূপের 'উজ্জ্বলনীলমণি'র অনুসরণ করেছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি প্রথমে গৌরাঙ্গের পূর্বরাগ বর্ণনা করে বৈষ্ণব রীতির আনুগত্য দেখিয়েছেন। মঙ্গলাচরণ পুথি 'রূপামৃতগীতে'র পর মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা অভিসারিকাদি ভেদে গৌরাঙ্গের বিবিধ চিত্র অংকিত হয়েছে। গৌরাঙ্গ যে শ্রীরাধিকার ভাবে আবিষ্ট থাকতেন, ভক্ত কবি এখানে সেই দিকটির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যেমন শিশিরাভিসারের একটি পদ—

ললিত শিশির ঋতু নিশি উজিয়ার।
হিমকর হিম ঘন সমীর তুষার॥

যামিনী পহর যব হি বহি যাত।
তবে পহু ভাবে ভণই মৃদু বাত॥
এ সখি সুতল গুরুজন মোর।
অবহি চলব যাঁহা বরজ কিশোর॥
আগে চলহ তুহু পথ হু ঁনিহারি।
কহি ইহ বচন চলই পদচারি॥
সময় উচিত কি এ মধুর সিংহার।
গৌর গৌর কোউ লখই না পার॥
সুরধনী তীরে করত পরবেশ।
নরহরি বুঝব কি উলস অশেষ॥

(গীতচন্দ্রোদয়, মঙ্গলাচরণ, পত্র ৩৮ খ)

কিংবা প্রোষিতভর্তৃকার চিত্র—

ভাবে অবশ তনু পুলক ন থেহ।
হোত মলিন খিণ কাঞ্চন দেহ॥
জাগই নিশি দিন মন নহু পাস।
অবনত বয়নে তেজই ঘন শ্বাস॥
খণে কহে কানু গহন দূর দেশ।
গাঅই খণে তছু চরিত অশেষ॥
খণে রহু নিচল বচন গতি মন্দ।
নরহরি ঐছে চরিত হেরি ধন্ধ॥

(গীতচন্দ্রোদয়, মঙ্গলাচরণ, পত্র ৪১ক)

'গীতচন্দ্রোদয় পূর্বরাগ' গ্রন্থে পূর্বরাগের লক্ষণ, উন্মেষ ও পরিণতি শ্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমণি নির্দিষ্ট। কবি শ্রীগৌরাঙ্গকে রাধার সঙ্গে অভিন্ন করেই দেখেছেন। রাধার পূর্বরাগের উন্মেষ ঘটেছিল শ্রীকৃষ্ণের নামগুণাদি শ্রবণে, চিত্রপট দর্শনে, সাক্ষাৎ দর্শনে ইত্যাদি। তারপর কৃষ্ণকে লাভের জন্যে একে একে তাঁর মধ্যে দশ দশার প্রকাশ। নরহরিও গৌরাঙ্গের মধ্যে রাধিকার উল্লিখিত ভাবগুলি প্রকাশ করেছেন। যেমন কৃষ্ণবিরহে শ্রীগৌরাঙ্গের 'উদ্বেগ' অবস্থার বর্ণনা :

আজু একি ভাবে ভাবিত এমন না দেখি কখন যেন।
গৌর সুবরণ বিবরণ হলো দিনে নিশাকর যেন॥
জলন্ত অনল সম জলে হিয়া ধৈরয ধরিতে নারে।
কদম্ব কানন এ বাণী শুনিতে ভাসয়ে নয়ান নীরে॥
কি কথা কহিতে মনে করে তাহা কহিতে বিষম হয়।
ঘন ঘন কাঁপি নিশাস ছাড়িয়া ভূমেতে পড়িয়া রয়॥
অনুক্ষণ তনু আনছান করে পুছিতে দ্বিগুণ বাড়ে।
নরহরি হেরি ব্যাকুল কি জানি পরাণ না রহে ধড়ে॥

(গীতচন্দ্রোদয়, পূর্বরাগ পৃঃ ৪৭)

শ্রীকৃষ্ণের জন্যে শ্রীরাধার মতোই গৌরচন্দ্রের উদ্বেগের সীমা নেই। তাঁর স্পর্শ পাওয়ার জন্যে শ্রীগৌরের অন্তর জলে যায়। দেহখানি বিবর্ণ হয়। 'কদম্বকানন' শব্দে তিনি এতই আকুল হয়ে পড়েন যে, তাঁর চোখ দুটি অশ্রুতে ভরে যায়। মনের কথা স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে পারেন না। দেহ কেঁপে কেঁপে ওঠে। তিনি অনুক্ষণ ধরণীশয়নে থাকেন। এই সব কথার মধ্য দিয়ে গৌরাঙ্গের মানসিক চাঞ্চল্য ও শুদ্ধতা ব্যঞ্জিত হয়। কবি শ্রীরূপের লক্ষণাদি সামনে রেখেই এই সব পদ রচনা করেছেন। গৌরাঙ্গের 'উন্মাদ' দশার একটি চিত্র—

কি কহব গৌর চরিত।
হেরইতে চমকই চিত॥
খণে চহুঁ দিশ চলু ধাই।
অনিমিখ লোচনে চাই॥
খণে ক্ষিতি পড়ি গড়ি যাত।
খণে ভণে কত কত বাত॥
হাসয়ে খণে খণে রোয়।
খণে অতি আকুল হোয়॥
খণে ধরু ধৈরজ ভারি।
বৈঠই বসন সম্ভারি॥

খণে খণ নিরত নিশ্বাস।
নরহরি হৃদয়ে তরাস ॥

(গীতচন্দ্রোদয়, পূর্বরাগ পৃঃ ৫৪)

কৃষ্ণবিরহে পূর্বরাগাক্রান্ত গৌরচন্দ্রকে দর্শন করলে যে কোনো লোকের চিত্ত চমকে ওঠে। তিনি ক্ষণে স্থির আছেন, পরক্ষণেই অস্থির হয়ে ধাবিত হচ্ছেন। কখনো বিস্ফারিত নেত্রে কোনো দিকে দৃষ্টিপাত করছেন। কখনো মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। কখনো বা আকুল হয়ে উঠছেন। বেশবাস স্খলিত হয়েছে। কখনো তিনি মাটিতে বসছেন। ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ছে। তা দেখে কবির হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হচ্ছে। শ্রীরূপ নির্ণীত উন্মাদ দশার সকল লক্ষণই পদটিতে প্রকটিত হয়েছে।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে, নরহরি শ্রীরাধার অভিন্ন তনু গৌরাঙ্গের মধ্যে রাধার সকল রকম ভাবই প্রকাশ করেছেন। বলা বাহুল্য তিনি এ কাজে সমর্থও হয়েছেন ॥

নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত বিষয়ক পদ

ভক্তিরত্নাকরে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত সম্পর্কে যথাক্রমে ২০টি এবং ১৪টি পদ আছে। নিত্যানন্দের জন্মলীলা (৩টি), বিবাহের অধিবাস (২টি), বরগমন (১টি), নৃত্যরত রূপ (৪টি), অভিষেক (১টি) এবং ভাবাবেশ বর্ণনা (৮টি), বন্দনা (১টি)। নবদ্বীপে চৈতন্যের নিত্য-লীলার নিত্যানন্দ একজন নিত্যসঙ্গী। কিন্তু নবদ্বীপলীলার প্রত্যক্ষদর্শী কবিরা নিত্যানন্দ সম্পর্কে ২।৪টির বেশী পদ লিখেন নি। এমন কি চৈতন্যোত্তর কবিদেরও নিত্যানন্দ-জীবন নিয়ে বেশী কিছু পদ নেই। এ বিষয়ে জ্ঞানদাসের ৪টি, গোবিন্দদাসের ২টি মাত্র পদআছে। বিশ্বনাথের 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'তে প্রতি ক্ষণদায় ১টি করে বিভিন্ন কবির মোট ২৯টি পদ সংকলিত হয়েছে। কিন্তু নরহরিই তাঁর জীবনের বেশীর ভাগ ঘটনাকে অবলম্বন করে পদ রচনা করেছেন।

নিত্যানন্দের জন্ম, অধিবাস, বরগমন, বিবাহ, রূপ ও সৌন্দর্য, অভিষেক সম্পর্কান্বিত তাঁর পদগুলি চৈতন্যলীলারই অনুসরণে রচিত। ভাবাবেশ বর্ণনার পদগুলিতেই কিছু নূতনত্ব আছে। নিত্যানন্দ সম্পর্কে নরহরির একটি অপূর্ব পদ :

ভুবনে জয় জয় নিতাই দয়াময় হরয়ে ভবভয় নিজগুণে।
অধম দুরগত তাহারে উনমত করই অবিরত প্রেমদানে॥
গৌরহরি বুলি নাচয়ে বাহু তুলি পড়য়ে ঢুলি ঢুলি ক্ষিতি তলে।
কোমল কলেবর কি হেম ধরাধর সে ধূলিধূসর শোভে ভালে॥
জিনি কমলদল নয়ন টলমল সঘনে ছলছল জলধারা।
বদনে মৃদু হাসি ঢালয়ে সুধারাশি কলুষ তব নাশি শশীপারা॥
কিভাবে গর গর কাঁপয়ে থরথর রঙ্গ কি কব নরহরি দাসে।
অখিল চরাচর নিরখি পহুবর ভুলল দুখভর সুখে ভাসে॥

(ভক্তি. পৃঃ ৬০০)

নৃত্যোন্মত্ত নিত্যানন্দের ভাববিহ্বল মূর্তিটির নরহরি স্পষ্ট রেখাঙ্কন করেছেন, ছন্দের তালে তালে যেন নিত্যানন্দের 'ঢুলি ঢুলি ক্ষিতি তলে' পড়ে যাওয়া আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অদ্বৈত সম্পর্কে ১৪টি পদের মধ্যে তাঁর জন্মলীলা (২টি), নৃত্য ও ভাবাবেশ (৯টি), রূপবর্ণনা (২টি) ও বন্দনা (১টি)। পদগুলি গৌরাঙ্গের ভক্তলীলাবিলাসেরই অনুরূপ। তাঁর ভাবাবেশের চিত্রে আছে :

প্রবল কলিমদ দমন ঘন ঘন ঘোর গরজি বিভোর।
গৌরহরি হরি ভণত কম্পই গিরত সহচর কোর॥
অবনী ঘন গড়ি যাত নিরুপম ধূলিধূসর দেহ।
কঞ্জলোচন ঝরই ঝর ঝর যনু সুণাঙন মেন॥ (ভক্তি. পৃঃ ৬০৩)

কিন্তু বৃদ্ধ অদ্বৈতের চৈতন্য-আবির্ভাবজনিত আনন্দ মত্ত হুংকার মুখর ছবিটি আরো বেশী মনোরম :

কিভাবে অদ্বৈতচাঁদ লম্ফ দেই বীরদাপে।
হুংকার গর্জন করে ঘন ঘন ভয়েতে পাষণ্ড কাঁপে॥
অট্ট অট্ট হাসে কি রস প্রকাশে কেহো না পাইয়ে থা।
অরুণ নয়নে চায় চারিপানে পুলকে ভরয়ে গা॥
ভুবনমোহন গোরাগুণগান শুনয়ে যাহার মুখে।
দুবাহু পসারি তারে কোলে করি নাচয়ে পরম সুখে॥ (ঐ, পৃঃ ৬০৪)

অদ্বৈত সম্পর্কে অনুরূপ বর্ণনা একমাত্র বৃন্দাবন দাসের রচনাতেই মেলে। গৌর নিত্যানন্দ অদ্বৈত সম্পর্কে কবির ভক্তি ও শ্রদ্ধার চরম প্রকাশ ঘটেছে এই সকল পদে॥

গৌর-নাগরী ভাবাত্মক পদাবলী

নাগরী ভাবাত্মক আড়াই শোর অধিক পদ নরহরি চক্রবর্তীর গ্রন্থে পাওয়া যায়।

মুদ্রিত 'গীতচন্দ্রোদয়'-পূর্বরাগে ১০৪টি: "পূর্বরাগ-মঙ্গলাচরণ" অংশের তৃতীয় প্রকরণের প্রথম আস্বাদে ৬১টি, দ্বিতীয় আস্বাদে ১২টি, এবং "শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ" অংশের তৃতীয় প্রকরণের প্রথম আস্বাদে ৩১টি।

'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে ১৫০টি: 'নদীয়া নাগরী' শিরোনামে ৭ম কিরণে ৩১টি, ৮ম কিরণে ২১টি, ৯ম কিরণে ২৩টি, মোট ৭৫টি।

'দেবরমণী'—'গান্ধর্বিণী-কিন্নরিণী'—'নাগপত্নী'দের শিরোনামে গ্রন্থের ১০ম, ১১শ, ১৪শ, ১৬শ কিরণে এই ভাবের পদ আছে যথাক্রমে ২৭, ১৯, ৮ এবং ৮টি, মোট ৬২টি। এ ছাড়া খণ্ডিত ১৭শ কিরণে গঙ্গার মুখে গৌরাঙ্গের অষ্টকালীয় নিত্যলীলা বর্ণনার মধ্যে এই ভাবের পদ পাই ১৩।১৪টি।

'ভক্তিরত্নাকরে'র ১২শ তরঙ্গে 'গৌরাঙ্গের বিবাহ' বর্ণনাংশে পুরনারীদের প্রসঙ্গে নাগরী ভাবের পদ আছে ৭টি (৫০৮ পৃষ্ঠায় ২টি; ৫০৯ পৃষ্ঠায় ৩টি, ৫১৪ পৃষ্ঠায় ১টি, ৫১৬ পৃষ্ঠায় ১টি)।

এছাড়া 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে সংকলিত এই বিষয়ের মোট ৪টি পদ[২০] এবং 'গৌরাঙ্গমাধুরী'র[২১] মোট ২টি পদ আমরা চক্রবর্তীর রচনা হিসেবে গ্রহণ করেছি।

এই পদগুলি ব্যতীত গৌরাঙ্গকে অবলম্বন করে নরহরির এমন অনেক পদই আছে, যেগুলিকে নাগর-ভাবের পরিপোষক বলেই মনে হয়। গৌরাঙ্গের রূপ ও ভাবাবেশ বর্ণনাতেও 'মন্মথদর্পহারী'-'নাগর শেখর'-'রসিক শিরোমণি'-'প্রেমবিনোদিয়া'-গৌরাঙ্গের ছবি লক্ষ্য করা যায়।

গৌর-নাগরভাব উপাসনা

গৌর-নাগর উপাসনার আদি প্রবর্তক শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার। তিনিই প্রথম গৌরাঙ্গকে মধুরভাবে ভজনা করেন। শ্রীচৈতন্য তাঁর জীবৎকালেই ভক্ত সমাজে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে পূজিত হন। নরহরি সরকার শ্রীকৃষ্ণের

২০. 'গৌ. প. ত.' (২য় সং) পদ—বেলা অবসানে (১১৩ পৃঃ), কে আছে এমন (১১৩ পৃঃ), এক দিন আমি শাশুড়ী (পৃঃ ১২৮), রমণীরমণ (পৃঃ ১৩০)।

২১. 'গৌরাঙ্গমাধুরী'—(১৩৩৭) আজি সুরধনী জলে (পৃঃ ১৮৯), মরমহি গৌর (পৃঃ ১৮৯)।

পরিবর্তে শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের স্থলে গৌর-গদাধরের পূজার্চনা প্রচলন করেন।

বৈষ্ণব সাধকেরা শ্রীকৃষ্ণের মধুর ভাবের উপাসক। তাঁর বৃন্দাবনলীলার গূঢ় তাৎপর্য ব্রজগোপীদের 'সর্ব ধর্ম পরিত্যজ্য' কৃষ্ণ ভজনা। সেই কৃষ্ণই নবদ্বীপে গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ। সুতরাং তাঁর উপাসনা করতে হলে ব্রজগোপীর মতো আবেগ থাকা দরকার। কবি নিজেকে ও অন্যান্য ভক্তদের ব্রজগোপীদের স্থানে অভিষিক্ত করলেন। ব্রজনাগর কৃষ্ণ হলেন 'নদীয়ানাগর' গৌরাঙ্গ, ব্রজগোপীরা হলেন গৌরভক্তের দল—তাঁরা 'নদীয়ানাগরী'। অর্থাৎ জীবন্ত কৃষ্ণলীলার অনুসরণে জীবন্ত গৌরাঙ্গলীলা সৃষ্ট হলো।

নরহরি সরকার তাঁর এই ভাবনাকে পদাবলীর মাধ্যমে ব্যক্ত করলেন। তাঁর সমকালীন অন্যান্য ভক্তদের মধ্যে বাসুদেব ঘোষ এই ভাবধারার একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক। মুরারি গুপ্ত ও গোবিন্দ ঘোষ এ বিষয়ে কিছু কিছু পদ লিখেন। নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন ও তাঁর অনুগামী একদল ভক্ত এই সাধন রীতি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন।

পরবর্তীকালে গৌরনাগর ভাবনা সমগ্র বৈষ্ণব সমাজে একটি বিশেষ স্থান লাভ করে। নরহরি সরকারের শিষ্য লোচনদাস নাগরী-উপাসনাকেই তাঁর কবি-জীবনে বড় করে দেখেন। তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' ও 'ধামালীপদ'গুলিতে তারই প্রমাণ আছে। বলরামদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ চক্রবর্তী, নয়নানন্দ, শেখর, যদুনন্দন, যদু, রসিকদাস, রাধাবল্লভ, দেবকীনন্দন, লক্ষ্মীকান্ত, গোপালদাস, সর্বানন্দ, জগদানন্দ, নরহরি চক্রবর্তী প্রমুখ পদকারগণও এই বিষয়ে পদ রচনা করেছেন।

'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে ১৯ জন কবির ১৮০টি নাগরীভাবের পদ সংকলিত হয়েছে।[২২] এর মধ্যে এমন অনেকগুলি পদ আছে, যা এই সংকলন ছাড়া অন্য কোনো প্রাচীন পুঁথিতে মেলে নি॥

পদের বিষয়বস্তু

গৌর নাগরের ভুবন ভুলানো নয়ন মনোহর রূপসৌন্দর্য দর্শনে নদীয়া-

২২. গোবিন্দ দাস-৬, বলরাম-১, বাসু ঘোষ-২৪, নয়নানন্দ-৫, জ্ঞানদাস-৩, শেখর-১, যদুনন্দন-৪, যদু-১, নরহরি (সরকার)-৮, নরহরি চক্রবর্তী-৮৩, মুরারি গুপ্ত-২, রসিক-১, রাধাবল্লভ-১, দেবকীনন্দন-১, লক্ষ্মীকান্ত-১, গোপালদাস-১, মাধবানন্দ-২, জগদানন্দ-৫, লোচন-২৬, মোট ১৮০টি।

নাগরীরা এমনি মুগ্ধ যে, তারা সাংসারিক কাজকর্ম ফেলে, এমন কি কুল-শীল-লজ্জা-ধর্ম-মানসম্মান সবকিছু বিসর্জন দিয়ে গৌরাঙ্গকে পাবার, তাঁর সঙ্গে মিলনের জন্য সর্বদা উৎকণ্ঠিত। এই উৎকণ্ঠা ও রূপ-বিহ্বলতা তাদের হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করেছে। তারা কখনো কখনো সুযোগ পেয়ে গৌর-নাগরের দেহে ঢলে পড়েছে, নানা রঙ্গ রসিকতায় মত্ত হয়েছে। কদাচিৎ বাস্তবে মিলন ঘটেছে, গৌর-মিলনের স্বপ্ন দেখেছে।

নরহরি সরকারের নামে প্রচলিত, 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে সংকলিত ৮টি পদে নাগরীদের গৌর-সর্বস্বতা, গৌর-রূপানুরাগের প্রাবল্য ও উন্মত্ততা প্রকাশিত। তাঁর পদে অশ্লীলতা দোষ নেই।

কিন্তু বাসুদেব ঘোষের 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র ২৪টি পদে নাগরীদের গৌর-সর্বস্বতা ও রূপানুরাগ শেষ পর্যন্ত দেহবিলাসে পরিণত হয়েছে। তাঁর পদে স্বাপ্নসম্ভোগ এমন কি বাস্তব মিলনের কথাও আছে।

মুরারি গুপ্ত বা গোবিন্দ ঘোষ প্রমুখের পদে নাগরভাবের ইঙ্গিত মাত্র পাই।

কিন্তু নাগরভাবকে নিতান্ত গ্রাম্য রতিলীলায় পরিণত করেছেন লোচনদাস। ধামালীর সুরে ও স্বরে রচিত তাঁর পদগুলির অধিকাংশই মানুষের আদি রিপুর আরাধনা, অনেক ক্ষেত্রেই রুচিহীন ও অশ্লীল।

নরহরি চক্রবর্তী লোচনদাসেরই সগোত্র॥

পদগুলি সম্পর্কে বক্তব্য

নাগরীভাবাত্মক পদগুলির বিষয়বস্তু কবি-সাধকদের সম্পূর্ণ কাল্পনিক ব্যাপার, গৌরাঙ্গ জীবন ইতিহাসের পরিপূর্ণ বিরোধী। এই কল্পনাবিলাস শ্রীচৈতন্য জীবনের মর্যাদাহানিকর ও অশ্রদ্ধেয়। সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেব ভুলক্রমেও নারীর এমন কি ধর্মপত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মুখ দর্শন পর্যন্ত করেন নি। বৃদ্ধা তপস্বিনী মাধবীদাসীর সঙ্গে দু চারটি বাক্যালাপের জন্য পরম প্রিয় ভক্ত ছোট হরিদাসকে তিনি বর্জন করেন। সেই জিতেন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী নদীয়ার যুবতীদের প্রতি 'কাম-কটাক্ষ' নিক্ষেপ করছেন, নাগরীরা তাঁর গায়ে ঢলে পড়ছে, তিনি নির্বিচারে তা উপভোগ করছেন, কখনো বা প্রত্যক্ষ দিবালোকে নাগরীর সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন,—এমন আদি-রসাত্মক উৎকট

নাগর-ভাবনা শুধু অনৈতিহাসিকই নয়, সম্পূর্ণরূপে কুরুচিপূর্ণও, কল্পনা মাত্র। এবং বৈষ্ণব সাধকের নিকট এই কল্পনা 'বৈষ্ণবাপরাধ' বলেই নিন্দিত।

নরহরি সরকারের জীবৎকালেই এই ভাবনা ধিক্কৃত হয়েছিল। বৃন্দাবনদাস এবং বৃন্দাবনের বৈষ্ণব সাধকেরা এই ভাবনার নিন্দাই করেছেন। বৃন্দাবনদাস লিখেছেন :

অতএব মহামহিম সকলে।
চৈতন্য নাগর হেন স্তব নাহি বলে ॥
(চৈতন্যভাগবত, ১৩শ পরিচ্ছেদ)

সম্ভবতঃ এই ভাব ধারার আদি স্রষ্টা বলেই, বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজ নিজ গ্রন্থে গৌরাঙ্গের নিত্যসঙ্গী নরহরি সরকারের নামোল্লেখ পর্যন্ত করেন নি।

কোনো কোনো আধুনিক সমালোচক নাগরী পদাবলীর তত্ত্ব, তাৎপর্য, দার্শনিকতা ব্যাখ্যা করেছেন। জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় তার গ্রন্থের তৃতীয় তরঙ্গের ২য় উচ্ছ্বাসের মুখবন্ধে এই ভাবের পদ রচনার ২টি কারণ উল্লেখ করেছেন :

> প্রথমতঃ, শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসসভায় উপস্থিত হয়েন, তখন তাঁহাকে কেহ শত্রু-ভাবে, কেহ পুত্র, কেহ স্বামীভাবে, কেহ বা নবীন নাগরভাবে অর্থাৎ যাঁহার যেমন মনের ভাব তিনি সেইভাবে, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন। এই জন্য প্রচলিত কথায় বলে—'কৃষ্ণ কেমন?' 'যার মন যেমন'। এখানেও তদ্রূপ যে নয়নভঙ্গী, যে হাস্য, যে হস্তাদিসঞ্চালন দেখিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমোন্মাদ ভাবিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ব্যাকুল এবং যে ভাব-ভঙ্গীকে বায়ুরোগ সন্দেহ করিয়া স্নেহবতী শচীমাতা আকুলা, সেই ভাব-ভঙ্গীকে হাবভাব কামচেষ্টা মনে করিয়া, হাবভাবময়ী নদীয়ার নাগরীগণ যে তাঁহাকে নবনাগর ভাবিবেন, তাহাতে বিচিত্রতা কি? ফলতঃ মহাপ্রভুর নবীননাগর রূপ ভক্তের ইচ্ছানুসারে। যাঁহারা ব্রজভাবে মাতোয়ারা, মধুর রসের রসিক, রসশেখর শ্রীগৌরাঙ্গকে তাঁহারা আর কোন রূপে দেখিতে চাহিবেন?

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ এক ও অভিন্ন। 'ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত

হৈল সেই', তাই রসিক ভক্ত পদকর্তৃগণ শ্রীগৌরাঙ্গকে নাগর সাজাইয়া আপনারা নাগরীভাবে তাহার রূপগুণ বর্ণন করিয়াছেন।[২৩]

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বাসুদেব ঘোষের কবিকৃতি আলোচনাকালে লিখেছেন :

> পদকর্তা নিজেকে ও তাঁহার ন্যায় অপর গৌরভক্তকে 'নদীয়ানাগরী' ভাবিয়াই ঐ পদ রচনা করিয়াছেন। অভিজ্ঞ পাঠকবর্গকে বলিতে হইবে না যে, এইরূপ নাগরীভাবের উপাসনার মধ্যে গভীর মনস্তত্ত্বজ্ঞান অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদিগের মধ্যেও Bride of Christ বা খ্রীষ্ট-নাগরী অভিমানে খ্রীষ্টের উপাসনা বিরল নহে। নারীজাতি চিরকাল কোমলতা, আত্মসমর্পণ ও প্রেমতন্ময়তার জীবন্ত আদর্শ; সুতরাং সেই নারীকে আদর্শ করিয়া, নারী অভিমানে যে, প্রেমিক ভক্তগণ স্বীয় ইষ্টদেবের উপাসনায় প্রণোদিত হইবেন, ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই।[২৪]

কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয় বলেন যে, গৌরাঙ্গের অলোক-সামান্য রূপের দুর্নিবার আকর্ষণ দেখানো ও ব্রজলীলার অন্ধ অনুস্মৃতি এই সব নাগরীভাবাত্মক পদ রচনার উদ্দেশ্য।[২৫]

নাগরী পদাবলী যে ব্রজলীলার অনুসরণে সৃষ্ট, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং নরহরি সরকার, লোচনদাস প্রমুখ সেই পদাবলীকারেরা যে নিজেদের 'ব্রজগোপী' ভেবে অর্থাৎ নাগরীর মানসিকতা নিয়েই পদ লিখেছেন এমন অনুমান করারও যথেষ্ট কারণ আছে। বাসুদেব ঘোষের পদে আছে—

১। চল দেখি গিয়া গোরা অতি মনোহরে।

... ...

মালতীর মালা গলে আপাদ দোলনি।
কহে বাসু দিব গিয়া যৌবন নিছনি॥

(গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃঃ ১০৮, পদ ৩।২।১৫)

২। বাসুদেব ঘোষ কহে শুন মোর কথা।
গোরার পিরিতিখানি মরমের ব্যথা॥

(ঐ, পৃঃ ১০৮, পদ ৩।২।৯)

২৩. শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিণী, (২য় সং, ১৩৪০), পৃঃ ১০৫।
২৪. শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, (৫ম খণ্ড), সতীশচন্দ্র রায়, পৃঃ ১৭০।
২৫. প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য, (২য় খণ্ড), পৃঃ ১০০।

৩। মন্ত্রমহৌষধি তুহুঁ যদি জানসি মঝু লাগি করহ উপায়।
বাসুদেব ঘোষে কহে শুন শুন হে সখি গোরা লাগি প্রাণ মোর যায়॥
(ঐ, পৃঃ ১০৯, পদ ৩।২।২০)

গোবিন্দদাসের (চক্রবর্তী ?) পদে—

১। মো মেনে মনু মো মেনে মনু।
কিখণে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আইনু॥
... ...
তাহে তনু সুখ বসন পরে।
গোবিন্দদাস তেঁই সে ঝুরে॥
(ঐ, পৃঃ ১০৬, পদ ৩।২।৩)

২। গোবিন্দদাস কহই নাগর হারাই হারাই তিলে
(ঐ,পৃঃ ১০৭, পদ ৩।২।৬)

এমনি ক'রে কবিদের ভণিতাংশে জোর দিয়ে পদগুলি পাঠ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কবিরা নিজেদের নাগরী বলেই পরিচয় দিয়েছেন, কখনো সরাসরি, কখনো কৌশলে। লোচনদাস তো সরাসরি বলেছেন—

১। রূপের নাগর রসের সাগর উদয় হলো এসে।
নাগরী লোচনের মন তাইতে গেল ভেসে॥
(ঐ, পৃঃ ১১৯, পদ ৩।২।৬৮)

২। লোচন পিয়াসে মরে ও রূপ দেখিয়া গো
বিধাতা বঞ্চিত কৈল মোরে॥
(ঐ, পৃঃ ১২১, পদ ৩।২।৭৮)

অর্থাৎ কবিরা নিজেরাই নাগরী, অন্ততঃ নাগরীর মানসিকতা তাঁদের প্রত্যেকেরই ছিল। প্রেমের দেবতা শ্রীগৌরাঙ্গ। সে প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণ সকলেই অনুভব করেছিলেন। সে কথাই শ্রীচৈতন্যের রূপ ও নদীয়ানাগরীদের মুগ্ধতার রূপকাত্মক ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাগরীভাবাত্মক পদ রচনা একটা প্রথায় পর্যবসিত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের ভণিতা সৃষ্টির মধ্যে বাসুদেব-লোচনের আবেগ ছিল না। যে ভাবের উদয়ে পুরুষ সাধক নারীর আবেগ লাভ ক'রে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন, নিজেকে প্রকৃতি থেকে অন্য কিছু কল্পনা করতেও পারেন না, নরহরি চক্রবর্তীর কালে সেই আবেগ অনেকটা প্রশমিত হয়েছিল।

অথচ অন্ধ প্রথানুগত্যের জন্তে এ যুগের কবিরা লেখনী চালনা করেছেন। লোচনদাস যথার্থই বলেছিলেন :

কুল খোয়াবি বাউরি হবি লাগবে রসের ঢেউ।
লোচন বলে রসিক হলে বুঝতে পারে কেউ ॥

কিন্তু ১৮শ শতকের কবিদের এই 'রসের ঢেউ' লাগে নি ॥

নরহরি চক্রবর্তীর নাগরী পদের বৈশিষ্ট্য

নরহরি চক্রবর্তী গৌর-পারম্যবাদী ভক্ত। নাগরী ভাবনা-মূলক পদ রচনায় তাঁর সবিশেষ উৎসাহ ছিল। পদ রচনায় তিনি অন্যান্য সকল কবিকেই অতিক্রম করেছেন। তাঁর নিজের গ্রন্থে আড়াইশোর অধিক পদ আছে। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র এই ভাবের মোট ১৮০টি পদের মধ্যে তাঁরই পদ ৮৩টি, আর ১৮ জনের মিলে ৯৭টি।

নরহরি নাগরী ভাবসাধনাকে জীবনব্রত করেছিলেন কিনা জানা যায় না। তাঁর প্রদত্ত ভণিতায় সে রকম কোনো ইঙ্গিত নেই। তবে তিনি যে লোচনদাসের মতো গৌরাঙ্গ-জীবনের বিশেষতঃ তাঁর নবদ্বীপ লীলায় সর্বত্র নাগরীভাবের ছড়াছড়ি করেছেন, তাতে সন্দেহ করা যায় না। গৌরনাগরের রূপবর্ণনা, নাগরীদের বেশবাস, নাগরীভাব বিতর্ক ইত্যাদি বিষয় ছাড়াও তিনি স্বর্গের দেবরমণী, 'গান্ধর্বিণী কিন্নরিণী,' পাতালের নাগপত্নীদের মুখে, এমন কি গঙ্গা-যমুনার কথোপকথনের মধ্যে, গৌরাঙ্গকে দেখে জনৈকা বৃদ্ধার মুখে গৌরনাগরী ভাবের আমদানী করেছেন। ভক্তিরত্নাকরে গৌরাঙ্গের বিবাহকালে গৌররূপ, পুরনারীদের সাজসজ্জা ও শচীভবনের মঙ্গলানুষ্ঠানে তাদের গমনাদি বর্ণনাতেও তিনি নাগরীভাব লক্ষ্য করেছেন।[২৬] অবশ্য লোচনদাসের মতো নরহরি চক্রবর্তী বুদ্ধির সীমা অতিক্রম করেন নি। লোচন বলেন, গৌরাঙ্গের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে গৌরনাগরিয়া ভাব ছড়িয়ে পড়ে—'গৌরনাগরিয়া গন্ধে ভরিল ব্রহ্মাণ্ড' (চৈতন্যমঙ্গল, আদি ৩য় পরিচ্ছেদ)। শিশুকে দেখেই বয়স্ক পুরনারীদেরও 'অলমল অঙ্গ সভার শ্লথ নীবিবন্ধ'।

নরহরি এমনটা না করলেও কিশোর ও যুবা গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলাকে তিনি নাগরী-গন্ধে আমোদিত করেই প্রকাশ করেছেন।

২৬. মঙ্গলকাব্যের মধ্যে বিশেষতঃ বিজয় গুপ্ত ও ভারতচন্দ্রে এই ধরণের বর্ণনা আছে।

দ্বিতীয়তঃ, 'গীতচন্দ্রোদয়ে' সজ্জিত পদগুলির ২টি পর্যায়—'পূর্বরাগ' মঙ্গলাচরণের নাগরীভাবের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি জনৈকা নদীয়া নাগরী, বক্তব্য প্রকাশ করছে জনৈকা সখী। আর শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ অংশের পদগুলির উদ্দিষ্ট ব্যক্তি গৌরনাগরিয়া, বক্তা জনৈকা কৌতূহলী বৃদ্ধা। এই উভয় ক্ষেত্রের পদসজ্জা শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে প্রদত্ত পূর্বরাগের নির্দিষ্ট লক্ষণানুসারে :

পূর্বরাগের সঞ্চার : দর্শন (সাক্ষাৎ, চিত্রপট, স্বপ্ন), শ্রবণ (দূতী বন্দী সখী মুখে)।

পূর্বরাগের দশ দশা : লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য, তানব, জড়িমা, বৈয়গ্র, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু।

নরহরি উপরোক্ত রীতি যথার্থভাবে অনুসরণ করেই পদগুলি সজ্জিত করেছেন। এইভাবে নাগরী-পদসজ্জা নরহরিরই প্রথম কীর্তি।

তৃতীয়তঃ, 'গীতচন্দ্রোদয়' পদসংকলন গ্রন্থ। উপরোক্ত রীতিতে তিনি নিজের পদ ও অন্যান্য কবিদের পদ সজ্জিত করেছেন। কিন্তু উপরোক্ত অনুভাবের কোনো কোনটির উপরে তিনি পূর্বসূরীদের পদ পান নি। সেখানে নিজেই পদ রচনা করে শ্রীরূপের নির্দেশের সম্মান রক্ষা করেছেন। যেমন—

নাগরীর চিত্রে : অথ শ্রবণে—তত্রাদৌ বন্দিবক্ত্রাৎ শ্রবণে ১টি পদ,
(পৃঃ ১৬-১৭) অথ দূতীবক্ত্রাৎ শ্রবণে ১টি পদ,
অথ সখীবক্ত্রাৎ শ্রবণে ১টি পদ,
অথ গীতশ্রবণে ১টি পদ,

তেমনি নাগরীর চিত্রে : লালসাদৌ ৩টি পদ, উদ্বেগ ৩টি, জাগর্য্য ৩টি, থেকে
(দশ দশাদি) মৃত্যুদশা পর্যন্ত প্রতি দশার ৩টি করে পদ।
দূতীগমন, বেশাভিসার-সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, স্বাপ্ন সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ ইত্যাদি বিষয়ের সকল পদ।

তেমনি নাগরের চিত্রে : সকল পদই নতুন। নাগরীর চিত্র বর্ণনায় পদ পাওয়া গেলেও কবির এই নাগর চিত্রের নতুন ভাবনার পদ—(বৃদ্ধা মুখে গৌরনাগরের নাগরালী ও পূর্বরাগ বর্ণনা) অন্য কেউ লিখেন নি।

'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'র ১০ম ও ১১শ কিরণের নাগরীদের রূপমুগ্ধতা, স্বাপ্ন-সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বা সংক্ষিপ্ত সম্ভোগের অনুরূপ পদ পূর্ববর্তী পরবর্তী নানা

কবির রচনায় মিলেছে। কিন্তু গৌরাঙ্গকে ঘিরে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে নাগরীরা কি ছলা কলায় নাগরকে জয় করে নেবে—এই ভবিতব্যকে নিয়ে রচিত পদাবলী নরহরি চক্রবর্তী ছাড়া অন্য কেউ লিখেছেন বলে জানা যায় না।

চতুর্থতঃ, নাগরী পদ রচনার শ্রেষ্ঠ কবি বাসুদেব ঘোষ, লোচনদাস প্রমুখের মতো নরহরির পদেও অশ্লীলতার বাড়াবাড়ি আছে। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে নরহরির পদে গৌরাঙ্গচরিত্রে সেই অশ্লীলতা স্পর্শ করেছে সব চেয়ে বেশী।

গৌরনাগরী পদের একটি লক্ষণীয় দিক হলো এই যে, কিছু পদে নাগরীরা গৌরাঙ্গকে নিয়ে হাবভাব-মিলনাদি প্রকাশ করেছে, সেখানে গৌরাঙ্গ সক্রিয় নন। তিনি কিছুই জানেন না, অথচ তেমন একজন ব্যক্তিকে নিয়ে নাগরীরা রঙ্গলীলা কল্পনায় মত্ত। এমন পদগুলির রুচি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় নয়, কিন্তু এতে গৌরচরিত্রের দোষও স্বীকার্য নয়। কিন্তু আর কিছু পদে গৌরাঙ্গ সক্রিয় হয়ে নাগরীদের সঙ্গে লীলাবিলাস করছেন, এখানে নাগরী ও গৌরাঙ্গ উভয় পক্ষই সক্রিয়। এই জাতীয় পদ যেমন রুচিহীন তেমনি গৌরচরিত্রের মর্যাদাহানিকর।

এই উভয় ধারার পদ প্রায় সকল কবিই রচনা করেছেন। তবে বাড়াবাড়ি আছে বাসুদেব ঘোষ, লোচনদাস, গোবিন্দ চক্রবর্তী ও নরহরি চক্রবর্তীর পদে।

বাসুদেব ঘোষের পদে পাই: গৌরাঙ্গ স্বয়ং নাগরীদের উত্তেজিত করছেন, বা গৌরাঙ্গের সঙ্গে নাগরী জাগ্রতাবস্থায় দিনে বা সজ্ঞানে রাত্রিতে মিলিত হয়েছে।

১। আজু গৌরাঙ্গ সনে রজনী গোঙায়নু সো সুখ কি কহব সই

(বাসু ঘোষের পদাবলী, পৃঃ ১৭৩)

২। অপাঙ্গ ইঙ্গিতে প্রাণ হরি নিল গোরা (তরু, ২১৫০)

৩। সো বহুবল্লভ গোরা জগতের মন চোরা (গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃঃ ১১০)

লোচনদাসের পদে আছে:

১। পতিকে ত্যাগ করে নাগরীর গৌরসঙ্গে মিলন:

(গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃঃ ১১৭, পদ ৩।২।৬২)

২। গৌরাঙ্গের সঙ্গে মিলন : (গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃঃ ১২০, পদ ৩।২।৭৩) গোবিন্দদাস ভণিতার পদে :

১। রমণী দেখিয়া হাসিয়া হাসিয়া রসময় কথা কয়

(ঐ, পৃঃ ১০৬)

২। হাসিয়া রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া সঙ্গে। হৈল ঠারাঠারি কি রস রঙ্গে

(ঐ, পৃঃ ১০৬)।

এই জাতীয় পদকে আমরা গৌরচরিত্রের মর্যাদাহানিকর বলে মনে করি।

নরহরি চক্রবর্তীর পদের ভাববস্তু বিশ্লেষণ করলে দেখি : 'নাগরীর পূর্বরাগ' অংশে নাগরী গৌরাঙ্গ-রূপে বিহ্বল হয়ে মৃত্যুদশা পর্যন্ত প্রাপ্ত হয়েছে, গৌরাঙ্গ সেখানে অনুপস্থিত। নাগরী গৌরাঙ্গকে প্রাণমন সমর্পণ করে দিনরাত্রি তাঁর ধ্যানে মগ্ন হয়েছে, লোকে এ নিয়ে অপবাদ দিয়েছে—এই ভাবের পদে এমন কিছু নেই, যাতে গৌরাঙ্গকে দোষ দেওয়া যায়। 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র নাগরীর পদ এবং 'গৌরচরিত্র-চিন্তামণি'র ৭ম কিরণের পদগুলি এইভাবের প্রকাশক।

তবুও দুই এক স্থলে আছে : গৌরাঙ্গ একাকী রাজপথে যাচ্ছিলেন, নাগরী তাঁকে দেখে তাঁর সামনে একটি 'মলিন কুমুদ কলি' ছুঁড়ে দিলে। গৌরাঙ্গ সেটি কুড়িয়ে নিয়ে কুমুদকে সান্ত্বনা দিয়ে নাগরীর দিকে কটাক্ষ করলেন—

এত কহি হাসি নয়ান কোনে।
বারেক চাহিল আমার পানে ॥

(গৌ. চ. চিন্তামণি, পৃঃ ১৪)

আরেক স্থলে আছে : জনৈকা সুসজ্জিতা নাগরীর ভ্রাতৃগৃহে যাবার পথে গৌরাঙ্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। তখন গৌরাঙ্গ—

চাহিয়া আমার পানে।
না জানি কি কৈলে নয়ান কোণে ॥
... ...
সঘনে অঙ্গের বসন খসে।
এসব দেখিয়া সে পুন হাসে ॥

(গৌ. চ. চি., পৃঃ ১৫)

তৃতীয় এক স্থানে পাই : জনৈকা নাগরী গভীর গোরানুরাগে মাঝে মধ্যে মূর্ছিত হতো। নানা চিকিৎসাতেও সে সারে নি। একবার মূর্ছাকালে তার পিসৈস (পিসী-শাশুড়ী) ছিলেন। তিনি বলেন যে, তাঁর চোখের সামনে

এমন বহু কঠিন রোগী কেবল গৌরাঙ্গ-পদস্পর্শে সেরে গেছে। সুতরাং শাশুড়ী বহু আদর করে নাগর গৌরাঙ্গকে বাড়ীতে ডেকে এনে 'বধূর গায়' পদস্পর্শ করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে।

ইহা শুনি গোরা গুণের সাগর বসন ঝাঁপিয়া মুখে।
ধীরি ধীরি করি রুচির চরণ ধরিল আমার বুকে॥

স্বপ্নে নয় বাস্তবে সংঘটিত এই তিনটি ঘটনা নিঃসন্দেহে আপত্তিকর, কারণ এখানে গৌরাঙ্গকে সক্রিয় দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু এগুলি সম্পর্কে কিছু বক্তব্য উত্থাপন করা চলে। এগুলির প্রথম দুটিকে দর্শন শাস্ত্রের ভাষায় 'ভ্রান্ত পরিদর্শন' বললে দোষ নেই। নাগরীর ছুঁড়ে দেওয়া কুমুদকলি তুলে নেবার পর নাগরী মনে করেছে, বুঝি গৌরাঙ্গ তার দিকে কটাক্ষ করছেন, বুঝি নয়নে নয়নে কথা বলছেন। দ্বিতীয়টিকেও নাগরীর কল্পনামাত্র বলা চলে। মনের গতি বিচিত্র। প্রেমের রাজ্যে ভাবের ঘোরে প্রেমিক প্রেমিকার অতৃপ্ত কামনায় এ রকম ভাবনা বা এক জিনিসকে অন্য রকম ধরে নেওয়াটা মোটেই অসম্ভব নয়। সে দিক থেকে এই দুটি ঘটনা গৌরচরিত্রের মর্যাদা লঙ্ঘন করে না।

কিন্তু তৃতীয় ঘটনাটা রুচিবিকৃতির চূড়ান্ত উদাহরণ। শাশুড়ী, পিসী-শাশুড়ীর সামনে তাদেরই অনুরোধে অসুস্থা নাগরীর বুকে একজন পরপুরুষের পদস্পর্শ শুনে ভক্তগণ যতই উল্লসিত হয়ে অশ্রুপাত করুন না কেন, আধুনিক কুসংস্কারবর্জিত রুচিবান পাঠক তা সাদরে গ্রহণ করতে পারবেন না। তবে ষোড়শ শতাব্দীর কুসংস্কারকে[২৭] যদি মানতে হয়, তাহলে গৌরাঙ্গকে কিছুটা মুক্তি দেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া বাক্যটি উচ্চারণ করেছে নাগরী নিজে অন্য নাগরীদের কাছে। এখানেও গৌরাঙ্গ সক্রিয় নন। কে কি বলে কার কাছে নিজের গৌরব বৃদ্ধি করলো, তা নিয়ে গৌরাঙ্গের কিছু আসে যায় না। সুতরাং এখানেও গৌরাঙ্গ চরিত্রের দোষ ধরা চলে না। তবে বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনায় ভিন্ন দৃষ্টি গ্রহণ করলে এটিকে আপত্তিকর মনে হবে না।

স্বাপ্ন সম্ভোগ বা নাগরীদের স্বপ্নে দৃষ্ট মিলন বর্ণনার পদগুলির রুচি নিন্দনীয় হলেও গৌরাঙ্গকে কোনোরূপ দোষারোপ করা যায় না। গৌরাঙ্গের

২৭. পদস্পর্শে রোগ সারা বা স্পর্শমাত্র রোগমুক্তি সেকালের একটি কুসংস্কার। নরোত্তমবিলাসে (১১শ বিলাস) আছে, নরোত্তমের পদস্পর্শে কুষ্ঠরোগী সেরে গেছে।

প্রতি গভীর অনুরাগবশতঃ নাগরীরা স্বপ্নে দেখে যে, গৌরনাগরের সঙ্গে তাদের মিলন ঘটছে। এখানে গৌরাঙ্গ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। নাগরীরা স্বপ্নে দেখে, তারা গৌরাঙ্গকে কাছে পেয়ে তাঁর দেহ মার্জনা করছে, তাঁর সঙ্গে রঙ্গরস-রসিকতায় মত্ত হচ্ছে, মিলন ঘটছে। বাসুদেব ঘোষের মতো নরহরিও এইরকম বক্তব্য প্রকাশ করেন। এজন্যে কবির শালীনতাবোধ ও নাগরী-বৃন্দই দোষ পেতে পারে, গৌরাঙ্গ নয়। এখানে নাগরীদের চরিত্রই প্রকাশিত হয়, গৌরাঙ্গ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য চলে না। যদি তেমন কোনো মন্তব্য করতেই হয়, তবে বলতে হবে গৌরাঙ্গের সর্বগ্রাসী অলৌকিক প্রভাব নাগরীদের উপরেও পড়েছিল, কিন্তু গৌরাঙ্গকে তারা ভুল বুঝে মনে মনে কুপথে পা বাড়িয়েছে, যেজন্যে গৌরাঙ্গ দায়ী নন।

নাগরী বিষয়ে নরহরির মৌলিক ভাবনার পদগুলির মধ্যে 'গৌরচরিত্র-চিন্তামণি'র ৯ম কিরণের পদে নাগরীদের লালসা-প্রকাশক উৎকট কল্পনাবিলাস বর্ণনা, নাগরীরা কী কী কৌশলে গৌরাঙ্গের দর্শন ও মিলন লাভ করবে, সেই ভবিতব্যের ব্যাপার।[২৮] গৌরাঙ্গ এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। নাগরীদের কোনো ব্যাপার তিনি ঘুণাক্ষরেও জানছেন না। এই গ্রন্থের 'দেবরমণী' 'গান্ধর্বিণী কিন্নরিনী' ও গঙ্গা-যমুনার মুখে ব্যক্ত নাগরীভাবনাতেও গৌরাঙ্গ অনুপস্থিত। সুতরাং এই সকল পদ থেকে গৌরচরিত্রে কলংক লেপন করা উচিতও নয়, সম্ভবও নয়।

পঞ্চমতঃ, নরহরির অন্যান্য বিষয়ের পদগুলিতে অনেক ক্ষেত্রেই একটি কাহিনীর ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য বিষয়ের পদাবলীতে সে রকম কোনো ধারাবাহিক কাহিনী নেই। 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র পদগুলি নাগরী বা নাগরের পূর্বরাগের এক একটি বিশেষ অবস্থার প্রকাশক। 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'র এই বিষয়ের এক একটি পদে এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী গঠন করা যায়। সে কাহিনী বিবৃত করেছে নাগরীরা, যেগুলি তাদের জীবনে এক এক মুহূর্তে সংঘটিত হয়েছে।

২৮. পদগুলির ক্রিয়াপদ লক্ষণীয়: 'শচীর ভবনে যাইয়া…দাঁড়াব'। 'পরাণ হরিব', 'আলিঙ্গন দিতে অধিক উদ্যত হব', 'নয়ান ইঙ্গিতে কবে গৌরাঙ্গ পানে হেরিব', 'মোর মুখ নিরখিতে না পাইয়া অধিক ব্যাকুল হবে', 'মোর অপরূপ ভঙ্গি নিরখিয়া ভাসিবে সুখে', 'রসবশ হইয়া কহিবে' ইত্যাদি।

ষষ্ঠতঃ, নরহরি ছান্দসিক ও অলংকার বিলাসী কবি। ছন্দের হিল্লোল ও অনুপ্রাসের ঘনঘটা তাঁর পদের একটি লক্ষণীয় দিক। কিন্তু আশ্চর্য যে, নাগরীভাবাত্মক পদগুলির অধিকাংশই সহজ সরল বাংলা ভাষায় রচিত। আড়াইশো পদের মধ্যে ব্রজবুলিতে রচিত পদ ২৫টির বেশী নয় এবং অধিকাংশ পদের ভণিতাই 'নরহরি'। ভাষায় চণ্ডীদাসের প্রভাবই সমধিক। নাগরী বিষয়ক পদগুলির ভাষা বাংলা কেন? নাগরী পদের স্রষ্টিকর্তা নরহরি সরকার। বাসু ঘোষ ও লোচন তাঁর সমধর্মী। এঁদের পদগুলি চণ্ডীদাসের সহজ সাধন পদের মতো পরিষ্কার বাংলা ভাষায় লেখা। লোচন আবার এজন্যে 'ধামালী' ছন্দ ব্যবহার করেছেন। 'ধামালী' বাংলার নিজস্ব ছন্দঃ রীতি। নরহরি চক্রবর্তী সেই ট্র্যাডিসন রক্ষা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, নাগরী-সাধনা বাংলাদেশের সাধনার একটি নিজস্ব ধারা। বাংলার বাইরে এ সাধনা ছিল না। নরহরিও এই সাধনাকে বাংলার নিজস্ব সম্পদ করে রাখতে চেয়েছিলেন। ব্রজবুলিতে পদগুলি রচিত হলে এই ভাব-সাধনা বাংলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পেতো। এবং বাইরের লোকেরা এ বিষয়ে ভুল বুঝতেও পারতো। কারণ ব্রজবুলি এক সময় সমগ্র পূর্ব ভারতে প্রচলিত ছিল। মৈথিলী বা অসমিয়া ব্রজবুলিও আছে। যাতে এই ভাবনা নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, বহির্বাংলায় এ সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়, সেজন্যেই বুঝি নরহরি বা অপরাপর সকল কবিই নাগরীর পদ বাংলায় রচনা করেছেন।

সপ্তমতঃ, নরহরির পদগুলি থেকে তাঁকে নাগর ভাবের উপাসক বলে মনে হয় না। তাঁর ভণিতায় তেমন কোনো ইঙ্গিত নেই। নরহরি বক্তামাত্র, নিজে নাগরী হতে পারেন নি। অর্থাৎ তাঁর পদে ভক্তিভাব শিথিল হয়েছে॥

পদ বিশ্লেষণ

'গীতচন্দ্রোদয়' (পূর্বরাগ)

অনিন্দ্য সুন্দর গৌর নাগরের রূপ দেখেছে নদীয়ার নাগরী। আনন্দে, সুখে, তৃপ্তি বা সন্তোষে নয়, অনঙ্গ ভুজঙ্গের দারুণ দংশনে তার প্রলুব্ধ চক্ষু বারংবার ধাবিত হয় দর্শনীয় সেই অজ্ঞাত পুরুষের উদ্দেশ্যে। আর্তকণ্ঠে সখীকে সে তাই সেই নারী-বিমোহন মন্মথদমনকারীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে :

সই ও নব নাগর কে।
থকিত দামিনী গোরোচনা জিনি কিবা সে রসের দে॥

(পৃঃ ৬৬-৬৭)

াকন্তু নাগরের রূপের বর্ণনায় নরহরির অবশুই কোনো মৌলিকতা নেই। তবে সখী নায়িকাকে যেভাবে উত্তর প্রদান করেছে, তাকে সাধারণ প্রশ্নোত্তর বলে না, তাতে নায়িকার রূপ তৃষ্ণা আরো বৃদ্ধি পায়, পূর্বরাগ পুষ্ট হয়, শুনতে শুনতে লজ্জায় ও সন্তোষে অন্তর ভরে যায় ; 'হে দে গো রঙ্গিনী রমণীর মণি এ তনু নিছনি গোরা' (পৃঃ ৬৭), 'এ নব রঙ্গিনী নিরখিলে যারে সে নব রঙ্গিয়া গোরা' (পৃঃ ৬৭) ইত্যাদি পদ দুটি তারই প্রমাণ।

কথাবার্তা প্রসঙ্গে নায়িকা তার পরিদৃষ্ট রূপের পরিচয় দিতে পারে না। চুল এলিয়ে বাহু দুলিয়ে সুরধনীর জল আলো করে স্নান করছিলেন গোরা। নয়নভরে নাগরী সেই রস-নিধিকে দর্শন করেছে। কিন্তু সখীকে তাঁর রূপের কথা সে বুঁঝিয়ে বলতে পারে না—বুঝি রূপের ব্যাখ্যা ভাষায় হয় না, চোখ দিয়েই তা অনুভব করতে হয়, সে শুধু বলে :

সে রূপ ছটায় কে বা না ভুলে।
লাজেতে মদন ঘুরিয়া বুলে॥ (পৃঃ ৭০)

সে রূপের কথা নাগরী আর ভুলতে পারে না। দিন রাত্রি ঐ রূপবানকেই সে যেন দেখতে পায়, তাঁর কথাই যেন অন্য সব কথাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। চিত্ত ক্রমশঃ অসংযত হয়ে ওঠে, রূপানুরাগ বিষম হয়ে দাঁড়ায়। নাগরীর সেই আবেশ বিহ্বল পরিচয়টি পাই তারই এক সখীর মুখে—

সে বিধুবদনী রমণীর মণি এমন কেনে বা হৈল গো।
ধৈরজ ধরম লাজকুলভয় কেবা বা হরিয়া নিল গো॥
অনুখণ মনে মনে কি ভাবয়ে বিষম বাউরী পারা গো।
লোচন বারিজে বারি নিবারিতে নারে সে সরিত ধারা গো॥
চমকি চমকি উঠে বারে বারে চকিত চৌদিগে চায় গো।
খসে কেশ্ বেশ বসন ভূষণ পুন না সম্বরে তায় গো॥
ঘামে তিতে তনু অনুপম ঘন কাঁপয়ে বিজুরী যেন গো।
নরহরি হিয়া বিয়াকুল হৈল না দেখি কখন যেন গো॥ (পৃঃ ৬৪)

তারপর কিছুদিন ধরে নাগরের আর দর্শন নেই। মদন-বান-জর্জরিতাকে সখীরা চিত্রপটে আঁকা গৌরাঙ্গ মূর্তি দেখায়, কিন্তু অস্থিরা নাগরীর চিত্ত তাতে সান্ত্বনা মানে কৈ? চিত্র দর্শনের পরেই সে আর্তস্বরে বলে ওঠে:

অতি অকাজ করিলু তায় চায়া।
ওগো হিয়া মাঝে রহিল সামায়া।।
সদা পরাণ কেমন কেমন করে।
বুঝি রহিতে নারিব এই ঘরে॥ (পৃঃ ৭৪)

দারুণ যন্ত্রণার ক্ষণিক সোয়াস্তি, নাগরীর স্বপ্নে গৌরসুন্দরকে দর্শন—

হেমতনু নব পুরুষ সুন্দর স্বপনে পাইলু দেখা।
হরিলে পরাণ নয়ানের কোণে না চিনিয়ে কোন গোরা।
(পৃঃ ৭৫)

স্বপ্নও ভেঙ্গে যায়, নাগরীর মনের চঞ্চলতাও বাড়ে। বন্দিগণ পরস্পর পথে ঘাটে গৌরগুণ কীর্তন করে, তা শুনে নাগরী গন্তব্যস্থলে যেতে পারে না, ঘরে ফিরে আসে। নির্জনে বসে, অন্নজল রোচে না। এমন সময় জনৈকা নারী দূতীর মতো অযাচিতভাবে তাঁকে গৌর রূপের বর্ণনা শুনিয়ে যায়। তার উপর সখী এসেও সেই নাগরেরই গুণগান করে। নাগরীর প্রাণ 'আনছান' করে, নিজের অন্তরকে নিজেই প্রবোধ দিতে পারে না। ইন্দ্রিয়গুলি অসংযত হয়ে ওঠে। ঘর সংসার শূন্য বলে বোধ হয়। এমন সময় 'গৌরাঙ্গচাঁদের লীলা সুললিত গান' হয়। নায়িকা নাগরী তা শুনে একেবারে অধৈর্য হয়ে ওঠে।

কবি নায়িকার পূর্বরাগের লালসাদি দশ দশার বর্ণনা করেন। লালসা অনুভাবিত নাগরীর সুন্দর চিত্র: 'সই তোরে কি বলিব আর' (পৃঃ ৭৭), 'ধনী হইল বাউরী পারা' (পৃঃ ৭৮) এবং 'আজু রঙ্গিনী রমণীমণি ধনী' (পৃঃ ৭৮) ইত্যাদি পদ তিনটিতে প্রকাশিত হয়েছে। কবি শাস্ত্রনির্দেশেই পদগুলি লিখেছেন। তবু পদগুলি থেকে নাগরীর গাঢ় লোভ, তার ঘূর্ণা, নিঃশ্বাস, চাপল্য ইত্যাদি লক্ষণগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অনুভব করা যায়।

উদ্বেগাকুল নাগরীর ছবিটিও বেশ উপভোগ্য—অস্থির চঞ্চলা নাগরী কোথাও একদণ্ড স্থির হয়ে বসতে পারছে না। তার আঁখিতে অশ্রু ঝরছে, করতলে মুখ অবনত করে সে নখের আঁচড়ে মাটিতে কি সব লিখে চলেছে, শরীর শিহরিত হচ্ছে, বসন স্খলিত হয়ে পড়ছে, ঘামে দেহবল্লরী ভিজবার

উপক্রম করছে, মুখে বাক্যটি নেই, ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে, তিলে তিলে দেহের উত্তাপ বেড়ে যাচ্ছে, সুচারু শরীর বিবর্ণ হয়ে উঠছে। (পৃঃ ৭৯, পদ ১)

জাগর্য্যাবস্থায় নাগরীর চিত্রটি বড় করুণ। যেদিন (স্বপ্নে বা সাক্ষাতে) সে গৌর নাগরকে দর্শন করেছে, সেই দিন থেকেই না-পাওয়ার অতৃপ্তি, পুনঃ না-দেখার অসন্তোষ, অন্যদিকে মিলনের জন্যে অসংবরণীয় লোভ, তার জন্যে মানসিক উৎকণ্ঠা—সব মিশে নাগরীর চোখ থেকে ঘুম টুটে গেছে, চিন্তায় ভাবনায় উদ্‌বেগ ও যন্ত্রণায় সারারাত্রি সে জেগে কাটায়—

অরুণিম আঁখে নিদ না পরশে শেজে না ছোঁয়ায় গা।
উসসি উসসি জাগে সব নিশি মুখে না নিসরে রা॥

(পৃঃ ৮০, পদ ২)

ক্রমে ক্রমে শরীর দুর্বল হয়, অসিত-চতুর্দশী চাঁদের মতো ক্ষীণ হয় দেহ। চঞ্চল মন আর দুর্বল দেহ টেনে টেনে সে অস্থির হয়ে ভ্রমণ করে, এখানে—ওখানে—কোনোখানেই শান্তি নেই, চোখ দুটি অশ্রুতে টলমল করে, বেশবাস বিগলিত হয়, কখনো কাতর হয়ে বিলাপ করে। এই ভাবাত্মক তানবের পদগুলি তাই উল্লেখযোগ্য।

এক সময় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে নাগরী মৌনাবলম্বন করে। তার দর্শন ও শ্রবণশক্তি লোপ পায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অনবসরে সে হুংকার দিয়ে ওঠে, সবকিছুতে ভ্রম হয়। কিন্তু নাগরীর এই জড়িমা অবস্থা প্রকাশ করতে সমর্থ হন নি কবি। তিনি যেন শাস্ত্র-লক্ষণ মিলিয়ে অবস্থার নামগুলি পর পর বসিয়ে দিয়েছেন, নাগরীর মনটি বা কাজকর্ম দেখিয়ে তা প্রকাশ করেন নি। যেমন—

'ওগো কত প্রবোধিব তায়' (পৃঃ ৮২, পদ ১) পদটি।

এই অবস্থার বাকী দুটি পদ তুলনামূলকভাবে জড়িমা প্রকাশ করেছে (পৃঃ ৮৩, পদ ২, ৩)।

সেই হিসেবে বৈয়গ্র্য অবস্থার পদগুলি সুন্দর (পৃঃ ৮৩, ৮৪, পদ ১-৩)। নাগরী সবরকম বিবেচনাশূন্য হয়ে খেদ করছে। ভাবগাম্ভীর্যজনিত তার করুণ অসহিষ্ণুতা প্রকটিত হয়েছে :

খেণে কহে মুই কি কৈলুঁ কাজ।
খোয়াইলুঁ গুরু গৌরব লাজ॥

খেণে কহে কেনে হইবে সিধি।
মোরে দুঃখ দেই দারুণ বিধি॥
খেণে কহে সুখে ভাসয়ে যেঁহো।
কি লাগি সদয় হইবে তেঁহো॥ (পৃঃ ৮৪)

অভীষ্ট নাগরকে যখন কিছুতেই পাওয়া গেল না, তখন নাগরীর দেহে ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পেল। ধীরে ধীরে তার সুনির্মল দেহলতা বিবর্ণ হতে লাগলো, দেহে শীত অনুভূত হলো, সজললোচনে ভূমিতলে সে শয্যাগ্রহণ করলো, সখীরা মিলনের আশা প্রকাশ করলে, কিন্তু কিছুতেই তার প্রত্যয় হলো না, সে বারংবার মাথায় করাঘাত করে গদগদ বচনে বিধাতাকে নিন্দা করতে লাগলো, দীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হলো, নখের আঁচড়ে সে বুক চিরে ফেলতে চেষ্টা করলো, সখী ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে কোলে বসালো (পৃঃ ৮৫ পদ ৩।৬০)। এখানে শাস্ত্র লক্ষণকে কবি কবিত্বমণ্ডিত করেই প্রকাশ করেছেন।

নাগরী কঠিন যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঠেছে। চারদিকে চেয়ে চেয়ে চমকে উঠছে। ভীষণ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করছে। অস্পষ্টভাবে কথা বলছে ও কাঁদছে, দুই চার পা চলে যাচ্ছে, আবার মাটিতে পড়ে যাচ্ছে,—নাগরীর এই উন্মাদ দশা চমৎকার ভাবে নরহরি বর্ণনা করেছেন (পৃঃ ৮৫-৮৭)।

মোহ ও মৃত্যুদশা বর্ণনাও নিন্দার নয়। 'কি বলিব সইয়ের চরিত' (পৃঃ ৮৮) 'কঞ্জলোচনী গোরী নবীন কিশোরী' (পৃঃ ৮৮) পদগুলিতে মোহগ্রস্তা নাগরীর বিকার বর্ণিত হয়েছে। ক্ষণে ক্ষণে তার মতি গতির পরিবর্তন ঘটে, কি ভাবতে কি ভাবে, কি করতে কি করে। সব সময়ই কাঁদতে থাকে, কখনো মাটিতে ঢলে পড়ে। মুখে বাক্য নিঃসৃত হয় না, অচলাবস্থায় তনু দেহটি পড়ে থাকে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও এক সময় বন্ধ হয়ে যায়। সখী মুখে 'গোরা' 'গোরা' শব্দ শুনে তার দেহ কাঁপতে থাকে।

অবশেষে প্রিয়তম নাগরকে না পেয়ে নাগরীর অবস্থা সর্বশেষ পর্যায়ে গেল। সে তো নাগরকে তার প্রণয়পীড়া লিখে জানিয়েছিল, মালাও পাঠিয়ে আমন্ত্রণ করেছিল। কিন্তু নাগরের আগমন আর হলো না। সুতরাং কন্দর্পের কঠিন বাণের আঘাতে মরণের উদ্যম ঘটে। কাঁদতে কাঁদতে সে কুসুম কাননে প্রবেশ করে, সখীর হাত ধরে কত রকম অনুনয় বিনয় করে। বলে,

এবা কি হইল।
বিধি কৈল বাদ মনে যে ছিল॥
তাহে এই মোর মালতী লৈয়া।
বনাইহ হার যতন পায়া॥
বিরলেতে কিছু কহিয়া ছলে।
পরাইহ গোরাচান্দের গলে॥ (পৃঃ ৮৯, পদ ২)

গোরার জন্যেই নাগরীর মরণের উদ্যম, অপূর্ণ সাধ মালতী মালা পরানোর কাজের ভার তাই সখীদের উপর ন্যস্ত। চির বিদায়ের পূর্বে তার নিম্নোক্ত উক্তি যেমন করুণ তেমনি হৃদয় বিদারক—

মু এবে বিদায় তো সভাপাশে।
যে উচিত তাহা করিবে শেষে॥
তোমরা বেথিত পরাণ হেন।
সতত কুশলে থাকিহ যেন॥ (পৃঃ ৮৯, পদ ২)

চিরবিদায়ের পূর্বে এর চেয়ে মর্মান্তিক বাণী আর কী হতে পারে? 'অবলা-মরম' গোরা জানে না, কিন্তু সখীরা নিশ্চয়ই তা জানে। সুতরাং তারা যেন তার শেষকৃত্যটুকু সমাধা করে। মরবার আগে নাগরীর সখীদের মঙ্গল কামনাটিও আকর্ষণীয়, 'আমি তো গেলাম, কিন্তু তোমরা যেন সর্বদা কুশলে থেকো'।

দশমী দশা অতিক্রান্ত হতে চলে। সখীরা কী করবে স্থির করতে পারে না। সুন্দরী ভূমিতে শয়ন করেছিল। এমন সময় জনৈকা সহচরী নাগর-প্রদত্ত হার তার দেহে স্পর্শ করালো। নাগরী চেতনা পেয়ে আনন্দে উঠে বসলো। বুঝলো নাগরের আমন্ত্রণ পাওয়া গেছে। সুতরাং সে মনের মতো বেশ রচনা করলো। সখীদের মাঝে বসে সে হর্ষোদ্যোতক বাক্যালাপ করতে লাগলো। তাকে দেখে মনে হলো তার এই আনন্দ বুঝি সদ্য নাগর-মিলন-জাত।

অতঃপর স্বাপ্ন সংক্ষিপ্তসম্ভোগ: নাগরী স্বপ্নে দেখে নাগরের সঙ্গে তার মিলন ঘটেছে।

এইভাবে 'গীতচন্দ্রোদয় পূর্বরাগে' নায়িকা-নাগরীর যে চিত্রটি প্রকাশিত হয়েছে, চণ্ডীদাসের রাধার সঙ্গেই তার প্রভূত সাদৃশ্য আছে॥

গীতচন্দ্রোদয়ে গৌরনাগরের পূর্বরাগ বর্ণনা

গীতচন্দ্রোদয়ে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনার প্রারম্ভে নরহরি গৌরাঙ্গের পূর্বরাগ প্রকাশক কিছু কিছু পদ গৌরচন্দ্রিকা রূপে সংযোজন করেছেন। তার মধ্যে "তৃতীয় প্রকার, ১ম আস্বাদের" পদগুলি ''নাগরী ভাববিতর্ক" মূলক (পৃঃ ৩০৯-৩২০)। মোট পদ ৩২টি। ১ নং পদটি[২৯] ছাড়া বাকি ৩১টি পদ গৌরাঙ্গের পূর্বরাগ বিষয়ক। এই পূর্বরাগ বর্ণনায় নাগরবৃত্তিই প্রধান।

রাধিকার পূর্বরাগ বর্ণনার প্রারম্ভে, নরহরি জনৈকা নাগরীর পূর্বরাগ ও তার দশ দশা পরিস্ফুট করেছেন, তারই সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে গিয়ে কৃষ্ণের পূর্বরাগের প্রারম্ভে এই গৌরনাগরের পূর্বরাগের অবতারণা।

পদগুলির শিরোনামে 'নাগর, বা 'নাগরী' শব্দটি নেই। আছে 'অথ ভাব বিতর্কে'। তবু বর্ণনা ও বক্তব্য বিষয় দেখলেই এগুলিকে 'গৌরনাগরী' পদের নতুন রূপ বলে স্বীকার করতে হবে। কোনোও এক নাগরীকে দেখে বা তার কথা শুনে গৌরনাগরের পূর্বরাগের সঞ্চার, তারপর তাঁর দশ দশা প্রাপ্তি। নাগরী পদে তার পূর্বরাগ বর্ণনা করেছে সখী, কখনো বা নায়িকা স্বয়ং। এখানে নাগর সম্পূর্ণ নীরব, সখীর স্থান লাভ করেছে "প্রেমবিহ্বলা কাচিৎ কুতুকিনী বৃদ্ধা",[৩০] যে গৌরাঙ্গকে সর্বদা 'নাতি' বলে সম্বোধন করে। এই বৃদ্ধার মুখেই কবি গৌর-নাগরের দশাগুলির পরিচয় দিয়েছেন।

সেকালে নাতি-নাতনীদের সঙ্গে বৃদ্ধা ঠাকুরমা-ঠাকুরদাদারা হাস্য পরিহাস, রসরসিকতায় মত্ত হতেন। রসিকতা করে ঠাকুরমা-ঠাকুরদা নাতি বা নাতনীর সঙ্গে নিজের প্রণয় বা বিবাহের সম্পর্কও স্থাপন করতেন। অনেক সময় এঁরা সিরিয়াস ভাবেই নাতি-নাতনীদের প্রণয়াস্পদের তত্ত্বও সানন্দে গ্রহণ করতেন, এমন কি তাদের পারস্পরিক মিলনেও সাহায্য করতেন। 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র 'পূর্বরাগে' চণ্ডীদাসের নামে এমন দুটি পদ আছে (পৃঃ ১৪৭-১৫০)[৩১] যেখানে বৃদ্ধা দিদিমা মুখরা তার 'সোনার নাতিনী' রাধিকার পূর্বরাগের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে নাতিনীর চাঞ্চল্য উপশমের উপায় খুঁজেছেন।

---

২৯. 'শ্রীশচীতনয় গৌর গুণধাম' (পৃঃ ৩০৯)—গৌরগুণকীর্তনবিষয়ক।

৩০. কবি স্বয়ং এই বাক্যটি লিখেছেন।

৩১. 'সোনার নাতিনী এমন যে কেনি' (পৃঃ ১৪৭), 'সোনার নাতিনী কেন আসি যাও পুনপুন' (পৃঃ ১৫০)।

বর্তমান পদগুলিতে চণ্ডীদাসের পদ দুটির প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। ভাষা ও ভাব সৃষ্টিতে মিলও লক্ষ্য করা যায়। নরহরির পদের বৃন্দা চণ্ডীদাসের মুখরার ভূমিকা পালন করেছে। নাগরী পদে সখীর মতো, নাগর-পদে এই কাজটা কোনো সখাকে দিয়েও করানো যেতো, কিন্তু চণ্ডীদাসের পদ কবির স্মরণে থাকায়, তিনি জনৈকা বৃন্দাকেই গ্রহণ করেছেন।[৩২]

নাগরী পদগুলির মতো বর্তমান অংশে গৌরনাগরের পূর্বরাগের পদগুলি শ্রীরূপের 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে প্রদত্ত রীতি অনুসারেই সজ্জিত হয়েছে।

'কুতুকিনী বৃন্দা' গৌরাঙ্গের মধ্যে পূর্বরাগের নানা লক্ষণ লক্ষ্য করেছে। সে অপর একজন বৃন্দাকে সে কথাই বলেছে। তারপর গৌরনাগরকে একাকী নির্জনে পেয়ে তার কারণ জিজ্ঞাসা করেছে। বৃন্দা একের পর এক নাগরের দশাগুলি তাকে বুঝিয়ে বলেছে, কিন্তু নাগর সম্পূর্ণরূপে নীরব থেকেছেন। তার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোন রকম প্রতিক্রিয়া নাগরের মধ্যে ঘটে নি। তিনি উত্তর দেন নি, বচসাও করেন নি। 'সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ রসোদগার' অংশে (পৃঃ ৩১৯-২০), বৃন্দারও তার সঙ্গিনীদের চাতুর্য-বচনে একবার মাত্র নাগরকে বিচলিত দেখা যায়—

"তাহা শুনি সে নাগর রায়।
নারে থির হৈতে কত উঠে চিতে চকিত চৌদিগে চায়॥
হাসি সভারে ভাসায় সুখে।"

মনে হয়, নরহরি এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, গৌরনাগরের পূর্বরাগ সম্পূর্ণ কাল্পনিক, তা গৌরচরিত্রের মর্যাদাহানিকর, সুতরাং অপাপবিদ্ধ গৌরাঙ্গের পূত-চরিত্র স্মরণ করেই তিনি তাতে দোষ স্পর্শের আশংকায় গৌরাঙ্গকে নীরব করে রেখেছেন। তাই এই তিন ছত্রকে ব্যতিক্রম বলেই ধরে নেওয়া যায়।

গৌরনাগরের পূর্বরাগ ও তার দশ দশা, সম্ভোগাদি বর্ণনায় কবি তাঁর নাগরচিত্র অঙ্কনে কোনো দিক দিয়েই মৌলিকতা প্রদর্শন করতে পারেন নি। এমন কি কবি অধিকাংশ পদে গৌর-ভাববিকার বর্ণনার নামে নাগরীদের

---

৩২. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বৃন্দা বড়াই। নরহরি ভণিতায় প্রাপ্ত পাঠবাড়ী ২৬৩১ নং পুথি, 'পদামৃতসিন্ধু' ও 'পদামৃতমাধুরী'র বৃন্দা পৌর্ণমাসী। প্রাচীন বাংলা প্রেম সাহিত্যে নায়ক-নায়িকার প্রেমের সেতুরূপে এই বৃন্দার আগমন (দ্র. বর্তমান নিবন্ধ, ৪র্থ অধ্যায়)।

রূপমুগ্ধতাকেই বড় করে দেখেছেন, দু একটি চরণে মাত্র গৌরাঙ্গের প্রসঙ্গ আছে। উদাহরণ স্বরূপ এই অংশের যে কোনো একটি দশার যে কোনো একটি পদকে গ্রহণ করা চলে—

অথ লালসায়াং—

সোনার নিমাই মোর পরাণ জুড়ায় হে দেখিতে তোমার তনুখানি।
পরাণ কেমন করে তাহা কি কহিব হে শুনি চাঁদ বদনের বাণী ।।
হেলিতে দুলিতে তুমি পথে চলি যাও হে কেশ আউলাইয়া ফেলি পিঠে।
তখন কুলের বধূ ধায় চারি পাশে হে দেখয়ে তোমারে এক দিঠে ।।
তুমি ত কাহারু পানে ফিরিয়া না চাও হে তাহাতে পাইলু মনে দুখ।
আরাধিলু বিধি তেহোঁ সদয় হইল হে এতদিনে হবে যেন সুখ ।।
কহ মোরে মরম এ লাজ পরিহরি হে ধৈরজ হরিল কোন্ ধনী।
নরহরি সহ সব যতনে সাধিব হে বারেক তোমার মুখে শুনি ।।

(পৃঃ ৩১১-৩১২)

এর মধ্যে লালসাতুর গৌরাঙ্গের ছবি কই ? বরং বৃদ্ধা বা যুবতীকুলেরই তাঁকে দেখবার লালসা পদটিতে স্পষ্ট।

তবে লালসা অংশের দ্বিতীয় পদটিতে বৃদ্ধার মুখের গৌরের লালসার কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে।

উল্লেখযোগ্য যে, এই অংশে ঘনশ্যাম ভণিতার বা ব্রজবুলিতে রচিত কোনো পদ নেই। সবগুলি নরহরি ভণিতার বাংলা পদ ।।

পদ বিশ্লেষণ

'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'

'গীতচন্দ্রোদয়ে' একজন নাগরীকে অবলম্বন করেই দশটি দশার পরিচয় আছে। গৌরনাগরকে অবলম্বন করে তারই বিশিষ্ট মানসিকতাটি সেখানে স্পষ্ট। তাকে সাহায্য করেছে জনৈকা সখী। সখীই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাগরীর মনোভাব পাঠককে জানিয়েছে।

গৌরচরিত্রচিন্তামণিতে নাগরী একজন মাত্র নয়, দলে দলে নাগরীদের উপস্থিতি। তারাই পারস্পরিক কথাবার্তায় নিজ নিজ গোরানুরাগ প্রকাশ করেছে। নায়ক বহুবল্লভ হলে, সাধারণতঃ বল্লভাদের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা দ্বেষ ও রেষারেষির ভাব জন্মে। কিন্তু এ গ্রন্থের নাগরীদের মধ্যে তেমন কোনো

ঈর্ষাদির ইঙ্গিতমাত্র নেই। তারা সকলেই এক পথের পথিক। তারা গৌর মিলনে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করেছে। একে অপরের কাছে আপনার অনুরাগ ব্যক্ত করে কৌতুক ও আনন্দ উপভোগ করেছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ-ভাগবতের কৃষ্ণ ও গোপীলীলার কথা মনে পড়ে। নরহরি ভাগবতের পৌরাণিক কথাকে যেমন নতুন রূপে প্রকাশ করেছেন, তেমনি তাকে বাঙালীর ঘরোয়া জীবনের কথায় পর্যবসিতও করেছেন। তাতে হয়তো পুরাণকে পাই নি, কিন্তু জীবনকে যে পেয়েছি, তা অনস্বীকার্য।

কিন্তু নাগরীদের প্রতিবন্ধকতা করেছে তাদের ননদী, শাশুড়ী, শ্বশুর প্রভৃতি নিকট জনেরা। পদাবলীর শ্রীরাধিকার মতো নাগরীরা কুলবধূ। স্বামী, ননদী, শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, 'মাসৈসা'দির সঙ্গে নিত্যকার সাংসারিক কাজকর্ম করেই তাদের জীবন কাটাতে হয়। তাদের লোকভয়, সমাজভয়, কুলশীল-মান মর্যাদার ভয়ও আছে। পরপুরুষের প্রতি তাদের আকর্ষণ অবৈধ। সুতরাং আত্মীয়েরা সতর্কভাবে তাদের প্রহরায় নিযুক্ত থাকে। 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র নায়িকা-নাগরীরও নিশ্চয় এই সব বিপত্তি ছিল, কিন্তু কবি তার আদৌ উল্লেখ করেন নি। ফলে এখানের নাগরীদের গোরানুরাগের সঙ্গে দ্বিধা দ্বন্দ্ব,, লজ্জা ভয় ধৈর্য মিলিয়ে অপূর্ব চরিত্রবত্তা বিকশিত হবার সুযোগ পেয়েছে।

'গীতচন্দ্রোদয়ে' সমাজ ও প্রতিবেশ আড়ালেই রয়ে গেছে। এখানে নাগরীদের কথাবর্তায় অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে তার ছায়াপাত ঘটেছে।

সর্বোপরি, তাদের কথাবর্তায় কেবল তাদের বা গৌরাঙ্গের চরিত্রই নয়, তাদের ননদী, শাশুড়ী বা শ্বশুরেরও চরিত্র স্ফুটতর হয়েছে। অনেক স্থলে ননদী তার ধূর্ততা, শঠতা, চাপল্য ও কামবাসনা নিয়ে, শাশুড়ী তার সংসার ও বধূদের প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি, কীর্তনাসক্তি, ধর্মকর্মব্রতাদিতে বিশ্বাসাদি নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়তঃ, পদগুলির অধিকাংশই নরহরি ভণিতাযুক্ত সহজ বাংলায় রচিত। এক একটি পদ এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী। কাহিনীটি বিবৃত করেছে নাগরী নিজে। গোরানুরাগের প্রেক্ষাপটে আপনার চরিত্র কথন এগুলির উপভোগ্য বিষয়। বিশিষ্ট সামাজিক পটভূমিকায় পরিবারস্থ আত্মীয়দের বাধা সত্ত্বেও তাদের গৌররূপ তৃষ্ণা ও তীব্র তীক্ষ্ণ গোরানুরাগ এবং সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে উপস্থিত বুদ্ধির প্রাখর্য, চাতুর্যের সাফল্য ও কল্পনার আতিশয্য মিলে কবিতাগুলি আস্বাদনীয় হয়ে উঠেছে।

'নদীয়া নাগরী' শিরোনামের পদগুলি তিনটি কিরণে (৭ম, ৮ম ও ৯ম) সজ্জিত; যথাক্রমে নাগরীদের প্রবল গৌররূপতৃষ্ণা, স্বাপ্নসম্ভোগ ও ভবিষ্যৎ মিলন লালসা বিষয়ে রচিত।

গৌররূপ দর্শনে নাগরীরা পাগল। জগৎ সংসার তাদের কাছে নিরর্থক। গোরাই তাদের যথাসর্বস্ব। একত্রে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই তাদের আনন্দোল্লাস। নিঃসঙ্গ হলেই বিষাদ ও অন্ধকার তাদেরকে গ্রাস করে। কেউ 'আতুর' হয়ে রাত কাটায়, কেউ স্বপ্ন দেখে বিচলিত হয়, কেউ নিশান্তে গৃহকর্ম সেরে অন্যের কাছে ছুটে যায়। সেখানে পরস্পর পূর্বদিন ও রাত্রি যাপনের কথাবার্তা বলে।

কেউ বলে, অসুস্থতার ছল করে কুটিলমতি শাশুড়ীকে ঠকিয়ে শয়নঘরে যাবার নামে বাইরে দাঁড়িয়ে গৌরাঙ্গ দর্শন করেছে (৫ নং পদ)। কেউ উপস্থিত বুদ্ধির অভাবে শাশুড়ীর কাছে শপথ করে যে, সে গৌরাঙ্গ সম্পর্কে কিচ্ছুটি জানে না (৬ নং পদ)। জনৈকা নাগরীর মুখে শাশুড়ীকে ঠকানোর রীতিটি চমৎকার হয়েছে—

'সংকীর্তনরত গৌরাঙ্গ যাচ্ছিলেন। নাগরী তখন রন্ধনে ব্যস্ত। গৌর-সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক শাশুড়ী কিছু কিছু জানতো। সুতরাং শাশুড়ী বধূকে ঘরে আবদ্ধ রেখে বাইরে এসে কীর্তন শুনতে থাকে। বধূ ক্রোধে জ্বলতে থাকে। কিছু উপায় না দেখে সে জানালা খুলে দাঁড়ায়। নাগরকে নয়নকোণে ইঙ্গিত করে, নাগরও কটাক্ষে প্রত্যুত্তর জানিয়ে চলে যায়। বধূ পুনরায় রন্ধনে বসে। শাশুড়ী শিকল খুলে দেখে বধূ রন্ধনে গভীর ভাবে মগ্ন আছে (৭ম কিরণ, পদ নং ১৬)।

ননদীদের 'ননদপনা' নাগরীদের কাছে অসহ্য। তারা নানাভাবে বধূদের গোরানুরাগে বাধা দেয়, মা বাপের কাছে দোষারোপ করে। পথে ঘাটে বধূকে পাহারা দেয়। বধূরাও সে জন্যে তাকে ঠকানোর পথ খোঁজে। জনৈকা নাগরীর মুখে শুনি—

'জল আনবার পথে গৌরাঙ্গকে দেখে ভাবাবিষ্টা নাগরীর কলসীটি মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে যায়। সংবাদ পেয়ে ননদী তার গর্জন করতে করতে ছুটে আসে। নাগরীও ফন্দী আঁটে। ননদীর প্রশ্নের উত্তরে সে বলে যে, ননদীরই চরিত্র সম্পর্কে লোকের মর্মান্তিক অকথা কুকথার প্রতিবাদ করতে গিয়েই

তার কলসীটি ভেঙেছে। ননদী কৃতজ্ঞতা ভরে বধূকে সান্তনা দেয়।' (৭ম কিরণ, পদ ৮)।

এই পদগুলির মধ্যে ভক্তি বা নাগরীবৃত্তির চিত্র যতটা আছে, তার চেয়েও বাঙালী সংসারের নিত্যকার অম্লমধুর চিত্রটিই পাঠককে মুগ্ধ করে।

৮ম কিরণে নাগরীদের স্বপ্ন প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। গোরার প্রতি গভীর আসক্তিবশতঃ নাগরীরা তাঁর সঙ্গে মিলনাদি কামনা করে। কিন্তু কঠিন বাস্তবে তা পূর্ণ হবার উপায় নেই। নাগরীদের সেই অপূর্ণ সাধ স্বপ্নে পূর্ণ হয়।

প্রভাতে তারা একত্রিত হয়ে পরস্পর স্বপ্নদর্শন উত্থাপন করে।

পদগুলি স্বপ্নসম্ভোগের, পরিপূর্ণ আদিরসাত্মক, কুরুচিপূর্ণ ও অশ্লীল। গৌরচরিত্রকে এগুলি নিঃসন্দেহে কলুষিত করেছে। তবু নাগরীদের মনো-বিশ্লেষণে এগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। জনৈকা নাগরীর স্বপ্ন অতি অদ্ভুত। সে বলে—

রাত্রে গৌরনাগর তাদের ঘরে ঢুকে ভুল করে তার ননদীর পালংকে যান। ননদী 'চোর চোর' বলে বধূকে জাগিয়ে দেয়, গোরা ভীত হয়ে দূরে লুকোতে চেষ্টা করেন। ননদী ধমক দিয়ে তাঁকে তাড়া করে। অদূরে গৌরাঙ্গকে দেখে। সে তাঁকে আদর করে পালংকে আনে ও উভয়ে রভসকেলিতে মত্ত হয়।

নাগর কিন্তু এ যে তাঁর প্রার্থিত নাগরী নয়, তা বুঝতে পারেন। তিনি বিষণ্ণ হয়ে চারদিকে চোখ রাখেন। তখন ননদী বধূর কাছে এসে সে ঘটনা গোপন করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে। (পদ ১১, পৃঃ ৯৯)।

এ ভাবে দেখা যায় পদগুলিতে অশ্লীলতার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছে। গোরার সঙ্গে নাগরীদের দেহজ মিলন বর্ণনা গৌরচরিত্রকে চরম আঘাত করেছে। বাসুদেব ঘোষ ও লোচনের পরিবেশিত আপত্তিকর আদিরস নরহরি চক্রবর্তীর হাতে পড়ে তটপ্লাবী বন্যার মতো উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

৯ম কিরণে অতৃপ্ত নাগরীদের গৌর-মিলন কল্পনাবিলাসের চূড়ান্ত পরিণতি। কোনো ক্রমেই যখন মিলন সম্ভব হয় না, তখন কে কি ভাবে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে পারবে, তারই পরিকল্পনা করে নাগরীরা।

পথে ঘাটেও যখন নাগরের দর্শন নেই, তখন তারা অগত্যা শচীগৃহে গিয়ে

গৌরাঙ্গকে দর্শন করতে চায়। মঙ্গলপ্রার্থিনী শাশুড়ীদের এক দৈবজ্ঞ একটি উপায়ও বলেছিলেন যে, বধূরা যেন প্রত্যহ প্রাতঃকালে শচীদেবীর পদধূলি গ্রহণ করে। বধূদের 'সোনায় সোহাগা'। শাশুড়ীরা আদর করেই তাদের শচীগৃহে পাঠায়। তবু পাছে তাদের গুপ্ত প্রণয় ব্যক্ত হয়ে পড়ে এই ভয়ে তারা গৃহ কর্মের অজুহাত দেখায়। তারপর দল বেঁধে শচীগৃহে যেতে মনস্থ করে।

নববাস পরিহিতা নাগরীবৃন্দ গমনকালে বলে, তাদের কেউ যেন শচীগৃহে কোনো কারণেই মনোভাব ব্যক্ত না করে, ঠাট্টা পরিহাস ইসারা বন্ধ রাখে, সুস্থির থাকে। কারণ অস্থিরতা প্রকাশ পেলেই শচীদেবীর টনক নড়বে।

তখন কেউ বলে শচীকে প্রণাম করে লজ্জিত হয়ে দাঁড়াবে, ঘোমটার ফাঁকে গৌরাঙ্গ দর্শন করবে। এবং 'নয়ানকোণে' 'অনায়াসে' তাঁর হৃদয় জয় হবে, তিনি অস্থির হয়ে উঠবেন। কেউ বলে 'আঁখির ঠাবাঠারি' হলে 'ধৈরজ ধরম কিছু না থাকিবে কাঁপিব মদনভবে॥'

ঘামে দেহ ভিজে যাবে, চুলগুলি এলিয়ে পড়বে, গাত্রবাস খসে পড়ার উপক্রম হবে, এবং 'গৌরাঙ্গ চান্দেরে আলিঙ্গন দিতে অধিক উদ্যত হব।' (পদ ৬, পৃঃ ১০৯)।

এর চেয়েও অনেক রুচিহীন বক্তব্য আছে। গৌরাঙ্গকে উত্তেজিত করার জন্যে নাগরীরা নারীর স্বাভাবিক লজ্জা, সাধারণ ভদ্রতা পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে। কবি যে তাদের সম্পূর্ণ অনাবৃত-দেহ করে বর্ণনা করেন নি, এই রক্ষা। ১১, ১৩ নং ইত্যাদি কিছু পদে নাগরীদের কবি এমন কামোন্মত্ত করে এঁকেছেন যে, তা সাধারণ পাঠকের পড়বার উপায় নেই।

গ্রন্থের ১০ম ও ১১শ কিরণে সুরললনাদের পারস্পরিক কথাবার্তায় গৌর ও গৌরনাগরীদের চরিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। কবি সুরনারীদের 'নাগরী' বলেন নি, কিন্তু এদের কথাবার্তা শুনে এদেরকে নদীয়া নাগরী থেকে পৃথক করা যায় না। দেবরমণী বলেই গৌরাঙ্গকে তারা পায় না। তাই বেদনায় তারা ফেটে পড়ে—

ধিক ধিক রহু সুরপুরের বসতি ধিক এ শরীর ভার।
ধিক ধিক রহু নয়ন এ রূপ যৌবনে কি কাজ আর॥ পৃঃ ১১৯

গৌর ও নাগরীদের চারিত্রিক শুচি অশুচি নিয়ে তারা পরস্পর কথা কাটাকাটি করে।

পরিকল্পনার দিক থেকে এই অংশটি অভিনবত্বের দাবী রাখে। নরহরির

পূর্ববর্তী কোনো কবির এই জাতীয় পরিকল্পনা নেই। দেবরমণীদের আচরণে মর্ত মানবীদেরই পরিচয় ও সাদৃশ্য আছে। রূপ-পিপাসা, সৌন্দর্য প্রবণতা, কলহপ্রিয়তা, বাক্-নবাবী-ভাব ইত্যাদি লক্ষণগুলির প্রকাশে তারা যেন আমাদের পরিচিত সংসারের মাঝখানে এসে স্থান করে নিয়েছে। তবে প্রধান বক্তব্য-বিষয়ের পুনরাবৃত্তির জন্যে পদগুলির গৌরব ততটা বৃদ্ধি পায় নি ॥

(ঘ) রাধাকৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক পদাবলী

নরহরির গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণ ও বলরাম বিষয়ে ৭২১টি পদ আছে। 'ভক্তিরত্নাকরে' ৫১, 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে ১৪ (মোট ২৩টি, তন্মধ্যে ৭টি ভক্তিরত্নাকরেও আছে) 'গীতচন্দ্রোদয়-মঙ্গলাচরণ' পুথিতে ২৬, এবং এর পূর্বরাগ নামক মুদ্রিত গ্রন্থে ৬৩০।

সাধারণতঃ বৈষ্ণব পদগুলিকে রসশাস্ত্রানুসারে পালায় পালায় বিন্যস্ত করা হয়। চৈতন্যপূর্বযুগের বিদ্যাপতির পদাবলীতে নিম্নোক্ত বিষয়ে পদ পাওয়া যায়—বয়ঃসন্ধি, পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, মান, বিরহ, রসোদ্গার, ভাবোল্লাস, প্রার্থনা প্রভৃতি। পর-চৈতন্য পদাবলী উজ্জ্বলনীলমণির আদর্শে রচিত। গোবিন্দদাসের রচনায় উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও নতুন পালা আছে—স্বয়ং দৌত্য, বনবিহার, বাসকসজ্জা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, দান ও নৌকালীলা, দোল ও ঝুলন, রসালস ও কুঞ্জভঙ্গ, প্রেমবৈচিত্ত্য, অষ্টকালীয় লীলা ইত্যাদি। এ ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও গোষ্ঠলীলার পদ এ যুগে প্রচুর রচিত হয়।

কিন্তু নরহরির পদাবলীতে এরূপ কোনো ধারাবাহিক পালা বিন্যাস লক্ষ্য করা যায় না। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রগুলি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেছিলেন। আবার পদাবলী সংকলন গ্রন্থও প্রস্তুত করেছিলেন। সুতরাং পদাবলীর বিষয়বস্তু ও পালা বিন্যাস তাঁর অজানা থাকবার কথা নয়। কিন্তু আলোচ্য পদগুলি সেরূপ কোনো দাবী রাখে না।

'ভক্তিরত্নাকরে'র পদগুলির বিষয়বস্তু হলো ৫ম তরঙ্গ: (১) রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড বর্ণনা, (২) রাধার কৃষ্ণ-সৌন্দর্য দর্শন, (৩) নানা ছদ্মবেশে রাধা-কৃষ্ণের মিলন, (৪) বলরামের সৌন্দর্য, নৃত্য ও বিলাস, (৫) রাধার জন্মলীলা, (৬) রাধা-কৃষ্ণের বন্দনা, (৭) রাস ও মিলন—রাধা-কৃষ্ণের রূপ, নৃত্য, জলকেলি, কুঞ্জবিহার, ঝুলন, ফাগুখেলা ইত্যাদি বর্ণনা। ১৩শ তরঙ্গ: রাধা,

ও কৃষ্ণের জন্মতিথি উৎসব, অভিষেক। আসলে এই পদগুলিতে পালা বিন্যাসের উপায়ও ছিল না। ৫ম তরঙ্গে শ্রীনিবাসাদিকে এবং ১৩শ তরঙ্গে বীরচন্দ্রকে যথাক্রমে রাঘব পণ্ডিত ও বাসুদেব বৃন্দাবনস্থ কৃষ্ণলীলাস্থলীর এক একটিতে নিয়ে গেছেন। এক এক স্থানের মাহাত্ম্য জানানোর সময় এঁদের মুখেই কবি এই পদগুলি প্রকাশ করেছেন।

আবার 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'র পদগুলি গঙ্গা-যমুনার কথোপকথনের সময় সংযোজিত। যমুনা গঙ্গাকে 'গৌরাঙ্গের পূরব বিলাস' অর্থাৎ 'কৃষ্ণ (রাধা) তত্ত্ব' শোনাচ্ছেন। এগুলির বিষয়ে তাই পালা সৃষ্টির দরকার হয় নি। পদগুলিতে পাই—(ক) রাধা-কৃষ্ণের পরিচয়, (খ) বিভিন্ন ছদ্মবেশে ও ছলে উভয়ের মিলন, (গ) উভয়ের অষ্টকালীয় লীলা (নিশান্ত ও প্রাতঃকালীয় বিহার মাত্র পাওয়া গেছে)।

'গীতচন্দ্রোদয়' পদ সংকলন গ্রন্থ। 'উজ্জ্বলনীলমণি'র আদর্শে এতে পদাবলী সজ্জিত। 'মঙ্গলাচরণে' গৌরবন্দনাদির সময় কবি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কিছু পদ সংযোজন করেছেন। এ থেকে উভয়ের বন্দনা ও রূপ বর্ণনা মেলে। আবার এর 'পূর্বরাগ' অংশে রাধা ও কৃষ্ণের পৃথক পৃথক ভাবে পূর্বরাগ বর্ণিত হয়েছে। পূর্বরাগ বর্ণনায় কবি সম্পূর্ণরূপে 'উজ্জ্বলনীলমণি'র বিভাগ-উপবিভাগগুলি বা রীতি-নির্দেশ সামনে রেখে পদ রচনা করেছেন।

সাক্ষাৎ চিত্রপট স্বপ্ন আদি যে দর্শন।
বন্দী দূতী সখী মুখে গীতাদি শ্রবণ॥
লালসাদি দশা কামলেখা মাল্যার্পণ।
সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ আদি ইহাতে বর্ণন॥
আদি শব্দে সম্পন্ন স্পর্শিব সংক্ষিপ্তেতে।
কব সে সংক্ষেপে আর স্ফুরে যে চিত্তেতে॥

(গীতচন্দ্রোদয়-পূর্বরাগ, স. হরিদাস দাস, পৃঃ ১১)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আলোচ্য পদের সংখ্যা সাত শতাধিক হলেও এগুলির বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য অল্প। 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র পরিকল্পনা অনুসারে (মঙ্গলাচরণ পুথি, পত্র ২২ক) জানা যায় যে, কবি পৃথকভাবে অভিসার, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস ইত্যাদি বিষয়েও পদ রচনা করেছিলেন বা পদ রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ গীতচন্দ্রোদয় পাওয়া যায় নি। এর

মান বর্ণনার আরম্ভাংশ মাত্র মিলেছে। তবে নরহরির মতো সর্ব বিষয়ে সতর্ক ও কৌতূহলী কবি যে বিচিত্র বিষয়কে আপনার কাব্যের অঙ্গীভূত করেছিলেন, তা সহজেই অনুমিত হয়।

প্রাপ্ত পদগুলিকে নিম্নোক্ত পর্যায়ে সাজানো যায়—(১) বৃন্দাবন, রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের সৌন্দর্য বর্ণনা, (২) বলরাম সম্পর্কিত পদাবলী, (৩) রাধা-কৃষ্ণের বন্দনা ও পরিচয় সূচক পদ, (৪) জন্মলীলা বিষয়ক পদ, (৫) রূপ বর্ণনা, (৬) পূর্বরাগ, (৭) মিলন, (৮) রাস, ঝুলন, দোল লীলা, (৯) অষ্টকালীয় লীলা। নরহরির কৃতিত্ব এই যে, স্বল্প পরিসরের মধ্যেই তিনি আপনার কবিত্ব শক্তি, স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

১। বৃন্দাবন, রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের সৌন্দর্য বর্ণনা

এ বিষয়ে ৩টি পদ আছে। 'গীতচন্দ্রোদয়' মঙ্গলাচরণ পুথিতে (পত্র ১৭ক) বৃন্দাবন বর্ণনার পদটিতে সেখানের প্রাকৃতিক শোভা প্রকাশিত হয়েছে। কুণ্ড বর্ণনার পদ দুটি 'ভক্তিরত্নাকরে'র। একটিতে কৃষ্ণের চোখে রাধাকুণ্ডের, অপরটিতে রাধার চোখে শ্যামকুণ্ডের সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছে। এ জাতীয় পরিকল্পনা বৈষ্ণব পদ সাহিত্যে অভিনব। তাছাড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের এই দুই মহাতীর্থ সম্পর্কে রচিত বলেও পদগুলি আদরণীয়।

সাধারণতঃ দেখা গেছে, নরহরি কোনো স্থান বা কুণ্ড বা বৃক্ষ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তার ইতিহাস, ভূগোল ও পুরাণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে থাকেন। কিন্তু এখানে উক্ত বিষয়গুলি অবতারিত হয় নি। এগুলির প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সৌন্দর্য প্রকাশেই কবি মনোনিবেশ করেছেন। যদিও প্রায় অভিন্ন তথ্যের সমাহারে কুণ্ডগুলির শোভা প্রকাশিত—সেই পরিপূর্ণ জল, মৃদুমন্দ বাতাস, মণ্ডিত কুঞ্জ, তরুলতা, পাখীপাখালির কলগীত, ষড় ঋতুর অবস্থান—তবু ছন্দের হিল্লোলে, অনুপ্রাসের ঘনঘটায়, অলংকারের সমাহারে সর্বোপরি কবি-কৌতূহল প্রকাশে পদ দুটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এক অলৌকিক রস স্ফুরণে কিংবা এক অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম রহস্য পরি-প্রকাশের সহায়ক হয়েছে।

কৃষ্ণের রাধাকুণ্ড দর্শনের দুই ছত্র—

লঘু লঘু নব পবন সঙ্গ উপজত মৃদুতর তরঙ্গ
প্রমুদিত জলচর চয় বহু ফিরত কত রঙ্গে।
ঝলকত মণিখচিত ঘাটচয় বিচিত্র চিত্র নাট
মণ্ডিত কুটি-মণ্ডপ মদনালয় মদ ভঙ্গে ॥
(ভক্তি. পৃঃ ১২৭)

২। বলরাম সম্পর্কিত পদাবলী

কৃষ্ণাগ্রজ বলরাম সম্পর্কিত পদগুলিতে নরহরি মৌলিকতার দাবী রাখেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে গোষ্ঠলীলা ব্যাপারেই সাধারণতঃ বলরামের আবির্ভাব। কিন্তু যুবক বলরামের সৌন্দর্য, নৃত্য, রাস, প্রিয়াসহ বিলাস-কলা বিষয়ে অধিকাংশ বৈষ্ণব কবিই উদাসীন। নরহরি বৃন্দাবনের রামঘাটের বর্ণনা প্রসঙ্গে (ভক্তি. পৃঃ ১৭২-৭৭) উক্ত বিষয়গুলির উপর ৮টি পদ পাঠকদের উপহার দিয়েছেন।

নানা সাদৃশ্যবোধক অর্থালংকারের সাহায্যে কবি বলরামের অপরূপ সৌন্দর্য প্রকাশ করেছেন। যদিও এ বিষয়ে পূর্বজ সংস্কৃত ও বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব স্পষ্ট, তবু দেহের স্থূল সৌন্দর্য বর্ণনা মাঝে মধ্যে কবি-উল্লাসের প্রকাশক হয়ে উঠেছে। ব্যতিরেক উপমা অনুপ্রাসের ঘনঘটায় কবির নিপুণতা ধরা পড়েছে।

অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে রাস নৃত্য চলেছে। বলদেব কখনো শিঙ্গা বাজান। শিঙ্গার নাদে চঞ্চলা হয়ে রাম-প্রেয়সীবৃন্দ গৃহকাজ ফেলে প্রিয়তমের কাছে ছুটে আসেন। নৃত্যের তালে তালে মৃদঙ্গ-কিঙ্কিনী-নূপুর বাজে, নৃত্যের ফাঁকে ফাঁকে তিনি প্রেয়সীদের মুখচুম্বন করেন। এই বর্ণনার মধ্যেও কবির অভিব্যক্তিটি লক্ষ্য করবার মতো॥

৩। রাধা কৃষ্ণের বন্দনা ও পরিচয়-সূচক পদ

'ভক্তিরত্নাকরে' (৪টি) ও 'গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণে' (২টি) এ বিষয়ে কিছু পদ আছে। বৃন্দাবনের শুক ও শারী যথাক্রমে কৃষ্ণ ও রাধার বন্দনা গান করছে। এই পরিকল্পনা পূর্ব প্রচলিত। পদগুলি অনুপ্রাসের প্রয়োগাধিক্য হেতু সুখপাঠ্য।

(১) কৃষ্ণবন্দনা—জয় জনরঞ্জন কঞ্জ নয়ন ঘন অঞ্জন নিভ নব না গর ঐ ঐ
(ভক্তি. পৃঃ ২৫৯)

(২) রাধাবন্দনা—জয় জগতবন্দিনী বিদিত নৃপনন্দিনী রাধিকা চন্দ্রবদনী দুঃখমোচনী
(ভক্তি. পৃঃ ২৫৯)

পরিচয়সূচকপদগুলি 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'র। রাধিকার পরিচয়ে তাঁর জনক জননী শাশুড়ী ননদীর নাম আছে। কৃষ্ণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে রাধাপ্রাণতার মাধ্যমে। এই পরিচয় পুরাণ ও চৈতন্যচরিতামৃত অনুসরণে রচিত। যেমন কৃষ্ণ সম্পর্কে উক্ত—

যেঁহো প্রিয়া পায় পড়ি রহে বহে কান্ধে করি কত যতন পায়া।
প্রিয়ার ভৎর্সন বাণী সুধাধারা পিয়ে কত সাধে আনন্দ হৈয়া॥
(গৌরচরিত্রচিন্তামণি, পৃঃ ১৭৫)

৪। রাধার জন্মলীলা ও রাধাকৃষ্ণের জন্মতিথি-উৎসব বিষয়ক পদ

'ভক্তিরত্নাকরে' এ বিষয়ে ৮টি পদ আছে। কৃষ্ণের জন্ম বিষয়ক কোনো পদ নেই। আলোচ্য পদগুলির মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্ম সর্বত্র এক,—জয় জয় রব, মঙ্গলগীত, বাদ্য, অঙ্গনে দধি দুগ্ধ হলদি ছড়ানো, দানধ্যান ইত্যাদি। এ দিক দিয়ে গৌরজন্ম বিষয়কপদগুলির সঙ্গে এগুলি অভিন্ন। তবে জন্মতিথির উৎসব ও অভিষেকের পদগুলি ভাববস্তুর বিচারে প্রশংসনীয়। কৃষ্ণের জন্মতিথি-উৎসবের একটি পদে (ভক্তি. পৃঃ ৬২৮) কবি এক কৌতুককর কাহিনীর উত্থাপন করেছেন। উৎসবে আগতা রাধা কৃষ্ণকে দেখে এমনি বিচলিত হয়ে পড়েছে যে, অগত্যা সখীরা কৃষ্ণকে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে রাধার মিলন ঘটাতে বাধ্য হয়েছে॥

৫। রাধাকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা

নরহরি সৌন্দর্যরসিক কবি। তিনি রূপের পূজারী ও রূপানুসন্ধানী। গৌরাঙ্গ বা রাধাকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা তাঁর একটি প্রিয় প্রসঙ্গ। এ জন্যে তিনি পূর্ববর্তী সংস্কৃত আলংকারিক, কবি ও মহাজনদের নিকট সর্বতোভাবে ঋণী।

বৈষ্ণব সাহিত্যে রূপ বর্ণনা গতানুগতিক। খুব কম কবিই এ বিষয়ে ভাবানুভূতির গভীরতা ও সৌন্দর্য চেতনার মৌলিকতা প্রকাশ করতে পেরেছেন।

নরহরির পদগুলিতে দেখি, তিনি নায়ক-নায়িকার সৌন্দর্য প্রকাশক যে বস্তুগুলি বা অলংকারসমূহ ব্যবহার করেছেন, তা বহু কবির ব্যবহারের বিষয় ছিল। নরহরি সেই প্রথানুগত্যের মধ্য দিয়েই পাঠক শ্রোতার শ্রবণ মন পরিতৃপ্ত করতে চেয়েছিলেন। যেমন—রাধার রূপ বর্ণনার একটি 'রসনারোচন শ্রবণ বিলাস' পদ (গী. ম., পত্র ২৭খ) :

দেখহ বৃষভানু কুমরী ভঙ্গী ভুবন মোহই।
কনক কঞ্জ পুঞ্জ তড়িত চম্পক কুমকুম বিদলিত তনু মৃদুতর শিরিস কুসুম নিন্দি কি নব সোহই॥
কুন্তল ঘন তিমির বরণ চামর চয় গরব হরণ বেণী বিপুল ভুজগ ভাঁতি কি এ কাহুক দংশই।
তরুণারুণ দলন জ্যোতি সিঁথি সিন্দুর চমক হোতি কুণ্ডল যুগ শ্রবণ গণ্ড মণ্ডনধৃতি ধ্বংশই॥

কিংবা কৌতূহলী কবির কৃষ্ণরূপের বর্ণনা :

শ্যামতনু ঘন দলিত অঞ্জন নীল কুবলয় নিন্দিতে।
চারু কচ কুসুমাঞ্চিত তহি লুব্ধ মধুপ সুগন্ধিতে॥
(গী. ম., পত্র ২৬ক)

শব্দে অনুপ্রাসে উপমায় পদগুলি উপভোগ্য হয়েছে। খুব কম ক্ষেত্রেই তিনি পুরোনো অলংকারে নতুন ব্যঞ্জনা সঞ্চার করতে পেরেছেন। স্পর্শাতীত রূপের যে সর্ব গভীর আকর্ষণ, কিংবা রূপের প্রতি যে অনন্ত বিস্ময়ের প্রকাশ, নরহরির কোনো কোনো পদে তার পরিচয় আছে, যেখানে 'মুরছি পড়ত তঁহি কুলবতী লাখ'। সৌন্দর্যমুগ্ধ কৃষ্ণ বলেন :

মোরো যে বোলো সে বোলো সখি।
সেরূপ নিরখি নারি নেবারিতে মজিল যুগল আঁখি॥
(গী. পু., পত্র ৩৩৫ পৃঃ)

৬। পূর্বরাগ

রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদগুলি 'উজ্জ্বলনীলমণি' বর্ণিত বিশেষ বিশেষ ভাব ও রসসমূহের দৃষ্টান্ত দানের জন্যে রচিত। ভাবে ভাষায় শব্দে চিত্রে অগ্রজ

কবিদের প্রভাবও আছে। প্রথানুসরণ, প্রথানুকরণের সঙ্গে বিবিধ সংস্কৃত শ্লোক ও কাব্যাংশের অনুবাদও আছে।

নরহরির পদ সজ্জার বৈশিষ্ট্য : রাধা ও কৃষ্ণের পূর্বরাগের সঞ্চার ঘটেছে পারস্পরিক দর্শন ও শ্রবণে,—সাক্ষাৎ-চিত্রপট-স্বপ্ন-দর্শনে, বন্দী-দূতি-সখী-মুখে নামগুণাদি শ্রবণে। এই সঙ্গে নরহরি মানসচক্ষে অকস্মাৎ দর্শন (গী. পূ., পৃঃ ১০৯, পদ ২৮, ২৯) এবং আকস্মিক শুকমুখে ও বংশীধ্বনি শ্রবণের (পৃঃ ১১১, পদ ৩৪-৩৬) প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছেন। তারপর উত্তম নায়ক-নায়িকার দশ দশা বর্ণনা—লালসা, জাগর্য্যা, তানব, জড়িমা, বৈয়গ্র, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু। এই সঙ্গে নরহরি কামলেখা ও মাল্যার্পণের উপরও পদ গ্রথিত করেছেন। এমন যথাযথভাবে শাস্ত্র নির্দেশ-এভাবে আর কোনো কবি পদরচনা করেছেন বলে জানা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, অধিকাংশ বৈষ্ণব কবির রচনায় রাধিকার পূর্বরাগেরই প্রাধান্য। কিন্তু নরহরি কৃষ্ণের পূর্বরাগকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর রাধা ও কৃষ্ণের পূর্বরাগের যথাক্রমে ৩৭০ এবং ২৫৭টি পদ আছে। অন্য কোনো বৈষ্ণব কবির নামে এঁদের পূর্বরাগ বিষয়ে এতগুলি পদ পাওয়া যায় না।

তৃতীয়তঃ, পদগুলিতে অন্তরের আকুলতা ও হৃদয়ের গভীর আর্তি অপেক্ষা প্রথানুসরণ ও আলংকারিকতাই প্রকট হয়ে উঠেছে। একই ভাবের, তথ্যের ও ঘটনার বর্ণনায় পদগুলি অভিনবত্ব হারিয়েছে। তবে পদরচনায় নরহরির নিজস্ব কৌতূহলটিও উল্লেখ করবার মতো।

চতুর্থতঃ, রীতির দিক দিয়ে পদগুলিতে যেমন শ্রীরূপের প্রভাব আছে, তেমনি ভাবে ভাষায় ছন্দে অলংকারে চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস-বিদ্যাপতি প্রমুখের প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। যেমন—চণ্ডীদাসের প্রভাব জাত পদ—(১) পিরিতে মজিলা বিনোদিনী, গী.পূ., পৃঃ ১৪৪ (এর ঘর বাহির দণ্ডে শতবার, গী. পূ., পৃঃ ১৪৪), (২) কেহো কহে কি আর কথায় পৃঃ ১৪৭ (ভেঝা বেঝা আন গিয়া, গী. পূ., পৃঃ ১৪৬), (৩) সখিগণ বেড়ি চারিপাশে, পৃঃ ১৫৯ (কালিয়াবরণ হিরণ বসন, গী. পূ., পৃঃ ১৫৮), (৪) সখি তা সনে করিব লেহা, পৃঃ ৩৩৩ (বঁধু কি আর বলিব, ক. বি., গ্রন্থ পৃঃ ১৩৭) ইত্যাদি। জ্ঞানদাসের প্রভাবে রচিত—কি খেণে গেলাম সাধে যমুনার জলে, পৃঃ ১৫১ (সই কেনে গেলাম জল ভরিবারে, গী. পূ., পৃঃ ১৫৫) (আলো মুই জানো না

পৃঃ ১৩৯)। বিদ্যাপতির (বাঙালী) প্রভাবে লেখা—রাই কি কাজ করিলি পথে পৃঃ ৩৩৯, শুন শুন হে রসিকরাজ পৃঃ ১৭৫, সখি শ্যামেরে প্রবোধ দিয় ৩৩৩ পৃঃ (—শুনলো রাজার ঝি, গী. পৃ., ৩৯২) ইত্যাদি ॥

রাধা চরিত্র

কদিন ধরেই রাধিকাকে বিচলিত ও বিমর্ষ দেখা যাচ্ছে। সখীরা তার কারণ জিজ্ঞাসা করে। বহু পীড়াপীড়ির পর সে কৃষ্ণদর্শনের কথা জানায়। স্পষ্ট করে বলে—"এ সখি শ্যাম মরমে পশি গেল। লোচন কোণে সকল হরি নেল॥" (পৃঃ ১৫২) সখীরা লক্ষ্য করে, রাধা একাকী আনমনা বসে থাকে, মাটিতে কি যেন লেখে, 'অনিমিখ আঁখে' কার যেন সন্ধান করে। সখীরা পুনরায় তার কারণ জিজ্ঞাসা করে। রাধা বলে, যমুনা গমনকালে সেই কৃষ্ণ নানা ছলে তার কাছাকাছি এসেছিল, তার ছায়া তার গায়ে লেগেছে। তার রূপ, তার হাসি, তার কটাক্ষ রাধার 'পরাণ সহিতে' টানাটানি করে (পৃঃ ১৫৫)। রাধা বলে : "যে হউক সে হউক সই না সহে পরাণে। জর জর হৈল হিয়া নয়ানের বাণে ।।" ...এমন হইবে ইহা কভু নাহি জানি। জাগিতে ঘুমাইতে দেখি কালারূপ খানি ।।" তারপর আর বলা যায় না। রাধিকার চোখ দুটি জলে ভরে যায়। "কহিতে কহিতে রাই দুই আঁখি মুদে। ধরিয়া সখীর গলা কালা বলি কাঁদে॥" (পৃঃ ১৫৬)। রাধিকা অস্থির হয় শ্যাম-মিলনের জন্যে, "সই কত নেবারিব চিতে। ভুলিলুঁ কুলের লাজ নারি থির হৈতে" (পৃঃ ২০২)। রাধিকার পানাহার-নিদ্রা বন্ধ হয়, শরীর হয় দুর্বল, সদা সর্বদা অস্বস্তি। যমুনার জল আনতে গিয়েই তো তার সর্বনাশ ঘটেছে! রাধা বলে :

"ওগো সই মোরে কি হইল।
কালিয়া রূপের বনে মন হারাইল ॥
ঘরে আইলুঁ হইয়া বাউরী।
পাসরিতে চাই পাসরিতে নারি ।।"

গীতচন্দ্রোদয়, পূর্বরাগ (পৃঃ ১৭৫)

কৃষ্ণচিত্র সর্বদা তার নয়নে নৃত্য করে, হৃদয় মাঝে সেই কালিয়াবরণ পুরুষ জেগে ওঠে (পৃঃ ১৯৮)। রাধিকা তার সমাজ প্রতিবেশ মন সবকিছু বুঝেও বোঝে

না, জেনেও জানে না। সব অসার, সব ব্যর্থ মনে হয়। ধীরে ধীরে সে এমনি অস্থির হয়ে ওঠে যে, সখীরা একদিন রাধাকে কদম্বতলায় কৃষ্ণ দেখাতে নিয়ে যায়। রাধার তখনকার আবেগ বিহ্বল অবস্থাটি অপূর্ব হয়ে ফুটে উঠেছে কটি বাক্যে: "ওনারূপ বারেক দেখিতে। নারয়ে নয়ান ফিরাইতে॥ চিত্রের পুত্তলীপারা রয়। অনিমিখ আঁখ্যে ধারা বয়।" (পৃঃ ১৯৩) আর একদিন রাধার অবস্থা অসহনীয় হয়ে ওঠে। সখীরা সে কথা কৃষ্ণকে গিয়ে জানাতে বাধ্য হয়। তারা অভিযোগের সুরে বলে—

শুনহে রসিকরাজ, একি করিলা বিষম কাজ।
কুলবতী সতী মতি মাতাইলা ভাঙ্গিলা কুলের লাজ॥
তারে চাহিয়া নয়নকোণে, হিয়ায় বিধিলা মদন বাণে।
ঈষত হাসিতে কি বিষ ঢালিলা অবলা না জীয়ে প্রাণে॥

সুতরাং কানু যেন একবার রাইকে দর্শন দেয়। 'পাইলু পাইলু প্রাণ রাধা' জেনে অস্থির কৃষ্ণ আসে রাই-এর কুঞ্জে। রাধা তা বুঝতেও পারে না। তবে কুঞ্জের সব কিছুর মধ্যে সে যেন একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করে। সখীকে জিজ্ঞাসা করে—

"ওগো বুঝিতে নারিয়ে মেন। তরুলতা খগ পশু দিবা সব নীলিম হইল কেন॥" সখী উত্তরে দেখিয়ে দেয় কৃষ্ণ এসেছে কুঞ্জে। কৃষ্ণের আগমনে রাধার তখনকার অবস্থাটি আরো বিচিত্র—

"দেখ দেখহ রাইএর কাজ।
যারে দেখিবারে ঝুরে দিবারাতি তারে নেহারিতে লাজ॥
যার বচনে নিছয়ে প্রাণ।
সে ভণে কাকুতি বাণী কত মত তাহে না পাতয়ে কান॥
যার পরশ লাগিয়া কান্দে।
এবে সে পরশে বাসে কত ভয় ভাবিতে পড়িলু ধান্ধে॥

(পৃঃ ১৬০)

৭। মিলন, স্বয়ংদৌত্য

পূর্বরাগের সর্বশেষ পরিণতি মিলনে। 'গীতচন্দ্রোদয় পূর্বরাগে' নরহরি এই মিলন বিষয়ে কিছু কিছু পদ গ্রথিত করেছেন। কিন্তু 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'গৌরচরিত্র-চিন্তামণি'তে রাধাকৃষ্ণের স্বয়ংদৌত্যের পদগুলিই অধিক উপভোগ্য।

ব. বি. / ন. চ. (২) /৪১-৫

এগুলিতে প্রেমের আর্তি ও আয়াস প্রকাশিত। রাধা যেমন কৃষ্ণ-সঙ্গের জন্য লালায়িত, কৃষ্ণও তেমনি প্রণয়িণীকে লাভ করবার তাড়নায় অস্থির। স্বাভাবিক ভাবে মিলন অসম্ভব বলেই নানা ছদ্মবেশে কৃষ্ণ রাধার গুরুজনদের চোখে ধূলি দিয়ে মিলন সম্ভব করে। এজন্যে তাকে সাজসজ্জা প্রস্তুতকারিণী নারী (গৌ. পৃঃ-১৭৮), সুবেশিনী নারী (গৌ. পৃঃ-১৮২), দ্বিজ (গৌ. পৃঃ-১৮৩) প্রভৃতির বেশ ধারণ করে রাধিকার গৃহে উপস্থিত হতে হয়। কখনো স্নানরতা রাধার কাছে কৃষ্ণ 'অদ্ভুতপদ্মে'র বেশে ভেসে আসে (গৌ. পৃঃ-১৮১)। রাধাও তীব্র প্রেমের তাড়নায় কখনো সুবল সখার (গৌ. পৃ:-১৮৫) কখনো নিকুঞ্জ দেবী (গৌ. ১৮৭), কখনো বা চন্দ্রাবলীর দূতীর (গৌ. ১৮৯) বেশ ধারণ করে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়। আবার কখনো বা গৌরীপূজার নাম করে গুরুজনদের ঠকিয়ে কৃষ্ণের কুঞ্জে উপনীত হয় (গৌ. ১৮৬)। এই বিষয়-নির্বাচনে নরহরি তাঁর পূর্বজ কবিদের কাছে ঋণী।

চণ্ডীদাসের ভণিতায় কৃষ্ণের নাপিতানী (তরু ৬৩৭, ৬৩৮), বেদে (তরু ৬৪৩), দেয়াসিনী (তরু ৬৪১), চিকিৎসক (তরু ৬৪৪), বাজিকর (পাঠবাড়ী পুথি ৬ক, ৪৯নং পদ), বণিকিনী (তরু ৬৪০) ইত্যাদি ছদ্মবেশে রাধার সঙ্গে মিলনের পদ আছে। কিন্তু নরহরির কৃতিত্ব এই যে তিনি রাধাকেও সুবলসখা, নিকুঞ্জদেবী, চন্দ্রাবলীর দূতীবেশে সজ্জিত করে কৃষ্ণমিলনে পাঠিয়েছেন।

পদগুলিতে কৌতুকরসের যথেষ্ট নিদর্শন আছে। তেমনি আছে প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ প্রতিবেশে রাধাকৃষ্ণের ছলনাচপল অনুরাগ ও অন্তর আদান-প্রদানের চমকপ্রদ বর্ণনা। ভাবে ভাষায় ছন্দে কোনো কোনো পদ নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। যেমন, সাজ সজ্জা রচনাকারিণী নারী বেশে কৃষ্ণের স্বয়ংদৌত্য : সখী এই নারীকে রাধার কাছে নিয়ে এল। নারী নিজের পরিচয় দিচ্ছে—

অধিক সাধে মনের মত, শিখিনু বেশ রচনা যত, করিলু শ্রম অশেষ তাহে
হইয়া নবীনা।

সে সব প্রকাশিবার তরে, ফিরিয়ে সই বরজ পুরে গুণ বিচার করয়ে হেন
না পাই প্রবীণা ॥

৮। বিবিধ—রাস, ঝুলন, ফাগুখেলা, জলকেলি ইত্যাদি

'ভক্তিরত্নাকরে' রাস-বিষয়ে নরহরির কয়েকটি পদ আছে (পৃঃ ২৮৮-২৯১)। পদগুলিতে 'রাস-বিনোদিয়া'-কৃষ্ণ ও 'রাস-বিনোদিনী'-রাধার রূপ ও

নৃত্য বর্ণিত। এই রূপ বর্ণনা সংস্কৃত কবিদের অনুগ, নৃত্য বর্ণনা কবির গৌর নৃত্যের সঙ্গে অভিন্ন। তবে রাসে রাধা কৃষ্ণ চরিত্রদুটিই লক্ষণীয়। কোনো প্রাকৃতিক পরিবেশের আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণনা নেই, নিছক শারদ পূর্ণিমার উল্লেখ আছে। কিন্তু কবির নায়ক নায়িকা উদ্দাম উল্লাসে ফেটে পড়েছে। নৃত্য-গীত-বাদ্য-আঙ্গিকাভিনয়,—সুর-তাল-গান, — মৃদঙ্গ-মাদল-নূপুর — কিঙ্কিনীর বিচিত্র রোল—স্থলে জলে অন্তরীক্ষে, দেহে মনে চেতনায় সেই উল্লাস। নরহরি ভাবে ভাষায় শব্দে চিত্রে তাকেই ধরে রেখেছেন।

ঝুলন ও ফাগুখেলা বিষয়ক পদগুলিতে সেই উল্লাসই প্রকাশিত হয়েছে। অপরূপ প্রাকৃতিক পটভূমিকা, নৃত্য বাদ্য গীত অভিনয়ে রাধাকৃষ্ণের এই বিচিত্র লীলা আয়োজিত। জলকেলির পদটিও (ভক্তি রত্নাকর ৫ম তরঙ্গ) সেই অপার আনন্দেরই প্রকাশক ॥

৯। অষ্টকালীয় নিত্যলীলা

'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলার 'নিশান্ত' ও 'প্রাতঃ-কালীয়' মাত্র দুটি সময়ের লীলা পাওয়া গেছে। গঙ্গা যমুনার কথোপকথনে যমুনার মুখে এই লীলা প্রকাশিত হয়েছে। অপূর্ব প্রাকৃতিক পটভূমিকায় সংঘটিত এই দুই লীলায় রাধা-কৃষ্ণের বিলাসকলা প্রকটিত। পদগুলিতে গোবিন্দদাস, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ পূর্বজ কবিদের প্রভাব আছে ॥

পদাবলী ঃ কলাবিধি

(ক) অলংকার

নরহরি চক্রবর্তীর পদাবলী অলংকার সম্পদে সমৃদ্ধ। প্রায় প্রতিটি ব্রজবুলি পদে তার পরিচয় আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ভাব প্রবাহে ভাটা পড়েছিল। সাম্প্রদায়িক দুর্নীতি, অনাচার ও দলাদলির মধ্যে পড়ে বৈষ্ণব সাধকেরা কোনোক্রমে পুরোনো সাধনাধারাটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টিত ছিলেন। সাহিত্যেও প্রথানুগত্য দেখা গিয়েছিল। ভাবের গাঢ়তা ও অনুভূতির গভীরতা হ্রাস পেয়েছিল। বাক্‌চাতুর্য, কষ্টকল্পনা, পল্লবিত আখ্যান ও বাঁধাধরা আলংকারিক প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। নতুন পদ রচনা স্বাভাবিকভাবে কঠিন হয়ে উঠলে পুরোনো পদগুলির সংগ্রহ ও শ্রেণী বিভাগ করতে কবিরা উৎসাহী হয়েছিলেন। ফলে সেগুলির অনুকরণে অনুসরণে বহুপদ

সৃষ্টি হয়েছিল। হরিবল্লভ, রাধামোহন, দীনবন্ধু, নরহরি-ঘনশ্যাম, বৈষ্ণবদাস, গৌরসুন্দর দাস, চন্দ্রশেখর, শশিশেখর, জগদানন্দ, নিমানন্দ, কমলাকান্ত, প্রেমদাস, উদ্ধবদাস, ঘনরামদাস, যাদবেন্দ্র প্রমুখ অসংখ্য পদকর্তাদের মধ্যে খুব কম ক্ষেত্রেই কেউ কেউ উৎকৃষ্ট কবিত্ব প্রকাশ করতে পেরেছিলেন।

নরহরি চক্রবর্তীর আলংকারিক কলাবিধির বৈশিষ্ট্য :

নরহরি কীর্তনের প্রতি দৃষ্টি রেখে যেমন সংগীতগ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তেমনি পদাবলী রচনাতেও উৎসাহিত হয়েছিলেন। তিনি নিজে সুপণ্ডিত ও কীর্তনে দক্ষ ছিলেন। কীর্তনীয়া এবং তার শ্রোতাদের আগ্রহ কোন্‌খানে, তা ভালভাবেই বুঝতেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, বাক্‌বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ঝংকার মুখর পদের প্রতি-ই কীর্তনীয়া ও শ্রোতৃবৃন্দের স্বাভাবিক আকর্ষণ। বিদ্যাপতি, বিশেষতঃ গোবিন্দদাসের পদের শ্রুতিমাধুর্য ও ধ্বনিঝংকাব শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। গোবিন্দ দাসের পদ তাঁর ভাষায় 'তিখিণবাণ সম বেধই হিয় শির'। নরহরি কীর্তনের প্রতি দৃষ্টি রেখেই 'রসনারোচন শ্রবণ বিলাস রুচির পদ' সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন; যা সাধারণ শ্রোতার মনের গভীরে আলোড়ন তোলার অনেক আগেই ধ্বনি তরঙ্গে শ্রুতিপথ ভরে দিতে পারে। শব্দচিত্র, ধ্বনিঝংকার, অলংকারের বিশেষ অনুপ্রাসের ব্যবহার এবং ছন্দের দোলা কবিকে অধিকতর আকৃষ্ট করতো।

দুই। নরহরি পরিশ্রমী ও সচেতন শিল্পী। প্রায় সকল বিষয়েই তাঁর প্রবল অনুসন্ধিৎসা ছিল। বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেও তাঁর উৎসাহ ছিল। পদাবলী ও কীর্তনেব আঙ্গিক সম্পর্কে তাঁর সচেতন সাধনা ছিল। ফলে ধ্বনির প্রাচুর্য, অলংকারের বাহুল্য, ছন্দের বৈচিত্র্য, সমাসবদ্ধ দীর্ঘ পদ বা দীর্ঘ বিশেষণ তাঁর পদাবলীতে সহজলভ্য। কোনো কোনো পদে তিনি যেমন অলংকারের মালা নির্মাণ করেছেন [যেমন, গৌরচরিত্রচিন্তামণির ২৬-২৮ পৃষ্ঠার গৌরাঙ্গের শয়ন বিলাস পদগুলি], তেমনি ধ্বনি তরঙ্গে তাঁর অনেক পদ অপরূপতা লাভ করেছে, যেমন—'বিহরত সুর সরিত তীর', 'নাচত শচীকুমর গৌর', 'দেখহ বৃষভানুকুমরী', 'কান্তিকাঞ্চন কঞ্জ কেতকী'—'গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ' পুথির পত্র, যথাক্রমে—৩৩ক, ২৯খ, ২১খ, ২৪ক।

তিন। নরহরি কানের দাবীকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, পাণ্ডিত্য প্রকাশে উৎসাহ দেখিয়েছেন। ফলে অনেক সময় তাঁর পদে শব্দ প্রয়োগের বাড়া-

বাড়ি ঘটেছে। অনেক শব্দ যেমন ঝংকার সৃষ্টি করেছে, ভাব ও অর্থের ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়েছে, তেমনি কিছু কিছু শব্দ অযথা স্থান লাভ করেছে, যেগুলি অনুপ্রাস সৃষ্টি ছাড়া সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশ করে নি (যেমন 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'র ১৭ পৃষ্ঠার ১।৩৮ নং পদের শেষ ৩ চরণ 'অরু কি কহব কুট হৃদয় কাষ্ঠ সম হিংসা-ক্লিষ্ট পুষ্ট মতি সৌষ্টব: অগুণপুষ্ট পষ্টপটু ধৃষ্ট অপরাধনিষ্ট পাপিষ্ট নষ্ট শঠ সুষ্ঠু প্রকৃষ্ট: ভ্রষ্ট চেষ্টাতিলঘিষ্ট নিকৃষ্ট হৃষ্ট রিপুযষ্ট রসাধিক শিষ্ট কষ্টপ্রদ নিষ্ঠুর দুষ্ট সুবিষয়াবিষ্ট সদা'। ইত্যাদি) কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য শিল্পের শাসন অগ্রাহ্য করেছে। রস অপেক্ষা জ্ঞানের প্রতাপ পাঠকের রসবোধকে বিঘ্নিত করেছে। আসলে গোবিন্দদাসের পদের বহিরঙ্গ গুণটি তিনি সহজেই আয়ত্ত করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মতো কাব্যের রসলোকে সর্বদা উপস্থিত হতে পারেন নি।

ছন্দ ও অলংকার নির্মাণে নরহরি অক্লান্ত শিল্পী। ১৮শ শতাব্দীর অন্যান্য কবিদের মতোই তিনি শব্দালংকারের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। অনুপ্রাস, ব্যতিরেক ও উৎপ্রেক্ষা সৃষ্টিতে তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল।

তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত পদাবলী থেকে অলংকারগুলির কিছু কিছু নমুনা চয়ন করা হলো:

এক। **অনুপ্রাস:**

১। **'ভক্তিরত্নাকর'** (মিশন ২য় সং-এর পৃষ্ঠা সংখ্যা বন্ধনীতে প্রদত্ত)— ১। অঞ্জনে রঞ্জিত মনোরঞ্জন খঞ্জন পাখি জিনি মঞ্জু নয়ন চারিভিতে (পৃঃ- ৫০৫)। ২। বিপুল পুলকিত গাত গর গর ধিরজ ধরই না পারি (৫০৮), ৩। সজল জলদ থির চর তছু পাঁতি (৫০৯), ৪। মদন কদন বদন চন্দ নিখিল তরুণী নয়ন কন্দ হসত লসত দশনবৃন্দ কুন্দ কনক পাঁতি (৫৫৮), ৫। অঞ্জনঘন পুঞ্জ-বরণ কুঞ্চিত কচ ধৈর্য হরণ বেশ বিমল অলকাকুল রাজত অনুপাম (৫৫৮), ৬। পরিসর বর বক্ষ অতুল নাশত কত কুলবতী কুল (৫৫৮), ৭। অমল কমল দল লোচন ধৃতিভর মোচন গজগতি গঞ্জন রে (১১৬)॥

২। **'গীতচন্দ্রোদয়, মঙ্গলাচরণ'** পুথি (বন্ধনীতে পত্র সংখ্যা)—১। মঞ্জু চিকুর চঞ্চল নব অম্বুজদল লোচনা। বক্ষ বিপুল বন্ধুর ভুজ ভূষণ জন রঞ্জনা (২ক) ২। গতি মঞ্জন জন রঞ্জন ধৃতি ভঞ্জন সুখ সদনা (২ক), ৩। চারু চাঁচর চিক্কন

চিকুর নেহারি (২৩খ), ৪। অতি অলক্ষ লক্ষণযুত বক্ষ পরম পীণ (২৩ক), ৫। ডগমগ অমল কমল দল লোচন গতি অতি অথির বচনে করু লেহ (৩ক), ৬। কান্তিকাঞ্চন কঞ্জকেতকী চম্পকাবলী গঞ্জিতে (২৪ক), ৭। মঞ্জু মুখ মৃদু হাস রঞ্জিত পুঞ্জ বিধুমদ ভাঞ্জতে (২৪ক), ৮। চাঁচর চিকুর রুচি রুচিকর (২৪ক), ৯। দামিনীদাম দরপভর ভঞ্জন (২৫ক), ১০। জগজন রঞ্জন কঞ্জ চরণ যুগ রঞ্জিত মণি মঞ্জীর মঞ্জুতর (২৫খ), ১১। বেসর দল দোলই। কুণ্ডল যুগ শ্রবণ গণ্ড মণ্ডল দ্যুতি ধ্বংসই (২৭খ), ১২। লোচনাঞ্জন লোল লোলত কামিনী কুল মাতি (৩৮ক), ১৩। কলিমদমত্ত মতঙ্গজ মরদন (৩১ক), ১৪। মদন মরদন বদনে ঘন ঘন শুনই হরি হরি বোল রে (৩২ক), ১৫। ধরি পরিকর কর কহইতে বাত। ধূসর ধূরি ধরণী গড়ি যাত (৩২খ), ১৬। করভ কুঞ্জর কর মৃদুতর ভুজ জানু পরশিএ। উরু ঝলমলি হেম স্তম্ভ দলি উলট কদলী কিএ (২৪খ), ১৭। মল্লি মালতী মালে মণ্ডিত লেত কুলবতী প্রাণ (২৩খ), ১৮। ভুরু ভুজঙ্গ ভ্রমর ভাল ভ্রাজত ছবি ধাম (২৩খ), ১৯। কেশ কেশ দুর্লব নব বেশ শিথিল থোর (২৩খ), ২০। পদতল থলপদ্ম তরুণ অরুণোদয় কেল (২৩খ), ২১। গঞ্জি কুঞ্জর করভ কর কর বলনি বাহু বিশাল (২৩খ), ২২। টলমল জল করুণ লোচনে ঝরঝর ঝরে আনন্দ ধারা (৩৫খ), ২৩। মন্দ মন্দ হসত লসত দশন কুন্দ পাঁতিয়া (৩৮ক), ২৪। বেশ বিরচি বন্ধুর দর দরপনে অবলোকি (৩৯খ), ২৫। মঞ্জুল ভুজ ভঙ্গি করই কুঞ্জর কর বারি (৪১খ), ২৬। ঝলকত তন তড়িত থির পহিরণ নব জলদ চীর চরিত ভূষণ মণি মনমথমদ কদনা (৪১খ)॥

৩। **'গীতচন্দ্রোদয়-পূর্বরাগ'** (হরিদাস দাস সম্পাদিত গ্রন্থের পৃষ্ঠা)—১। দামিনী দাম দমন মন হারী (পৃঃ-১১), ২। কণ্ঠ কলিত কত রতন হার (১২), ৩। তৃষিত তিরপিত পতিত পামর (২৬), ৪। চম্পক কনক কোকনদ কুমকুম পুঞ্জ গঞ্জ অতি মঞ্জুল দেহ (৩৮), ৫। কুন্তলে কুসুম কত শত অলিকুল (১৬)॥

৪। **'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'** (হরিদাস দাস সম্পদিত গ্রন্থের পৃষ্ঠা)—১। বিকট সংকট মিটত ঝটিত রটহ সুধাময় নাম (পৃঃ ২), ২। ভয়ভঞ্জন জনরঞ্জন। গুণরত্নহি করু যত্ন হিঁ (৩), ৩। জন লোচন অভিরামা বপুমোচন দ্যুতি ধামা। নহ অন্ত সুযশ নামা চিত চিন্তহ বসুধামা (৩), ৪। গুণগণ বিশদ বিপদ মদমর্দন মধুর মুরতি মুদবর্ধন কারী (১২), ৫। কত লক্ষ লক্ষ বিপক্ষ অক্ষি বিমুগ্ধকৃত সুগবাক্ষ নির্মল (২৭), ৬। জন নেত্র নিমিষ বিভঙ্গ অক্ষ অভঙ্গ ভজি

সুধঙ্গ (২৭), ৭। চলক অলক গুচ্ছ সুস্বচ্ছ (২৭), ৮। শণিগর্ব পর্বত খর্ব কৃত বর ভাল ভালয় ভাতি চন্দন তিলক (২৭), ৯। অতি সুজন মন সম কর্ণ-কুণ্ডল গণ্ড মণ্ডল মণ্ডিত (২৭), ১০। শৈথিল্য অল্প অনল্প শোভীনকল্প উদার সুঠান রে (২৭), ১১। আলস ধর জন লালস কর বর বালিশ বিলসত জগত অদৃশ রে (২৮), ১২। হরগিরি খণ্ড অখণ্ড সন্ত দধিপিণ্ড গঙ্গ থির তরঙ্গ সদৃশ রে (২৮), ১৩। জাগত জনু জাগত নহি লাগত সুখ কোর (৩২), ১৪। সুন্দর বর কুন্দরদন রঙ্গদ মৃদু মঞ্জু বদন চারু চপল লোচন জন লোচন মন ফন্দ হে (৩৫), ১৫। সব সরস অলস যুত লসত অনুপাম (৪০), ১৬। মনমথ মদ মদন মুরতি পিরিতি রসের ফাঁদ (১৫৪)॥

দুই। **ব্যতিরেক**

১। **'ভক্তিরত্নাকর'**—১। জিনি হেম সরসিজ তনু (৪৯৫ পৃঃ), ২। সিংহ জিনি মাঝাখানি ক্ষীণ (৫০৪), ৩। হেন ভাগ্যবতী কে আছে এমনি পাবে পতি জিনি মদন মেনো (৫০২), ৪। চঞ্চল ললিত বিশাল বক্ষঃ পরি ঝলকত জিনি দামিনী মণিহারা (৫৫৮), ৫। প্রভাতের ভানু জিনি তনুছটা (৫৯৯), ৬। তনু রুচি জিনি দামিনী দাম (৫৮৩), ৭। শিরিস কুসুম জিনি তনু অনুপাম রে (৬০৩), ৮। নাসিকা শুক চঞ্চু জিতি সতী যুবতিগণ মন মোহয়ে (৫২০), ৯। লোল লোচন কঞ্জ মঞ্জু ময়ংক জিতি মুখজ্যোতি (৫৫৮), ১০। রজত গিরি জিতি জ্যোতি ডগমগ (৫২৬), ১১। জিনি বিধুঘটা বদনের ছটা মদন গরব হরে। (৫৯৫), ১২। শারদ চন্দ্র জিনি বদন বিলাস (৫৩০), ১৩। জানু লম্বিত ললিত ভুজযুগ গঞ্জি ভুজগ মৃণাল রে (৫২০), ১৪। ভাবে গরগর গমন গজপতি গঞ্জি গরজে অভঙ্গ (৫৬৮), ১৫। কনক ভূধর গরব ভঞ্জন মঞ্জু মুরতি রসাল রে (৫২০), ১৬। ভুজযুগ ভৃঙ্গ পাঁতি লসলোচন ডগমগ অরুণ কিরণ ভর হরঙ্গ (৫২৭), ১৭। মদন কদন বদনচন্দ (৫৫৮), ১৮। ভাল তিলক ঝলকত অতি ভাণ্ড্ ভুজগ মঞ্জুল গতি (৫৫৮), ১৯। ললিত কটি সুকৃশ কেশরী গরব খরব কারী (৫৫৮), ২০। অরুণ অধর সুহাস মৃদু মৃদু দন্ত নিন্দই মোতি (৫৫৮), ২১। বাহু কনক মৃণাল মনমথ দমন বক্ষ বিলাল (৫৫৮), ২২। কুমকুম দামিনী দাম দমন তনু (৫৬৩), ২৩। নিখিল মদন মদ ভঞ্জন অঙ্গ (৫৬৩), ২৪। কুঞ্জর করবর গরব বিমোচন মঞ্জু বিপুল ভুজ যুগল পসারি (৫৬৩), ২৫। শশধর নিকর নিন্দি মুখ মধুরিম হাসত (৫৬৩), ২৬।

গজবর গরব হরণ গতি নব নব (৫৬৩), ২৭। মদন মদ ভর হরণ তনু জনু দমকে দামিনীদাম (৫৮৩), ২৮। বদন বিধু বিধু কদন মাধুরী অমিয়া ঝরে অবিরাম (৫৮৩), ২৯। জগজন নয়ন তাপভয় ভঞ্জন যিনি কনকারুণ অপরূপ (৬০১), ৩০। মনমথ মদ ভর-হর মুখ হেরি (৬২৯), ৩১। পুলকিত ললিত অঙ্গ ঝলমল কত দিনকর নিকর নিন্দি বর জ্যোতি (৬০২), ৩২। কুঞ্জর দমন গমন মনোরঞ্জন হসত সুলসত দশন যনু মোতি (৬০২)॥

২। **'গীতচন্দ্রোদয়-মঙ্গলাচরণ' পুথি**—১। উর ঝলমলি হেমস্তম্ভ দলি উলট কদলী কি এ (পত্র, ২৪খ), ২। মরকত দলিতাঞ্জন জলদ পুঞ্জ জিনি বরণ উজোর (২৫খ), ৩। ঝরই অমিয় মুখ মিলিত হাস মৃদু নিন্দই কত শত শরদ নিশাকর (২৫খ), ৪। শ্যামতনু ঘন দলিত অঞ্জন নীল কুবলয় নিন্দিতে (২৬ক), ৫। নবীন কেশরী গরবভর হর খীণ মধ্য সুশোভিতে (২৬ক), ৬। সিঁথাএ সিন্দুর ভানুমদ দুর মলয়জ ইন্দু সাজে। মৃগমদ বিন্দু মেঘখণ্ড নিন্দু ভালে সু অলকা ভ্রাজে (২৭খ), ৭। নাসিকা শুকচঞ্চু জিত ওষ্ঠাধরারুণ রঞ্জিতে। ভ্রূলতা লস লোল লোচন মীনখঞ্জন গঞ্জিতে (২৭খ), ৮। মনমথ রথ চক্রদ্বিরদ কুম্ভ জিত নিতম্ব বিরদ কি মধুর উরুদেশ উলট রম্ভামদ ভাগই (২৮ক), ৯। তনু মৃদুতর শিরিস কুসুম নিন্দি কি নব সোহই (২৭খ), ১০। কনক মৃণাল জিনি ভুজ ভাল (২৭খ)॥

৩। **'গীতচন্দ্রোদয়-পূর্বরাগ'** (হরিদাস দাস সং)—১। কেশর কনক কঞ্জ জিনি লাবণি (পৃঃ ৪৬), ২। তপন তাপ জিনি তনু অতি উতপত (৪৬), ৩। কনক ধরাধর গরবহারী তনু (৪৭), ৪। সুচারু শরদ বিধু জিনি মুখ (৪৭), ৫। কনক নবনী জিনি তনুখানি (৮৪), ৬। জলদ জিনিয়া রূপ (১০৮), ৭। ঝলকত অঙ্গ সুবলিত ললিত থির দামিনী পুঞ্জ পুঞ্জ (৩২)॥

৪। **'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'**—১। মনমথ মদ ভঞ্জন তনু চিকন অনুপাম (পৃঃ ৩০), ২। কঞ্জ পুঞ্জ গঞ্জই মুখ মঞ্জু মধুর জ্যোতি (৪১), ৩। ওষ্ঠ অধর বিম্ব দমন কুন্দরদন মোতি (৪১), ৪। নিন্দি হেম সম্পুট গঠনাদ্ভুত উরু পর্ব (৪২), ৫। অরুণ মিলিত কনকাচল কুমকুম পুঞ্জ গঞ্জি জগবঞ্চন রূপ (৫০), ৬। বঙ্কুর ভুরু বর বক্র অতনু ধর নিন্দই ভুজগ ভৃঙ্গকুল পাঁতি (৫১), ৭। চীন বসন পহিরণ সুরীতি অতি বিলসিত সিংহ দমন কটি দেশ (৫৩), ৮। রসের মুরতি রতিপতি জিতি যুবতী পরাণ চোরা (১৫৪)॥

তিন। **উৎপ্রেক্ষা**

১। **'ভক্তিরত্নাকর'**—১। ঝলকত বর বালক তনু। কুমকুম থির দামিনী যনু (পৃঃ ৪৯০), ২। গৌরাঙ্গ-বিবাহ অধিবাসে পুরনারীদের ঘর হতে বের হওয়ার চিত্র—ঘর হৈতে যেন বার হৈল চারু চান্দের মালা (৫০৩), ৩। নয়ত সুতনু জনু কনকলতা নব কুসুম সমূহ ভার গত কারী (৫০৯), ৪। চিকণ চাঁচর কেশ শিরে লোহে লোটায় পিঠে ছটা মন মোহে। হেমধরাধর শিখরেতে যেন যমুনা প্রবাহ বহয়ে ভালে (৫৫৯), ৫। কঞ্জ লোচনে লোর ঢরকত প্রকট যনু যুগ গঙ্গ (৫৬৮), ৬। দশন যনু মোতি (৬০২), ৭। কঞ্জ লোচন ঝরই ঝরঝর যনু সুশাঙন মেহ (৬০৩), ৮। জগজন রঞ্জন কনক কঞ্জ রুচি যনু মকরন্দ বরিখে অনিবার (৬৩৫)॥

২। **গীতচন্দ্রোদয়-মঙ্গলাচরণ' পুথি**—১। পহিরল নীল বসন তনু বিলসত পীত অচলে যনু জলদ বিথার (৩ক পত্র), ২। মৃগমদ চিবুকে সুলসত জলজে যনু ভৃঙ্গ বসত সুন্দর ক্রম কণ্ঠমাল লম্বিত চিত রঞ্জই (৩০খ), ৩। ভুরুযুগ ভাতি মধুগন্ধে মাতি যেন ভৃঙ্গ পাঁতি শোহে (২৪ক)॥

৩। **'গীতচন্দ্রোদয়-পূর্ব্বরাগ'**—১। অপরূপ তনু মুখচন্দ। জনু কতমন-মথ ফন্দ (১০৯ পৃঃ), ২। কিবা সে দোঁহার অঙ্গ ছটা। যেন মেঘ দামিনীর ঘটা (১৭০), ৩। শ্রমজলে ভরু দুহুঁ দেহ। প্রকট হোয়ল জনু নেহ (২১৬), ৪। বৈঠত কুসুম শেজে দুহুঁ মেলি। মরকত হেম একত জনু ভেলি (২২১), ৫। অলখিত কুচে কর অরপে। কমল কলিকা জনু দংশই সরপে (২৩৩), ৬। তনু তনু মিলে কত যতনে। ভেল জনু জটিল কনক নীল রতনে (২৩৩), ৭। দূতী-বচন জনু অমিয় প্রবাহ (২৭৪), ৮। শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জে এলেন শ্রীরাধা : পুলকি রহল হসি মঞ্জুল বরণী। থির বিজুরি জনু বিলসত ধরণী (২৭১), ৯-১০। কুঞ্জে বসে আছেন রাধিকা--কৃষ্ণ আসছেন সেখানে : দেখিল কালিয়া আইসে হেন। সজল জলদঘটা যেন (১৭৬) নিকটে আইলা শ্যামচান্দ। যেন কত মদনের ফান্দ (১৭৬), ১১। রাধাকৃষ্ণ শোভা—শোভা দুহুঁক অপার। জনু ঘন তড়িত ঝলকে অনিবার (১৮৪), ১২। দৃঢ় পরিরম্ভনে দুহুঁ ভেল এক। দামিনী ঘন জনু ভেল পরতেক (১৮৭)॥

৪। **'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'**—শ্রীগৌরাজ নিশান্তে শয্যায় শুয়ে আছেন,

তার বর্ণনা—১। পীত লতিকা জনু করত বিকাশ (পৃঃ ২৬), ২। কুন্দকলি জনু জলদ পরি উড়ু রাজয়ে (২৭), ৩। সুবলিত অঙ্গ অঙ্গ ঝলকত জনু বিলসত সোই মুরতিময় কাম (২৮), ৪। রজত পাত্র মধি শোহত জনু জনু তিমির শরদ শশিকিরণ মাঝার (৩২), ৫। দুগ্ধসিন্ধু মধি অসিত দীপ জনু নীলমণি মণ্ডপ সিত ক্ষিতি মাঝ (৩২), ৬। হরগিরি পর নব মেঘখণ্ড জনু বিশদ কুসুম মধি মধুপ বিরাজ (৩২), ৭। পদ্মরাগ মণি আসনে জনু বিলসত রস মধুর (৩২), ৮। গৌরাঙ্গ সমীপে গদাধর—গুণমণি গৌর সমীপে বিলসত জনু চন্দ নিকট হি চন্দ পরকাশ (৫৪)॥

চার। **উপমা**

১। **'ভক্তিরত্নাকর'**—১। দুগ্ধসিন্ধু সম দন্ত দ্যুতি (৪৯২ পৃঃ), ২। হসইতে দশন বিজুরি সম চমকত (৫৬৩), ৩। উমড়ই হৃদয় গদাধরে হেরইতে শাঙন ঘন সম নয়নে ঝরে (৫৬৮), ৪। সুললিত ভাব ভূষণে অতি ভূষিত চম্পক শোন কুসুম সম দেহ (৬৩৫), ৫। (গোবিন্দদাসের পদ) তিখিণ বাণ সম বেধই হিয় শির (৬৩৪), ৬। নদীর প্রবাহ পারা সভার নয়নে ধারা (৫২৯), ৭। সুর সরিত প্রবাহ পারা দুটি নয়নে বহয়ে ধারা (৫৬৪), ৮। পাষাণ সমান হিয়া সেহো গলি যায় (৬১১), ৯। ঝলকত দুহুঁ তনু কনক ধরাধর (৫২৯), ১০। হসত লসত দশন বৃন্দ কুন্দ কনক পাঁতি (৫৫৮), ১১। গোরারূপ মেঘের বিজুরি (৫৮২), ১২। অধর বাঁধুলি ফুল সুললিত দামিনী দশন ছটা (৫৬৭)॥

২। **'গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ' পুথি**—১। ঝলমল নখতারক মণি দর্পণ সম সাজ (পত্র ২৩খ), ২। চন্দ্রসদৃশ চন্দন তিলকালকা উজোর (২৩খ), ৩। চারু উচকুচ কলস সম্পুট (২৭খ)॥

৩। **'গীতচন্দ্রোদয় পূর্বরাগ'**—১। ধূলায় ধূসর চারু কলেবর কনক কমল পারা (পৃঃ ৪৬), ২। শিরীষ কুসুম সমান মৃদু তনু খীণ খণে খণে হোই (৮২)॥

৪। **'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'**—১। অরু কি কহব কুট হৃদয় কাঠ সম (পৃঃ ১৭), ২। কি বা সে সরুয়া মাঝ খানি উরু উলট কদলী পারা (৮৭), ৩। গলায়ে দোথরি মুকুতার মালা সুরধনী ধারা প্রায় (৯৩), ৪। নীলমণি হার পারা ধারা দু নয়ানে গো মুচিল সে কাজরের রেখা (৬৪), ৫। গৌরাঙ্গের

বিছানার বালিশ—হরগিরি খণ্ড অখণ্ড সন্ত দধিপিণ্ড গঙ্গ থির তরঙ্গ সদৃশ রে (২৮), ৬। ও মুখকমল কমল বন বিজিত সুচারু মরন্দ সদৃশ মৃদু হাস (৫৩)॥

পাঁচ। **রূপক**

১। **'ভক্তিরত্নাকর'**—১। উথলল প্রেমসিন্ধু মহী ভাসল (পৃঃ ৫৩০), ২। হৃদয়-সম্পুটে ধরব অনুক্ষণ (৫৪৫), ৩। এ চাঁদ-বদনে যাকে সদা মা বলিয়া ডাকে (৫৪৫), ৪। প্রেম অমিয়া বরষত নিত (৫৫৮), ৫। ভকত ভ্রমর ভোর (৫৫৮), ৬। কম্পই ধরণী ধরত পদপঙ্কজ (৫৬৩), ৭। বদন-বিধু বিধু কদন অমিয়া ঝরে অবিরাম (৫৮৩), ৮। উথলে আনন্দ সিন্ধু (১৬০), ৯। ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম-ভকতি-রতন রে (৬০৩), ১০। চঞ্চল যুগ ভ্রময় নয়ন (১৭৪)॥

২। **'গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ'**—১। প্রেমরসবাদর সুখদ নরোত্তম (পত্র ৫খ), ২। সংকীর্তন-মেঘে প্রেম বরিষে প্রচুর (৩০খ), ৩। ঝরই অমিয় রস ইসইতে থোর। পিবইতে উনমত ভকত চকোর (৩২ক)॥

৩। **'গীতচন্দ্রোদয় পূর্বরাগ'**—১। বরষত নয়ন-জলজ দিন রাতি (পৃঃ ২২৮), ২। শ্রবণ-চসকে সে অমিয়া পিয়া ঘুচয়ে হিয়ার ব্যথা (৯৪), ৩। গোরা প্রেম সুধা সাগরে নিতি (৯৬), ৪। মাতল কানু-মধুপ নাহি ছোরি (১৪৯), ৫। নাভি কমল অলিলোম লসত নব (১৩০), ৬। করুণা-জলধি উমড়ি চলু চহুদিশ পামর পতিত ভকতি-রসে ভাসি (৩২)॥

ছয়। **যমক**

১। **'ভক্তিরত্নাকর'**—১। হেরি অপরূপ রূপ পরিকর (৫৫৮), ২। সুরগণ গগণে মগণ সহ বর বরষত কুসুম (৫৮২), ৩। প্রবল তরঙ্গ রঙ্গ উপজায় (৫৬৩)॥

২। **'গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ'**—১। বেশ বিরচি বন্ধুর দর দরপণে অবলোকি (পত্র ৩৯খ), ২। হাটক রুচি রুচির দেহ (২খ), ৩। কুলবতী-কুল কুল-ধরম বিমোচন (২৫খ), ৪। উরু উরু পর্ব জঘন জনরঞ্জন (৫ক), ৫। ঘন ঘন শ্যাম মনরঞ্জে (২৭খ)॥

৩। **'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'**—মুনিগণ হৃদয়ে সুতলপে কলপয়িতে করু কত কলপ কলপ ভরি যাগ (৪৩ পৃঃ) ॥

সাত। **সমাসোক্তি**

'ভক্তিরত্নাকর'—১। আজু গায়ত মধুরলীলা। শুনি দরবয়ে দারু-শিলা। (পৃঃ ৫৬৪), ২। পদতল তালে তরল পদপংকজ কম্পই ধরণী সহই নাহি ভার (৫২৭), ৩। ধরইতে চরণ ধরণী অতি মুদিতা (৫৬৩) ॥

আট। **শ্লেষ**

ভাব কদম্ব কুসুম দেই পূজত তনুমন নিরমঞ্জন করু তায় ('গৌরচরিত্র-চিন্তামণি', পৃঃ ৫২) ॥

নয়। **ভ্রান্তিমান**

চাঁচর কেশের ঝুটা চমকিয়া বাঁকে। মালতি বলিত অলি ফিরে ঝাঁকে ঝাঁকে (ভক্তি, পৃঃ ৫৬৬) ॥

দশ। **কাকু**

১। মধুর সুস্বরে গায় কেহ কেহ কে ধরে ধৈরজ শুনিয়া গো (ভক্তি, পৃঃ ৫৮২)। ২। মন্দ মন্দ হাসে দশন প্রকাশে কে না পড়ে সে না ধান্ধে ('গী-চ. মঙ্গলাচরণ', পত্র ২৩ক)।

এগার॥ **ধ্বন্যুক্তি**

১। **'ভক্তিরত্নাকর'**—নৃত্যত বলদেব বিপুল পুলকিত প্রতি অঙ্গ। দাঁ দাঁ দৃমি দৃমি কট ধা দৃগু দৃগুধ বিথুংকট। তক্ তক্ ধিকিতক থোরি কু কু বাজত মৃদু মৃদঙ্গ॥ (পৃঃ ১৭৫), ২। ঝুনু ঝু ঝু ঝুনু নূপরধ্বনি কোই ধিরজ ধরত না শুনি : কিংকিণীরণ রণি রণি রব উপজাত হিয় উমঙ্গ (পৃঃ ১৭৫), ৩। বাজে ঝিগ ঝিগ ঝিগ ঝেদ্রাং দৃগু দৃগু দৃমিদিগ দ্রাং : তার ত্রিপুট প্রকটত মৃদু মর্দন গতি ঘোর (১৭৫), ৪। তক থৈ থৈ তাথৈ তা থোদি থুন্না থোং কুণা : কুণা ঝিনি না না না কৃত রতিপতি মতি ভোর (১৭৫), ৫। চঞ্চল পগভঙ্গি ঝিনিনি ঝংকৃত কটি কিংকিণী মণি : ঝুনু ঝু ঝু ঝু নূপুর রব, মুনিগণ মনচোর (১৭৫), ৬। আজু পুণিম পূরণ শশী নির্মল মধুযামিনী। ধা ধা ধিগি তগ ধিলঙ্গ দৃমি দৃমি দৃমি বাজ মৃদঙ্গ : নৃত্যত বলদেব বলিত বিলসত সব ভামিনী॥ (১৭৫), ৭। শরণাগত রক্ষক নরহরি মব ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ

ত্রিগড়তিয়া (১৭৭), ৮। ঝন নন নন শব্দকৃত মঞ্জীর চরণে বিরাজই। নিছনি নরহরি মধুর নৃত্যে মৃদঙ্গ দৃমিদৃমি বাজই॥ (২৮৯), ৯। নৃত্যতি রাসবিলাসিনী রাধা। বাজত মৃদঙ্গ ধিক ধিক ধাধা॥ (২৮৯), ১০। কটি কিংকিনী সুচারু ছটা। তায় ঝিনিনি শব্দ ঘটা॥ বাজে ঝু ঝু ঝু নূপুর পায়। নরহরি সে নিছনি তায়॥ (৪২৫), ১১। শ্রীনবদ্বীপ বধূবৃন্দ রীতি অতুল উলু লু লু লু লু লু দেত কি উলাস শ্রবণে (৪৯৯), ১২। বিবিধ মঙ্গল হোত কুলবধূ উলু লু লু লু লু লু দেত (৫০০), ১৩। চরণে নূপুর রুনু ঝুনু রুণু ঝুনু ঝুনুরবে রঞ্জয়ে শ্রুতি (৫১০), ১৪। ঘন ঘন ঘণ্ট ঝমকত ঝাঁঝরী ঝননন ঝাঁজ গরজে ঘন ঘোর (৫৩৩)।

২। **'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'**—১। অদ্ভুত উহ প্রেমে মাতি লসত যৎ (শত) কপোত পাঁতিঃ ঘু ঘু ইতি শব্দ ছদ্ম হুংকৃতি ঘন গাজে (পৃঃ ৩৪), চপল কর কৃত কাহু শংখ ন ঝনন ঝনন নঝংকে কংকণ কিংকিণী রিণি ঝিনিনি নূপুর ঝুনু নু নু নু নু বাজয়ে (১৮৬)।

৩। **'গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ'** পুথি—[সমগ্র পদ] পত্র-১, পদ-১, পত্র-২খ—পদ-৫, ৬, ৯, পত্র-৩ক-খ, পদ-১৩, ১৮, পত্র-৪ক-খ, পদ-২২॥

বার। **স্বভাবোক্তি**

১। গোরাচাঁদ ছাড়ি যাবে নৈদা এথে তরঙ্গ বহিত জাহ্নবী ধারা।
... ...
তরুলতাকুল পল্লবিত নহে নাবিক সে পুষ্প সুগন্ধহীনা।
তাহে না বৈসে না পিয়ে পুষ্পরস না গুঞ্জে ভ্রমর ভ্রমরী দীনা॥
পিককুল কলরববিরহিত না নাচে ময়ূর ময়ূরী সনে।
শারীশুক নানা পাখী আঁখি ঝুরে নারে উড়িবারে ব্যাকুল বনে॥
ধেনুগণ হাম্বারবে না ধায়য়ে মৃগাদি পশু না ধরয়ে ধৃতি।
ভণে নরহরি শোভা দূরে দেখ সম্বরিতে নারে নদীয়া খিতি॥
(ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ৫৯৩)

২। ঝরএ অঝর ঝরে আঁখি। ঝুরয়ে বনের পশুপাখী।
দারু শিলা যায় দরবিয়া। না জানি কেমন তুয়া হিয়া॥
যদি কভু যাও সেই বনে। চাহিয় তমাল তরু পানে।
হেমলতা দেখিবে তাহাতে। তবে পরতীত যাবে চিতে॥
(গীতচন্দ্রোদয়-পূর্বরাগ, পৃঃ ২৩৮)

তের। **সংকর ও সংসৃষ্টি**

১। **'ভক্তিরত্নাকর'**—১। মদন মদ-দলি কদলী উরু উরু পর্ব অতি অনুপাম রে (৫২০ পৃঃ—অনুপ্রাস, ব্যতিরেক, যমকের মিশ্রণ), ২। হিমকর নিকর নিন্দি মধুরানন হাসত মধুর সুধা জনু ঝরই (৫২৭—অনুপ্রাস, ব্যতিরেক, উৎপ্রেক্ষা), ৩। শারদ নিশাকর নিকর নিন্দি মুখ কোটি মদন মদ মরদন হাস (৫৫৮—অনুপ্রাস, ব্যতিরেক), ৪। বন্ধুর বদন মদন মদ মরদন মধুরিম হাস যুবতি-ধৃতি হারি (৫৩০—অনুপ্রাস, ব্যতিরেক), ৫। সিংহ জিনি কটিদেশ কৃশ ঘন অংশু অংশুক ভ্রাজয়ে (৫২০), ৬। চরণতল থলকমল নখমণি নিছন ঘন ঘনশ্যাম রে (৫২০-৫২১), ৭। চম্পক কুসুম কনক নব কুমকুম তড়িতপুঞ্জ জিনি বরণ উজোর (৫২৭), ৮। কনক কেতকী কুমকুমজিনি সুচারু রূপের ছটা (৬০৪), ৯। প্রবল প্রতাপে তাপত্রয় কুণ্ঠিত জগজত পরম হরষ হিয়া ভেল (৬০২), ১০। লোচন অরুণ কমলদল ছল ছল জল ঝলকত জনু মোতিম দাম (৫৬৩), ১১। মদন মদ ভর হরণ তনু জনু দমকে দামিনী দাম (৫৮৩)॥

২। **'গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ'**—১। কান্তিকাঞ্চন কঞ্জ কেতকী চম্পকাবলী গঞ্জিতে (পত্র ২৪ক), ২। কঞ্জ পুঞ্জ গঞ্জই মুখ মঞ্জু মধুর জ্যোতি (২৩ক), ৩। কুমকুম কনক কঞ্জ জিনি তনু রুচি রুচির বদন বিধু (৫ক), ৪॥ হাটক রুচি রুচির দেহ মনমথ-মদ মর্দনা (২খ), ৫। পদতল-থলপদ্ম তরুণ অরুণোদয় কেল (২৩খ), ৬। বেশ বিরচি বন্ধুর দর দরপনে অবলোকি (৩৯খ), ৭। নাচত শচীসুত কীর্তন মাঝ। কনক ধরাধর নিন্দি রুচির তনু বিলসত জনু নব মনমথ রাজ (৩০খ)॥

৩। **'গীতচন্দ্রোদয় পূর্বরাগ'**—১। চম্পক কনক কোকনদ কুমকুম পুঞ্জ গঞ্জ অতি মঞ্জুল দেহ (পৃঃ ৩৮), ২। গৌরবিধুবর পরম সুন্দর কনক ভূধর দেহ। হোত ছল ছল ছিন জনু নব দলিত কেশর রেহ (৪৮)॥

৪। **'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'**—১। ভুরু ভুজঙ্গ ভ্রমর ভাল ভ্রাজত ছবিধাম (পৃঃ ৪১), ২। জংঘা জনু জনিতলোভ রম্ভা গত গর্ব (৪২), ৩। কঞ্জ পুঞ্জ গঞ্জই মুখ মঞ্জু মধুর জ্যোতি। ওষ্ঠ অধর বিম্ব দমন কুন্দ বদন মোতি (৪১)॥

পদাবলী ঃ কলাবিধি

(খ) ছন্দ

বাংলা কবিতার ইতিহাসে নরহরি চক্রবর্তী একজন উল্লেখযোগ্য ছন্দ শিল্পী। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভাষায় 'ছন্দোবিলাসী কবি—ছান্দসিক'। তিনি বহুবিধ ছন্দে পদ রচনা করেছেন। বাংলা ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় পৃথক পৃথক ভাবে ছন্দ-গ্রন্থও প্রস্তুত করেছেন। তাঁর সংস্কৃত ভাষায় ছন্দ আলোচনা 'সংগীতসার সংগ্রহে'র 'ছন্দ প্রকাশ প্রকরণ' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাওয়া যায়।[১] এর একটি স্বতন্ত্র পুথিও মিলেছে—বরাহনগর পাঠবাড়ী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরের পুথি, ৪৫০।৮ সংখ্যক।[২] বাংলা গ্রন্থটির নাম 'ছন্দঃ সমুদ্র'[৩]—নরহরি এই গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন, 'নিজবোধ হেতু করি ভাষায় বর্ণন'। স্মরণীয় যে, 'ছন্দঃ সমুদ্র'-ই বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম ছন্দঃশাস্ত্র।

ছন্দ সম্পর্কে নরহরির কৌতূহলের অন্ত ছিল না। ছন্দোবন্ধ তাঁর চিত্তকে উদ্দিপ্ত করতো। তিনি স্বয়ং এই কথাটি জানিয়েছেন—"রচিহু আনন্দ হিয়। ছন্দ মম চিত্ত প্রিয়।"[৪] প্রাচীন-মধ্যযুগের আর কোনো কবির মুখে এই কথা শোনা যায় নি।

দুই। ছন্দশাস্ত্র পাঠ, ছন্দগ্রন্থ রচনা ও বিভিন্ন ছন্দে পদ রচনা দেখে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, এ বিষয়ে নরহরির সচেতন সাধনা ছিল। তিনি পরিশ্রমী গবেষকের মতো ৩১টির অধিক প্রাচীন ছন্দঃশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। এগুলির উদ্ধৃতি আছে তাঁর রচনাগুলির মধ্যে।[৫]

তিন। নরহরি প্রাচীন ছন্দঃশাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেই ক্ষান্ত হন নি। সচেতন ভাবে নিজের অনুভবকে নিজের মনের মতো করে গ্রন্থবদ্ধও করেছিলেন। উক্ত দুই গ্রন্থে সংস্কৃত ছন্দগুলিকে প্রণালীবদ্ধভাবে সাজিয়ে একাধিক উদাহরণ যোগে বিশ্লেষণ করেছেন। মাত্রা, পর্ব, পর্বাঙ্গ, সুর, লয়

---

১. ২য় অধ্যায়ে আলোচিত। ১ম খণ্ড পৃঃ ১৪০।

২. পুথিটি খণ্ডিত, ৮টি পত্র ২৩, ২৪, ২৭-৩২ আকার ১০"×৫"।

৩. ২য় অধ্যায়ে আলোচিত।

৪. 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি', পৃঃ ২১।

৫. এই ৩১টি গ্রন্থের তালিকা প্রদত্ত হয়েছে ১ম খণ্ড, ৩২-৩৩ পৃষ্ঠায়, ১ম অধ্যায়ে।

ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় আলোকপাত করেছেন। উদাহরণগুলি প্রাচীন কবিদের রচনা থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

চার। নরহরি নিজেও কবিতা রচনা করে সংস্কৃত ছন্দগুলির ব্যবহার দেখিয়েছেন। 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে এগুলি সংকলিত হয়েছে। তিনি বলেছেন তাঁর 'ছন্দঃ সমুদ্র' ছন্দের সূত্রভাগ। সুতরাং 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'কে তারই উদাহরণ ভাগ বলা যায়। দ্বিতীয়োক্ত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে তিনি বলেছেন,

> "রচিহুঁ ছন্দ বহু ভাঁতি ইম (ইহ) মাত্রাবর্ণ বিভেদ।
> শুনত শ্রবণ সুখ হোত অতি নাশত কবিকুল খেদ ॥
> পিঙ্গলাদি বহু গ্রন্থ মধি লখি লক্ষণ পরচার।
> কিংবা মংকৃত গ্রন্থবর ছন্দঃসমুদ্র নিহার ॥"[৬]

তাঁর পদাবলী সংস্কৃত, সংস্কৃতানুগ ও বাংলা ছন্দে রচিত। তাঁর ছন্দের কান, শব্দের সমৃদ্ধি ও বিভিন্ন ভাষায় জ্ঞান ছিল। সংস্কৃত, হিন্দী, ব্রজবুলি, বাংলা ও বৃন্দাবনের স্থানীয় ভাষায় তাঁর অসাধারণ দখল ছিল। তবে তিনি ক্লাসিক ছন্দ রচনাতেই মনোনিবেশ করেছিলেন। লোচন দাস ও ভারতচন্দ্রের মতো ধামালী বা স্বরবৃত্ত ছন্দে লেখা তাঁর কোনো পদ পাওয়া যায় নি।

পাঁচ। নরহরি কীর্তনের আভিজাত্য প্রতিষ্ঠার জন্যেই ছন্দোরীতির বৈচিত্র্য সম্পাদনে ব্রতী হয়েছিলেন। সচেতন ভাবে তিনি বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, যদুনন্দনের ব্রজবুলি পদের এবং চণ্ডীদাস, নরহরি সরকার, জ্ঞানদাসের বাংলা পদের ছন্দগুলিকে অনুসরণ করেছিলেন। ছন্দের আকৃতি ও ছন্দোবন্ধের বিচারে তাঁর একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুষ্পদী বা চৌপদী বন্ধের অজস্র পদ আছে। এগুলিকে নিয়ে তিনি মিশ্রবন্ধেও বহু পদ রচনা করেছেন। ছন্দের প্রকৃতি বিচারে অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত (প্রাচীন) রীতিতে তাঁর পদগুলি রচিত। 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'র সংস্কৃত ছন্দগুলি প্রাচীন শাস্ত্র নির্দিষ্ট রীতির অনুবর্তী। সব মিলিয়ে তাঁর শব্দচয়ন, ধ্বনি সৃষ্টি, বিবিধ প্রকার মিল, বিচিত্র স্তবকবন্ধ যেমন সেকালের পক্ষে বিস্ময়ের সঞ্চার করে, তেমনি পদগুলির মধ্যে ছন্দ ও সুরনিরূপণের অপূর্ব শিল্পচাতুর্যও পাঠককে মুগ্ধ

৬. 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি', পৃঃ ২১।

করে। সংস্কৃত ছন্দের প্রয়োগ বিজ্ঞানে তাঁর প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনবত্বের দাবী রাখে।

নরহরির ছন্দ জিজ্ঞাসা ও ছন্দোবন্ধ সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় কবির ভাষার লালিত্য ও বর্ণনার মাধুর্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।[৭] সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় নরহরির 'হোত শুভ অধিবাস শুভক্ষণে' ইত্যাদি গৌরাঙ্গের বিবাহ-অধিবাস বিষয়ক পদটির ছন্দো-বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সাধারণ পাঠককে সচেতন করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, নরহরির মুদ্রিত পদগুলিতে কোনো কোনো স্থানে অশুদ্ধি আছে। তার জন্যে কবির কোনো দোষ নেই। এই অশুদ্ধি ঘটিয়েছেন পরবর্তীকালের গ্রন্থ সম্পাদকেরা। তিনি লিখেছেন: "ছন্দের গতি উত্তমরূপে লক্ষ্য করিতে না পারায়ই জগবন্ধু বাবুর গৌরপদতরঙ্গিণী ও রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের ভক্তিরত্নাকরে ছন্দের অনেক অশুদ্ধি ঘটিয়াছে।" তিনি পরিশেষে মন্তব্য করেছেন: "তিনি (নরহরি) একজন উৎকৃষ্ট ছন্দোবিৎ ছিলেন, তাঁহার পদাবলীর ছন্দ নিখুঁত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"[৮] এ ছাড়াও কবির ছন্দ সম্পর্কে কেউ কেউ আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন।[৯]

নরহরির ছন্দের আকৃতি ও ছন্দোবন্ধ

(ক) একপদী

১। রঙ্গে নাচয়ে শচীর বালা। রূপে করয়ে ভুবন আলা॥ (ভ.৪৭৫)*

২। কিবা খোল করতাল বাজে। চারিপাশে পরিকর সাজে॥ (ভ.৫৬৪)

৩। ভুবনমোহন গোরাচাঁদ। অখিল জনের মন ফাঁদ॥ (ভ.৫৬৪)

---

* সংকেত: ভ.=ভক্তিরত্নাকর (গৌড়ীয় মিশন ২য় সং, পৃষ্ঠা সংখ্যা)।

৭. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, (৮ম সং), পৃঃ ২২০।

৮. 'পদকল্পতরু', (৫ম), পৃঃ ১৩৭-১৩৮।

৯. (ক) ডঃ বাসন্তী চৌধুরী, 'বাংলার বৈষ্ণব সমাজ, সংগীত ও সাহিত্য, (বুকল্যাণ্ড ১৯৬৮) গ্রন্থের ২৪৮-২৭৮ পৃষ্ঠায় নরহরির 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে ধৃত সংস্কৃত রীতির ছন্দগুলির আলোচনা করেছেন।

(খ) ডঃ আনন্দমোহন বসু, 'বাংলা পদাবলীর ছন্দ' (১৯৬৮) গ্রন্থের ১৭১-১৭৯, ৩২১-৩২৭ পৃষ্ঠায় নরহরির মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত রীতির কিছু কিছু ছন্দের বিশ্লেষণ করেছেন। এ জন্যেই নরহরির ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা সংক্ষেপে করেছি।

৪। কানু সমীপ সখী রাই। কহে চল চলহ মাধাই ॥ (গী-পূ. ২৫৫)*
৫। কুঞ্জে রমণীমণি আজ। বৈঠলি সখীক সমাজ ॥ (গী-পূ. ২৫৭)
৬। গৌর পরিকর মাঝ। কৈছে হোয়ল আজ ॥ (গী-পূ. ২৯২)
৭। রচহ কবিগণ। পরম মুদমন ॥ (গৌ. ২১)*
৮। কহি বার বার। গুরুচরণ সার ॥ (গৌ. ৩)
৯। এ সব রঙ্গিনী। উপদেশ বাণী ॥ (গৌ. ১২৬)
১০। অভিনব গৌরকিশোর। অখিলভুবনচিত চোর ॥ (গী.ম. ৩২খ)*
১১। গোরা পহু পিরিতি মুরতি। কিভাবে বিভোর দিবা রাতি ॥ (গী.ম. ৩২খ)
১২। গৌর হরল ভুবনতাপ। মেটল বলি কলিক দাপ ॥ (গী.ম. ৩৪ক)
১৩। নিতাই করুণানিধি। আনি মিলায়ল বিধি ॥ (গী.ম. ৩৫ক)

(খ) **দ্বিপদী**

১। আজু পূর্ণিম সাঁজ সময়ে/রাহু শশী গরাসি ॥
গৌরচন্দ্র উদয়ে তবহি/তাপ তম বিনাশি ॥ (ভ. ৪৯০)
২। পরম শুভ শচীগর্ভে বিলসত/গৌর গোকুল নাহ ॥
করই স্তুতি নতি দেবগণ ঘন/ভবনে ভরই উছাহ ॥ (ভ. ৪৯০)
৩। গৌর সুন্দর পরম শুভক্ষণে। ধরল যজ্ঞোপবীত ॥ (ভ. ৫০০)
৪। গৌর বরজ কিশোর বর। অনুরাগে নব নব ভারী ॥ (ভ. ৫০৮)
৫। মাঘ সপ্তমী শুক্লপক্ষ। শুভক্ষণ ফণ ভুরি ॥ (ভ. ৫২৩)
৬। জয়শ্রীদুঃখিনী কৃষ্ণদাসগুণ। কহিতে শকতি কার ॥ (ভ. ৬৪৬)
৭। জয় জয় শ্রীহরিরাম আচার্য বর্য। আশ্চর্যচরিত চিতহারী ॥ (ভ. ৬৪৬)
৮। জয় বিদ্যাপতি। কবিকুল চন্দ্র ॥ (গী-ম. ৭ক)
৯। আজু সরস বসন্ত ঋতু নিরখি গৌরকিশোর ॥ (গী. ম. ৩৯ক)
১০। আজু কি নব রঙ্গ গহুঁক পুলকে ভরল গাত ॥ (গী. ম. ৪১ক)
১১। দেবরমণীবৃন্দ পরম কৌতুক রস ভোর ॥ (গৌ. ১৪০)

---

* সংকেত : গী. পূ. = গীতচন্দ্রোদয় পূর্বরাগ (হরিদাস দাস সম্পাদিত)।
গৌ. = গৌরচরিত্রচিন্তামণি (হরিদাস দাস সম্পাদিত)।
গী. ম. = গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ পুথি, পাঠবাড়ী ২৫৩৪।৩ নং (পত্র সংখ্যা) ॥
গৌ. প. সূ. = গৌর পরিকরগণের সূচক পুথি (পত্র সংখ্যা)।

১২। চারুচিত্র চরিত্রময় বহু গুপত ইহ যুগ মাহি ॥ (গৌ. ১৪২)

১৩। জয় বিশ্বম্ভর কৃষ্ণ শচীসুত গৌরাকৃতি করুণাময় হে ॥ (গৌ. ১৪৩)

১৪। লসত পরিকর মধ্য গৌরকিশোর নিরুপম সাজ ।। (গৌ. ১৪২)

(গ) **ত্রিপদী**

১। ফাল্গুন পূর্ণিমা/মঙ্গলের সীমা/প্রকট গোকুল ইন্দু (ভ. ৪৯০)

২। আপনার ঘর ছাড়ি/না যাবে পরের বাড়ী/বসিয়া খেলাবে এক ঠাঁই (ভ. ৪৯৪)

৩। আজু কি আনন্দময়/লোক গতি অতিশয়/শোভাময় শচীর ভবনে (ভ. ৪৯৯)

৪। বল্লভ দুহিতা/লক্ষ্মী সুচরিতা/সখীতে বেষ্টিত হৈয়া (ভ. ৫০১)

('গৌর পরিকরগণের স্থচক' পুথির প্রাপ্ত ১৪টি পদই ত্রিপদীতে লেখা :)

৫। প্রেমময়ী শচীমাতা/ত্রিজগত মধ্যে খ্যাতা/জগন্নাথ মিশ্রের ঘরণী (১খ)

৬। গোঁসাই শ্রীসনাতন/দ্বিজেন্দ্র দুঃখীর ধন/শ্রীকুমারদেবের কুমার (৮ ক)

৭। ও মোর গোপাল গুরু/ভকতি কল্পতরু/শ্রীমকরধ্বজ নাম যার (৯খ)

৮। ওহে বিনোদিনি/তুয়া নামখানি/কিসে সিরজিল কে (গী. পৃ. ৩৪৫)

৯। পেখলুবর/গৌর সুঘর/সুন্দর সুখধাম (গী.পৃ. ৫৮)

১০। গৌর বিধুবর/পরম সুন্দর/কনক ভূধর দেহ (গী.পৃ. ৪৮)

১১। আজু রঙ্গিণী/রমণীমণি ধনী/গেহ রহই না পারি (গী.পৃ.৭৮)

১২। গৌর শশধর/ধিরজ ধ্বংসন/কনক নবনীত অঙ্গ (গী.ম. ২৩খ)

১৩। শ্যাম তনুঘন/দলিত অঞ্জন/নীল কুবলয় নিন্দিতে (গী.ম. ২৬ক)

১৪। কনক পংকজ/পুঞ্জ জিনি তনু/মঞ্জুবেশ বিরাজই (গী.ম. ২৭খ)

১৫। ভাবে গর গর/গৌর সুন্দর/ভকতি মণ্ডলী মাঝে রে (গী.ম. ৩২ক)

(ঘ) **চৌপদী**

১। আজু গোধূলি সময় শুভক্ষণ/গৌরগুণমণি ভুবনমোহন/
বেশ বিরচিত বিবাহ বিহিত/সুমৃদুল তনুছবি ছলকয়ে (ভ. ৫০৫)

২। গোরা রসে ভাসি হাসি লহু লহু/কুলবতী কুল উলসিত বহু।

পানি সহিবারে সাজে শচীদেবী/আদেশেতে কিবা কৌতুক চিতে
(ভ. ৫১০)

৩। গৌর বিধুবর বরস নাগর/জননী পদধূলি ধরত শির পর/
করত বিজয় বিবাহে ভুসুর/বৃন্দ বলিত সুশোহয়ে (ভ. ৫১৩)

৪। গৌর রসিক শেখর বর/বেষ্টিত প্রিয় বিপ্রনিকর/
হরষিত সুবিবাহ করব/ইথে চলু চড়ি চৌদলে (ভ. ৫১৩)

৫। বরজ ভূষণ গৌরবিধুবর/করি বিবাহ বিনোদ গতি পর।
প্রেয়সী সহ চলই নিজ ঘর/পরম অদ্ভুত শোহয়ে (ভ. ৫৫৩)

৬। বিহরত সুর সরিততীর/গৌরু তরুণ বয়স থির/
তড়িত কনক কুমকুমমদ/মর্দন তনু কাঁতি (ভ. ৫৫৮)

৭। আজু অভিষেক সুখের অবধি (ভ. ৫৫৯)

৮। আজু কি আনন্দ নদীয়া নগরে (ভ. ৫৬১)

৯। ভুবনমোহন গৌর নটবর (ভ. ৫৬৯)

১০। গৌরগুণমণি বরজ শশধর (ভ. ৫৭৮)

১১। গৌরগোকুল নাহ নটবর (ভ. ৫৮৪)

১২। নাগরবর বরজ শশী/নারী সুবেশ ধরি বিহসি/
রসের ভবে যাবটপুর/প্রবেশ করয়ে (গৌ. ১৭৮)

১৩। শ্যামসুনাগর বর সুখকারী/কুন্দলতাসহ যুগতি বিচারি/
অপরূপ নারী বেশ ধরে রাই/দরশন আশে হরষ হৈয়া
(গৌ. ১৮২)

১৪। রাধিকা রমণীমণি/বিপিনে প্রিয় গমন শুনি/
ভেজই সুচতুর দূতী/তুরিত চলয়ে (গৌ. ১৮৫)

১৫। রমণীমণি ধনী রাধিকা সজি (গৌ. ১৮৬)

১৬। জয় জগতবন্দিনী/বিদিত নৃপ নন্দিনী/
রাধিকা চন্দ্র বদনী/দুঃখমোচনী (গী.ম. ৪ক, ২২ নং পদ)

১৭। ঝলকত তন তড়িত থির। পহিরণ নব জলদ চীর।
চারু চরিত ভূষণ মণি/মনমথমদ কদনা (গী.ম. ৪১খ, পদ ৫।৪৬)

১৮। নটবরবর/বয়স কিশোর/রসিক শেখর/গোরা (গী.ম. ২৪ ক)

১৯। দলিত অঞ্জন/তনুরুচি ঘন/তড়িত বসন/শোহে (গী.ম. ২৬ক)

(ঙ) **মিশ্রবন্ধ : একপদী ও দ্বিপদীর পর্যায়ক্রমে রচিত যুগ্মক**

১। শচীর দুলাল গোরা নাচে/দেবের দুর্লভ ধন যারে তারে যাচে
(ভ. ৫৮৭)

২। গোরা বড় দয়ার ঠাকুর/সংকীর্তন মেঘে প্রেম বরিষে প্রচুর
(ভ. ৫৮৮)

৩। হেরি বসন্ত ঋতু রাতি/ভাবভরে হসত মৃদু উলসে ভক্ত ছাতি
(গী.ম. ৩৮খ)

৪। গোরা নাচে কি মধুর বেশে/মজায় যুবতি জাতি সে দীঘল কেশে
(গী.ম. ২৯ক)

একপদী ও ত্রিপদীর পর্যায়ক্রমিক যুগ্মক

১। কানু শুনিয়া রাইয়ের কথা।
একাকী তুরিতে/উলসিত চিতে/চলয়ে সুন্দর যথা (গী.পৃ. ১৬৮)

২। কানু শুনি সুবদনী রীতি।
আঁখ্যে বারি ঝরে/ধরি দূতী করে/ধরিতে নারয়ে ধৃতি
(গী.পৃ. ১৭৬)

৩। ওগো সে নদীয়া চান্দে (গী.পৃ. ৩০৪)

৪। ওগো গৌরাঙ্গ গুণের নিধি (গী.পৃ. ৩০৫)

৫। পেখি আয়লু আজ (গী.পৃ. ৩০৫)

৬। রাই কি কাজ করিলা পথে (গী.পৃ. ৩৩৯)

৭। রাইমুখ পানে চায়া (গী.পৃ. ৩৩৯)

৮। ধনী শুনিয়া কানুর রীত (গী.পৃ. ৩৫১)

একপদী (দুটি) ও ত্রিপদী (১টি)র ছন্দোবন্ধ

১। মুখে মধুর মধুর হাসি।
সুধা বরিষয়ে রাশি রাশি॥
কত শত শত। নির্মল শরত। চন্দমা গরব নাশি (গী.ম. ২৪ক)

২। শিরে সুন্দর বেণী।
তাহে উপমা কি ভুজঙ্গিনী॥

তহি মল্লিফুল। লুব্ধ অলিকুল। বিরচি বিচিত্র মণি ॥
(গী.ম. ২৭ক, পদ ৩)

৩। চূড়া টালনি বামে।
অলি গুঞ্জে তহি ফুলদামে ॥
বিচিত্র সে চূড়ে। শিখিপিঞ্ছ উড়ে। কি নব রঙ্গিম ঠামে ॥

(চ) **পয়ার (দ্বিপদী)**

১। আজু কি আনন্দ বৃষভানুর মন্দিরে (ভ. ১৯২), ২। গোরা প্রেমে গরগর নিতাই আমার (ভ. ৫৯৭), ৩। ভালরঙ্গে নাচে মোর শচীর দুলাল (গী.ম. ২৯খ), ৪। ভাবের আবেশে গোরা হিলি ঢুলি যায় (গী.ম. ৩২খ)

(ছ) **মহাপয়ার (দ্বিপদী)**

১। নিজ পরিচয় কত দেঅব শ্রীমৎ গৌড়দেশ সুরসরিত তটে
বিনিবাসবিপ্রকুলজাত সুজনক জগন্নাথ প্রিয় বৈষ্ণবদত্ত নাম
যুগ নরহরি ঘনশ্যাম ইতি প্রথিত কিন্তু মম বন্ধুবর্গ উপদেশ
নিত্য ব্রজভূমি কৃতাশ্রয় পূর্ণ কপটকুট ছুটন কদা। (গৌ. ১৭)
(অমিল মহাপয়ার)

২। শুন শুন শ্রবণেচ্ছুক সুখদায়ক মানব জনম বিফল ভয় মোর।
নিপট দুষ্টমতি মন্দ হীনগুণ পাপ পথ পথিক বিষয়ে বিভোর ॥
(গৌ. ১৭)
(সমিল মহাপয়ার)

৩। রাত্র্যন্ত প্রাত পূর্বাহ্ন মধ্যাহ্ন অপরাহ্ন সায়ৎ প্রদোষা নিশা সুপ্রথিত।
শ্রীগৌরভক্ত কবি চক্রচূড়ামণি তন্মত বিলোকি ইহ দাস নরহরি
গ্রথিত ॥ (গৌ. ২২)
(সমিল মহাপয়ার)

(জ) সংস্কৃত রীতির ছন্দ—যেমন, ললিত, শ্যামা, কামিনী, যামিনী, চতুষ্পদী, তারা, কুমারী, সুবিলাপ, মঙ্গল, রঙ্গিণী, উজ্জ্বল, সুচিত্রা, কাদম্বিনী, বিচিত্রা, রঙ্গবর্দ্ধিণী, রঙ্গমালা, রমণী, হেমবতী ইত্যাদি।[১০]

১০. বাসন্তী চৌধুরী তাঁর 'বাংলার বৈষ্ণব সমাজ সংগীত ও সাহিত্য' গ্রন্থে এই ছন্দগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন (পৃঃ ২৪৮-২৭৮)।

নরহরির ছন্দের রীতি ও প্রকৃতি

(১) **অক্ষরবৃত্ত** (= মিশ্রকলা বৃত্ত বা তানপ্রধান)

১। কৃষ্ণের অগ্রজ রাম/রোহিণী নন্দন/ ৮+৬=১৪
বারুণী রেবতী দুই/প্রিয়া প্রাণধন ॥ (ভ. ৬১১) ৮+৬=১৪

২। মিশ্র সনাতন হর্ষ মনে। =১০
করয়ে কন্যার অধি/বাস শুভক্ষণে ॥ (ভ. ৫১১) ৮+৬=১৪

৩। এই অভিলাষ মনে/গৌরাঙ্গচাঁদের গুণে ৮+৮+১০=২৬
মাতিয়া বেড়াই দিবানিশি। (ভ. ৬৪৯)

৪। গোরা পহুঁ মনে/হইল হেন। ৬+৫=১১
বৃন্দাবন কুঞ্জে/বসিল যেন ॥ (গৌ. ১৬৬) ৬+৫=১১

৫। বিষ্ণুপ্রিয়া সে/সখীর সঙ্গে। ৫+৫=১০
গোরা চরিত/কহয়ে রঙ্গে ॥ (গৌ. ১৬৪) ৫+৫=১০

অক্ষরবৃত্ত রীতির বিভিন্ন মাত্রার চরণ ও পর্ব নির্মাণে নরহরির কৌতূহলের অন্ত ছিল না। যেমন (১) ৬ মাত্রায় একপদী,একপর্বিক—'আর এক নারী' (গৌ.১২৫), 'এ সব রঙ্গিণী' (গৌ. ১২৬) ; (২) **৬+২ মাত্রার চরণ**—'রঙ্গিয়া রমণী যত' (গৌ. ১৩৮), 'রঙ্গিয়া রমণীগণে' (গৌ. ১২৮) (৩) **৮ মাত্রার**—'গৌরপরিকর মাঝ' (গী.পৃ. ২৯২), নিতাই করুণানিধি (গী.পৃ. ৬০০), (৩) **৯ মাত্রা**—'মাধব সমুঝলু কাজ' (গী.পৃ. ৩৪০), 'কি ভাবে অবশ গোরা গা' (গী.পৃ. ২৯১) 'কুঞ্জে রমণীমণি আজ' (গী.পৃ. ২৫৭), কানু সমীপ সখী রাই (গী.পৃ. ২৫৫), (৪) **১০ মাত্রা**—২ মাত্রা অতি পর্বেঃ 'রাই—লাজে অবনত মাথ' (গী. পৃ. ৩৪৬), 'সখী—না জানি সেদিন কবে' (গী.পৃ. ৪১২), 'কিবা—খোল করতাল বাজে' (গৌ. ১৭১), (৫) ১০ **মাত্রার**—'নদীয়া বিনোদ গোরা রায়' (গী.পৃ. ২৪), 'অরুণ নয়নে ধারা বহে' (গী.ম. ৪০ক), 'কনক কেশর পারা গোরা' (গী.ম. ৪১খ), (৬) **১১ মাত্রা**—'আজু কালা কেনে এমন দেখি' (গী.পৃ. ৩৬২) 'ছল ছল দুটি অরুণ আঁখি' (গী.পৃ. ৩৬৩), 'হেদে হে নদীয়া নাগর নাহি' (গী.পৃ. ৩১৬) (৭) **১২ মাত্রা**—২ মাত্রা অতিপর্বেঃ 'আজু কি লাগি এমন গোরা যায়' (গী.পৃ. ১৬) 'অতিপর্ব' (২ মাত্রার) ব্যবহারেও নরহরি যত্নবান ছিলেন—'রাই নিরখি কানুর রীত'

(গী-পৃ. ৩৩৪), 'ওহে রসিক নাগর রায়' (গী.পৃ. ৩৩৪) 'ওহে কালিয়া নাগর রাজ (গী.পৃ. ৩৩১), 'শুন শুনহে রঙ্গিণী সই' (গৌ. ১৪৭)।

(২) **মাত্রাবৃত্ত (প্রত্ন)** (= কলাবৃত্ত, বা ধ্বনি প্রধান)

১। রচি হুঁ আ নন্দ হিয়। ৫ + ৫ = ১০
ছন্দ মম/চিত্ত প্রিয় ॥ (গৌ. ২১) ৫ + ৫ = ১০

২। জয় জয় জয়/গৌরচন্দ্র/কামদমুদ/বর্ধনা। ৬ + ৬ + ৬ + ৪ = ২২
হাটক রুচি/রুচির দেহ/মনমথমদ/মর্দনা ॥ (গী.ম. ২খ)

৩। জয় বিদ্যাপতি/কবিকুল চন্দ। ৮ + ৭ = ১৫
রসিক সভা ভূ/ষণ সুখকন্দ ॥ (গী.ম. ৭ক)

৪। কুন্তল ঘন/তিমির বরণ ৬ + ৬
চামর চয়/গরব হরণ ৬ + ৬
বেণী বিপুল/ভুজগ ভাঁতি ৬ + ৬
কিএ কাহুক/দংশই। (গী.ম. ২৮ক) ৬ + ৪

অনুরূপ রচনা—'বিহরত সুরসরিত তীর' (গী.ম. ৩৩ক), 'আজু গোধুলি সময় শুভক্ষণ' (ভ. ৫০৫), 'গোরা বসে ভাসি হাসি লহু লহু' (ভ. ৫১০), 'হোত শুভ অধিবাস শুভক্ষণে' (ভ. ৫১১), 'গৌরবিধুবর বরজ নাগর' (ভ. ৫১৩), 'নিরুপম রস উলস আজ' (ভ. ৫৫৭), 'আজু অভিষেক সুখের অবধি' (ভ. ৫৫৯) ইত্যাদি।

৫। জয় জন/রঞ্জন ৪ + ৪
কঞ্জ ন/য়ন ঘন ৪ + ৪
অঞ্জন নিভ নব ৪ + ৪
না-গর ঐ ঐ (ভক্তি. ২৫৯) ৪ + ৪

৬। নাগর/বর বর ৪ + ৪
বরজ/ধৃতি হর ৪ + ৪
হরষ/হিয়া পিয়া ৪ + ৪
রস ভরে (ভ. ১৫৯) ৪

(এই পদটিতে মাত্রা গণনাটি লক্ষণীয়)

(গ) **'নরহরি চক্রবর্তী গ্রন্থে বিশিষ্টার্থক শব্দ, বা প্রবচন**

(গৌরচরিত্রচিন্তামণি' থেকে সংকলিত, বন্ধনীতে পৃষ্ঠাসংখ্যা)

১। দেশের বাহির ঘরের রীত। সে কথা কহিতে কান্দয়ে চিত॥ (পৃঃ ৭৩)

২। পড়সী কেবল কূলের কাঁটা। দিবস রজনী দেয় এ খোঁটা (৭৩)

৩। আপনার দোষ আঁচলে বাঁধিয়া পরকে দুষিতে চায় (৭৯)

৪। অকলংক কেবা আছয়ে জগতে কলংক সবার গায় (৮৪)

৫। পরে দোষে যেই সেই দোষী দুখ ভুঞ্জয়ে জানিহ মনে (৮৫)

৬। আপনি হইলে ভাল ভাল সব লোকের কথায় কি (৮৫)

৭। ননদ কেবল বিষের ফল (৮৬) বা, ননদী বিষম বিষের প্রায় (৭৩)

৮। সমানে সমানে সুখ উপজয়ে অসমান সনে বাড়য়ে বেথা (১৩৪)

৯। কারে কি কহিব যুবক সময় কেবল দোষের ভাগী (৮৮)

১০। চতুর উপরে চতুর যে জন তাহে কি চাতুরী রয় (১২৩)

১১। পরাণ অধিক গুপত করয়ে পাইয়া অলপ ধনে (১২৩)

১২। গুপত না রহে বেকত রীতি (৯৮)

১৩। পরের কলংক গায় যেই, সেই কলংকী (১৩৩)

১৪। যার চাতুরী প্রবল তার কি কখনো কলংক রটে (১৩১)

১৫। যুবতী লাগিয়া জগতে বিষম কলংক না গণে কেহ (১২৯)

১৬। সুজন জনে কি সুজনে নিন্দয় কুজন জনের কাজ (১২৬)

১৭। দোষযুক্ত জনে দূষিতে নিষেধ (১২৫)

১৮। দোষহীন জনে যে দোষে অবশ্য সে দোষী জগতে হয় (১২৫)

১৯। যার যে স্বভাব থাকে তাহা কেহ না ছাড়িতে পারে (১২৯)

২০। অসতীর সহ বসতি করিলে অনায়াসে তুমি অসতী হবে (১৩৩)

২১। বেকত বিষয়ে বিষাদ ঘটয়ে গুপতে অধিক সুখ (১২৩)

২২। পিরিতি গুপত না থাকে কখন, বেকত স্বভাব তার (১২৩)

২৩। রসিকিনী বিনা বুঝিতে পারে কি রসিক জনের হিয়া (১২৭)

২৪। নিরাকারে যার আরতি তারে কি আকার কখন ভায় (১২৭)

২৫। যার পিরিতির মন সে কি হেন তুচ্ছ কলংক গণে (১৩১)

২৬। হিত করিতে উচিত (১৩১)

২৭। পিরিতি করিলে কলংক রটে (১৩১)
২৮। সাধুরীতি যার সে রাখে পরের লাজ (৭২)
২৯। পিরিতি পরম রতন ইহারে গুপত করিলে কাজ (১২৩)
৩০। পিরিতে কে কি না করিতে পারে (১৫৭)
৩১। চুপ করি থাক গোপনেতে ঢাক চুল দিয়া কাটা কান
৩২। চোরের উপর বাটপাড়ি করি চোখে ধূলা দিতে হয়
৩৩। কিছু না থাকিলে মিছামিছি কেহ কারে কি কহিতে পারে

ষষ্ঠ অধ্যায়

গ্রন্থাবলীর সাহিত্য মূল্য

এক। লোক জীবন বা সমাজ চিত্র

১। রাষ্ট্র ব্যবস্থা

''ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাসে'* সেকালের রাষ্ট্র ব্যবস্থার কিছু কিছু ইঙ্গিত মেলে। দেশের রাজধানী ছিল গৌড়।[১] গৌড়েশ্বরের নাম উভয় গ্রন্থেই নেই। তিনি ছিলেন ম্লেচ্ছ বা মুসলমান—'গৌড়ের রাজা যবন অনেক অধিকার'।[২] তিনি কিছু কিছু প্রতাপশালী ও পণ্ডিত ব্যক্তিকে সম্পত্তি দিয়ে ভূস্বামী রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু কেউ তাঁর অবাধ্য হলে, তিনি তার ধর্মনাশ করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। সনাতন-রূপ যবন রাজার অধীনে 'ম্লেচ্ছ ভয়ে রাজ্যভার' অঙ্গীকার করেছিলেন।[৩]

"সনাতন রূপ মহামন্ত্রী সর্বাংশেতে।
শুনিলেন রাজা শিষ্ট লোকের মুখেতে ॥
"সনাতন রূপে আনি দিল রাজ্যভার।
"রাজ্যভোগ করয়ে কিঞ্চিৎ কর দিয়া ॥"[৪]

সনাতন রূপের রাজধানী ছিল রামকেলি। তাদের রাজসভায় বিভিন্ন দেশের শাস্ত্রজ্ঞ, গায়ক, বাদক, নর্তক ও কবিগণ উপস্থিত হতেন। এদের যথাযোগ্য সম্মানার্থে বহু অর্থ ব্যয় হতো। নিজেরা দুভাই সর্বদা শাস্ত্রচর্চা ও ন্যায়সূত্রের মতামত আলোচনায় মগ্ন থাকতেন। তাঁরা স্বদেশীয় ব্রাহ্মণদের গঙ্গা সন্নিধানে বাসোপযোগী জায়গা দিতেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের আদর ছিল সর্বাধিক। রাজসভাতে ভাগবত পাঠ হতো। কিন্তু রাজকার্যে তাঁদের গৌড়ে যবনগৃহে যেতে হতো। এজন্যে তাঁদের কুণ্ঠার অন্ত ছিল না।[৫]

---

* সংকেত : "ভ"—ভক্তিরত্নাকর (মিশন ২য় সং), "ন"—নরোত্তমবিলাস (বসুমতী ৩য় সং), "গৌ"—গৌরচরিত্রচিন্তামণি (হরিদাস দাস সম্পাদিত)। ভ, ন, গৌ—সংকেতের পাশের সংখ্যা গ্রন্থ পৃষ্ঠা।

১ ভ. ১৩, ন. ৪৮, ২. ভ. ২৮, ৩. ৪. ৫. ভ. ২৮-২৯,

মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তৈলঙ্গ, উৎকল, মিথিলা, গুজরাট, বঙ্গ, কাশী, কাশ্মীরাদির পণ্ডিতেরা এদের সভায় আসতেন।[৬] নরহরি সনাতন-রূপের ঊর্ধ্বতন চতুর্থ পুরুষ রূপেশ্বর ও হরিহরের (মতান্তরে পদ্মনাভ) রাজ্য গ্রহণ সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন।[৭]

গৌড়েশ্বরের অধীনে আরেক ভূ-স্বামী (বা রাজা) নরোত্তম ঠাকুরের পিতা কৃষ্ণানন্দ দত্ত। তাঁর রাজধানী ছিল পদ্মাবতী তীরবর্তী গোপালপুর নগর। তিনি রাজ কার্যে দলবল নিয়ে গৌড়ে যেতেন।[৮] কৃষ্ণানন্দের পর গোপালপুরের রাজা হন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সন্তোষ দত্ত। সন্তোষ দত্ত বিচক্ষণ ও কর্মক্ষম, বিদ্বান ও শাস্ত্রবিৎ ব্যক্তি "প্রজাপালনে প্রবীণ। অত্যন্ত প্রভাব অন্য যাঁহার অধীন ॥" গুরু বৈষ্ণব ও কৃষ্ণে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা।[৯]

বন-বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন দস্যু সর্দার। তাঁর একটি দল ছিল।[১০] ধনসম্পত্তির উপরে তাঁর লোভ ছিল অত্যন্ত বেশি। তিনি দস্যুদের লুটতরাজে দূরদেশেও পাঠাতেন। তবে তাঁর অন্য একটি মনও ছিল। প্রথমাবধি তাঁর রাজসভায় ভাগবতাদি পাঠ হতো। শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুর গিয়ে ঘটনাদি লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁরই সাহচর্যে এসে বীরহাম্বীরের মতিগতির পরিবর্তন ঘটে।[১১]

গৌড়েশ্বর যবন হলেও বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁর মন্ত্রক বা সাহায্যকারীরূপে কাজ করবার সুযোগ পেতেন। নিত্যানন্দ প্রভুর শ্বশুর সূর্যদাস তাঁর কাছে 'সরখেল' উপাধি লাভ করেন।[১২]

দেশের মধ্যে দুর্ভিক্ষ বা লোক পীড়া হতো, 'ভক্তিরত্নাকরে' তার ইঙ্গিত আছে।[১৩] পথঘাট নিরাপদ ছিল না। পথে দস্যুভয় ছিল। কেউই একাকী যাতায়াতে সাহসী হতো না। শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দের মতো নিষ্কিঞ্চন বৈরাগীদেরও গমন পথে লোকজন ছিল।[১৪] ধর্মগ্রন্থ বা দেববিগ্রহ প্রেরণের সময়ও বহু সতর্কতা অবলম্বন করতে হতো। বৃন্দাবন থেকে গৌড়ে ধর্মগ্রন্থাদি আনয়নের সময় শ্রীনিবাসের সঙ্গে এগার জন অস্ত্রধারী রাজপাত্র, পদাতিক ও একজন প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন।[১৫] পুরুষোত্তম জানায়

৬. ন. ৪৩, ৭. ভ. ২৫, ৮. ভ. ১৩, ৯. ভ. ২১, ১০. ন. ৪৩,
১১. ভ. ৩৪২, ১২. ভ. ৬০৭, ১৩. ভ. ৪৪৯, ১৪. ভ. ৩৫১, ৩৮৯,
১৫. ভ. ৩২৮, ন. ৫৩, ৬৩, ৭০।

বৃন্দাবনে শ্রীরাধিকা বিগ্রহ প্রেরণে বহুলোক নিযুক্ত হয়েছিল।[১৬] চোর ডাকাত তস্করের ভয়ে পথিকদের সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকতে হতো। দস্যুরা সুযোগ বুঝে অতর্কিতে, রাত্রির অন্ধকারে মালভর্তি গাড়ী লুট করতো। বীরহাম্বীর ছাড়াও দস্যু চাঁদরায়,[১৭] ও দস্যু হরিশ্চন্দ্র[১৮] সেকালের কুখ্যাত ডাকাত বীরহাম্বীরের দল কর্তৃক শ্রীনিবাসাদির ধর্মগ্রন্থ ভর্তি গাড়ী লুট করা সেকালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সব দস্যুদের ছোট বড় দল ছিল। তারা বনের ভেতর বা নানা গোপন ও দুষ্প্রবেশ্য-স্থানে আত্মগোপন করে থাকতো। দিনে তারা ভালোমানুষ সেজে ঘুরে ঘুরে শিকারের সন্ধান করতো। অপকর্মগুলি ঘটতো দুর্গম স্থানে।[১৯] নৌকাপথেও মানুষের নিস্তার ছিল না।[২০] দস্যুদের দাপটে লোকে তাদের কুকর্মের কথা প্রচার করতে সাহসী হতো না।[২১] নরহরি এদের ক্রিয়াকাণ্ডের পরিচয় দিয়েছেন—

"…এক সংঘট্ট হইয়া।
পূজে চণ্ডী ছাগ মেষ মহিষাদি দিয়া॥
চণ্ডীপদে প্রণমি কহয়ে বারবার।
কার্যসিদ্ধি করি রক্ষা করহ সভার॥"

মুখ্য দস্যু পথিকের অবস্থা ও সঙ্গের জিনিসপত্রে নজর রাখতো। পরে তার নির্দেশে সদলবলে আক্রমণ চালাতো।[২২] লুটের কাজে সর্দার সন্তুষ্ট হলে অন্যান্যেরা বস্ত্র, অলংকার ও ধন উপহার পেতো। তার অসন্তোষে দলীয় লোকও অত্যাচারিত হতো।[২৩] ধান ইত্যাদি শস্য গোলাতে রাখা হতো।[২৪] ছোট খাটো সিঁদেল চোরও ছিল। তারা রাত্রিতে গৃহস্থের ঘরদোর খোলা পেলে ঢুকে যেতো।[২৫] অনেক সময় জ্ঞাতি বা পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে ঈর্ষা ও বিবাদ হতো। জ্ঞাতিদের শত্রুতায় কেউ কেউ দেশত্যাগ করতে বাধ্য হতেন। বৃন্দাবন যাত্রার প্রাক্কালে রামচন্দ্র কবিরাজ কনিষ্ঠ গোবিন্দকে ডেকে বলেছিলেন,

এবে এথা বাসের সঙ্গতি ভাল নয়।
সদা মনে আশংকা উপজে অতিশয়॥

---

১৬. ভ. ৩৮৯, ১৭. ১৮. ন. ১৮০, ১৯. ৩৪২, ২০. ভ. ১০৯,
২১. ২২. ভ. ৩৪২, ২৩. ভ. ৩৪২, ২৪ ভ. ৪১২-৪১৩,
২৫. গৌরচরিত্রচিন্তামণি, পৃঃ ৯৯।

আছয়ে কশ্চিৎ ভৌম বহুদিন হৈতে।
তাহে যে উৎপাত এবে দেখহ সাক্ষাতে॥
শীঘ্র এই বাসাদিক পরিত্যাগ করি।
নির্বিঘ্নে অন্যত্র বাস হয় সর্বোপরি॥[২৬]

বলা বাহুল্য যে, গোবিন্দদাস কুমারনগর ত্যাগ করে গণ্ডগ্রাম তেলিয়া বুধরিতে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

মথুরামণ্ডলের এক রাজার নাম ছিল ব্রজনাভ। তিনি কৃষ্ণলীলা স্মরণ করে বহু গ্রাম স্থাপন করেছিলেন।[২৭]

বৃত্তি: দেশে নানা বৃত্তিজীবিলোক ছিল। তন্তুবায়, গোপ, বণিক (গন্ধ বণিক), শংখবণিক, মালাকার, বারুই বা বারুজীবি, তাম্বুলী, ভাস্কর, কুন্দার, গণক, সর্বজ্ঞ, পাঠক, চিকিৎসক, মাঝি,[২৮] মাংসব্যবসায়ী, পাককর্তা (রসুয়া), অধ্যাপক, পুরোহিত, গায়ক, বাদক, নর্তক, বাহক, স্বর্ণকার, কুম্ভকার,[২৯] ওঝা, মালী-ম্যালানী, নাপিত[৩০] প্রভৃতি। এ ছাড়া এক শ্রেণীর নারী ছিল, যারা অভিজাত গৃহস্থ বাড়ীতে গিয়ে বধূদের সাজবেশ রচনা করতো।[৩১]

যানবাহন ও যোগাযোগ, বিনিময় প্রথা: সেকালের পথঘাট দুর্গম ছিল। যানবাহনের মধ্যে ছিল স্থলপথে গরুরগাড়ী (গো-শকট), চৌদল (চতুর্দলা) ও পালকী, এবং জলপথে নৌকা। সাধারণ মানুষ পদব্রজে দেশ-বিদেশে যাতায়াত করতো। ধনীরা ব্যবহার করতো চৌদল।[৩২] বিশিষ্ট ধনী বা রাজপুরুষদের জন্যে ছিল হস্তী, অশ্ব ও দোলা[৩৩]। দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত দোলায় চড়ে বিদ্যা বিজয়ে বের হতেন। জাহ্নবাদেবী 'মনুষ্যের যানে' খেতুরী গিয়েছিলেন।[৩৪]

সংবাদ প্রেরণার্থে পত্রের ব্যবহার ও দূতের ব্যবস্থা ছিল। বাহক হস্তে পত্রের বা বিশেষ লোকের মাধ্যমে সংবাদ বিনিময় হতো। 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাসে' শ্রীজীব, শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দের মধ্যে পত্র বিনিময়ের বহুবার উল্লেখ আছে।[৩৫] 'ভক্তিরত্নাকরে' পাঁচটি প্রাচীন পত্রের হুবহু প্রতিলিপি উদ্ধৃত হয়েছে।[৩৬]

২৬. ভ. ৩৮৫, ২৭. ভ. ৯৪, ২৮. এগুলির নাম আছে—ভ. ৫৩৯-৫৪১, ৪৫৫, ৩৪৫, ৩৭৯, ৩২৩, ৪০৩ পৃষ্ঠায়। ২৯. এগুলির নাম আছে ন. ৯৭-১০২ পৃঃ। ৩০. গৌ. ৬০, ৭৬, ৩১. গৌ. ১৭৮-১৮০, ৩২. ন. ৫৩, ৭২, ৯০-৯২, ১১৪, ভ. ৬১, ৬৪, ৪৫৫, ৬১৮, ৬২০; ৩৩. ভ, ৫৪১, ৩৪. ভ. ৪১৮, ৩৫. ভ. ৯, ১৮, ২০, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৬০, ন. ৪৩, ৫৫, ৬৯, ৭০, ৯০, ৯৩ ইত্যাদি। ৩৬. ভ. ৬৩২-৬৩৩, ৬৩৮।

জিনিস পত্র সাধারণতঃ মাথায় বহন করা হতো। বেশি হলে গরুর গাড়ী বা নৌকায় তোলা হতো। মুটে বা বাহক বৃত্তির লোক ছিল। বাহকের হাতে ডোর কৌপিন পুথিপত্র পাঠানো হতো।[৩৭] বৈষ্ণব সম্মেলনগুলিতে ভক্তেরা সাধ্যানুযায়ী নিজ নিজ প্রদত্ত দ্রব্য নিজেরাই বহন করে এনেছিলেন।[৩৮] হৃদয় চৈতন্যের কাছে জনৈক মহাজন 'ধন' এনেছিলেন গঙ্গাপথে নৌকায়।[৩৯]

নরহরির গ্রন্থে ব্যবসা বাণিজ্যের কোনো উল্লেখ নেই। মুদ্রার প্রচলন ছিল। পাথেয়রূপে খাদ্যসামগ্রীর সঙ্গে রৌপ্য বা স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে রাখা হতো।[৪০] সনাতন বৃন্দাবনে পলায়নকালে কারারক্ষীকে ও পথিমধ্যে এক হুঁয়াকে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলেন। সেকালেও ঘুষ নেওয়া হতো।[৪১] কারারক্ষী সনাতনের কাছে মুদ্রা লাভ করেই তাঁকে মুক্তি দিয়েছিল। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের লেনদেনেও স্বর্ণাদির চল ছিল। নবদ্বীপের মতো বড় বড় শহরে হাট বাজার ছিল। গৌরাঙ্গ নগর ভ্রমণে তাঁতি, গোয়ালা, গন্ধবণিক, মালাকার, তাম্বুলি, শংখবণিক প্রভৃতির বিপণিগুলিতে উপস্থিত হয়ে জিনিসপত্র সংগ্রহ করেছিলেন।[৪২] বাজারে প্রয়োজনীয় জিনিসের খুব একটা অভাব ছিল না।।

(২) **কাব্যানুশীলন ও শাস্ত্রচর্চা**

দেশে শাস্ত্রচর্চা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ব্যাপক ছিল। ব্যাকরণ, কোষ, অলংকার, তর্কশাস্ত্র, কাব্য, সাহিত্য, অলংকার প্রভৃতি প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই অধ্যয়ন করতে হতো।[১] ভক্তমণ্ডলী, সাধারণ বৃদ্ধ ছাড়াও তরুণেরা ভাগবতাদি পাঠ করতেন।[২] বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, রামকেলি ,চাখন্দি, মথুরা, সৈয়দাবাদ, যাজি-গ্রাম প্রভৃতি স্থানে টোল ছিল। বৃন্দাবন ছিল বিদ্যার্জনের ও শাস্ত্রালোচনার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। সনাতন, রূপ, শ্রীজীব, লোকনাথ, গোপালভট্ট, মধুপণ্ডিত, দাস গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রঘুনাথ ভট্ট, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ মহাপ্রাজ্ঞ পণ্ডিতেরা তখন বৃন্দাবনে বসবাস করতেন। মথুরাবাসী মধুসূদন তত্ত্ব-বাচস্পতির নিকট শ্রীজীব বেদান্ত ন্যায়াদিতে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন।[৩] গৌড়ে রামভদ্র, গঙ্গানারায়ণ, কৃষ্ণচরণ, ব্যাসাচার্য প্রমুখ বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।[৪] শ্রীনিবাস শ্যামানন্দও প্রবীণ অধ্যাপক ছিলেন। এঁদের এবং শ্রীজীব, রঘুনাথ, শ্যামানন্দ, শ্রীনিবাস, বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর বহু ছাত্র ছিল।

---

৩৭. ভ. ৯, ন. ৬৯, ৯৭, ৩৮. ন. ৭৩, ৭৫, ৩৯. গৌরপরিকরগণের সূচক—গৌ. প. সূ.-পত্র, ৪০. ভ. ৩২, ৮৭৫, ৪১. গৌরপরিকরগণের সূচক পত্র, ৪২. ভ. ৫৪১।
১. ভ. ৪৯, ২. ভ, ৩৪৮, ৩৬০, ৪৫৯, ৩. ভ. ৩৫, ৪. ভ. ২৯।

অনেক ভূস্বামী (রাজা) পণ্ডিতদের আদর ও সম্মান করতেন। সনাতন রূপের রাজধানীতে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, উৎকল, মিথিলা, গৌড়, গুজরাট, মথুরা, বঙ্গ, কাশী, কাশ্মীর প্রভৃতি দূর দূর দেশ থেকে বড় বড় পণ্ডিতেরা গমন করতেন। নবদ্বীপবাসী অধ্যাপকগণের অনেকেরই রামকেলিতে গমনাগমন ছিল। হৃদয়চৈতন্যের গুরু অগ্রগণ্য পণ্ডিত ছিলেন। রামকেলি থেকে তাঁকে নিয়ে যেতে লোক এসেছিল। নবদ্বীপের অধ্যাপকেরা সনাতন রূপ কর্তৃক বিশেষভাবে আপ্যায়িত হয়েছিলেন।[৫] সনাতন রূপের রাজ্যত্যাগ ও বৃন্দাবন গমনের পর রামকেলির পণ্ডিতেরা অন্যত্র গমন করেন। শ্রীনিবাসের অধ্যাপক ধনঞ্জয়ের উপাধি ছিল 'বিদ্যাবাচস্পতি'। গোপাল ভট্টের শিক্ষাগুরু প্রবোধানন্দ 'স্বরস্বতী' উপাধি লাভ করেন।[৬]

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা প্রত্যহ বেদ-ভাগবতাদি পাঠ ও শ্রবণ করতেন। বৃন্দাবনের গোস্বামীবা বিভিন্ন বিষয়ে শাস্ত্র রচনা করেছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকরে' সনাতন, রূপ, জীব, রঘুনাথ দাসেব রচনাবলীর তালিকা আছে।[৭] গোস্বামী গ্রন্থগুলির ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থাও হয়েছিল। শ্রীজীব স্বয়ং শ্রীনিবাসকে গৌড়বঙ্গে গোস্বামীগ্রন্থ প্রচাবের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বৃন্দাবন থেকে গ্রন্থগুলি গৌড়ে গাড়ী বোঝাই করে পাঠানো হয়েছিল। সেকালে গৌড় অপেক্ষা বৃন্দাবনের শাস্ত্র ব্যাখ্যাই সমাদর লাভ করেছিল। ভাগবত ব্যাখ্যায় বৃন্দাবনের গোস্বামীরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। শ্রীনিবাসই সর্বপ্রথম গোস্বামী মতানুসারী মধুর ব্যাখ্যা বঙ্গদেশে প্রচলন করেন। 'ভক্তিরত্নাকরে' আছে, বীরহাম্বীরের রাজসভায় তাঁর পাঠক ব্যাস ভাগবত ব্যাখ্যা করতেন। একদা শ্রীনিবাস এসে তাঁর ব্যাখ্যার পর নতুনভাবে ভাগবতের ব্যাখ্যা শোনালেন। তখন, "সভামধ্যে সভার নেত্রেতে ঝরে জল। শ্রীবীরহাম্বীর রাজা হইলা বিহ্বল ॥"[৮] যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস ছাত্রদের সেই ব্যাখ্যাই শোনাতেন—"যৈছে সর্বশ্রেষ্ঠ মত গোস্বামী প্রকাশে। তৈছে ব্যাখ্যা করান আচার্য শ্রীনিবাসে ॥"[৯] তাঁর নতুন ব্যাখ্যা শুনে সাধারণ মানুষ যেমন বিহ্বল হতো, তেমনি 'কুমতাবলম্বীরা' লজ্জায় স্থান ত্যাগ করতো এবং

৫. ভ. ৫৬-৫৭, ৬. ভ. ২৯, ৮, ৭. ভ. প্রথম তরঙ্গ, ৩৬-৪১, ৮. ভ. ৩৪৫, ৯. ভ. ৩৬১।

পণ্ডিতেরা শ্রীনিবাস চরণে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন—'শ্রীনিবাস পদে আসি মাগয়ে শরণ'।[১০] নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব তিথিতে শ্রীনিবাসের ভাগবত পাঠ শুনে আত্মবিস্মৃত জনগণ তাঁর পাঠলালিত্য শক্তিকে 'শ্রীশক্তি অর্পিল শক্তি', 'শক্তি সঞ্চারিল বেদব্যাস' বা 'গদাধর পণ্ডিত-কৃপাশক্তি পূর্ণ প্রকাশ' ইত্যাদি বলে অভিনন্দিত করেছিল।[১১] 'বিশ ত্রিশ ভট্টাচার্য সনে' সনাতনের ভাগবত আলোচনা, ভাগবতের সমাদর প্রকাশ করে। নিছক ধর্মপ্রচারার্থেই নয়, সেই সঙ্গে শিক্ষার্থেও গোস্বামী গ্রন্থ বিতরিত হতো। এ থেকে বোঝা যায় যে, সেকালে মুদ্রণ ব্যবস্থা না থাকলেও হস্তলিখিত পুথির অভাব ছিল না। লোকে ধৈর্য ধরে পরিশ্রম করে বিভিন্ন পুথি নকল করতো। 'নরোত্তমবিলাসে' বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ভাগবত অনুলেখনের প্রসঙ্গ অছে।[১২] বহু পুথি কীটে নষ্টও করতো। বৃন্দাবনে শ্রীনিবাসের ভাগবত পাঠকালে এমনি এক কীটদষ্ট পুথির কথা বলা হয়েছে। সেকালে আচার্যেরা শিক্ষার্থীদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাদের বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিতও করতেন।

ব্রাহ্মণেরা সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ছিলেন। শ্যামানন্দ-নরোত্তমের মত অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত বিচক্ষণ পণ্ডিত কম ছিলেন। তবে ব্যাকরণ কাব্য পুরাণাদি চর্চায় অন্যেরাও উৎসাহিত হতেন। নারীশিক্ষার প্রসঙ্গ নরহরি বিস্তারিত করেন নি। নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবা দেবী সেকালের বৈষ্ণব সমাজকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁর বিচক্ষণতা, ভক্তিভাব ও অলৌকিক শক্তিতে ভক্তসমাজ মুগ্ধ হয়েছিলেন। আচার্য বাড়ীর মেয়েদের অনেকেই লেখাপড়া শিখতেন। নিত্যানন্দপ্রভুর পুত্রবধূ সুভদ্রা, শ্রীনিবাস-কন্যা হেমলতা যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করেছিলেন। সুভদ্রার 'অনঙ্গ কদম্বাবলী' কাব্য ও হেমলতার কিছু বৈষ্ণব পদ আছে।[১৩] গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়া সেকালে বহুমান্যা ছিলেন। তাঁকে 'ঠাকুরাণী' নামে সম্মান করা হতো।[১৪]

সেকালে শিক্ষার্থীদের মধ্যে টিপ্পনী বা ফাঁকি জিজ্ঞাসার রীতি ছিল। চৈতন্য-দেব তাঁর সহপাঠীদের এ বিষয়ে উত্তেজিত করে তুলতেন। 'কায়স্থবালকের চাতুর্য পরীক্ষার্থে' কঠিনতম গণিত প্রশ্নের প্রচলন ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে।[১৫]

১০. ভ. ৩৬১, ১১. ভ. ৩৯৯, ১২. ন. পুথি. ৩২ক-খ, ১৩. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী (১৩৬৯), শ্রীসুকুমার সেন, পৃঃ ৪৩-৪৪, ১৪. ন. পুথি. ৩৩ক-খ, ১৫. মধ্য-যুগের বাংলা ও বাঙালী, পৃঃ ৪৫।

ছাত্ররা তর্কবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করতো। এজন্যে গুরুর নিকট তাদের পরীক্ষায় বসতে হতো।

সেকালে অহংকারী পণ্ডিতের বা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতেরও অভাব ছিল না। বিদ্যা মদে এঁরা নিজের সম্পর্কে অত্যুচ্চ ধারণা প্রকাশ করতেন। চৈতন্যদেবের মতো উল্লেখযোগ্য পণ্ডিতকে কেশব কাশ্মীর নামক[১৬] জনৈক দিগ্বিজয়ী উপেক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলেন। বিদেশী অপরিচিত দিগ্বিজয়ী গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। বিশ্বনাথের কম বয়সে এমনি এক দিগ্বিজয়ী দেবগ্রামে এসে ছিলেন। তাঁকে দেখে গ্রামস্থ পণ্ডিতেরা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। নরহরি বলেন, সেই দিগ্বিজয়ীকে বিশ্বনাথ অনায়াসে পরাস্ত করেছিলেন।[১৭] শ্রীজীবও এমনি এক দিগ্বিজয়ীর গগনচুম্বী অহংকারের সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন। গোবিন্দ কবিরাজের মাতামহ দামোদরের কাছেও এক দিগ্বিজয়ী পরাজিত হন। পরাজিত পণ্ডিতদের অনেকেই বিজেতার শরণ নিতেন। কেউ কেউ মনোদুঃখে বিজেতাকে কুৎসিৎ অভিশাপও দিতেন। দামোদরকে পরাজিত পণ্ডিত 'অপুত্রক হও' বলে অভিশাপ দিয়েছিলেন।[১৮] জ্ঞানদাসের জন্মস্থান কাঁদড়ায় জয়গোপাল নামে এক কায়স্থ পণ্ডিতের বিদ্যালাভের পর দুর্মতি ঘটেছিল। তিনি শিক্ষাগুরুকে 'হেয় বোধ' করেছিলেন। বীরচন্দ্র তাই তাঁকে পবিত্যাগ কবেন।[১৯]

নরহরি সেকালের কবি সাহিত্যিকদের নামোল্লেখ করেছেন। বৃন্দাবনের গোস্বামীবৃন্দ ছাড়াও শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ, রামচন্দ্র, গোবিন্দ কবিরাজ, গোবিন্দ চক্রবর্তী, বীরহাম্বীর, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, অচ্যুতানন্দ কবি ছিলেন। কবিত্বের জন্যে রামচন্দ্র ও গোবিন্দ দুই ভাই-ই 'কবিরাজ' উপাধি লাভ করেছিলেন॥[২০]

(৩) লোক-লৌকিকতা

স্ত্রী আচার

নরহরির গ্রন্থে তদানীন্তন সামাজিক স্ত্রী আচাবের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। বেশী বয়স পর্যন্ত মেয়েদের সন্তান জন্মগ্রহণ না করলে স্ত্রী বা স্বামী-স্ত্রী

১৬. এই নামটিই ভক্তিরত্নাকরে পৃঃ ৫৪২ (১২।২২৫৪) আছে।

১৭. ন. পুথি ৩১থ, ১৮. ভ. ১১, ১৯. ভ. ৬৩৮, ২০. ভ. ৩৩৮, ৪১৬।

উভয়েই দেবতা বা অলৌকিক শক্তিধর পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করতো।[১] বহু সাধ্য সাধনার পর নারী গর্ভবতী হলে, সেই নারীকে পাড়া প্রতিবেশিনী বা প্রিয়-জনেরা নানা দ্রব্য উপহার দিত।[২] সন্তান প্রসব না হলে দেবদেবীর চরণামৃত পানের ব্যবস্থা হতো।[৩] সন্তানের জন্মকালে নানা মঙ্গলক্রিয়া অনুষ্ঠিত হতো। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে সন্তানকে গ্রামদেবতার (পার্বতী-শংকর, পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্য) চরণে সমর্পণ করা হতো।[৪] প্রতিবেশী নারী পুরুষ বা 'আপ্তগণ' ও প্রিয়জনেরা শিশুকে আশীর্বাদ করতেন। শিশুর মাথায় ধান দূর্বা দিতেন কুল-নারীরা।[৫] আশীর্বাদ করতে এলে অনেকেই নবজাতকের নামে বিভিন্ন দ্রব্য আনতেন।[৬] সূতিকাগার পরিষ্কার রাখা হতো। উপস্থিত সকলে 'হরিধ্বনি' দিতেন।[৭] গায়ক ও বাদক আহ্বান করা হতো। কোনো কোনো পরিবারে নারীরা মঙ্গলগীত গাইতেন, ঘৃত-দধি-দুগ্ধ-হলদি-জল অঙ্গনে ছড়িয়ে উৎসব করতেন।[৮] পুত্র জন্মালে পিতা বা অভিভাবক দেব-দ্বিজ ও দীনদুঃখীকে কিছু না কিছু ধন দান করতেন, কেউ কেউ ব্রাহ্মণ ভোজন করাতেন।[৯]

বহুদিন পর্যন্ত সন্তানকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হতো না, অপরিচিতের নিকট পাঠানো চলতো না। ডাইনী, ভূতপ্রেত ইত্যাদির আশঙ্কা ছিল।[১০]

শিশুর জন্মের অষ্টম দিনে 'অষ্টকলাই' উৎসব। গ্রামস্থ শিশুদের বাড়ীতে ডেকে তাদের কলাই ভাজা দেওয়া হতো।[১১]

ছ-মাসের সময় একটি শুভদিন দেখে সন্তানের অন্নপ্রাশন হতো। প্রথমে দৈবজ্ঞকে এনে তার সাহায্যে নাম-করণ করা হতো।[১২] অনেক সময় একাধিক নামও রাখা হতো।[১৩] এইদিন শিশুর হাতে প্রতিবেশী ও প্রিয়জনেরা নানা সামগ্রী উপহার দিতেন। নবজাতককে নানা আভরণ ও পট্টবস্ত্র পরানো

---

(৩): ১. শ্রীনিবাস জন্মের পূর্বে তাঁর পিতামাতা পুত্রলাভের কামনা নিয়ে জগন্নাথ মন্দিরে যান। ভাবাবিষ্ট চৈতন্যের মুখে শুনি: 'পুত্রের কামনা করি আইলা ব্রাহ্মণ'। জগন্নাথ স্বপ্নে বলেন: 'জন্মিবে তোমার এক পুত্র প্রেমময়'। ভ. ৪৫-৪৮, ৩৮৬। ২. ভ. ৪৮, ৩. দুর্গার যন্ত্রধৌত জল পান করা মাত্রে গোবিন্দ কবিরাজ ভূমিষ্ঠ হন (ভ. ৩৮৬)। ৪. নবজাত নিত্যানন্দকে পার্বতী শংকর চরণে (ভ. ৪৪৫), শ্রীনিবাসকে (ভ. ৪৯) ও নরোত্তমকে (ন. ৪০) গৌরচরণে সমর্পণ করা হয়। ৫ ভ. ৪৯, ন. ৪৪, ৬. ভ. ৪৪৬, ন. ৪৪ বিত্তশালীরা অর্থ পর্যন্ত দিতেন। ৭. ন. ৪৭, ৮. ভ. ১৯২, ৯. ভ. ৫২৩, ন. ৪৪, ১০. গৌ. ৬২-৬৪ ১১. ভ. ৪৯১, ১২. ভ. ৪৯১, ১৩. ভ ৪৪৬ (নিত্যানন্দের দুটি নাম রাখা হয়—রাম ও নিত্যানন্দ)।

হতো। পিতা বা মাতার কোলে শিশু থাকতো।[১৪] কুলবধূগণ নানা মঙ্গলক্রিয়া করতেন। বিষ্ণুর প্রসাদী অন্ন শিশুর মুখে দেওয়া হতো।[১৫] অন্যসময় শিশুর হাতে 'মিষ্ট অন্ন কণিকা' দেওয়া হতো।[১৬] মাতা সন্তানকে শুইয়ে তার দুচোখে কাজল দিতেন, কখনো বা বিভিন্ন নারীর মাঝে বসে স্তন দিতেন।[১৭]

তারপর প্রত্যহ মাতা বাঁটা হলুদ ও সুগন্ধি তেল সন্তানের গায়ে মাখাতেন, স্নান করিয়ে ধীরে ধীরে গামছায় গা মুছিয়ে দিতেন। মাঝে মধ্যে আত্মীয় বন্ধুরা শিশুকে দেখতে আসতেন, আশীর্বাদ করে যেতেন। মা শিশুকে ঠাকুর দেবতার নামগুণ ও সংকীর্তন শিক্ষা দিতেন,[১৮] হাঁটতে শেখাতেন।[১৯]

শুভদিনে চূড়াকরণ হতো। নাপিত ক্ষৌরকর্ম করতো। 'দিব্যবস্ত্র' পরিয়ে সন্তানকে 'দিব্যাসনে' বসানো হতো। কর্ণমূলে 'পীতসূত্র' দিয়ে আশীর্বাদ করা হতো। ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করতেন, নারীরা মঙ্গলগীত গাইতেন ও উলু দিতেন, বাদক বাজনা বাজাতো। কখনো বা নর্তক নৃত্য করতো।[২০] শুভদিনে কর্ণভেদ হতো।[২১]

আরেক শুভদিনে যজ্ঞসূত্রধারণ সাড়ম্বরে পালিত হতো। সন্তানের মস্তক মুণ্ডিত হতো, তাকে রক্তাম্বর পরানো হতো। তার হাতে দণ্ড, কাঁধে ঝুলি থাকতো। তাকে ভিক্ষা করার অভিনয় করতে হতো। ব্রাহ্মণ বেদধ্বনি করতেন, ভাট মঙ্গলগান গাইত, নৃত্যগীতবাদ্যে গৃহ প্রাঙ্গণ মুখরিত থাকতো।[২২]

ধনীগৃহের সন্তানকে অধিক বয়স পর্যন্ত দেখা শোনার জন্যে লোক নিযুক্ত হতো।[২৩]

বিবাহে পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষই উপযুক্ত পাত্রী বা পাত্রের অনুসন্ধান করতেন।[২৪] কখনো কখনো পুরুষেরা নিজেই নিজের পছন্দমতো পাত্রীকে ভালোবেসে বিবাহ করতেন।[২৫] বিবাহে 'জলসাধা' বা 'জলসাই' বা 'পানি-সাই' অনুষ্ঠান মেয়েদের মধ্যে বিশেষ আকর্ষণের ও আনন্দের বিষয় ছিল।[২৬] এই অনুষ্ঠান বিবাহের পূর্বে বরঘরে উদ্‌যাপিত হতো। নানা বস্ত্রালংকারে সুসজ্জিতা যুবতীরা বরের মায়ের নিকট অনুমতি গ্রহণ করে হাতে শুভ দ্রব্য, পদ্মফুল, পট্টবস্ত্র ও মাথায় ডালাভর্তি জিনিস পত্র নিয়ে ধীর মন্থর গতিতে

---

১৪. ভ. ৪৯১, ১৫. ন. ৪৪, ১৬. ভ. ৪৯১,
১৭. ভ. ৪৯১, ১৮. ভ. ৪৯, ১৯. ভ. ৪৯২, ২০. ভ. ৪৯৯, ২১. ভ. ৫০০,
২২. ভ. ৫০০, ২৩. ন. ৪৮, ২৪. ন. ৪৫, ২৫. ভ. ৫০১, ২৬. ভ. ৫০৪।

নানা ভঙ্গীতে জলাশয়ে উপস্থিত হতো। পথে ও ঘাটে তারা তেল হলুদ বিলিয়ে দিত, উলু সহকারে স্ত্রী-আচার সম্পাদন করতো।

বিবাহ বাড়ীতে বড় চন্দ্রাতপ টাঙানো হতো, কলাগাছ পোঁতা হতো, জলপূর্ণ ঘট রাখা হতো, নানা জনকে নিমন্ত্রন করা হতো।[২৭]

বাড়ীর কর্ত্রী বা মাতা ষষ্ঠীদেবী ও গঙ্গাদি দেবতার পুষ্পচন্দনে পূজা দিতেন।[২৮]

কুলবধূরা ও কুমারীরা বরের চুলে তেল মাখাতো, গায়ে হলুদ ও গন্ধদ্রব্য দিতো। বরকে গঙ্গাজলে অভিষেক করা হতো বা স্নানের পর দেহে মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেওয়া হতো।[২৯] হলুদ-সুতায় ধান দূর্বা বেঁধে বরের হাতে তা পরানো হতো। তার ডান হাতে দর্পণ থাকতো। কপালে অর্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দনতিলক বা ফোঁটা আঁকা হতো, মাথায় মুকুট পরানো হতো।[৩০] বরের চোখে কাজল ও চিবুকে কুমকুম দেওয়া হতো।[৩১]

এদিকে কন্যার পিতার ঘরে ব্রাহ্মণেরা 'চারুমণ্ডলী বন্ধানে' বসতেন। নানা মঙ্গলক্রিয়া সেরে বধূবেশী সুসজ্জিতা কন্যাকে সিংহাসন, অভাবে বড় পিঁড়িতে বসিয়ে ব্রাহ্মণেরা তাকে গন্ধ দ্রব্য ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করতেন। নারীগণ উলুধ্বনি দিতেন। অন্যান্য বিপ্রেরা বেদ পাঠ করতেন। নানা বাদ্য বাজতো। ভাটেরা বন্দনা গাইতো।[৩২]

বিয়ের প্রাক্‌কালে বরকে ছোড়লায় বা ছাদনাতলায় পিঁড়ির উপর দাঁড় করিয়ে কন্যার মা এয়োগণের সঙ্গে উত্থান-ক্রিয়া ('উরুথি') করতেন। একটি পাত্রে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে সাত বার বরের মস্তকের কাছে ঘুরানো হতো।[৩৩] অন্যান্যেরাও তার মাথায় ধান দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করতেন। কুলবধূরা চোখে কাজল, কপালে সিঁদুর ও চন্দন দিয়ে, কানে চাঁপা ও গলায় হার পরে, পাটের শাড়ী জড়িয়ে গজেন্দ্রগমনে বিবাহ বাসরে এসে বসতেন।[৩৪] সুসজ্জিতা কন্যাকে পিঁড়িতে বসিয়ে ছোড়লায় আনা হতো। বেদপাঠ, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, আগন্তুককে গন্ধদ্রব্য দান ইত্যাদি চলিত ছিল। এমনকি ঘণ্টাও বাজানো হতো।[৩৪ক]

৫০৮, ৫১০, ২৭. ভ. ৫০৮, ২৮. ভ. ৫১০, ২৯. ভ. ৫০৪, ৩০. ভ. ৫১৩, ৩১. ভ. ৫০৬, ৩২. ভ. ৫১০, ৩৩. ভ. ৫০৪-৫০৫, ৩৪. ভ. ৫১৪, ৩৪ক. ভ. ৫১৪।

বিবাহে কন্যাই প্রথম বরের গলায় মালা দিতো, পরে বর আপনার মালাটি কন্যার গলায় পরাতো। কন্যাদানের পর কন্যাকে বরের বামে বসিয়ে হোম করা হতো। কন্যার পিতা জামাতাকে ধেনু, ধন, শয্যা, দাসদাসী যৌতুক দিতেন। বিবাহ শেষে কুলনারীরা বর-বধূকে বাসর ঘরে নিয়ে যেতেন। সেখানে বরকে পান সেজে দেওয়া হতো। বরের সঙ্গে রসিকতা ও কৌতুক করা হতো, কেউ গায়ে এসে পড়তেন, কেউ বা ঘোমটার আড়ালে হাসতেন।[৩৫] কনেকে জোর করে বরের কোলে বসিয়ে দেওয়া হতো, বরকে পান দিয়ে তা কনেকে দিতে বলা হতো।[৩৬]

বিবাহের পরদিন বর 'কুশণ্ডিকা' কর্ম সম্পাদন করতো। বিদায়কালে মাতা কন্যা ও বরের মাথায় ধানদূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করতেন, নারীরা উলু দিতেন, বাজনা বাজতো, বেদপাঠও হতো। বর বধূকে চৌদলে (চতুর্দলা) চড়িয়ে বিদায় দেওয়ার রীতি ছিল।[৩৭]

এদিকে বর-বধূ উপস্থিত হলে বরের মা কুলনারীদের সঙ্গে তাদের ধানদূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে ঘরে তুলতেন। ভাট, নট ও বাদ্যের ব্যবস্থা থাকতো। মাতা উপস্থিত সকলের হাতে ধরে পুত্রের মঙ্গল প্রার্থনা করতেন। সকলকে আশীর্বাদ করতে অনুরোধ জানাতেন। উপস্থিতেরা 'ধনসম্পদ বাড়ুক', 'পতি-সহ বধূ চিরজীবী হোক' ইত্যাদি বলে আশীর্বাদ করতেন।[৩৮] এইদিন বস্ত্র, ভূষণ ও ধনদানেরও চল ছিল।[৩৯]

বহু বিবাহ বা একাধিক বিবাহ প্রথা তখন চলিত ছিল।[৪০]

নরহরির 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে যুবতী মেয়েদের গঙ্গা, গৌরী, সূর্য ও বুড়া শিব পূজার কথা আছে।[৪১] এই সব পূজা মনোমত বর লাভের জন্য। কবির উল্লিখিত 'চন্দ্রব্রত' মেয়েলী ব্রতানুষ্ঠান।[৪২] 'লক্ষ্মীর কথা' অর্থাৎ 'পাঁচালী' শেখা ও শোনা তখনকার দিনের মেয়েদের লৌকিক আচার বলেই গণ্য হতো।[৪৩] বটবৃক্ষতলে সন্তানের কল্যাণে মায়েরা বিচিত্র অর্ঘ্যে ষষ্ঠীর পূজা দিতেন।[৪৪]

স্বর্গত পিতা মাতার উদ্দেশ্যে শেষ পারলৌকিক কার্য—গয়াকার্য। 'ভক্তি-

---

৩৫. ভ. ৫১৭, ৩৬. ভ. ৫০৬, ৩৭. ভ. ৫১৭, ৩৮. ভ. ৫০৭,
৩৯. ভ. ৫১৮, ৪০. নিত্যানন্দ, শ্রীনিবাসের দুটি করে বিবাহ হয়। ৪১. গৌ. ১০৪-১০৫,
৪২. গৌ. ১০০, ৪৩. গৌ. ১০৩, ৪৪. ভ. ৪৯৬।

রত্নাকরে' গৌরাঙ্গ-প্রসঙ্গে তার উল্লেখ আছে।[৪৫] গয়াকার্য শেষে বাড়ী ফিরে এলে 'বিবিধ মঙ্গল কর্ম' অনুষ্ঠিত হতো। গয়াকার্য আত্মীয় স্বজনের পক্ষে আনন্দের বিষয় ছিল। প্রতিবেশীরা গয়া প্রত্যাগত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে আসতো, তার মুখে গয়াকার্য শুনতো॥[৪৬]

(৪) বেশভূষা

সেকালের মানুষের, বিশেষতঃ মেয়েদের বেশভূষার বিস্তৃত পরিচয় নরহরির গ্রন্থে পাওয়া যায়। সাজতে ও কেশ সংস্কার করতে বাঙালী মেয়েরা চিরদিনই উৎসুক। এমন কি সেকালে এক উপজীবিকা-সম্পন্ন নারীরই সন্ধান পাওয়া যায়, যারা রাজান্তঃপুরের মহিলাদের সাজগোজ নিপুণহস্তে সম্পাদন করতো।[১]

মেয়েরা লম্বা চুল নানা ছাঁদে বাঁধতো।[২] কখনো লম্বা বেণী তৈরী হতো।[৩] চুলে গন্ধতেল মাখতো। চুলে 'কবরীবন্ধনে'রও উল্লেখ আছে।[৪] কখনো 'কানড়' ইত্যাদি ছাঁদ প্রস্তুত হতো।[৫] চুলে কিংবা বেণীতে ফুল গোঁজা থাকতো।[৬] কেউ বা ফুলের মালাও জড়িয়ে দিত।[৭] সখীরা চুল বেঁধে দিত অথবা নিজেরাও বাঁধতো। চুল কুঞ্চিত করারও রীতি ছিল।[৮]

কপালে সিঁদুর বা কুঙ্কুম বা চন্দনের ফোঁটা দিত।[৯] বিবাহিত মেয়েরা সিঁথিতে সিঁদুর পরতো।[১০]

ঘন কাজলে চোখ দুটি উজ্জ্বল করা হতো।[১১] চিবুকে কস্তুরি মৃগমদ বা কুঙ্কুম চুয়া চন্দন লাগাতো।[১২] কখনো 'তাম্বুলরাগে' অধর রাঙিয়ে নেওয়া হতো।[১৩] কানে থাকতো কুণ্ডল বা মকর কুণ্ডল,[১৪] মণিতাড়ঙ্ক বা তাড়ঙ্ক[১৫] এবং চাঁপা। কানে ফুল দেওয়ারও রেওয়াজ ছিল।[১৬]

---

৪৫. ভ. ৫১৮, ৪৬. ভ. ৫১৮-৫১৯।

(৪): ১. ভ. ১৫৯-১৬০ ('নাগরবর বরজশশী' পদ)। ২. গীতচন্দ্রোদয় পূর্বরাগ-সংক্ষেপে গী.পু. পৃঃ ৯|১১|৯৪, গৌ. ১০০, ৩. গী.পু. ১১, ৪. গী.পু. ১১০, ৫. গৌ. ১০১, ৬. গী.পু. ২৪|৫৮, গৌ. ১০১|১৩৭, ৭. ন. ৪০|৪৭, ৮. গী.পু. ১৩৮, ৯. ভ. ৭, ন. ৪০, গৌ. ১০১, ১০. গৌ, ১৮০|১৯২, গী.পু. ১১|৯০, ১১. গৌ. ১৩৭|১৮০, গী.পু. ৯|৪|৯০, ১২. ভ. ৪৫১, গৌ. ১০১|১৩৭, গী. পু. ১৪|১৩৮, ১৩. গী.পু. ১৪|৬২, ১৪. গী.পু. ৫|৯, ন. ৪৭, ১৫. গী.পু. ১২|১৩০, ১৬. গৌ. ১১২|১৮০।

নাসায় মুক্তা বা বেসর দুলতো।[১৭] গলায় ধাতুজ হার, 'দোথার মুক্তার মালা', মণিময় মালা[১৮] বা ফুলমালা পরতো। মালতীমালার প্রচলন বেশী ছিল। বনমালাও প্রস্তুত হতো।[১৯]

চন্দন কর্পূর মৃগমদে মুখমণ্ডল পরিমার্জিত হতো।[২০] পাতলা কাঁচুলি বা অসিত কাঁচুলি ব্যবহারের রীতি ছিল।[২১] হাতে কঙ্কন, বলয়া;[২২] কটিতে কিংকিনী, কখনো হার;[২৩] পায়ে নূপুর বা মণি নূপুর পরা হতো।[২৪]

হাতের আঙ্গুলে থাকতো অঙ্গুরী।[২৫] মেয়েরা স্নানের সময় দেহ পরিমার্জনা করতো।[২৬] আয়নায় মুখ দেখতো।[২৭] চুল বাঁধার সময়ও আয়নার ব্যবহার হতো।[২৮] পট্ট ও সাধারণ বস্ত্র ছিল। নীল জলদরুচি পরিবাসের উপর মেয়েদের বিশেষ অনুরক্তি ছিল।[২৯] পট্টবস্ত্রের বিশেষ মর্যাদা ছিল।[৩০] বিবাহিত মেয়েরা মাথায় ঘোমটা দিত।[৩১] মেয়েদের ওড়নী বা ওড়নারও ব্যবহার ছিল।[৩২]

পুরুষদের পোষাক পরিচ্ছদের বিশেষ উল্লেখ নেই। তবে বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত বেশভূষার পরিচয় পাই। পুরুষেরা চাঁচর চুল রাখতো এবং চুলে ফুল বা ফুলমালা দিতে সংকোচ বোধ করতো না।[৩৩] কেউ বা বেণীও প্রস্তুত করতো।[৩৪] কারো কারো মাথায় উষ্ণীষ থাকতো,[৩৫] হাতে থাকতো ছড়ি।[৩৬] কপালে চন্দন, চন্দনের টিকা বা তিলক ধারণ করা হতো।[৩৭] কোনো কোনো পুরুষ অলংকারও ব্যবহার করতো।[৩৮] তন্মধ্যে কানে কুণ্ডল, গলায় হার।[৩৯] সাধারণতঃ বৈষ্ণব পুরুষেরা কণ্ঠে তুলসীমালা, পরণে পট্টবস্ত্র বা ত্রিকচ্ছবসন পরতেন।[৪০] ডোর কৌপিনের ব্যবহার ছিল। বুকে হাতে চন্দন দিয়ে ইষ্টনাম লেখা হতো।[৪১] কেউ বা মালতীর মালাও পরতেন।[৪২]

---

১৭. ভ. ২৮৮, গৌ. ১০১-১০২, গী.পু. ৯০, ১৮. গী.পু. ১২।১১১, গৌ. ৯৩,
১৯. গী.পু. ৩০।৯০ ভ. ৭।২৮৮, ২০. গৌ. ১০১।১৩৭, গী.পু. ১৩৮।২১৪,
২১. গী.পু. ২০১।৩৬০, ভ. ২৮৮, গৌ. ১৯২, ২২. ভ. ২৮৮, গৌ. ১০১, গী.পু. ৯১,
২৩. গৌ. ১০১, ভ. ২৯০, গী.পু. ১৩৮, ২৪. ভ. ২৮৮, গৌ. ১৮৬, গী.পু. ৫।১২৪,
২৫. ভ. ৫০৪, ২৬. গী.পু. ৩৬১. ২৭. গৌ. ১৩৭, ২৮. গী.পু. ৯৪,
২৯. গী.পু. ১২।৯১, ৩০. গী.পু. ১৪, ন. ৯৩, ৩১. ভ. ৫১৭, গৌ. ৯৩,
৩২. গী.পু. ২৫৯, ৩৩. ন. ৪০।৪৭, ৩৪. ভ. ৭।২৯০, ৩৫-৩৬. ভ. ৩২৬,
৩৭. ভ. ৭।৪৬, ন. ৪০, ৩৮. ভ. ৭, ন. ৪০, ৩৯. ভ. ৪৭,
৪০. ভ. ৪৬।৬৬, ন. ৮৩, ৪১. ভ. ৩৯৮, ৪২. ভ. ৭।

ধনীঘরের পুরুষেরাও চন্দন মাখতো, সুগন্ধি তেল মেখে স্নান করে পাতলা কাপড় পরতো ॥[৪৩]

(৫) গৃহস্থালী

নরহরির গ্রন্থে বিভিন্ন গৃহস্থালীর উল্লেখ আছে। 'ভক্তিরত্নাকরে' নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলির নাম পাই—চুল্লী, শিকা, ভাণ্ড (গায়ে নানা রকমের চিত্র সম্বলিত) ডালা, পিঁড়ি, গাড়ু, ছত্র, চামর, পাখা, দণ্ড, কমণ্ডলু, লগুড়, চন্দ্রাতপ, ধান রাখার গোলা, হল, মুষল, ঠেঙ্গা।[১]

'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে নতুন দ্রব্যের সন্ধান আছে—চসক (পানপাত্র), পালঙ্ক, বিছানা (তল্প), বালিশ, চতুষ্কী (মশারি, চৌকি), কলসী (কুম্ভের সঙ্গে এর পার্থক্য আছে), কম্বল, শর, তুণ, পিঞ্জর (স্বর্ণ ও লৌহ নির্মিত), পাত্র (জল রাখার, দুধ রাখার)।[২]

'নরোত্তমবিলাসে' অন্যান্য নতুন গৃহস্থালীর নাম আছে—পানবাটা, থাল (বিশেষ গড়নের থালা), বাটি, ঝারী (গাড়ু বা জলপাত্রবিশেষ), গামছা (পানিতোলা)।[৩]

সেকালেও গৃহস্থেরা নিজ নিজ গৃহ ও প্রাঙ্গণগুলি পরিপাটি করে সাজাতে চেষ্টা করতেন। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই খিড়কী বা আঙ্গিনা এবং জানালার ব্যবহার ছিল। অনেকেই গৃহের পাশে তরুলতা দিয়ে উদ্যান প্রস্তুত করতেন ॥

(৬) খাদ্যবস্তু

সেকালেও বাঙালীর প্রধান খাদ্য ছিল ভাত। নরহরি অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের নাম করেছেন, যথা—'ভক্তিরত্নাকরে' রুটি, পানা (আখের রস), শাক, নাড়ু, নানা ধরণের মিঠাই, গমের পূপা (পিঠা বা রুটি), দুধ, দুধের বিকার (দুধ দিয়ে তৈরী বিশেষ ধরণের খাদ্য), ক্ষীর, ননী, সর, দধি, ছানা, ঘৃত,

৪৩. গৌ. ১৬১।

(৫): ১. ভ. ১২শ তরঙ্গ, ২. গৌ. ৪।২৮।২৯।৭১।৯৯।২৭।৯৭ পৃঃ, ৩. ন. ৮২।১০৬।৮১।

তাম্বুল, ঘি-ভাত, দুধ-লাউ, বিভিন্ন তরকারী।[১] 'নরোত্তমবিলাসে' পাই —শাক-সূপ, পুরি, আমের আচার, চিনি পানা, শিখরিনী (ঘি-দই-গুড় আটা দিয়ে তৈরী)।[২]

ফলের মধ্যে আছে নারিকেল, আম, ডালিম, পনস, কদলী।[৩]

সেকালে ফলের সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য হিসেবে কিছু কিছু মূলও গ্রহণ করা হতো। গ্রন্থকার এই সব মূলের নামোল্লেখ করেন নি। অনেকেই ছাগ-মেষ-মহিষের মাংস খেতো। কিন্তু মাছের ব্যবহার সম্পর্কে নরহরি কিছুই জানান নি। মদ্যপান এবং মদের সঙ্গে মাংসের চল ছিল। অনেক ব্রাহ্মণসন্তানও মদ খেতো।[৪]

সাধারণতঃ কলাপাতা, পদ্মপাতা বা পলাশ পাতায় অন্নব্যঞ্জনাদি পরিবেশিত হতো। জলপাত্র রাখা হতো তারই পাশে।[৫] গৃহস্থ বাড়ীর কুলবধূরাই রান্না করতেন। উৎসব বা কোনোও অনুষ্ঠানে বাইরে থেকে 'রসুয়া' বা 'পাককর্তা' আনা হতো॥[৬]

(৭) ধর্ম, পূজাচার, ধর্মোৎসব

নরহরির গ্রন্থে বৈষ্ণব ধর্মের বিধিবিধানের কথা পাই। প্রাচীন পুরাণোক্ত বিভিন্ন দেবদেবীর নাম তিনি উল্লেখ করেছেন। তবে সব কটির পূজাই যে সেকালে সর্বত্র চলিত ছিল, এমন মনে করার কারণ নেই। এই সব দেব দেবীরা হলেন—পুরুষদেবতা : চতুর্মুখ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর (শংকর, মহেশ, কৈলাস-নাথ, ফণীপতি), বিশ্বকর্মা, গণেশ, মন্মথ (অনঙ্গ), ইন্দ্র, ব্যাস, নারায়ণ, বুড়াশিব, ধর্ম, সূর্য, সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য।[১] স্ত্রীদেবতা—শক্তি (ভগবতী, ভবাণী, পার্বতী, গৌরী), চণ্ডী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গঙ্গা, শচী ও সর্বোপরি 'শ্রীরাধিকা'।[২] শ্রীরাধা কৃষ্ণ ছাড়া বুড়াশিব, সূর্য, ব্যাস, বিষ্ণু, লক্ষ্মী-নারায়ণ, গৌরী ও গঙ্গা পূজার যে প্রচলন ছিল, তার ইঙ্গিত আছে। অপৌরাণিক উগ্রচণ্ডাদেবীর

---

(৬) : ১. ভ. ৬০।৩০৩।৩৯৮।৫৮১।৫৭০।৫৯৩, ২. ন. ৮৯।১১০।১১১।১১২, ৩. ভ. ৪৯৬, ন. ১১১-১১৪, গী.পু. ৫, ৪. ভ. ৪৫২, ৫. ভ. ৫৮১, ৬. গৌ. ১১২, ন. ৯৭।১১২।

(৭) : ১. ভ. ৪৫৫।৫৪০, গৌ. ৩০। ভ. ৫১২।৫৪৮।৬১৩।৪৪৪।৪৮১ পৃঃ।
২. ভ. ৩৮৫, গৌ. ৫৮, ন. ১০২, ভ. ৪৬৬, গৌ. ৫৮, ভ. ৪৮১, গৌ. ১০৫, ভ. ৫১।

পূজার কথাও পাওয়া যায়।[৩] বারব্রতের মধ্যে চন্দ্রব্রত, লক্ষ্মীব্রতের উল্লেখ পাই।[৪] লক্ষ্মীপূজা বা লক্ষ্মীব্রত পালনের সময় লক্ষ্মী-পাঁচালী শোনার রীতি ছিল। গৃহস্থ বধূরা বটষষ্ঠী ও গঙ্গার পূজা করতেন।[৫] কুমারীদের প্রধান পূজা ছিল সূর্য ও গৌরীর।

বৈষ্ণব ছাড়া শক্তি ও রাম মন্ত্রের উপাসকদের প্রসঙ্গও পাওয়া যায়।[৬] এ ছাড়া নারদ, গন্ধর্বকিন্নর, দেবসভাসদ ইত্যাদি সম্পর্কেও সেকালের মানুষ ওয়াকিবহাল ছিল।[৭]

কিন্তু নরহরির গ্রন্থে বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণব শ্রীপাট, আচারপদ্ধতি, বিধিবিধান, উৎসব অনুষ্ঠান, বিগ্রহসেবা, পূজাপদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কেই বিস্তৃত পরিচয় মেলে। তাঁর 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাস' থেকে তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজ ও ধর্মাচারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে। বিষয়টিকে সূত্রাকারে প্রকাশ করা যায়—(অ) বৈষ্ণব-শ্রীপাট স্থাপন, (আ) ধর্মপ্রচারক গোষ্ঠী সৃষ্টি ও রাজানুকূল্য লাভ, (ই) মূর্তি, বিগ্রহ ও শিলা সেবা, (ঈ) তীর্থদর্শন ও গোস্বামী গ্রন্থের পঠন পাঠন, (উ) বৈষ্ণব মহোৎসব উদ্‌যাপন, (ঊ) নৃত্যগীতবাদ্য যোগে আ-দ্বিজ চণ্ডালের হরিনাম সংকীর্তন (ঋ) গুরুবাদ সৃষ্টি ও তার প্রতিষ্ঠা, (৯) বৈষ্ণবধর্ম ও পাষণ্ডীবৃন্দ, (এ) সাধারণ মানুষ।

(অ) বৈষ্ণব শ্রীপাট বা ধর্মপ্রচারকেন্দ্র

নরহরির গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, সেকালে বাংলাদেশের সর্বত্র বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচারের জন্যে কতকগুলি পীঠস্থান বা কেন্দ্রস্থল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এক এক জন ধর্মপ্রবক্তা বা উঁচুস্তরের ভক্তের বাসস্থানকে অবলম্বন করে এই পীঠ স্থানের সৃষ্টি। এগুলি হলো

১। খেতুরী —(রাজা সন্তোষ দত্তের সাহায্যে) মহান্ত—নরোত্তম ঠাকুর।

২। শ্রীখণ্ড—নরহরি সরকার, রঘুনন্দন, ঠাকুর কানাই।

৩। বিষ্ণুপুর—(রাজা বীরহাম্বীরের সাহায্যে)—শ্রীনিবাসাচার্য।

৩. গৌ. ১০৬, ৪. গৌ. ১০০, ১০৬, ৫. ভ. ৫৩৮।

৬. ভ. (৩৮৫ পৃঃ) গোবিন্দ কবিরাজের মাতামহ শক্তির এবং (৩৯১ পৃঃ) শিখরভূমির রাজা হরিনারায়ণ রাম-উপাসক ছিলেন।

৭. গৌ. ১৫।১৪৪।২০।

৪। উৎকল—(উৎকলরাজ পুরুষোত্তম জানার সাহায্যে) শ্যামানন্দ, রসিক মুরারি।

৫। খড়দহ—জাহ্নবাদেবী, বীরভদ্র।

৬। যাজিগ্রাম—শ্রীনিবাসাচার্য।

৭। কালনা—হৃদয়চৈতন্য।

৮। কাটোয়া—যদুনন্দন চক্রবর্তী।

৯। কাঞ্চনগড়িয়া—গোকুলানন্দ দাস, শ্রীদাস।

১০। বোরাকুলি—গোবিন্দ চক্রবর্তী।

১১। খানাকুল—অভিরাম গোস্বামী, মালিনীদেবী।

১২। নবদ্বীপ—বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, বংশীবদন, মুরারি, শ্রীবাস পণ্ডিত, দামোদর, ব্রহ্মচারী, শুক্লাম্বর, দাস গদাধর।

১৩। শান্তিপুর—অচ্যুতানন্দ, গোপাল।

এ ছাড়া কুমার-নগর, মৌড়েশ্বর, একচক্রা, আকাইহাট, অগ্রদ্বীপ, রামকেলি প্রভৃতি স্থানেও অসংখ্য বৈষ্ণবভক্ত বসবাস করতেন। এঁরা ধর্মপ্রচারে সবিশেষ সহায়তা করেছিলেন।

কিন্তু এই সব পীঠস্থানগুলির প্রাণকেন্দ্র ছিল শ্রীধাম বৃন্দাবন। প্রেরণার অপর একটি স্থান ছিল নীলাচল। তখন বৃন্দাবনে অধিকাংশ বৈষ্ণব পণ্ডিত ও ভক্তেরা বসবাস করতেন। শ্রীসনাতন ও রূপ গোস্বামীর মৃত্যুর পর শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, ভূগর্ভ, লোকনাথ, রঘুনাথ দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রাঘব পণ্ডিত প্রমুখ জীবিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে মধ্যমণি ছিলেন শ্রীজীব গোস্বামী।

তখন নীলাচলে ছিলেন গোপীনাথ আচার্য, কানাই খুঁটিয়া, শিখি মাইতি, মামু গোস্বামী ও গোপালগুরু প্রমুখ বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দ।

নীলাচল বৃন্দাবনের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার পীঠস্থানগুলির গভীরতর যোগাযোগ ছিল। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের নির্দেশেই এগুলি পরিচালিত হতো। দ্বিতীয়তঃ, একটি পীঠস্থানের সঙ্গে আরেকটির সর্বদা যোগাযোগ ছিল। সমাচার-পত্রী, বাহক বা ভক্তদের সাহায্যে এই যোগাযোগ সাধিত হতো। মহান্তেরা বিভিন্ন পীঠস্থানে গমনাগমন করতেন। বলা বাহুল্য যে, এই কেন্দ্রগুলি থেকেই বৈষ্ণব মতাদর্শ ও চৈতন্যতত্ত্ব সমাজে দ্রুতবেগে বিস্তার লাভ

করেছিল। কেন্দ্রগুলি যে সমকালেই প্রভাব বিস্তার করেছিল তা নয়, পরবর্তী বহুদিন পর্যন্ত এগুলির প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল।

(আ) ধর্ম প্রচারক গোষ্ঠী সৃষ্টি ও রাজানুকূল্য

বৃন্দাবনে যেমন শ্রীজীব গোস্বামী 'মহামণ্ডলেশ্বর' রূপে বিরাজ করতেন, তেমনি এক একটি কেন্দ্রে এক এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ, জাহ্নবাদেবী, রঘুনন্দন নিজ নিজ কেন্দ্রে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এক এক নেতাকে ঘিরে অসংখ্য ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন। কোনো কোনো কেন্দ্রে ভূস্বামীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য ছিল। এই রাজাদের মধ্যে দু তিন জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খেতুরীর রাজা সন্তোষ দত্ত, বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর এবং উৎকলপতি প্রতাপরুদ্রের পুত্র পুরুষোত্তম জানা বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে বিশেষভাবে সহায়তা করেন। খেতুরী মহামহোৎসবের সমস্ত ব্যয়ভার, বৈষ্ণবদের বসবাস আহারাদির ব্যবস্থা, উৎসব প্রাঙ্গনের বন্দোবস্ত, ভক্তগণের আগমন ও প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা সন্তোষ দত্তের তত্ত্বাবধানেই সম্পাদিত হয়। গ্রন্থকার সন্তোষ দত্তের এই সাহায্য অকুণ্ঠচিত্তে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বীরহাম্বীরের সর্ববিধ সাহায্যের কথা নরহরি উল্লেখ করেন নি। তবে তিনি যে গুরু শ্রীনিবাসের ধর্মপ্রচার ও তাঁর বিবাহ প্রভৃতি ব্যক্তিগত কাজে প্রচুর অর্থ সাহায্য করতেন তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। জাহ্নবাদেবীর বৃন্দাবনে শ্রীরাধাবিগ্রহ প্রেরণের সময় হাম্বীর রামচন্দ্র কবিরাজের হাতে 'সহস্রেক মুদ্রা' দিয়েছিলেন।[৮] পুরুষোত্তম জানা সম্পর্কে নরহরি লিখেছেন যে, তিনি নিজে দুটি বিগ্রহ নির্মাণ করিয়ে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেছিলেন। বৈষ্ণব মহাসম্মিলনগুলিতে যে এই সব রাজাদের অকৃপণ দান ও সাহায্য ছিল, তা গ্রন্থগুলি পাঠ করলেই বোঝা যায়। রাজানুকূল্য পেয়েই বৈষ্ণবধর্ম গৌড়বঙ্গ উৎকলে অধিকতর প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শিখরভূমির রাজা হরিনারায়ণ (যিনি শ্রীনিবাসের সাহায্যে পঞ্চকূটের ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্রের নিকট রামমন্ত্রে দীক্ষিত হন অথচ শ্রীনিবাসের সঙ্গ ছাড়া হতেন না)। বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে তাঁরও যথেষ্ট দান ছিল। নরহরি তাঁর সুমধুর চরিত্রের প্রশংসা করেছেন।[৯]

প্রত্যেক মহান্তের এক একটি ভক্তগোষ্ঠী ছিল। শ্রীনিবাস, নরোত্তম,

---

৮. ভ. ৬১৮, ৯. ভ. ৩৯১।

শ্যামানন্দ, অচ্যুতানন্দ, জাহ্নবা, বীরভদ্র প্রমুখের ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলীর বিস্তৃত তালিকা নরহরি প্রদান করেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই পণ্ডিত, উল্লেখ্য ভক্ত, কবি ও উচ্চশ্রেণীর সাধক ছিলেন।[১০] এঁরাও ধর্মপ্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতেন বা মহান্তদের সাহায্য করতেন।

(ই) মূর্তি, বিগ্রহ ও শিলা সেবা

'ভক্তিরত্নাকর' পাঠে জানা যায় যে, সেকালে বৈষ্ণব সমাজে গৌর, গৌর নিতাই এবং গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া মূর্তির পূজা প্রচলিত ছিল। মুরারি গুপ্ত জানিয়েছিলেন যে, বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীই সর্বপ্রথম গৌরাঙ্গমূর্তি নির্মাণ করিয়ে পূজা করতেন।[১১] নরহরি সেকথা উল্লেখ করেন নি। তাঁর গ্রন্থে নিম্নোক্ত ৫টি মূর্তির পূজার কথা পাই

(ক) গৌর-নিতাই মূর্তি : গৌরাঙ্গ নির্দেশে গৌরীদাস পণ্ডিতের পূজা।[১২]

(খ) গৌরাঙ্গ মূর্তি : গৌরাঙ্গ প্রদত্ত 'নিজ স্বরূপবিগ্রহ', কাশীশ্বর পণ্ডিত বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দবিগ্রহের দক্ষিণে স্থাপন করেন। নাম 'শ্রীগৌরগোবিন্দ'।[১৩]

(গ) গৌরাঙ্গ মূর্তি : নরহরি সরকার শ্রীখণ্ডে স্থাপন করেন। রঘুনন্দন নরোত্তমকে তা প্রদর্শন করান ও নরোত্তম মূর্তি দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হয়ে প্রণাম করেন।[১৪]

(ঘ) গৌরাঙ্গ মূর্তি : দাস গদাধর কর্তৃক কাটোয়াতে স্থাপিত। বৃন্দাবন থেকে ফিরে নরোত্তম কাটোয়ায় এসে তা দর্শন করেন।[১৫]

(ঙ) গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া মূর্তি : এই যুগলবিগ্রহ নরোত্তমঠাকুর স্বয়ং খেতুরী মহোৎসবে স্থাপন করেন।[১৫ক]

---

১০. ভ. ৪১৮,

১১. শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতম্ (মুরারি গুপ্তের কড়চা) স. মৃণালকান্তি ঘোষ (৩য় সং) ৪র্থ প্রক্রম, ১৪শ সর্গ, ১২-১৪ নং শ্লোক।

১২. ভ. ৩৫২, ১৩. ভ. ৫৯, ১৪. ভ. ৩৭৬, ১৫. ভ. ৩৭৭,

১৫ক. ভ. ৪২১-৪২৩।

প্রাচীন দেব-বিগ্রহের পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে নতুন নতুন দেব-।বগ্রহ নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা তখনকার বৈষ্ণবাচার্যেরা করে গেছেন। খেতুরী মহাসম্মিলনে সর্বসম্মতিক্রমে ৬টি বিগ্রহ স্থাপন কবেন শ্রীনিবাসাচার্য

গৌরাঙ্গ, বল্লভীকান্ত, শ্রীব্রজমোহন।
শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত, শ্রীরাধারমণ॥

এবং প্রণামমন্ত্র রচিত হয়

গৌরাঙ্গ বল্লভীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
রাধারমণ হে রাধে বাধাকান্ত নমোঽস্তুতে॥[১৬]

এছাড়া নিম্নোক্ত বিগ্রহগুলি বৈষ্ণব সমাজে সাড়ম্বরে পূজিত হতো

রাধাবিনোদ, গোবিন্দদেব, মদনমোহন, মদনগোপাল, গোপীনাথ, রাধাদামোদর, কেশবদেব, বলদেব-সুভদ্রা, শ্রীরাধা ও জগন্নাথদেব।[১৭]

জাহ্নবাদেবী বৃন্দাবনে স্বহস্তে অন্নব্যঞ্জনাদি পাক করে শ্রীগোবিন্দদেব, গোপীনাথ, মদনমোহন, রাধাদামোদর, রাধারমণ ও রাধাবিনোদের সেবার্চনা করেন।[১৮] রাধাগোপীনাথের স্বপ্নাদেশে তিনি গৌড হতে শ্রীরাধিকা মূর্তি নির্মাণ করিয়ে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেছিলেন। শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রমুখ আচার্যবৃন্দ বৃন্দাবন নীলাচলাদি পরিভ্রমণ কবে এই সব বিগ্রহ দর্শন করতেন।

শালগ্রাম শিলাও বৈষ্ণবেরা নিত্য পূজা করতেন। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং গোবর্দ্ধন শিলা রঘুনাথদাসকে প্রদান করেন। দাস গোস্বামীর পর কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীমুকুন্দ, কৃষ্ণপ্রিয়া প্রমুখ একে একে এই গোবর্দ্ধনশিলার সেবা করেন।[১৯] 'নরোত্তমবিলাসে' গোবর্দ্ধনশিলা ছাড়া শ্রীবংশীবদন শিলা সেবারও উল্লেখ আছে।[২০]

বিগ্রহাদি সেবা পূজারও বিশেষ নিয়ম ছিল। শ্রীনিবাসাচার্য খেতুরী উৎসবের শুভারম্ভে পরিকরবর্গের অনুমতি লাভ করেই বিগ্রহ পূজায় বসেছিলেন। পূজাবিধির চিত্র: শ্রীবিগ্রহের অভিষেকক্রিয়া, সিংহাসনে

১৬. ভ. ৪২১, ৪২২।

১৭. সনাতন মদনগোপাল (ভ. ৬০), রূপ রাধাগোবিন্দ (ভ. ৫৭), পরমানন্দ ভট্টাচার্য মধু পণ্ডিত, গোপীনাথ (ভ. ৬১), বীরহাম্বীর (ভ. ৩৮৯) কালাচাঁদ বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন।

১৮. ভ. ৪৩৭-৪৩৮, ১৯. ন. পুথি ৩২ক-খ পত্র, ২০. ন. ১১০।

বিগ্রহ স্থাপন (জয়ধ্বনি-বেদপাঠ মঙ্গলগীত সহকারে), বিগ্রহের বেশ রচনা, সুগন্ধি-চন্দন পুষ্পমালা সমর্পণ, পূজা, আরত্রিক। আরতি সমাপ্তে মহান্ত সকলের ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ; ভোগসমর্পণ, ভক্ষণাবসর ও আচমন, তাম্বুল প্রদান, চামরবীজন। উপস্থিতদের পুষ্পমালা প্রসাদী চন্দন প্রদান। অতঃপর সংকীর্তনারম্ভ।[২১]

পূজাচার

বিগ্রহ সেবা পূজার বিবিধ উপকরণ ছিল—গঙ্গাজল, পুষ্প, চন্দন, মালা, তুলসীপত্র, নব বস্ত্র, গুঞ্জাহার ও পুষ্পচূড়া।[২২] ভোগের জন্যে বিবিধ মিষ্টান্ন ও অন্নব্যঞ্জন নিবেদিত হতো। পরম বৈষ্ণব ভক্ত এই অন্নাদি ভোগ রন্ধন করতেন।[২৩]

পুরোহিত গঙ্গাজলে বিগ্রহ স্নান করাতেন। বিগ্রহের মাথায় পুষ্পচূড়া ও গলায় পা পর্যন্ত লম্বিত পুষ্পমালা দিতেন। পরে চন্দন পুষ্প তুলসীতে পূজা ও মন্ত্রোচ্চারণ, ভোগ নিবেদন ও তাম্বুল দান। চামরে বাতাস করে বিগ্রহের ক্লান্তি দূর করা হতো।[২৪] ভোগই হতো প্রসাদ। প্রসাদ তুলে নেবার পর স্থানটি ধুয়ে দেওয়ার রীতি ছিল।[২৫]

পূজা শেষে নামসংকীর্তন। সবশেষে উপস্থিত সকলকে প্রসাদী চন্দন, পুষ্প, মালা ও প্রসাদ বিতরণ করা হতো।

দেবতার মন্দিরে নবাগতকে প্রসাদীমালা ও প্রসাদভোগ দেওয়া হতো।[২৬] নতুন কার্যারম্ভে ও বিদেশ গমনকালে বিশিষ্ট ভক্তকে দেবতার 'আজ্ঞা মালা' দেবার চল ছিল।

(ঈ) তীর্থদর্শন ও গোস্বামী-গ্রন্থ প্রচার

সেকালেও তীর্থদর্শন পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হতো। লোকে দল বেঁধে দুর্গম পথ পায়ে হেঁটে নীলাচল প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে উপস্থিত হতো। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং তীর্থাভিলাষী পরিব্রাজক ছিলেন। শাস্ত্রে উল্লিখিত বহু তীর্থস্থানই তাঁর সময়ে বিলুপ্ত হয়েছিল। তিনি সেই সব লুপ্ত তীর্থ-উদ্ধারের চেষ্টা করেন। প্রয়াগে উপনীত হয়ে তিনি সনাতনকে মথুরার লুপ্ততীর্থ উদ্ধার এবং ভক্তি

---

২১. ভ. ৪২১-৪২৩, ২২. ভ. ৪৮৮, ২৩. ভ. ৭৪, ২৪. ভ. ৩২৫,
২৫. ন. ৭৭, ২৬. ভ. ৩২৭, ৩২৯।

স্মৃতি শাস্ত্র রচনা ও প্রচার করতে নির্দেশ দেন।[২৭] সনাতন ও রূপ গোস্বামী সেই নির্দেশ শিরোধার্য করে

নানা শাস্ত্র প্রমাণ করিয়া সংকলন। কবিলেন ব্রজেতে ভ্রমণ দুইজন॥
গুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিল যত্ন করি। ব্যক্ত কৈল রাধাকৃষ্ণ রসের মাধুরী॥[২৮]

নিত্যানন্দও 'বিংশতিবৎসর' বহুতীর্থ পর্যটন করে প্রতীচী-তীর্থে মাধবেন্দ্রের সাক্ষাৎ লাভ করেন।[২৯] নীলাচল অভিমুখী একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গে চৈতন্যদাস-লক্ষ্মীপ্রিয়া জগন্নাথ মন্দিরে উপনীত হন।

নীলাচল যাইতে লোকের গতাগতি।
চলিলেহ দোঁহে হৈল অপূর্ব সঙ্গতি॥[৩০]

কিশোর শ্যামানন্দ গৃহত্যাগ করে গঙ্গা স্নানার্থী 'দেশবাসী'র সঙ্গে অম্বিকায় উপস্থিত হন।[৩১] শ্রীনিবাস, নরোত্তম, রামচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীজীব, জাহ্নবাদেবী, শ্যামানন্দ, লোকনাথ প্রমুখ সেকালের প্রত্যেক বৈষ্ণবাচার্যই নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করেন। 'ভক্তিরত্নাকরে' শ্রীনিবাস রামচন্দ্র ও নরোত্তমের ব্রজ ও নবদ্বীপমণ্ডল পরিক্রমার বিস্তৃত পরিচয় আছে। এই গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে ব্রজমণ্ডলে অবস্থিত ১৩৮টি এবং নবদ্বীপমণ্ডলে স্থিত ২০টি দর্শনীয় তীর্থস্থানের বিশদ বিবরণ পাই।

সেকালের উল্লেখযোগ্য তীর্থ ছিল—নীলাচল, মথুরা-বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, প্রয়াগ, গয়া, কাশী, অযোধ্যা প্রভৃতি।

একালের মতো সেকালেও তীর্থযাত্রীদের তীর্থস্থান পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে এক এক জন গাইড নিযুক্ত থাকতো। তারা তীর্থস্থানের বিভিন্ন দর্শনীয় বস্তু —লীলাস্থলী, বন, উপবন, পুষ্করিণী ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ যাত্রীদের বুঝিয়ে বলতো। শ্রীনিবাসাদি রাঘব পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে ব্রজমণ্ডলের[৩২] ও ঈশানের সাহায্যে নবদ্বীপমণ্ডলের তীর্থস্থানগুলি[৩৩] পরিদর্শন করেন।

সনাতন-রূপের প্রতি শ্রীচৈতন্যের অপর নির্দেশ ছিল

বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব আচার।
ভক্তি স্মৃতি শাস্ত্র করি করিহ প্রচার॥[৩৪]

---

২৭. চৈতন্যচরিতামৃত (সাহিত্য অকাদেমী. ১৯৬৩), পৃঃ ৩৯০ (মধ্য-২৩)।
২৮. ঐ. ৯৪, ২৯. ভ. ২২১-২২২, ৩০. ঐ. ৪৭, ৩১. ঐ. ১৬,
৩২. ভ. ৯৩, ৩৩. ভ. ৪৬৪-৪৬৫, ৩৪. চৈতন্যচরিতামৃত (সাহিত্য অকাদেমী), পৃঃ ৩৯১।

শ্রীচৈতন্যের আদেশে সনাতন ও বৃন্দাবনের অন্যান্য গোস্বামীরা বৈষ্ণব-ধর্মের উপর ভিত্তি করে কাব্য-নাটক-স্মৃতি-দর্শনাদি শাস্ত্র রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। 'ভক্তিরত্নাকরে' সনাতন গোস্বামীর ৪টি, রূপগোস্বামীর ১৬টি, জীবগোস্বামীর ২৫টি, রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ৩টি গ্রন্থের উল্লেখ আছে।[৩৫] সেই সূত্রেই গোপাল ভট্ট ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থ রচনার প্রয়াস।

গ্রন্থ রচনা ও অধ্যাপনা এবং সেই সঙ্গে কৃষ্ণসেবানুকূল বৈষ্ণবাচার প্রকাশ গোস্বামীদের নিত্যকর্তব্য ছিল। শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রমুখ বৃন্দাবনে এসে গোস্বামীদের কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাসকে গৌড়মণ্ডলে ভক্তিশাস্ত্র প্রচার ও বিতরণের কাজে নিযুক্ত করেন। শ্রীনিবাসের কাজে সাহায্য করেন নরোত্তম ও শ্যামানন্দ। শ্রীজীব গ্রন্থপ্রচারের জন্যে গোস্বামী গ্রন্থগুলি গাড়ী বোঝাই করে শ্রীনিবাসের তত্ত্বাবধানে গৌড়দেশে প্রেরণ করেন। তাছাড়াও সময় মতো কিছু কিছু গ্রন্থ তিনি শ্রীনিবাস এবং সমাচারপত্রীর হাতে গৌড়ে পাঠিয়েছিলেন।

শ্রীনিবাস গৌড়ে ও শ্যামানন্দ উৎকলে রীতিমতো টোল খুলে অধ্যাপনায় ব্রতী হন। গোস্বামীদের ব্যাখ্যাত বৈষ্ণব তত্ত্ব দর্শন তাঁদের আলোচনার একতম লক্ষ্য ছিল।[৩৬]

(উ) বৈষ্ণব মহোৎসব উদ্‌যাপন

শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা স্মরণ করে ফাগুখেলা, হোলিখেলা, শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাধার জন্মদিন পালন, রাসলীলা প্রভৃতি উৎসব বহুদিনের চল। কিন্তু শ্রীনিবাসের জীবৎকালে বৈষ্ণবাচার্যেরা সাড়ম্বরে নিম্নোক্ত কয়েকটি বৈষ্ণব সম্মেলন আহ্বান করে বৈষ্ণবমতাদর্শকে সমাজের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত করে দেন

(ক) প্রথম বৈষ্ণব সম্মেলন[৩৭] কাটোয়া মহামহোৎসব :	উদ্যোক্তা—যদুনন্দন চক্রবর্তী। উদ্দেশ্য—দাস গদাধরের তিরোভাব তিথি স্মরণে বৈষ্ণব মিলন।
(খ) যাজিগ্রাম মহোৎসব[৩৮] : (শ্রীনিবাস গৃহে)	উদ্যোক্তা—শ্রীনিবাসাচার্য। উদ্দেশ্য—বৈষ্ণব মিলন।

৩৫. ভ. ১ম তরঙ্গ, ৩৬. দ্রঃ প্রথম অধ্যায়, 'শাস্ত্রানুশীলন ও কাব্যচর্চা' অংশ।
৩৭. ভ. ৩৯৫, ৩৮. ভ. ৩৯৭।

(গ) শ্রীখণ্ড মহামহোৎসব [৩৯] : উদ্যোক্তা—রঘুনন্দন।
উদ্দেশ্য—নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব তিথি স্মরণে বৈষ্ণব মিলন।

(ঘ) কাঞ্চনগড়িয়া মহা-মহোৎসব [৪০] : উদ্যোক্তা—গোকুলানন্দ ও শ্রীদাস।
উদ্দেশ্য—হরিদাসাচার্যের তিরোভাব তিথি স্মরণে বৈষ্ণব মিলন।

(ঙ) খেতুরী মহামহোৎসব [৪১] : (সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব সম্মেলন) উদ্যোক্তা—নরোত্তম ঠাকুর।
সাহায্য ও তত্ত্বাবধান—রাজা সন্তোষ দত্ত।
উদ্দেশ্য—সর্বভারতীয় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বৈষ্ণব মিলন।
সময়— ২ দিন।

(চ) বোরাকুলি উৎসব [৪২] : উদ্যোক্তা—গোবিন্দ চক্রবর্তী।
উদ্দেশ্য—বৈষ্ণব মিলন।

(ছ) ধারেন্দা উৎসব [৪৩] : উদ্যোক্তা—শ্যামানন্দ।
উদ্দেশ্য—বৈষ্ণব মিলন।

নরহরির প্রদত্ত উৎসব বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, প্রত্যেকটি বৈষ্ণব সম্মেলন সাড়ম্বরেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিগ্রহ পূজা, ভক্ত সমাবেশ, নৃত্যগীত, বাদ্যযোগে নাম সংকীর্তন, প্রসাদী মালাচন্দন পুষ্প ও ভোগ বিতরণ ইত্যাদিতে উৎসব মুখরিত ছিল।

কাটোয়া, শ্রীখণ্ড ও কাঞ্চনগড়িয়ার মহোৎসব তিন বৈষ্ণবাচার্য যথাক্রমে দাস গদাধর, নরহরি ঠাকুর ও হরিদাসাচার্যের তিরোভাব তিথি উপলক্ষে উদ্‌যাপিত। যাজিগ্রাম, বোরাকুলি ও ধারেন্দা উৎসব গৃহপ্রাঙ্গণে বৈষ্ণব সম্মেলন ও ভাবের আদান প্রদানের নিমিত্তে অনুষ্ঠিত। কিন্তু খেতুরী উৎসব ধনী-দরিদ্র, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের এক মহাসম্মেলন। বাঙালী জাতির ইতিহাসে একে প্রথম জাতীয় সম্মেলন বললেও অত্যুক্তি হবে না।

এই সম্মেলন-উৎসবগুলি থেকে স্পষ্ট হয় যে, বৈষ্ণবাচার্যেরা তাঁদের

---

৩৯. ভ. ৩৯৮, ৪০ ভ. ৪০৭-৪০৯, ৪১. ভ. ৪১৫-৪৩০, ৪২. ভ. ৬৩৫-৬৩৬, ৪৩. ভ. ৬৪৪।

ধর্মমতকে সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। জনতার সঙ্গে একাত্মতা লাভেরও কেন্দ্রভূমি ছিল এই উৎসবগুলি।

(উ) নৃত্যগীত বাদ্যযোগে নাম সংকীর্তন

নাম-সংকীর্তন সেকালে বৈষ্ণবদের নিত্য কর্তব্যে পরিণত হয়। চৈতন্য জন্মের আগেও অদ্বৈত প্রমুখ গুপ্তকক্ষে কীর্তন করতেন। চৈতন্যদেব প্রকাশ্য রাজপথে কীর্তন করে কীর্তনে ব্যাপ্তি আনয়ন করেন। শ্রীবাস অঙ্গনে তিনটি সম্প্রদায় গঠন করে নৃত্যযোগে তিনি কীতন করেছিলেন। কীর্তনে খোল করতাল মৃদঙ্গের ব্যবহার ছিল। নিত্যানন্দ প্রমুখও পরিকর সঙ্গে নৃত্যবাদ্য যোগে কীর্তন করতেন।

কিন্তু শ্রীনিবাস-নরোত্তমের কালেই এই কীর্তনের আভিজাত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটি বৈষ্ণব শ্রীপাটে ভক্তদের সম্মিলিত কীর্তনের ব্যবস্থা ছিল। প্রতিটি বৈষ্ণব সম্মেলন নৃত্যগীত বাদ্যযোগে কীর্তনে মুখরিত হতো। দেবীদাস, বল্লভ, গৌরাঙ্গদাস, শ্যামদাস, মনোহর প্রমুখ সেকালের বিখ্যাত বাদক। নরোত্তম, গোকুলানন্দ, কিশোর প্রমুখ প্রসিদ্ধ গায়ক। নৃত্য করতেন সকল ভক্ত। তন্মধ্যে খেতুরীতে বীরভদ্র, বোরাকুলিতে কানাই ঠাকুরের নৃত্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। নৃত্য সম্পর্কে নরহরি লিখেছেন

মণ্ডলী বন্ধানে চারু নৃত্য আরম্ভিতে।
গীতবাদ্য বৃদ্ধি যৈছে কে পাবে বর্ণিতে।[৪৪]

(ঋ) গুরু ও দীক্ষা প্রণালী

সেকালের বৈষ্ণবেরা গুরুর কাছে সাড়ম্বরে দীক্ষা গ্রহণ করতেন। দীক্ষিত না হলে জীবের গতি নেই, সমাজে তার মান্য নেই—এমনি একটা ভাব তখন সর্বত্র স্বীকৃতি পেয়েছিল। নানা বিধিবিধান মেনে গুরুরা দীক্ষা দান করতেন। সমাজে গুরুর স্থানও নির্দিষ্ট হয়েছিল। গোস্বামী গ্রন্থেই ভগবান-শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্যের পরই গুরুর স্থান পাকাপাকি হয়। ভগবান ও ভক্তের মিলন সেতু রূপে গুরু সম্মানিত হন। তাঁর প্রবেশ যেমন সর্বত্র ছিল, তেমনি তাঁর আদেশ শিরোধার্য ও সর্বথামান্য ছিল। গুরু বাড়ীতে এলে গৃহকর্তা বা তাঁর পত্নী গুরুর চরণদ্বয় ঠাণ্ডা জলে ধুইয়ে দিতেন। সেই পাদোদক বাড়ীর সকলে

৪৪. ভ. ৪২৪।

পান করতেন। গুরুও শিষ্যের মাথায় পা তুলে দিতে সংকোচ বোধ করতেন না। তাঁর ভুক্তাবশিষ্ট শিষ্য সানন্দে ভোজন করতেন।[৪৫]

শ্রীনিবাস গোপাল ভট্টের, নরোত্তম লোকনাথের ও শ্যামানন্দ হৃদয়চৈতন্যের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন। এবং পরবর্তীকালে অসংখ্য ব্যক্তি তাঁদের শিষ্য হন। শ্রীনিবাসের শিষ্যদের মধ্যে রামচন্দ্র কবিরাজ, গোকুলানন্দ, শ্রীদাস, বীরহাম্বীর প্রমুখ, নরোত্তমের শিষ্যদের মধ্যে গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণাচার্য প্রমুখ এবং শ্যামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে রসিকমুরারি, রাধামোহন, পুরুষোত্তম, রাধানন্দ প্রমুখ বৈষ্ণব সমাজে সমাদর লাভ করেন। জাহ্নবাদেবীর শিষ্যদের মধ্যে জ্ঞানদাস, বীরভদ্র প্রমুখ ও রামচন্দ্রের শিষ্যদের মধ্যে হরিরামাচার্য প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। অচ্যুতানন্দ, বীরভদ্র, সীতাদেবী প্রমুখও বহু ভক্তকে দীক্ষা দান করেন।

এ থেকে মনে হয় যে, সেকালে গুরুবাদ সমাজে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গুরু প্রসন্ন হলেই দীক্ষালাভ হতো। কোনো কোনো আচার্য্য বিবাহ দিনেই নিজ স্ত্রীকেও দীক্ষা দান করতেন।[৪৬] গুরু অপ্রসন্ন হলে অনেক সময় কারো কারো শিষ্যত্ব বর্জন করা হতো।[৪৭]

অন্যদিকে শূদ্রকুলজাত ব্যক্তিও পরম বৈষ্ণব সাধক বা ভক্ত হলে তাঁর কাছে ব্রাহ্মণ পর্যন্ত দীক্ষা গ্রহণ করতেন। নরোত্তম ঠাকুর, শ্যামানন্দ, রামচন্দ্র কবিরাজ—তিনজনেই ব্রাহ্মণ নন, অথচ এঁদের কারো কারো ব্রাহ্মণ শিষ্যও ছিল। 'নরোত্তম বিলাসে' দেখি নরোত্তমের নিকট এক ব্রাহ্মণ আর্তস্বরে প্রার্থনা করছে

দীক্ষামন্ত্র দিয়া তুমি করহ উদ্ধার।
মো পাপীর সর্বস্ব এ চরণ তোমার॥

এবং "বিপ্র শিষ্য করিল ঠাকুর নরোত্তম। ভক্তি বলে হৈলা তেঁহো পরম উত্তম॥"[৪৮] তাঁর অন্য ব্রাহ্মণ শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী ও রামকৃষ্ণ আচার্য।

(৯) বৈষ্ণবধর্ম ও পাষণ্ডীবৃন্দ

নরহরির গ্রন্থ পাঠ করলে বোঝা যায় যে, তখনো বৈষ্ণব মতাদর্শ সমাজে অপ্রতিহত প্রাধান্য লাভ করতে পারে নি। সমাজের এক শ্রেণীর লোক

৪৫. ভ. ৫৫, ৮৫, ৪৬. ন. ১১০, ৪৭. ভ. ৬৩৮-৬৩৯, ৪৮. ন. ১০৫।

বৈষ্ণবদের ধর্ম ও ক্রিয়াকাণ্ড সুনজরে দেখতে পারে নি। বরং দল বেঁধে তারা বৈষ্ণবদের উপহাস করতো। চৈতন্যের জীবৎকালে যে 'পাষণ্ডী'র দল বর্তমান ছিল, শ্রীনিবাসের কালেও তাদের উত্তর-পুরুষেরা বিনষ্ট হয় নি। সেই সব 'প্রভুভক্তদ্রোহী' গোস্বামী ব্যাখ্যাত চৈতন্যলীলাবিলাস ও বৃন্দাবন-নবদ্বীপ মহিমাকে সরাসরি অস্বীকার করেছিল। গৌরাঙ্গ ও কৃষ্ণ যে অভিন্ন, বৈষ্ণবদের এই সশ্রদ্ধ বিশ্বাসবোধে তারা কুঠারাঘাত করেছিল।[৪৯]

ভক্তিরত্নাকরে আছে, জগন্নাথদেবের মন্দিরে নিঃসন্তান চৈতন্যদাস সস্ত্রীক পুত্রবর লাভ করে স্বগ্রামে ফিরে এলেন। তাঁর তখনকার 'অপূর্ব ভক্তিরীত' দেখে অনেকেই টিপ্পনী কেটেছিল

"এই সব অনর্থক। এই হেতু ধনহীন হৈল অপুত্রক॥"[৫০]

রূপ সনাতনের ভক্তিভাব ও গোপাল ভট্টের সুমধুর চরিত্র নিয়ে নানালোকে নানা কথায় তর্ক করতেও পরাঙ্মুখ হয় নি।[৫১] শ্যামানন্দের 'সিদ্ধভক্তিক্রিয়া'য় অনেকেরই তর্কের সীমা ছিল না।[৫২] জাহ্নবাদেবীকে বৃন্দাবন গমনপথে একটি গ্রামের পাষণ্ডীরা অযথা কটূক্তি করেছিল, যখন শিষ্যেরা দেবীর চরণ-বন্দনায় রত

তাহা দেখি হাসিয়া পাষণ্ডীগণ কয়।
ইহোঁ বিপ্রপত্নী মোর মনে লয়॥
কেহো কহে এগুলার নাহি কুন জ্ঞান।
মনুষ্যে প্রণমে দেবে না করে প্রণাম॥
কেহো কহে চণ্ডীকৃপা করিলে সে হয়।
কেহ কহে চণ্ডীকৃপা অজ্ঞে কি বুঝয়॥
বিপ্রপত্নী বিপ্র কিনা প্রণমে চণ্ডীরে।
এগুলার অপরাধ হৈল চণ্ডীদ্বারে॥[৫৩]

তারপর পাষণ্ডীরা আস্ফালন করতে করতে চণ্ডী মন্দিরে গিয়ে সমস্বরে প্রার্থনা করে—"অল্পরাত্রে এগুলার (জাহ্নবাভক্তগণের) করিবে সংহার"।[৫৪] কোথাও কোথাও পাষণ্ডীরা সংকীর্তনকারী বৈষ্ণবদের বাড়ীর সদর দরজার পাশে রাত্রে 'মদ্যভাণ্ড সিন্দুরাদি' রেখে ভক্তদের লাঞ্ছিত করবারও চেষ্টা করতো।[৫৫]

৪৯. ভ. ৪।৫।৬৪, ৫০. ভ. ৪৮, ৫১. ভ. ১০।৩০, ৫২. ভ. ৩২২, ৫৩-৫৪. ভ. ৪৩৩, ৫৫. ভ. ৫৮৮।

এদের অন্য পরিচয়ও আছে—তখন বৈষ্ণব সমাজে শ্রীরঘুনাথ, শ্রীগোপাল প্রভৃতি বিগ্রহের পূজা ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। তাই

বহির্মুখগণ মধ্যে যে প্রধান তারে।
রঘুনাথ সাজাইয়া ভাঁড়ায় লোকেরে ॥
স্বমত রচিয়া যে পাপিষ্ঠ দুরাচার।
কহয়ে কবীন্দ্র বঙ্গ দেশেতে প্রচার ॥

এবং "আপনাকে গাওয়ায় ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন।"[৫৬]

নরহরি রাঢ়দেশের 'মল্লিক' উপাধিধারী এক বহির্মুখের অনুরূপ কুকার্যের পরিচয় দিয়েছেন

সে পাপিষ্ঠ আপনাকে 'গোপাল' কহায়।
প্রকাশি রাক্ষস মায়া লোকরে ভাঁড়ায় ॥[৫৭]

কবি এও লক্ষ্য করেছেন যে, নিছক উদরপূর্তির জন্যে এই সব পাষণ্ডীরা রঘুনাথ সাজতো, দল বেঁধে আত্মগরিমা প্রচার করতো।

কিন্তু সমাজ যে এদের ঘৃণা করতো তারও নজির আছে। রাঢ়ের উক্ত পাষণ্ডী 'গোপাল' সাজতো বলে লোকে তাকে "শিয়াল" বলে অবজ্ঞা ও অপমান করতো।[৫৮]

পাষণ্ডীরা যে তখন বেশ প্রবল ছিল, সেকথা আরো কিছু কিছু বক্তব্যে মিলে—শ্রীনিবাস কর্তৃক গৌড়ে গোস্বামী গ্রন্থ আনয়নের প্রাক্‌কালে গোপাল ভট্টের কাছে শ্রীজীবের প্রার্থনা ছিল যে, শ্রীনিবাস যেন নির্বিঘ্নে গৌড়ে গ্রন্থ নিয়ে পৌঁছুতে পারেন, এবং

পাষণ্ডীগণের দর্প করিয়া খণ্ডন।
স্বচ্ছন্দে করেন যেন গ্রন্থ বিতরণ ॥[৫৯]

এবং সেই শক্তি যেন শ্রীনিবাস লাভ করতে সমর্থ হন।

'ভক্তিরত্নাকর' থেকে আরো জানা যায় যে, সেকালে বৈষ্ণবেরা ম্লেচ্ছদের সর্বতোভাবে ঘৃণা করতেন। সনাতন রূপের পিতা শ্রীকুমার এমনি ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন যে, কদাচারদুষ্ট যবন স্পর্শ দূরে থাক্ অকস্মাৎ যবন দর্শন হয়ে গেলে তিনি প্রায়শ্চিত্ত না করে অন্ন গ্রহণ করতেন না।[৬০] সনাতন ও রূপ গোস্বামী

৫৬-৫৭-৫৮. ভ. ৬৩৮, ৫৯. ভ. ৩৩৪, ৬০. ভ. ২৫।

ম্লেচ্ছ রাজার দরবারে যেতেন রাজকাজে। এই গতায়াতের জন্যে তাঁরা সর্বদা কুণ্ঠিত থাকতেন এবং নিজেদের ম্লেচ্ছের সমান চিন্তা করে ব্যথিত হতেন।[৬১]

এ থেকে বোঝা যায়, সেকালে বৈষ্ণব বিরোধী লোকের অভাব ছিল না।

(এ) সেকালের সাধারণ মানুষ

সেকালের সাধারণ মানুষের সবিশেষ পরিচয় নরহরি চক্রবর্তী দেন নি। তবে দু একটি ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায় যে, সাধারণ মানুষ বড় ভীতু ছিল। যুগ যুগ পালিত ধর্মের উপর তাদের একনিষ্ঠ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল। শূদ্র নরোত্তম যত বড়ই ভক্তবৈষ্ণব ও আচার্য্য হোন না কেন, 'তৎ কর্তৃক ব্রাহ্মণকে দীক্ষাদান' এই ব্যাপারটিকে তারা দ্বিধাহীনভাবে মেনে নিতে পারে নি। ধর্মলোপ আশংকায় তারা উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল, ব্রাহ্মণ অধ্যাপকেরা তাই রাজা নরসিংহকে এ বিষয়ে বারংবার অভিযোগ করেছিলেন

ধর্মলোপ হৈল কেহ না করে বিচার ॥
কৃষ্ণানন্দদত্ত পুত্র নরোত্তমদাস।
লইয়া বৈষ্ণব মত কৈল সর্বনাশ ॥
না জানিয়ে কিবা বা কুহক সেই জানে।
অনায়াসে বিপ্র শিষ্য হয় তার স্থানে ॥[৬২]

সম্ভবতঃ এই পরিপ্রেক্ষিতেই খেতুরী মহোৎসবে নরোত্তমকে "দ্বিজ" বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

নরহরি নিতান্ত সাধারণ মানুষের চারিত্রিক অধঃপতনের চিত্রও এঁকেছেন

এদেশের লোক দস্যু কর্মে বিচক্ষণ।
না জানয়ে ধর্ম কিবা কর্ম বা কেমন ॥

এদের 'কুক্রিয়া'র চিত্র

ছাগ মেষ মহিষ শোণিত ঘরে দ্বারে ॥
কেহ কেহ মনুষ্যের কাটামুণ্ড লৈয়া।
খড়্গ করে করয়ে নর্তন মত্ত হৈয়া ॥[৬৩]

এই সব লোকের কাছে নিষ্কিঞ্চন পথিকেরও নিস্তার ছিল না। কবি বলেন

সভে স্ত্রীলম্পট জাতি বিচারে রহিত।
মদ্যমাংস বিনা না ভুঞ্জয়ে কদাচিত ॥[৬৪]

---

৬১. ভ. ২৫, ৬২-৬৩. ন. ১০৫-১০৬, ৬৪. ন. ৭৬।

(৮) কুসংস্কার

কুসংস্কার বহুদিনের। নরহরির গ্রন্থেও তার কিছু পরিচয় আছে।

সেকালের মানুষ স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়কে অলীক বলে উড়িয়ে দিতে পারতো না। বরং তা যে অচিরে বাস্তবায়িত হবে, এ বিশ্বাস তাদের ছিল।[১] স্বপ্নেদৃষ্ট ঘটনার উপর নির্ভর করে কারো কারো মতিগতির পরিবর্তন ঘটতো, কেউ দুঃখে সান্ত্বনা পেত, কেউ স্বপ্নে দেখা ঘটনাকে অনুসরণ করতো। দৈববাণী ও আকাশবাণী তারা যেমন শুনতে পেত, তেমনি তার উপর অগাধ বিশ্বাস স্থাপন না করে পারতো না।[২] মানুষ মনে করতো দেবতা স্বয়ং বা মৃতব্যক্তি বৃদ্ধের ছদ্মবেশে মর্তধামে প্রয়োজনবোধে নেমে আসেন এবং মানুষকে সাহায্য করেন বা শিক্ষা দেন।[৩] ভক্তের সঙ্গে ভগবান বা দেববিগ্রহ মুখোমুখি কথা-বার্তা বলেন।[৪] কখনো কখনো মৃতদেহে ব্যক্তি বা দেবতা বা ভূত-প্রেত ভর করেও থাকে।[৫] প্রয়োজনে মৃতব্যক্তিরা পূর্বশরীরেই মর্তে আসেন।[৬] গৌরাঙ্গ, নরোত্তম, জাহ্নবাদেবীর মতো অনন্যসাধারণ মানুষ যে অসাধ্যসাধন করতে পারেন, এ বিশ্বাস মানুষের ছিল। গৌরাঙ্গ একদিন সংকীর্তনকালে আমের বীজ রোপণ করে তৎক্ষণাৎ তা থেকে পাকা আম ফলিয়ে গণসহ ভক্ষণ করেন (ভ.র.পৃঃ ৫৩৬), জাহ্নবাদেবীর স্পর্শে বৃন্দাবনবাসী এক বৃদ্ধ বিপ্রের মৃতপুত্র জীবন লাভ করে (ভ.র. পৃঃ ৪৩৮), কুষ্ঠীবিপ্রের মস্তকে নরোত্তমের পদধারণমাত্রে বিপ্রের রোগমুক্তি (ন.বি. পৃঃ ১০১) হয়। অন্য দিকে এই বড় মানুষের প্রতি 'হীনবুদ্ধি' করলে মানুষের কুষ্ঠরোগ হয়, ধনবংশের বিনষ্টিও ঘটে।[৭] ব্রহ্মশাপ ইত্যাদির ভয় তো ছিলই।[৮] অল্প বয়সে অধিক বিদ্যার্জন করলে বা শিশুর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রকাশিত হলে, লোকে তাকে দেবতার অংশসম্ভূত বলে মান্য করতো।[৯] কেউ অসাধারণ কাজ কিছু করলে যেমন, সর্পসংকুল স্থান থেকে বিগ্রহ আবিষ্কার করলে, লোকে তাঁকে ঈশ্বরের অবতার বলে শ্রদ্ধা জানাত।[১০] তেমনি সর্বনাশ ঘটে গেলেও, সেই ঘটনাতে দেবতা বা ঈশ্বরের কোনো সৎ অভিপ্রায় আছে বলে তারা মনে করতো।[১১] তাদের বিশ্বাস

---

(৮): ১. ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাসে স্বপ্নদর্শনের ছড়াছড়ি—তন্মধ্যে কয়েকটি পৃঃ ভ. ৬০।৬৪।৬৫।৬৬।৭৩।৭৬।৭৭।৮১।৮২।৮৩, ন. ৪০।৪৬।৪৭।৪৯।৫০।৫৬।৬০।৬৯।

২. ন. ৫৩;৭২, ভ. ৬৬।৩৭৮, ৩. ন. ৬৬, ভ. ৪৪৫, ৪. ভ. ১৫, ৫. ন. ১১৬।১১৮, ৬. ন. ১১৮, ৭. ভ. ১০১, ৫৮৮, ৮. ভ. ৫৮৮, ৯. ভ. ১২, ১০. ন. ৬৮, ১১. ন. ৫৩।

ছিল যে, মর্তধামে মানুষের পাপকর্মের হিসেব চিত্রগুপ্ত লিখে রাখেন।[১২] তেমনি মানুষের মঙ্গল কর্ম দেবতারা স্বর্গ থেকে লক্ষ্য করেন ও সেই কাজ উপযুক্ত বিবেচিত হলে তাঁরা পুষ্পবৃষ্টিও করে থাকেন। কখনো কখনো তাঁরাও ছদ্মবেশে মর্তে এসে সেই মঙ্গল অনুষ্ঠানে যোগদানও করেন।[১৩] দৈবজ্ঞের কথায় মানুষের একনিষ্ঠ বিশ্বাস ছিল।[১৪] বাচ্চাদের দৈবগ্রহাদি ও ভূতপ্রেত-ডাইনী লাগবার ভয় ছিল।[১৫]

দেবতার প্রসাদ খেয়ে মাথার চুলে হাত মোছা তখনকার দিনের বিশেষ রীতি ছিল। বিশ্বাস ছিল, প্রসাদ উচ্ছিষ্ট নয়।[১৬]

পুরুষের ডান চোখ[১৭] ও নারীর বাম চোখ[১৮] স্পন্দিত হলে তাকে যাত্রার শুভলক্ষণ বলে গণ্য করা হতো। বাহু স্পন্দনও[১৯] তাই ছিল। উৎসব বা অনুষ্ঠানে কলাগাছ রোপণ, আম্রপল্লব, নারিকেল ফল, জলপূর্ণ কলসী মঙ্গল বা শুভের প্রতীক বলে গণ্য হতো।[২০] বর্জ্য হাঁড়ি অশুচি বলে তা অস্পৃশ্য ছিল॥

(৯) আমোদ প্রমোদ খেলাধুলা

নরহরির গ্রন্থে সেকালের আমোদ প্রমোদের উল্লেখ নেই। প্রধানত বৈষ্ণব-ভক্তের উদ্দেশ্যে বৈষ্ণব মহান্ত-জীবনী বলে কবি সাধারণ মানুষের আনন্দ বিনোদনের প্রসঙ্গটি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। তবে তাঁর গ্রন্থে নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি বিদ্যার যে বিস্তৃত পরিচয় আছে[১] তা থেকে বোঝা যায় যে, সেকালে বৈষ্ণব সমাজ ব্যতীত সাধারণ মানুষও মধ্যে মধ্যে বাদ্য নৃত্য ও গীতের যোগে উৎসব পালন করতো।[২] উৎসবে 'কাঁকতালী' দেওয়ার রীতি ছিল।[৩]

১২. ভ. ৫৬১, ১৩. ভ. ৫৬১৬২, ১৪. গৌ. ১০৬, ১৫. গৌ. ৬২, ১৬. ভ. ৫৭০, ১৭. ভ. ৩২১, ১৮. গৌ. ১০৪, ১৯. ভ. ৩২১ ২০. ন. ৭৬।৭৭।

(৯): ১. ভ. ৫ম তরঙ্গ, ১২শ তরঙ্গ। সংগীতসারসংগ্রহ, গীতচন্দ্রোদয়।

২. দ্বাদশ শতাব্দী থেকে নটীনৃত্যের কথা পাই। জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতী নাচতেন ও গাইতেন। সেকশুভোদয়ায় আছে, এক সময় লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় নাচ গানের আসর বসেছিল। গাইছিলেন গাঙ্গো নটের পুত্রবধূ বিদ্যুৎপ্রভা। কবিকর্ণপূর তাঁর আনন্দবৃন্দাবনচম্পূতে নৃত্যগীতের বর্ণনা করেছেন (শ্লোক ২০। ৫৮-৬০, ৬৯-৭১, ৯০-১০১ শ্লোক)। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবতে যাত্রা অভিনয়, বিশেষ করে রামায়ণ নাটের (নিত্যানন্দের বাল্যলীলায়) সুন্দর বর্ণনা আছে (দ্রঃ প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, ডঃ সেন)।

৩. ভ. ৫২০।

খেলাধূলার মধ্যে পাশা খেলা, 'লুকলুকানি', পুষ্পক্রীড়ার উল্লেখ আছে।[৪] বনভোজনও তখনকার দিনে আনন্দ সঞ্চয়ের বিষয় ছিল॥[৫]

(১০) ফল ফুল

আম, কলা, পনস্, ডালিম্ব[১] প্রভৃতি ফল সেকালের মানুষের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বাঁধুলী, কুন্দ, কেতকী, মালতী, যুথী, চাঁপা, শিরীষ, পদ্ম[২] স্বর্ণলতিকা, বিল্ব, করবী, কুমুদ, অতসী, কদম্ব, স্থলপদ্ম[৩] প্রভৃতি ফুলের, লাউ প্রভৃতি লতা গুল্মের[৪] বিশেষ উল্লেখ গ্রন্থকার করেছেন॥

(১১) জীবজন্তু

সিংহ, দ্বিরদ, গাভী, শিয়াল, কুরঙ্গ-কুরঙ্গী, ছাগ, মেষ, মহিষ, খগ প্রভৃতি[১] পশু; শিখী, কোকিল, শুকসারী, কপোত, চাতক, চক্রবাক, হংস, সারস, কৌঞ্চ, ঘুঘু, চকোর প্রভৃতি পাখী;[২] পিপীলিকা, খদ্যোত, ভ্রমর, ষটপদ, সাপ, ভেক প্রভৃতি কীট-পতঙ্গের উল্লেখ নরহরির গ্রন্থে আছে॥[৩]

দুই॥ নরহরি চক্রবর্তীর ভু-পরিক্রমা
(নরহরির গ্রন্থে যে ভৌগোলিক তথ্য পাওয়া যায় তার সম্বন্ধে আলোচনা)

অধিকাংশ আধুনিক সমালোচক নরহরি চক্রবর্তীর ভৌগোলিক অনুসন্ধিৎসার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর 'ভক্তিরত্নাকরে'র পঞ্চম ও দ্বাদশ তরঙ্গে যথাক্রমে 'ব্রজমণ্ডল' ও 'নবদ্বীপমণ্ডলে'র প্রদত্ত ভৌগোলিক বিবরণই তাঁদের এই প্রশংসার মূলে।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁর সম্পাদিত 'ব্রজপরিক্রমা' ও 'নবদ্বীপপরিক্রমা' নামক দুটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের[১] ভূমিকাতে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছেন। 'নবদ্বীপ পরিক্রমা'র "বিশেষ দ্রষ্টব্য" অংশে তিনি

---

৪. ভ. ৫৮০-৫৮১, ৫. ভ. ৫৮০।

(১০): ১. ন. ১১১, ১১২, ১১৪, ২. ভ. ৫৬৭-৫৬৮, ৫৮৭, ৬০৪,

৩. গৌ. ২৬।২৭।২৯।৩১-৩৩, ৪. গৌ. ১৮।৫১, ভ. ৩২৫।

(১১): ১. গৌ. ১৮, ন. ১০২ ২. ভ. ৫৯৩, ৩২৫, গৌ. ২৫।৩১।৩৩।৩৪।৩৫,

৩. গৌ. ১৮।২৪।২৭।

দুই: ভু-পরিক্রমা ১. গ্রন্থ দুটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, পূর্বেই সে কথা উল্লিখিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য 'ভক্তিরত্নাকর' অংশ প্রথম খণ্ড।

লিখেছেন যে, এতদিন পর্যন্ত 'অতীত বঙ্গের প্রধান গৌরব কেন্দ্র' নবদ্বীপ শুধুমাত্র ভক্তদের মুখে মুখে ফিরতো, তার প্রতি পণ্ডিত-গবেষক-ঐতিহাসিকের দৃষ্টি পড়ে নি। কেবলমাত্র 'ভক্তিরত্নাকর' বা 'নবদ্বীপপরিক্রমা' পাঠ করেই বিস্ময়াবিষ্ট পণ্ডিত সমাজ নবদ্বীপের স্থানাদি আবিষ্কারে যত্নবান হন। এবং সেই উদ্যমেরই ফল বর্তমান মায়াপুর আবিষ্কার। নরহরির নির্দিষ্ট স্থানাদি তাঁর গ্রন্থ থেকে জেনে তাঁরা প্রাচীন ঐতিহ্যের স্থান নির্দেশ করেছেন।[২] বসু মহাশয় তাঁর 'ব্রজপরিক্রমা'র শেষে ব্রজমণ্ডলের একটি স্থান-সূচীও সংযোজিত করেছেন।[৩] ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেছেন

> "তিনি (নরহরি) বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের যে সুবৃহৎ ও পরিষ্কার মানচিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে কালের পৃষ্ঠায় এই দুই স্থানের ভৌগোলিক তত্ত্ব চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে। ম্যাণ্ডিভাইলের অঙ্কিত জেরুজেলেম এবং হিউনসঙ্গ-এর অঙ্কিত কুশীনগর হইতেও নরহরির নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন চিত্র অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে।"[৪]

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় লিখেছেন যে 'ভক্তিরত্নাকরে' উক্ত দুই মণ্ডলের লীলাস্থলীগুলির যে বিশদ বিবরণ আছে, তা 'আধুনিক গেজেটিয়ার লেখকেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে'।[৫]

অন্যদিকে ডঃ ক্ষুদিরাম দাস মহাশয় সম্প্রতি 'শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি নবদ্বীপ' প্রবন্ধে নরহরির ভৌগোলিক-জ্ঞানের উপর সংশয় তুলে লিখেছেন

> "কিন্তু গ্রন্থটি (ভক্তিরত্নাকর) যে পরিমাণে ভক্তভক্তির উৎকর্ষ বিধায়ক, ঠিক সেই পরিমাণেই ইতিহাস ও বাস্তবের উপর নিষ্ঠুর অজ্ঞতার পরিচায়ক।"[৬]

অর্থাৎ নরহরির বাস্তব তথ্য "বিশ্বাসী ভক্তদের কাছে মূল্যবান হলেও ইতিহাস ও ভূগোলের দিক থেকে তা বিভ্রান্তিকর।"

---

২. 'নবদ্বীপ পরিক্রমা' (প্রকাশকাল নেই) ভূমিকা।

৩. 'ব্রজপরিক্রমা' (১৩১২), পৃঃ ভূমিকা।

৪. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, (৪র্থ সং), পৃঃ ৩৭৪।

৫. ভারতকোষ, (৪র্থ খণ্ড, প্রকাশকাল নেই) পৃঃ ১৬৪, 'নরহরি চক্রবর্তী' নিবন্ধ।

৬. দেশ, (৩ শ্রাবণ, ১৩৮২, ১৯.৭.১৯৭৫), পৃঃ ৯৪১-৯৪৫, 'শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি নবদ্বীপ' প্রবন্ধ।

ডঃ দাস তাঁর অভিমতের পক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তি প্রদর্শন করেছেন

১। গ্রন্থের কোথাও (মহান্তজীবনী বর্ণনায়) সন তারিখ নেই।

২। জীবনচরিত জনশ্রুতি নির্ভর।

৩। নরহরি কথিত নবদ্বীপের ন-টি দ্বীপের অন্ততঃ চারটি দ্বীপের নাম অন্যত্র নেই।

৪। প্রতিটি দ্বীপের নাম (সংস্কৃত নাম) গুলি বাংলা নামের কৃত্রিম তৎসম করণ মাত্র।

৫। প্রতিটি দ্বীপের নামকরণে যে এক একটি কাহিনী আছে, সেগুলি কল্পিত, অলৌকিক, উদ্ভট।

৬। ভাগীরথী ও জলঙ্গীর অবস্থান বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত নেই। তেমনি চৈতন্য জন্মভূমি 'মায়াপুর' নামটি ষোড়শ শতাব্দীর অন্য কোনো বৈষ্ণব গ্রন্থে নেই, সুতরাং সম্পূর্ণই কাল্পনিক।

অবশ্য ডঃ দাসের অভিমতের প্রতিবাদও[৭] হয়েছে। অন্যতম প্রতিবাদী শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার মিত্র, ডঃ দাসের 'মায়াপুর বাস্তবে কোথাও ছিল না' ইত্যাদির উপর যথেষ্ট কটাক্ষ করেছেন।[৮]

সমালোচকদের এই সব বাদানুবাদ ও অভিমত স্মরণে রেখেই আমরা নরহরির ভৌগোলিক অনুসন্ধিৎসা ও আলোচ্য ভৌগোলিক তথ্যের পরিচয় নেবো। তারও আগে সেকালের জনমানস ও নরহরির মানসিকতা সম্পর্কে কথঞ্চিৎ পরিচয় নেওয়া দরকার :

আধুনিক ভূ-বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা সেকালের পণ্ডিত মনীষীদের কাছে অবশ্যই আশা করা যায় না। নরহরি বৈষ্ণবকবি, এবং বিরল শ্রেণীর বৈষ্ণব সাধক ও ভক্ত। সুতরাং তাঁর ভূগোলচেতনা ও বাস্তবজ্ঞান যে একালের মতো হবে না, সেকালের অন্যান্য ভক্ত কবিদের মতোই হবে, সেটাই স্বাভাবিক। তবে সেকালের তুলনায় নরহরির ভূগোল জ্ঞান ভালোই ছিল। সাধনার সূত্রেই তিনি নবদ্বীপমণ্ডল, ব্রজমণ্ডল এবং নানান বৈষ্ণব তীর্থ ও শ্রীপাট

---

৭. ১ম: দেশ (৯।৮।১৯৭৫), পৃঃ ১২৮, আলোক চৌধুরী, খড়্গপুর।
২য় : দেশ (১৬।৮।১৯৭৫), পৃঃ ১৯৭-১৯৮, সুধীর কুমার মিত্র, কালী লেন,কলি-২৬।

৮. দেশ (১৬।৮।১৯৭৫) পৃঃ ১৯৭।১৯৮।

পরিভ্রমণ করেছিলেন। বৈষ্ণব স্মৃতিপূত স্থানগুলি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এখানে স্মরণ করতে পারি, শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃন্দাবনের বিভিন্ন তীর্থগুলি উদ্ধারের প্রচেষ্টাকে। তিনি সুবুদ্ধি রায়কে এই কর্মে নিযুক্ত করেছিলেন। বোধ করি নরহরির এই রকম আগ্রহ থেকেই ভূগোল-অনুসন্ধিৎসা জেগেছিল।

নরহরির আলোচ্য ভূগোলের ক্ষেত্র স্বাভাবিক কারণেই সীমিত হয়েছে। বৈষ্ণব ধর্মসংশ্লিষ্ট ব্রজমণ্ডল, নবদ্বীপমণ্ডল ও মহান্তলীলাস্থল ছাড়া তিনি অন্য কোনো স্থানাদির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি। এগুলির মধ্যে কিছু কিছু স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন, পরিসীমা, জনবসতির ইঙ্গিত, সেগুলির বিলুপ্তি ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংবাদ এবং সেই সঙ্গে অনেক স্থানের পুরাবৃত্ত, লীলামাহাত্ম্য, পুষ্করিণী-নদনদী-গাছগাছালি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বহুদর্শিতার সাক্ষর রেখেছেন।

নরহরির গ্রন্থে ভূগোলের সংবাদ তিনটি বিশেষ পর্যায়ে গ্রহণ করা যেতে পারে—(ক) নবদ্বীপমণ্ডল, (খ) বৃহত্তর বঙ্গের প্রাচীন বৈষ্ণব শ্রীপাট, (গ) ব্রজমণ্ডলের তীর্থাদি।

(ক) **নবদ্বীপ মণ্ডল***

শচীদেবীর পুরোনো ভৃত্য ঈশানের নেতৃত্বে শ্রীনিবাস নরোত্তম রামচন্দ্র কবিরাজ নবদ্বীপমণ্ডল পরিক্রমা করেছেন। ঈশান তাঁদের এই মণ্ডলের প্রতিটি দর্শনীয় স্থানে নিয়ে গেছেন। এবং সেখানের গ্রাম, নগর, পুষ্করিণী, বৃক্ষ ইত্যাদির প্রসিদ্ধি সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন।

প্রথমেই নবদ্বীপ সম্পর্কে কবির সপ্রশংস উল্লেখ

নবদ্বীপে গঙ্গা শোভা করিয়া দর্শন।
করয়ে ভারতবর্ষ সৌভাগ্য বর্ণন॥

নবদ্বীপের গঙ্গানদ ও তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই ইঙ্গিতটুকু কবি প্রদান করেছেন। তারপর নবদ্বীপের স্থানবিভাগ সম্পর্কে তাঁর 'ভক্তিরত্নাকর' ও অধুনাপ্রাপ্ত 'নবদ্বীপ পরিক্রমা' পুথিতে (পরিষৎ ৬৪৮০) বলা হয়েছে যে,

* নবদ্বীপ মণ্ডলের স্থানগুলি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছেন ড. বাসন্তী চৌধুরী। দ্রঃ 'বাংলার বৈষ্ণব সমাজ, সংগীত ও সাহিত্য' (১৯৬৮), ১০ম অধ্যায়।

নবদ্বীপ ন-টি দ্বীপের সমষ্টি। গঙ্গার পূর্বতীরে ৪টি দ্বীপ—অন্তর্দ্বীপ, সীমন্ত দ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ ও মধ্যদ্বীপ। এবং এর পশ্চিমতীরে ৫টি দ্বীপ—কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদ্রদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ। গ্রন্থকার এগুলি সম্পর্কে জানিয়েছেন

অথবা শ্রীনবদ্বীপ নবদ্বীপ নাম।
পৃথক পৃথক কিন্তু হয়ে এক গ্রাম॥

নরহরি আরো বলেছেন যে, কালক্রমে নবদ্বীপমণ্ডলের অনেক গ্রামই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এমন কি কোনো কোনো গ্রামের নাম পর্যন্ত বিকৃত বা বিলুপ্ত হয়েছে, এবং এগুলি বর্তমান (তাঁর সময়েই) বিশেষজ্ঞদের অনুভবের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে

যৈছে কলি বৃদ্ধ তৈছে নামের ব্যত্যয়।
তথাপি সে সব নাম অনুভব হয়॥
কথোকাল পরে কথো গ্রাম লুপ্ত হৈল।
কথো গ্রাম নাম লোকে আস্ত ব্যস্ত কৈল॥

(ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ৪৬১)

নাম-ব্যত্যয়ের উদাহরণ। যেমন

গঙ্গার পূর্বতীরে রাতুপুর হয়।
কেহ কেহ রাতুপুব রুদ্রপুর কয়॥
এই রাতুপুর পূর্বে রুদ্রদ্বীপ নাম।
গ্রাম লুপ্ত হৈল এবে আছে মাত্র স্থান॥

তেমনি অন্তর্দ্বীপ বা আতোপুর সম্পর্কেও কবির মন্তব্য

'বহুকালাবধি লুপ্ত হৈল এই গ্রাম।'

কিন্তু চৈতন্য-তিরোভাবের পর শ্রীনিবাসাদির পরিক্রমাকাল পর্যন্ত মাত্র একশো বা তার কাছাকাছি সময়ের মধ্যেই চৈতন্য লীলাস্থলীর এমন বিলুপ্তি আশ্চর্যের বিষয়।

এরপর নরহরি 'ভক্তিরত্নাকরে' "শ্রীচৈতন্যচরিতের" প্রথম প্রক্রমের তিনটি শ্লোক তুলে নবদ্বীপবাসীদের জীবনযাত্রা প্রণালী ও চারিত্রিক সমুন্নতির ইঙ্গিত দিয়েছেন। 'জয় জয় শ্রীনদীয়া সুখধাম' ইত্যাদি একটি স্বরচিত গীতে এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

নরহরি লিখেছেন, 'নদীয়া বসতি অষ্টক্রোশ বিস্তৃত'। তার মাঝে "মায়াপুর" নামক স্থানে ভগবান গৌরচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটে। মায়াপুরকে তিনি 'যোগপীঠ' বলে অভিনন্দিত করেছেন।

কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর অন্য কোনো বৈষ্ণবগ্রন্থে, জীবনী বা পদাবলীতে মায়াপুর নামটি নেই। কবিকর্ণপূর, মুরারিগুপ্ত, জয়ানন্দ, লোচন, বৃন্দাবন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ জীবনীকারেরা গৌর জীবনের বহু বিচিত্র তথ্য পরিবেশন করলেও তাঁর জন্মস্থানকে 'নবদ্বীপ' বলেই উল্লেখ করেছেন। এঁদের নীরবতা লক্ষ্য করেই আধুনিক সমালোচকেরা মায়াপুর সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেছেন।

অবশ্য পরবর্তীকালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৪৫৮ সংখ্যক পুথি 'উর্দ্ধাম্নায়মহাতন্ত্র', 'কপিলতন্ত্র', এবং আধুনিক 'নবদ্বীপশতকে' মায়াপুর নামটি আছে।[৯] কিন্তু এগুলির প্রামাণিকতা সম্পর্কেও পণ্ডিত মহলে সন্দেহ প্রবল। অবশ্য ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণবজীবনীতে নামটি নেই বলেই যে, সেকালে এর অস্তিত্ব ছিল না, এমন যুক্তি চলে না। মায়াপুর নিতান্ত অখ্যাত পল্লী, তার পার্শ্ববর্তী উল্লেখ্য গ্রাম নবদ্বীপ—বা নবদ্বীপের মধ্যস্থ মায়াপুর[১০] এই তথ্য যদি সত্য হয়, তাহলে কবিরা অনুল্লেখ্য মায়াপুর নাম না করে উল্লেখ্য নবদ্বীপেরই নামে জানাতে পারেন। কেন না, কৃষ্ণদাস প্রমুখ মাজিদা, গাদিগাছা, সিমুলিয়া প্রভৃতি স্থানের পৃথক পৃথক নাম করেও সাধারণভাবে এগুলিকে নবদ্বীপ বলেই উল্লেখ করেছেন।

তবে কেউ অনুমান করতে পারে যে, মায়াপুর নামটিই পরবর্তীকালের সৃষ্টি। এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধীরে ধীরে তা সর্বত্র প্রচলন লাভ করে। কিন্তু এই অনুমানের পক্ষে কোনো রকম প্রামাণ্য তথ্যই দেওয়া যায় না।

---

৯. ক. বি. ৪৪৫৮ সংখ্যক পুথিটি গোপাল ভট্টের নাম যুক্ত।
উর্দ্ধাম্নায় মহাতন্ত্র—'বর্ততেহ নবদ্বীপে নিত্যধাম্নি মহেশ্বরি। ভাগীরথীতটে পূর্বে মায়াপুর গোকুলম্॥'
কপিলতন্ত্রে— 'জম্বুদ্বীপে কলৌঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে। জনিত্বা পার্ষদৈঃ সার্ধং কীর্ত্তনং কারয়িষ্যতি॥'
নবদ্বীপশতকে— 'যে মায়াপুর বৈভবে শ্রুতিগতেহপুল্লাসিনোনোখলাঃ।'

১০. নবদ্বীপমধ্যে গ্রাম নাম বহু হয়। লোকে জিজ্ঞাসিয়া মায়াপুরে প্রবেশয়॥
(ভক্তিরত্নাকর, ৮ম তরঙ্গ, পৃঃ ৩৬৫)।

আধুনিক কালের পণ্ডিতমহলে চৈতন্যজন্মভূমি নিয়ে নানা সভাসমিতি, আলাপ আলোচনা, তর্ক বিতর্ক চলেছে। জগন্নাথ দাস বাবাজীর সাহচর্যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অমানুষিক পরিশ্রম করে জঙ্গলাকীর্ণ মায়াপুর আবিষ্কার করেন [১১]—তারপর থেকেই এই তর্ক বিতর্ক শুরু হয়[১২]—যার অবসান আজও ঘটে নি।

আবার প্রাচীন ম্যাপে উল্লিখিত মিঞাপুর বা মেয়াপুরকেও কেউ কেউ মায়াপুর বলে মনে করেন।

বর্তমান মায়াপুর গঙ্গার পূর্বতীরে—ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত।[১৩] নিমগাছের তলায় যোগপীঠ, ক্ষেত্রপাল-গোপেশ্বর শিব ও নৃসিংহ মন্দির, বৃদ্ধশিবঘাট, মহাপ্রভুর ঘাট, বারকোণাঘাট, শ্রীবাসঅঙ্গন, অদ্বৈতভবন, গদাধর ভবন, চন্দ্রশেখর ভবন ইত্যাদি প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নরহরির 'ভক্তিরত্নাকরে' বর্ণিত শ্রীনিবাসাদির নবদ্বীপ পরিক্রমার বিবরণ এবং কবির সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা 'নবদ্বীপ পরিক্রমা' পুথিতে নবদ্বীপ মণ্ডলের নিম্নোক্ত স্থানাদির নাম পাই। দুটি গ্রন্থের পরিক্রমার স্থান-নাম তালিকা এক, —তবে নবদ্বীপ পরিক্রমা পুথিতে 'ভারুইডাঙ্গা' নামটি নেই। এবং মায়াপুর বা নবদ্বীপ সম্পর্কে ৩টি নতুন দর্শনীয় স্থানের নাম আছে—'চিলাডাঙ্গা', 'পাটডাঙ্গা' এবং 'বারকোণাঘাট'। পরিক্রমা স্থানগুলি উভয় গ্রন্থ থেকে পাশাপাশি উদ্ধৃত হলো

ভক্তিরত্নাকর (১২শ তরঙ্গ)	নবদ্বীপ পরিক্রমা পুথি
*১। মায়াপুর	১। মায়াপুর
২। আতোপুর	২। আতোপুর
*৩। সিমলিয়া	৩। সিমুলিয়া

১১. আবিষ্কারের পর ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃষ্ণনগর এ. ভি. স্কুলে এক বিরাট জনসভা আহ্বান করেন।

১২. এই তর্ক বিতর্কের মধ্যে সমর্থকদের নাম—দ্রঃ দেশ (৩১ শ্রাবণ, ১৩৮২) পৃঃ ১৯৭-১৯৮।

১৩. "অনেকের মতে, গঙ্গার গতি পরিবর্তনের ফলে (শ্রীচৈতন্যের) আসল জন্মস্থান লুপ্ত হয়েছিল, পরে কয়েকজন বৈষ্ণব ভক্তের ঐকান্তিকতায় শ্রীমায়াপুর উদ্ধার হয়।" —নদীয়া : স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ (১৯৭৩) পৃঃ ২১৩।

ব. বি. / ম. চ. (২) /৪১-৯

ভক্তিরত্নাকর (১২ তরঙ্গ)	নবদ্বীপ পরিক্রমা পুথি
*৪। গাদিগাছা	৪। গাদিগাছা
*৫। মাজিদা	৫। মাজিদা
*৬। বামন পৌখেরা	৬। বামনপুখরা
৭। হাটভাঙ্গা	৭। হাটভাঙ্গা
৮। কুলিয়া পাহাড়পুর	৮। কুলিয়াপাড়পুর
*৯। সমুদ্রগড়ি	৯। সমুদ্রগতি
*১০। চাঁপাহাটি	১০। চাঁপাহাটি
১১। রাতুপুর	১১। রতুপুর
*১২। বিদ্যানগর	১২। বিদ্যানগর
*১৩। জাহ্নগর	১৩। জাহ্নগর (জাহ্নদ্বীপ)
*১৪। মাউগাছি	১৪। মাউগাছি
১৫। বৈকণ্ঠপুর	১৫। বৈকুণ্ঠপুর
*১৬। মাতাপুর	১৬। মাতাপুর
১৭। রাদুপুর	১৭। রাদুপুর
*১৮। বেলপৌখেরা	১৮। বেলপুখরিয়া
১৯। সুবর্ণ বিহার (পুনরায় মায়াপুর প্রবেশ)	১৯। সুবর্ণ বিহার (পুনরায় মায়াপুরে প্রবেশ)
২০। ভারইডাঙ্গা	

(* তারকাচিহ্নিত স্থানগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে বা আজও বর্তমান আছে)

১। আতোপুর (বা অন্তর্দ্বীপ)

মায়াপুর থেকে শ্রীনিবাসাদি প্রথম আতোপুরে আসেন। গাইড ঈশান বলেন, বহুকালাবধি এই গ্রাম লুপ্ত হয়েছে। পূর্বে নাম ছিল অন্তর্দ্বীপ। এটি গঙ্গার পূর্বতীরে। এখানে সগণ গৌরচন্দ্র অবর্ণনীয় কীর্তন বিলাস করেন। এক সময় এটি রমণীয় স্থান ছিল। এখান থেকে সুবর্ণবিহার গ্রাম দেখা যায়। ঈশান অঙ্গুলি নির্দেশে শ্রীনিবাসাদিকে তা দেখিয়ে দেন।

বর্তমানে আতোপুর নামক কোন গ্রাম নেই। ১৯১৬-১৭ সালের কৃষ্ণনগর থানার সরকারী নক্সাতেও নেই, জেলা-গেজেটিয়ারেও দেখা যায় না। কোনো প্রাচীন গ্রন্থেও মেলে না। অনেকের ধারণা—নটি দ্বীপ মেলানোর জন্যেই নরহরি নামটি নিজে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ভক্তদের মতে, উত্তরে বল্লালদীঘি, পূর্বে জলঙ্গী বা খড়িয়া নদী, দক্ষিণে ভাগীরথী জলঙ্গীর সংগমস্থল, এবং পশ্চিমে দ্বীপের মাঠ, জলকর দমদমা, গঙ্গানগর পর্যন্ত এই অন্তর্দ্বীপের ব্যাপ্তি ছিল। মায়াপুর ছিল এই চতুঃসীমার মাঝে, কিছুটা উত্তরাংশে। এখন সেখানেই চৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই দ্বীপের অন্তর্গত ছিল শংখবণিক ও তন্তুবায় পল্লী, শ্রীধরের বাড়ী ইত্যাদি।

২। সিমুলিয়া (বা সীমন্তদ্বীপ)

আতোপুর থেকে সিমুলিয়া, যার প্রাচীন নাম সীমন্তদ্বীপ। ঈশানের ভাষায়, এখানে অসংখ্য পরিকর বেষ্টিত গৌরচন্দ্র বিহার করতেন, তাঁর নগরকীর্তনে অভূতপূর্ব আনন্দ প্রকাশ পেতো। এটিও গঙ্গার পূর্বতীরে। চৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডে ২৩ অধ্যায়ে[১৪] সিমুলিয়া নাম পাই।

'নদীয়ার একান্তে নগর সিমুলিয়া।' 'গঙ্গার নগর দিয়া গেলা সিমুলিয়া'।

জয়ানন্দের গ্রন্থে একেই বলা হয়েছে 'সিম্বলিয়া'। কিন্তু বর্তমানে মায়াপুর বা নবদ্বীপের নিকটে এই নামে কোন গ্রাম নেই।

ভক্তগণ বলেছেন, প্রাচীন সীমন্তদ্বীপ বল্লালদীঘির উত্তরসীমা থেকে রুকনপুর পর্যন্ত অর্থাৎ সোনডাঙ্গা, রাজাপুর, মোল্লাপাড়া, বিষ্ণুনগর, বামনপুখুর, সরডাঙ্গা ইত্যাদি স্থানে পরিব্যাপ্ত ছিল।

বর্তমানে কাজীর বাড়ী ও সমাধি, যেখার চর ভক্তেরা দর্শন করেন। পরিক্রমাকালে সমাধিক্ষেত্রের ধুলো তাঁরা মাথায় নেন, গায়ে মাখেন ও কথকের মুখে কাজী উদ্ধার লীলা (চৈতন্যভাগবত থেকে) শোনেন। এ দুটি স্থানকে সিমুলিয়ার অন্তর্গত বলা হয়।

১৪. শ্রীচৈতন্যভাগবত। মধ্য। ২৩।৩৪৭, ৩০০ (পয়ার)।

৩। গাদিগাছা (বা গোদ্রুমদ্বীপ)

গঙ্গার পূর্বতীরে গাদিগাছা। এর প্রাচীন নাম গোদ্রুমদ্বীপ। এখানেও 'শ্রীগৌরাঙ্গের অদ্ভুতবিহার'। চৈতন্যভাগবতে গাদিগাছার নাম পাই।[১৫]

ভক্তদের মতে, বর্তমান নবদ্বীপের পূর্বদিকে যে স্বরূপগঞ্জ, মহেশগঞ্জ, তিওরখালি, আমঘাটা, শ্যামনগর, বিরিজ, দেপাড়া, হরিশপুর, সুবর্ণ-বিহার প্রভৃতি গ্রামগুলি আছে, এ সবই সেকালে গোদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত ছিল।

বর্তমানে গাদিগাছা নামে একটি গ্রাম আছে—বর্তমান মায়াপুরের প্রায় দুমাইল দক্ষিণে, জলঙ্গী পেরিয়ে, গঙ্গার পূর্বতীরে। সম্প্রতি ভক্তি বিনোদ ঠাকুর এখানে "সুরভিকুঞ্জ" প্রতিষ্ঠা করেছেন।

৪। মাজিতা বা মাজিদা (বা মধ্যদ্বীপ)

গঙ্গার পূর্বতীরে মাজিতা, যার পূর্বনাম মধ্যদ্বীপ বলে উল্লিখিত। নরহরির ভাষায় এখানেও 'গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিলাস'। চৈতন্যভাগবতে (মধ্য ২৩।৪৯৪) মাজিতার নামটি পাওয়া যায়।

নরহরি জানিয়েছেন যে, "বামুনপোখেরা" ও "হাটভাঙ্গা" গ্রাম দুটি মাজিতার অন্তর্গত এবং গঙ্গাতীরে কুমারহট্টের নিকটে "সপ্তঋষি ঘাট"—যেখানে সপ্ত ঋষি গৌরচন্দ্রের ভজনা করেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে।

ভক্তদের মতে, মাজিদা, ওয়াসিদপুর, বামনপাড়া, সিমুলগাছি, ইত্যাদি স্থান মিলে সেকালের মধ্যদ্বীপ গঠিত হয়।

১৯১৬-১৭ সালের কৃষ্ণনগরের মানচিত্রে মাজিদহ নামক একটি গ্রাম দেখা যাচ্ছে। এটি মায়াপুর থেকে প্রায় ৩ মাইল বা গাদিগাছা থেকে প্রায় ১ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

(খ) মাজিদা থেকে বামনপোখেরা গ্রাম, এর প্রাচীন নাম "ব্রাহ্মণপুষ্কর"। পুরাবৃত্তে আছে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কষ্ট নিবারণার্থে পুষ্করতীর্থ এখানে আগমন করেন। বর্তমানে 'বামুনপুরা' নামক একটি স্থান আছে, যা মাজিদহ থেকে প্রায় ১½ মাইল ও মায়াপুর থেকে প্রায় ৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ভক্তেরা ন

১৫. শ্রীচৈতন্যভাগবত। মধ্য-২৩।৪৯৪, ৪৯৮ (পয়ার)।

একেই প্রাচীন বামনপোখেরা বলেন এবং এখনো এখানে তীর্থযাত্রীদের পুষ্করতীর্থের চিহ্ন দেখানো হয়, যাত্রীরা তা স্পর্শ করেন।

(গ) হাটডাঙ্গার প্রাচীন নাম উচ্চহট্ট। কিন্তু এই অঞ্চলে এ নামে কোনো স্থান নেই। প্রাচীন গ্রন্থে বা ম্যাপেও নামটি মেলে নি।

৫। কোলদ্বীপ (বা কুলিয়া পাহাড়পুর)

কোলদ্বীপ গঙ্গার পশ্চিমতীরে। এর প্রচলিত নাম কুলিয়া পাহাড়পুর। বৈষ্ণবেরা বর্তমান নবদ্বীপ শহর, কাসিমপুর, ওসমানগঞ্জ, গঙ্গাপ্রসাদ, গদখালিচর প্রভৃতি স্থানকে কোলদ্বীপের অন্তর্গত বলে প্রচার করেছেন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নবদ্বীপ অঞ্চলের কোনো কোনো স্থানের নামের সঙ্গে কোল শব্দটি যুক্ত ছিল—যেমন—কোলের দহ, কোল আমাদ, গদখালির কোল, কোলের গঞ্জ ইত্যাদি। এ থেকে অনুমিত হয় যে, এই অঞ্চলের কিছু কিছু স্থানের সমষ্টিগত নাম কোলদ্বীপ থাকতে পারে।

প্রাচীন গ্রন্থগুলির মধ্যে একমাত্র প্রেমদাসের 'বংশীশিক্ষা'য় কুলিয়াপাহাড় নামক একটি স্থানের নাম আছে, যা নদীয়ার মধ্যবর্তী ও বংশীবদন চট্টের জন্মস্থান।

"নদীয়ার মাঝখানে সকল লোকেতে জানে কুলীয়াপাহাড নামে স্থান।
তথায় আনন্দধাম শ্রীছকড়ি চট্ট নাম মহাতেজা কুলীন সন্তান।।" [১৬]

এ গ্রন্থেই পরে একেই সংক্ষেপে "কুলিয়া" বলা হয়েছে :

"শ্রীছকড়ি চট্ট······কুলিয়ায়। বাস করিলেন"···[১৭]

নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী তাঁর 'বৈষ্ণবাচার দর্পণে' লিখেছেন যে, দেবানন্দ পণ্ডিত ও চৈতন্য শাখাভুক্ত ওঝা-বনমালীর নিবাস ছিল 'কুল্যা পাহাড়পুর'।[১৮] কবিকর্ণপূরের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে', 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে,' বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃতে', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'[১৯], 'প্রেমবিলাসে'[২০] কুলিয়ার নাম আছে।

---

১৬. বংশীশিক্ষা (যোগেন্দ্রনাথ দে প্রকাশিত, ১৩৩১) পৃঃ ৬, ১ম উল্লাস।

১৭. বংশীশিক্ষা (যোগেন্দ্রনাথ দে প্রকাশিত, ১৩৩১) পৃঃ ৬, ১ম উল্লাস।

১৮. বৈষ্ণবাচার দর্পণ (৪র্থ সং, ১৩৩৬) পৃঃ ৩৪২-৩৪৩।

১৯. নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাথ (পরিষৎ, ১৩১২) পৃঃ ৯৪।১৪০-১৪১।

২০. ত্রয়োদশ বিলাস, ২০ পৃঃ, চতুর্বিংশ বিলাস, ২৪০ পৃঃ।

আবার কবিকংকণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে সমুদ্রগড়ির পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামের নাম 'পাড়পুর' ('সমুদ্রগড়ি পাডপুর বায় ত্বরাত্বরা')।[২১]

এ থেকে মনে হয় যে, সেকালে কুলিয়া ও পাহাড়পুর নামে দুটি ছোট বড় অতি-নিকটস্থ গ্রাম ছিল। তন্মধ্যে কুলিয়াই উল্লেখ্য গ্রাম, তাই অনেক সময় কবিরা শুধু কুলিয়া নামই করেছেন। আবার কুলিয়া নামে নিকটবর্তী কোনোও বিখ্যাত গ্রাম থাকাটা অসম্ভব নয়, তার সঙ্গে পার্থক্য দেখাতেই হয়তো প্রাথমিক পরিচিতিতে পাহাড়পুরের নাম যোগ করে দেওয়া হয়েছে।

কুলিয়ার অবস্থান সম্পর্কে নরহরি কিছুই বলেন নি। চরিতামৃতে বলা হয়েছে যে, শ্রীচৈতন্য কুমারহট্ট ও কাঞ্চনপল্লী হয়ে বাচস্পতি গৃহে আসেন, এখান থেকে লোক-ভীড় এড়ানোর উপায় হিসেবে তিনি কুলিয়ায় মাধবদাসের গৃহে ৭ দিন অবস্থান করেন। অর্থাৎ কুলিয়ায় বাচস্পতির গৃহ (বিদ্যানগরের নিকটে) ছিল। 'চৈতন্যভাগবতে' (অন্ত্য। ৩য়) আছে, 'সবে গঙ্গামধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়'—'গঙ্গার ওপারে কভু ধায়েন কুলিয়া'। অর্থাৎ কুলিয়া গঙ্গাতীরে (তীরসংলগ্ন), এবং তা নবদ্বীপের অন্যপারে (চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে—'নবদ্বীপস্য পারে') অর্থাৎ এখনকার মায়াপুরের বিপরীত দিকে গঙ্গার পশ্চিম তীরে। এ জন্যেই অনেকের অনুমান বর্তমান নবদ্বীপ-ই প্রাচীন কুলিয়া।[২২]

৬। ঋতুদ্বীপ (বা রাতুপুর)

গঙ্গার পশ্চিমতীরে ঋতুদ্বীপ বা রাতুপুর। সমুদ্রগড়ি, চম্পকহট্ট ও রাতুপুর ইত্যাদি স্থান নিয়ে এই দ্বীপ গঠিত হয়।

(ক) নরহরি বলেন যে, সমুদ্রগড়ি গ্রামটির আসল নাম সমুদ্রগতি। প্রভুকে দর্শন করতে গঙ্গার সঙ্গে সমুদ্র এখানে আসেন বলেই এর এই নাম। এখানে 'ভক্তালয়ে গৌরাঙ্গের বিলাস' প্রকটিত হয়।

সাম্প্রতিক বর্ধমান জেলায় 'সমুদ্রগড়' নামক একটি স্থান আছে। তা বর্তমান নবদ্বীপের ৪½ মাইল দক্ষিণে (কিছুটা দক্ষিণ-পশ্চিমে) এবং কালনা থেকে প্রায় ৬ মাইল উত্তরে, পূর্ব রেলওয়ের উপরে, গঙ্গাতীর থেকে প্রায় ২

২১. 'চণ্ডীমঙ্গল'—(সাহিত্য অকাদেমী, ১৩৮২) শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত, পৃঃ ২৩০।

২২. সজ্জনতোষিণী (৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা)—'অপরাধ ভঞ্জন পাট' প্রবন্ধ, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

মাইল পশ্চিমে। এখানে মহাপ্রভুর বিগ্রহ ও লছমনজীউ বর্তমান। ভক্তেরা একেই প্রাচীন সমুদ্রগড়ি বলে শ্রদ্ধা করে আসছেন।

(খ) চম্পকহট্টের প্রচলিত নাম চাঁপাহাটি। নরহরি বলেন, এখান 'সগণ গৌরচন্দ্র অপূর্ব বিলাস' প্রকাশ করেন। এখানে গৌরপ্রিয় প্রেমময় বাণীনাথের গৃহ ছিল।

চাঁপাহাটি বর্তমান বর্ধমান জেলায় অবস্থিত, নবদ্বীপ শহর হতে মাত্র ২ মাইল পশ্চিমে। এখানে বাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর বিগ্রহ আজও পূজিত হন। ১৩২৮ সালে চৈতন্যমঠের সেবকেরা এখানে নতুন মন্দির, নলকূপ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

(খ) রাতুপুর সম্পর্কে গ্রন্থকার লিখেছেন যে, এক সময় এটি এক বৃহৎ গ্রাম ছিল, এখন (কবির কালে বা শ্রীনিবাসের সময়) গ্রামটি বিলুপ্ত—তার নামমাত্র শোনা যায়। এখানেও 'গৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত বিহার'। এখানে ছয় ঋতু সব সময় স্পষ্ট অনুভূত হয় বলেই এর নাম ঋতুদ্বীপ।

১৯১৬-১৭ সালের কৃষ্ণনগর থানার সরকারী নক্সায় রাতুপুর ও রাতুপুরচর নামে দুটি বিশেষ স্থান দেখা যায়। গ্রামটি চাঁপাহাটির নিকটেই (উত্তর পশ্চিমে) অবস্থিত ছিল। বর্তমানে এই নামে কোনো গ্রাম নেই।

৭। জহ্নুদ্বীপ (জাহ্নগর বা জান্নগর)

ঋতুদ্বীপ থেকে শ্রীনিবাসাদি জাহ্নদ্বীপে আসেন। এই দ্বীপের অন্তর্গত বিদ্যানগর ও জাহ্নগরের নাম উল্লিখিত হয়েছে।

(ক) বিদ্যানগর গ্রামে 'সগণ গৌরাঙ্গ ভক্তালয়ে মহারঙ্গে বিহার' করেছিলেন। ভক্তেরা বলেন, এখানেই গদাধর পণ্ডিতের টোল ছিল, চৈতন্যদেব এখানে কলাপ-ব্যাকরণাদির পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণব-জীবনীতে এই তথ্য পাওয়া যায় না।

যে বিদ্যানগরের উল্লেখ 'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃতে' পাওয়া যায়, সেটি আলোচ্য বিদ্যানগর নয়। সেটি গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের রাজকার্যস্থল। এই বিদ্যানগরের নাম আছে বৃন্দাবনদাসের বৈষ্ণববন্দনা পুথিতে। আলোচ্য বিদ্যানগর এখনো বর্তমান—বর্ধমান জেলায়, চাঁপাহাটি থেকে প্রায় আড়াই মাইল উত্তর পশ্চিমে।

(খ) জান্নগরের পূর্ব নাম জান্নদ্বীপ বা জহ্নুদ্বীপ। নরহরি বলেন—

"জহ্নুদ্বীপে গৌরচন্দ্রের যে বিহার। সে সব ভাবিতে হিয়া বিদরে আমার ॥" সেকালে এখানে 'পুষ্পময় অপূর্ব কানন' ছিল।

জান্নগর আজও বর্তমান; নবদ্বীপের প্রায় ৩ মাইল পশ্চিমে। এর উত্তরে মামগাছি।

৮। মোদ্রদ্রুমদ্বীপ (বা মাউগাছি)

গোস্বামীদের মতে মাউগাছি, ভাণ্ডারকুলা, পারুলিয়া, একডালা, মহৎপুর, বৈকুণ্ঠপুর, বাব্‌লারি-দেওয়ানগঞ্জ প্রভৃতি স্থান মিলে সেকালে মোদ্রদ্রুমদ্বীপ গঠিত হয়েছিল। নরহরি তন্মধ্যে মাউগাছি, বৈকুণ্ঠপুর, মহৎ-পুর—এই তিনটি গ্রামের নাম উল্লেখ করেছেন।

(ক) মাউগাছির পূর্বনাম মোদ্রদ্রুমদ্বীপ। এখানেও শ্রীচৈতন্য 'করিলা অদ্ভুত লীলা অন্য অগোচর'। বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় বলা হয়েছিল, এখানেই সদাশিব ভট্টাচার্যের বাসস্থান ছিল, যিনি চৈতন্যের জন্মদিনে শচীমাতার গৃহে উপস্থিত হন।[২৩] নরহরি 'নবদ্বীপ পরিক্রমা' পুথিতে বলেছেন যে, পূর্বে এখানে 'রামবট' নামক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ছিল।

মাউগাছিকে মামগাছিও বলা হতো। প্রেমবিলাসে[২৪] এর উল্লেখ আছে। স্থানটি পূর্বোক্ত কৃষ্ণনগরের নক্সায় দেখা যায়—এটি গঙ্গার পশ্চিম তীরে প্রাচীন মায়াপুর থেকে প্রায় ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। মামগাছি আজও বর্তমান। এখানে শার্ঙ্গমুরারি পূজিত রাধাগোবিন্দ বিগ্রহের একটি মন্দির নির্মিত হয়েছে।

(খ) বৈকুণ্ঠপুর সম্পর্কে নরহরি বলেন যে, এখানে ভক্তগোষ্ঠীসহ শচীকুমার 'অশেষ বিহার' করেছিলেন। এক সময় এখানে ঘনবসতি ছিল, মাঝে লোক বসতি কমে যায়, পুনরায় (শ্রীনিবাসের কালে) ঘনবসতি গড়ে ওঠে। বৈকুণ্ঠপুরের প্রসিদ্ধ স্থান ছিল নারায়ণপীঠ। প্রবাদ যে, এখানে নারদ নারায়ণের দর্শন লাভ করেন।

---

২৩. বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, পৃঃ ২২৪-২২৫।

২৪. প্রেমবিলাস, ২৩ অধ্যায়, পৃঃ ২২২।

এই নামে কোনো গ্রাম প্রাচীন গ্রন্থে ও ম্যাপে পাই না। বর্তমানে নবদ্বীপ অঞ্চলে 'বৈকুণ্ঠপুর' নামে গ্রাম নেই।

(গ) মহৎপুর (বা মাতাপুর) মাতাপুরের প্রাচীন নাম মহৎপুর। এখানেও 'সপরিকর গৌরাঙ্গের অদ্ভুত লীলা' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার আরো বলেন, এখানে একটি প্রকাণ্ড 'পঞ্চবটবৃক্ষ' ও 'যুধিষ্ঠির টিলা' ছিল, কালে এদুটি নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

পূর্বোক্ত নক্সায় মহৎপুর গ্রাম আছে—তা প্রাচীন মায়াপুর থেকে প্রায় সাড়ে তিন মাইল পশ্চিমে—গঙ্গা পেরিয়ে।

নদীয়া জেলার মহৎপুর নামক বর্তমানে যে গ্রামটি দেখা যায়, তা মায়াপুর থেকে প্রায় ৮ মাইল পূর্বে, জলঙ্গীতীরে, ধুবলিয়া বিমান ঘাটির ৪ মাইল পূর্বে, সুতরাং এটি নরহরি কথিত মহৎপুর হতে পারে না।

কেউ কেউ অনুমান করেন যে, বর্তমান বর্ধমান জেলায় (নবদ্বীপ ও পূর্বস্থলীর মধ্যবর্তী গঙ্গাতীরে) যে মাধাইপুর বা মাধাইতলা গ্রাম—তা-ই প্রাচীন মহৎপুর।[২৫] এখানে গৌরনিতাই সেবার নতুন মন্দির নির্মিত হয়েছে। এটি প্রাচীন মহৎপুর বা মাতাপুর হওয়া অসম্ভব নয়।

৯। রুদ্রদ্বীপ (বা রাতুপুর)

নরহরি জানিয়েছেন যে, গঙ্গার পশ্চিমতীরে রুদ্রদ্বীপ অবস্থিত ছিল। এর চলিত নাম রাতুপুর। গ্রামটি ক্রমে লুপ্ত হয় এবং শ্রীনিবাসের সময় এর নাম মাত্র শোনা যায়। বৈষ্ণবভক্তদের মতে, ভাগীরথীর পশ্চিমস্থ ইন্দ্রাকপুর, শংকরপুর ও পূর্বতীরস্থ রুদ্রপাড়া, চর-নিদয়া ও টোটা প্রভৃতি স্থান একত্রে রুদ্রদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল।

রাতুপুরে গৌরাঙ্গের লীলাবিলাসের কোনো কথা 'ভক্তিরত্নাকরে' বলা হয় নি। জানানো হয়েছে যে, শ্রীরুদ্রদেব এখানে গৌরসুন্দরের আলিঙ্গন লাভ করেছিলেন। রুদ্রের বিলাস হেতুই রাতুপুর নাম। ঈশান অন্য সব স্থানে শ্রীনিবাসাদিকে গৌরলীলার পুরাবৃত্ত শুনিয়েছিলেন, এখানে স্থানমহিমা জানিয়েই অন্যত্র গমন করেছেন।

---

২৫. হরিদাস দাস—গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (৪) পৃঃ ১৯২৫।

বর্তমানে রাতুপুর নামে কোনো গ্রাম গঙ্গার কোনো তীরেই নেই।[১০৮] ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয় বর্তমান রুদ্রপাড়াকে প্রাচীন রুদ্রদ্বীপের বিশেষ অংশ' মনে করে এখানে 'শ্রীরুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ' প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এই নামটি পুরানো বৈষ্ণবগ্রন্থ বা মানচিত্রে পাই না।

নরহরি রাতুপুরের পরেই বেলপৌখেরা, ভারইডাঙ্গা ও সুবর্ণবিহার পরিক্রমার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এগুলি রুদ্রদ্বীপের অন্তর্গত ছিল কিনা, তা স্পষ্ট করে বলেন নি।

(ক) বেলপৌখেরার প্রাচীন নাম বিল্বপক্ষ। এখানেও 'সগণ বিশ্বম্ভর অবর্ণনীয় বিলাস' করেন। পূর্বোক্ত নক্সায় দেখা যায়, বেলপুকুর নামক একটি গ্রাম রুদ্রপাড়া থেকে প্রায় ৩½-৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত, যা মায়াপুর থেকে ২½-৩ মাইল উত্তরে গঙ্গার পূর্বতীরে। গ্রামটি আজও বর্তমান।

(খ) ভারইডাঙ্গার প্রাচীন নাম ভরদ্বাজটীলা। এখানেও 'গৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত বিলাস'। এক সময় এখানে ঘনবসতি ছিল।

১৯১৭ সালের প্রস্তুত ৭৯. এ. ৭ নং ম্যাপে ভারইডাঙ্গাকে "Balaidanga" লেখা হয়েছে। এটি মায়াপুর থেকে প্রায় ৩½ মাইল উত্তরে। গ্রামটির নাম প্রাচীন গ্রন্থে নেই। এখন এটি বিলুপ্ত।

(গ) সুবর্ণবিহারের কোনো প্রাচীন নাম গ্রন্থকার বলেন নি। পূর্বাপর একই নাম। এখানে, 'ভক্তগোষ্ঠীসহ গৌরাঙ্গের নৃত্য' সাধারণ মানুষকে বিহ্বল করেছিল। লোকে নিত্যরত গৌরচন্দ্রকেই সুবর্ণপ্রতিমা মনে করেছিল।

সুবর্ণবিহারের নাম অন্যত্র না পেলেও গ্রামটি অদ্যাপি বিদ্যমান। মায়াপুর থেকে ৫ মাইল দক্ষিণপূর্বে, গঙ্গার পূর্বতীরে।

সুবর্ণবিহার থেকে পুনরায় শ্রীনিবাসাদি মায়াপুরে মহাযোগপীঠে গমন করেন।

এই আলোচনায় দেখা গেল যে, নরহরি কথিত নবদ্বীপমণ্ডলের ২০টি গ্রামের মধ্যে ১১টি গ্রাম অদ্যাপি বর্তমান। এবং মাতাপুর নামক ১টি গ্রামের সম্পর্কে এখনো স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নি। যদি মাতাপুর কালক্রমে কোনো কারণে পরিবর্তিত হয়ে মাধাইপুর হয়, তাহলে ২০টির মধ্যে অন্ততঃ ১২টি গ্রাম আজও দেখা যাচ্ছে।।

খ। নরহরির উল্লিখিত বৃহত্তর বঙ্গের প্রাচীন শ্রীপাট ও অন্যান্য স্থান ঃ

'ভক্তিরত্নাকরে' নবদ্বীপমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল ব্যতীত অন্যান্য ৭১টি স্থানের নামাদি পাওয়া যায়। তন্মধ্যে * তারকাচিহ্নিত ৫৮টি স্থান আজও বর্তমান। (বন্ধনীর সংখ্যা গ্রন্থের তরঙ্গ। শ্লোক-নির্দেশক)

*১। অগ্রদ্বীপ (৪।১৬২)—বর্তমান বর্ধমান জেলায় কাটোয়ার ৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। প্রাচীন স্থান গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত। পাশে নতুন শহর গড়ে উঠেছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নির্মিত মন্দির আছে। গোবিন্দ-মাধব-বাসুঘোষের বসবাস ছিল।

*২। অম্বিকা (অম্বিকানগর) (৬।১৭)—বর্তমান বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। নাম অম্বিকা কালনা। গৌরদাস, সূর্যদাস পণ্ডিত, হৃদয়চৈতন্য ও কৃষ্ণদাস সরখেলের শ্রীপাট।

*৩। আকাটহাট (১০।৪০৯)—বর্ধমান জেলায় দাইহাটের ১ মাইল পূর্বে। কালাকৃষ্ণ দাসের সমাধি ও নূপুর আছে।

*৪। উৎকল (৬।৮৮-৮৯)—প্রাচীন কলিঙ্গের দক্ষিণ ভাগ (উড়িষ্যা) ভুবনেশ্বর, কটক, পুরী প্রভৃতির সামগ্রিক নাম। (চৈ. ভা. অন্ত্য ৩।২৬৯)।

*৫। একচক্রা (১১।৪৩২)—বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমায় অবস্থিত। নতুন নাম বীরচন্দ্রপুর। নিত্যানন্দ ও বীরচন্দ্র-প্রভুর শ্রীপাট (চৈ. ভা., চৈ. চ)।

*৬। কড়ুই (কড়ুই) (১০।১৩৯)—বর্ধমান জেলায় মঙ্গলকোট থেকে পূর্বে। এরই ৫ মাইল উত্তরে শ্রীখণ্ড। গোকুল কবীন্দ্রের প্রথম বাসস্থান।

*৭। কণ্টকনগর (২।২৪, ৮।৪৪৫) বর্তমান কাটোয়া। (চৈ. ভা., চৈ. চ. মধ্য)।

*৮। কাঞ্চনগড়িয়া (১০।২৪-২৫)—মুর্শিদাবাদ জেলায় কাঁদি মহকুমার ভরতপুর থানায় অবস্থিত। শ্রীনিবাসশিষ্য নৃসিংহ কবিরাজ ও বৃন্দাবন চট্টরাজের শ্রীপাট।

*৯। কানাইর নাটশালা (১২।২৩৫১)—সাঁওতাল পরগণার দুমকা জেলায় অবস্থিত। রাজমহল ষ্টেশন থেকে ৫ মাইল। পোঃ তালঝরি। গয়া গমনকালে চৈতন্যদেব এখানে শ্রীকৃষ্ণদর্শন করেন।

*১০। কুণ্ডলীদমন (৪।১৬৬)—বর্তমান নাম 'কুণ্ডলতলা'। বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া ষ্টেশন থেকে ৪ মাইল উত্তরে। নিত্যানন্দের কর্ণকুণ্ডল আছে।

*১১। কুমারহট্ট (১২।৩০২)—নতুন নাম 'কুমারহাটি'। ২৪ পরগনা জেলায়, হালিসহর স্টেশন থেকে ৪ মাইল পশ্চিমে। ঈশ্বরপুরীর আবির্ভাব স্থান (চৈ. চ. মধ্য ১৬।২০৫)।

*১২। খানাকুল-কৃষ্ণনগর (৪।১৪৮, ৮।২২২)—অপর নাম বীরলোক (ভক্তিরত্নাকর ৪।৯৭—১০০)। হুগলী জেলার চাঁপাডাঙ্গার ৯ মাইল দূরে দারকেশ্বর নদীতীরে। অভিরাম গোস্বামীর শ্রীপাট।

*১৩। খড়দহ (১।৭৬৭)—২৪ পরগণা জেলায়। ষ্টেশন থেকে ২ মাইল পশ্চিমে নতুন মন্দির নির্মিত। বীরচন্দ্রের জন্মস্থান।

১৪। খাড়গ্রাম (১।৬৮২)—পরিচয় জানা যায় না।

*১৫। খানচোঁড়া (১২।৩৮৪৮)—অপর নাম 'খানাজোড়া' বা 'খালাছড়া'। নদীয়া জেলার নবদ্বীপের নিকটবর্তী। নিত্যানন্দের বিহার ভূমি (চৈ. ভা. অন্ত্য ৫।৭০৯)।

*১৬। খেতুরী (১।৪৩৩)—রাজশাহী জেলায়। রামপুর-বোয়ালিয়র থেকে ১২ মাইল দূরে। লালগোলাঘাট থেকে প্রেমতলী দিয়ে ২ মাইল। সন্তোষ দত্ত নির্মিত প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। নতুন মন্দির নির্মিত হয়েছে। নরোত্তমের শ্রীপাট।

১৭। গোপালপুর (১।৪৬৪, ১০।১৯৩, ১৩।২০৪)—পরিচয় নেই।

*১৮। ঘণ্টাশিলা (১৫।৩০-৩১, ৪৮)—নতুন নাম ঘাটশিলা'। মেদিনীপুর জেলায় সুবর্ণরেখার তীরে। রসিকানন্দের দীক্ষাস্থল।

*১৯। চক্রদহ (১২।৭৯৭-৭৯৮)—নতুন নাম 'চাক্‌দা', অতি প্রাচীন নাম 'চক্রদ্বীপ'। বর্তমান নদীয়া জেলার একটি থানা। মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট।

*২০। চক্রশালা (১২।১৮০২)—চট্টগ্রাম জেলায়। পুণ্ডরীক বিদ্যা-নিধির জন্মস্থান।

২১। চাকন্দি (১।৮৬২)—নদীয়া জেলায় অগ্রদ্বীপের ৩ মাইল উত্তরে। অধিকাংশ স্থান গঙ্গাগর্ভে, প্রাচীন গ্রাম লুপ্ত। শ্রীনিবাসের জন্মস্থান।

*২২। চাটিগ্রাম (১২।১৮০২)—চট্টগ্রাম জেলাকে বলা হতো (চৈ. ভা. আদি ২।৩১)।

*২৩। ঝাড়িখণ্ড (১।৬৭৫)—রাঁচি জেলার বর্তমান বোনাই, গাঙ্গপুর, সরগুজা, লাহারা, বামড়া, আটগড়, ছোটনাগপুর, কেন্‌ঝর প্রভৃতি স্থানের সামগ্রিক নাম (চৈ. চ. মধ্য ১৭।২৫-২৬, ৫৩-৫৪)।

*২৪। ঝামটপুর (১৩।২৪৯)—বর্ধমান জেলায়। গঙ্গাটিকুরীর ৩ মাইল উত্তরে বর্তমান। কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্মস্থান।

*২৫। তড়া-আটপুর (১৩।২৪৫)—নতুন নাম 'আঁটুরবটী'। হুগলী জেলার চাঁপাডাঙ্গা থেকে ৫ মিনিটের পথ। পরমেশ্বর দাসের শ্রীপাট।

*২৬। তামড় (৭।৪৬)—বাঁকুড়া জেলার বন-বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী। এখান থেকেই বীর হাম্বীরের দস্যুদল শ্রীনিবাসের পুথি ভর্তি গাড়ির অনুসরণ করেছিল।

*২৭। তালখড়ি (তালখেড়া) (১।২৯৫)—যশোহরের মাগুরার অন্তর্গত, যশোহর থেকে ১৮ মাইল উত্তরে। লোকনাথ চক্রবর্তীর শ্রীপাট।

*২৮। তেলিয়া বুধরি (৯।১২৬)—মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলার ১ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। নাম—বুধরি। রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ দাসের শ্রীপাট।

*২৯। দণ্ডেশ্বর (৬।১৭)—মেদিনীপুর জেলায় সুবর্ণরেখার তীরে। শ্যামানন্দের পিতার বসতিস্থল।

*৩০। দেউলি (১০।১৩৪)—বাঁকুড়া বন-বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী, দ্বারকেশ্বর তীরে। শ্রীনিবাসশিষ্য কৃষ্ণবল্লভের জন্মস্থান।

*৩১। দোগাছিয়া (১২।৩৮৪৮)—নাম 'দোগেছে'। নদীয়া জেলায় নিত্যানন্দের বিহার ভূমি। বলরামদাসের শ্রীপাট। (চৈ. ভা. অন্ত্য ৫।৭০৯)।

*৩২। ধারেন্দা (৭।৪৬২)—মেদিনীপুর জেলার দণ্ডেশ্বর গ্রামের নিকটবর্তী, রোহিণী গ্রামের ৫ মাইল দূরে। শ্যামানন্দের অনেক শিষ্যের বসতি স্থান।

*৩৩। নবহট্ট (১।৫৫৬)—নাম 'নৈহাটি'। বর্ধমান কাটোয়ার ৩ মাইল উত্তরে।

৩৪। নাগদ্বীপ (১২।৩৪)—পরিচয় মেলে নি।

৩৫। পঞ্চকুট (৯।৩০৮)—বর্তমানে লুপ্ত। অন্যনাম ছিল পাঁচেট।

৩৬। পাটডাঙ্গা (১২।৩১৪২)—পরিচয় মেলে নি।

৩৭। পাটলগ্রাম (৫।৭৮১)—পরিচয় মেলে নি।

*৩৮। পানিহাটি (৮।১০৬, ৬।৬৩)—২৪ পরগণা জেলায় বর্তমান। গঙ্গাতীরে শ্রীরাঘব ভবন, দাসগোস্বামীর দণ্ডোৎসব স্মৃতিবাহী বটবৃক্ষ বিদ্যমান। এখানে পাঠবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এখানের সংগৃহীত পুথিপত্র বরাহনগরে স্থানান্তরিত হয়েছে।

*৩৯। পৌলস্ত্যদেশ (১।৫৫০)—সপ্তগণ্ডকী-রেঞ্জ পর্বতের সানুদেশে মধ্য তিব্বতের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত (চৈ. ভা. আদি ৯।১২৬)।

*৪০। ফতেয়া বা ফতেয়াবাদ (১।৭৪১; ১।৫৬৬, ৬৪৮)—বর্তমান নাম 'ফরিদপুর'—যশোহরে। কুমারদেবের বাস ছিল।

*৪১। ফাগুতলা (৬।১৪৬)—মাদ্রাজের অনন্তপুর জেলায়। নতুন নাম 'ফাল্গুন'। (চৈ. চ. মধ্য ৯।২৭৮)। গৌরপদাংকিত ভূমি।

*৪২। ফুলিয়া (১২।৩৫৮৫)—নদীয়া জেলায় হরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাঠ। কৃত্তিবাসের জন্মস্থান।

*৪৩। বড়গাছি (১২।৩৮৪৮-৩৮৫০)—নতুন নাম 'বাহিরগাছি'। নদীয়া জেলায় ই. আই. আর পথে মুড়াগাছা থেকে ২ মাইল উত্তরে। (চৈ. ভা. অন্ত্য ৫।৭১০-৭১১)

*৪৪। বন-বিষ্ণুপুর (১।৮৮২)—বাঁকুড়া জেলায় মহকুমা শহর। বীরহাম্বীরের শ্রীপাট।

৪৫। বন্দিঘাটী (১২।৩৮৮৮)—পরিচয় নেই।

*৪৬। বলরামপুর (১৫।৫৯)—মেদিনীপুর জেলায় ঘাটাল থেকে ৪২ মাইল উত্তরে। শ্যামানন্দের লীলাস্থল, তাঁর শিষ্য যদুনাথের শ্রীপাট।

৪৭। বাকলা চন্দ্রদ্বীপ (১।৫৬৫)—বিলুপ্ত। পাবনা, ঢাকার দক্ষিণাংশ, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ মিলে চন্দ্রদ্বীপ সৃষ্ট হয়েছিল। উল্লিখিত চন্দ্রশেখরের আবির্ভাবস্থান নদীগর্ভে নিমজ্জিত।

*৪৮। বারান্বিত গ্রাম (১৫।২৩-২৪)—মেদিনীপুর জেলায় রোহিণীর নিকটবর্ত্তী।

*৪৯। বাহাদুরপুর (১০।২৭৯)—মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা থানার অন্তর্গত। শ্যামদাস চক্রবর্তীর শ্রীপাট।

*৫০। বোরাকুলি (১৪।৮৯)—মুর্শিদাবাদ জেলায় পদ্মার পশ্চিমতীরে পাতিবোনা স্টীমার ঘাট থেকে ৪ মাইল।

*৫১। ভট্টবাটী গ্রাম (১।৫৯৪)—মালদহ জেলায় পিয়াসবাটীর নিকটবর্ত্তী।

*৫২। মহুলা (১৪।৯২)—মুর্শিদাবাদ জেলায়। গোবিন্দ চক্রবর্তীর আদিবাসস্থান।

*৫৩। মৌড়েশ্বর (৪।১৬৪)—বীরভূম জেলায় একটী থানা। মৌড়েশ্বর শিব আছেন।

*৫৪। যাজপুর (১।৮৭১)—উৎকলে বৈতরণীতীরে। (চৈ. ভা. আদি ২।২৮০)

*৫৫। যাজিগ্রাম (৪।১৫৬)—শ্রীখণ্ডের ২ মাইল পূর্বে বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। শ্রীনিবাস-শ্রীপাট।

*৫৬। রঘুনাথপুর (৭।৪৭)—সঠিক পরিচয় বলা যাচ্ছে না। বিখ্যাত দুটি গ্রাম, একটি পুরুলিয়া ও অপরটি বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত।

*৫৭। রয়ণী (রোহিণী) গ্রাম (১৫।২১)—মেদিনীপুর জেলায় সুবর্ণ-রেখার তীরে। রসিকানন্দের শ্রীপাট।

*৫৮। রাজবলহাট (১৩।২৪৯)—বর্ধমান জেলায় ঝামটপুরের নিকটবর্তী।

৫৯। রাধানগর (৬।৮৯)—উৎকলে।

*৬০। রামকেলি—মালদহ জেলায় পিয়াস বাড়ীর পশ্চিমে বর্তমান। শ্রীসনাতন-শ্রীরূপের প্রথম জীবনের বসবাসস্থল, রাজধানী ইত্যাদি।

*৬১। ললিতপুর (১২।১৯৬৬)—নদীয়া জেলায় নবদ্বীপের দক্ষিণে (চৈ. ভা. মধ্য ১৯।৪২)

*৬২। শালিগ্রাম (৭।৩৩১)—নদীয়া জেলায় বাহিরগাছির নিকটে। সূর্যদাস পণ্ডিত, কংসারি মিশ্র, গৌরীদাসের শ্রীপাট।

*৬৩। শান্তিপুর (৫।২০৪৪)—নদীয়া জেলায়। অদ্বৈত, শ্রীহর্ষ ও গোপালাচার্যের শ্রীপাট।

৬৪। শিখরভূমি (৯।৩০৩)---বর্ধমানের নিকটবর্তী প্রদেশ। সঠিক পরিচয় নেই।

*৬৫। শ্রীখণ্ড (১।৮৬৪)—বর্ধমান জেলায় কাটোয়ার ৮ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে।

*৬৬। শ্বেতদ্বীপ (৪।১৬৮)—বৃন্দাবনধামের নামান্তর।

*৬৭। সপ্তগ্রাম (৮।১৪৩)—হুগলী জেলার গঙ্গার পশ্চিমতীরে (?)। উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাট। আদিসপ্তগ্রাম রেলষ্টেশন থেকে ১০ মিনিটের পথ।

৬৮। সরজনিনগর (বা কুমারনগর) (১।২৪৯, ২১০)—ভাগীরথীর তীরবর্তী। লুপ্ত।

৬৯। সেরগড় (১০।১৩৯)—লুপ্ত। পঞ্চকোটে অবস্থিত ছিল।

৭০। সেহোনাগ্রাম (৫।১৬১)—পরিচয় মেলে নি।

৭১। হরিনদী গ্রাম (৭।৩৩৪)—লুপ্ত। গঙ্গাগর্ভে। নবদ্বীপের দক্ষিণে, শান্তিপুর থেকে ৪ মাইল। (চৈ. ভা. আদি ১৬।২৬৭)।

'নরোত্তমবিলাসে' উল্লিখিত গ্রাম নাম ২১টি : অম্বিকা, একচক্রা, উৎকল, কণ্টকনগর, কাঞ্চনগড়িয়া, কুমরপুর, খড়দহ, খানাকুল, খেতুরি, গাম্ভীলা, তালখড়ি, ধারেন্দা-বাহাদুরপুর, নবদ্বীপ, নৃসিংহপুর, বন-বিষ্ণুপুর, বুধরি, যাজপুর, যাজিগ্রাম, রামকেলি, শান্তিপুর ও শ্রীখণ্ড। এগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি গ্রামের কথা 'ভক্তিরত্নাকরে' নেই

*১। কুমরপুর (পৃঃ ১১০)—মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গাতীরে বেলডাঙ্গা গ্রাম থেকে ২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে বর্তমান। রামকৃষ্ণাচার্যের শিষ্য গোপাল চক্রবর্তীর শ্রীপাট।

*২। গাম্ভীলা (পৃঃ ১৩১)—মুর্শিদাবাদ জেলায় জিয়াগঞ্জ হতে ১ মাইল দূরে গঙ্গাতীরে; প্রাচীন পাট গঙ্গাগর্ভে। গঙ্গানারায়ণের শ্রীপাট। বর্তমানে বালুচরই গাম্ভীলা নামে পরিচিত।

*৩। নৃসিংহপুর—মেদিনীপুর জেলায়। শ্যামানন্দের অবস্থানস্থল, তাঁর শিষ্য পুরুষোত্তমের শ্রীপাট।

সুতরাং 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাসে' উল্লিখিত মোট ৭৪টি স্থানের মধ্যে অন্ততঃ ৬১টি স্থান এখনো বর্তমান। অন্যান্য ১৩টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানের পরিচয় মেলে নি, বাকি ৭টি স্থান লোপ পেয়েছে॥

(গ) ব্রজমণ্ডল[২৬]

ব্রজমণ্ডল শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও বলরামের লীলাস্থলী। নরহরির পূর্বেই এ সম্পর্কে বহু শাস্ত্র রচিত হয়েছে। তাঁর আলোচনায় নরহরি এই সব প্রাচীন গ্রন্থের

---

২৬. ব্রজমণ্ডলের তীর্থগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ডঃ বাসন্তী চৌধুরী তাঁর 'বাংলার বৈষ্ণব সমাজ, সংগীত ও সাহিত্য' গ্রন্থের ১০ম অধ্যায়ে, (পৃঃ ২৭৯-৩০০)। এছাড়া ব্রজধাম বিষয়ে কিছু আলোচনা গ্রন্থও আছে। যেমন একটি গোবর্ধন দাস বিরচিত 'শ্রীশ্রীব্রজধাম' (পরিচয় ও পরিক্রমা, ১ম খণ্ড, ১৩৭৫)। এজন্যে আমরা বিষয়টির প্রসঙ্গমাত্র উত্থাপন করছি। নরহরির প্রদত্ত পরিক্রমা পদ্ধতিটির হুবহু তালিকা অন্যত্র লিখিত হয় নি।

শ্লোক প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, নরহরি জীবনের অধিকাংশ সময় ব্রজধামে বসবাস করেছিলেন। বিভিন্ন তীর্থে তাঁর গতায়াত ছিল। তীর্থাদি সম্পর্কে তাঁর কৌতূহলেরও অন্ত ছিল না। তিনি তৎকাল প্রচলিত তীর্থগুলিরই পরিচয় দিয়েছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে প্রচলিত, বা শ্রীরূপ-গোস্বামীর 'মথুরামাহাত্ম্যে' উল্লিখিত কিছু কিছু তীর্থের নাম পাই (যেমন, ইষ্টকাশ্রম, ধোবাশ্রম, গোবিন্দতীর্থ ইত্যাদি) যে গুলি নরহরির গ্রন্থে মেলে না। সম্ভবতঃ এগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিলুপ্ত হয়েছিল। আবার নর হর এমন কিছু তীর্থেরও নাম করেছেন (যেমন, প্রেমসরোবর, মুখরাই, সংকেত ইত্যাদি) যেগুলি শ্রীরূপ বা অন্য কেউ উল্লেখ করেন নি। মনে হয় এগুলি ষোড়শ শতাব্দীর পরে উদ্ভূত হয়েছিল। কালে কালে পুরোনো তীর্থের বিলোপ ও নতুন তীর্থের উদ্ভব ঘটে থাকে। তৃতীয়তঃ, নবদ্বীপমণ্ডলের মতোই ব্রজ-মণ্ডলের আয়তন পরিসীমা ও পদ্মাকৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নরহরি এর সুবিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। এখানের প্রধান প্রধান তীর্থস্থান, বন-উপবন এবং প্রতিটি স্থানের দর্শনীয় ঘাট, কুণ্ড, বৃক্ষ, কূপ, এবং শ্রীবিগ্রহ ও মন্দিরাদি উল্লিখিত হয়েছে। নরহরির ভৌগোলিক চেতনা প্রবল ছিল। তিনি প্রতিটি স্থানের খুঁটিনাটি পরিচয় দিয়েছেন। সেগুলির পূর্বাপর নাম ও ইতিবৃত্ত উদ্ধার করেছেন। এ থেকে কিছু কিছু স্থানের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভও করা যায়। চতুর্থতঃ, ব্রজমণ্ডলের প্রতিটি স্থানাদির পরিচয়ে তিনি কোনো না কোনো সূত্রে সেটির সঙ্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গ এবং বলরামের সম্পর্ক বা লীলার উল্লেখ করেছেন। এজন্যে তিনি অনেক সময় প্রাচীন শাস্ত্রের তথ্য গ্রহণ করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই (যেমন, আনিয়োর, গাঠুলি, পাটল, কেঙনাই প্রভৃতি) প্রাচীনশাস্ত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নি। এগুলির সব কাহিনীই তাঁর উদ্ভাবিত কিনা বলা কঠিন। তবে গল্পপ্রিয় কবি যে কিছু কিছু কাহিনী সৃষ্টি করবেন না, এমন নয়। আমরা ব্রজমণ্ডলের তীর্থাদি সম্পর্কে নামমাত্র তালিকা প্রস্তুত করছি

মথুরামণ্ডলের তীর্থাদি—রাঘব গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে শ্রীনিবাসাদি ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করছেন। রাঘব তাঁদের সর্বপ্রথমে শ্রীগৌরের ভিক্ষাদাতা সনোড়িয়া বিপ্রের গৃহে নিয়ে গেলেন। বললেন, এখানে শ্রীগৌর 'ব্রজেন্দ্র-নন্দন' রূপে ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন। প্রাচীন ব্যক্তি কথিত 'পাষণ্ড দলনে

শ্রীঅদ্বৈতের চতুর্ভুজ রূপ পরিগ্রহ প্রসঙ্গটিও এখানে উল্লিখিত হয়েছে। এরপর রাঘব তাঁদের নিয়ে এলেন মথুরার মধ্যস্থলে অর্ধচন্দ্রাকার স্থানে—তারপর এলেন মধুবনান্তর্গত মথুরায়। সেখানে কৃষ্ণের জন্মস্থান বাসুদেব-দেবকীর গৃহ, শ্রীকেশব, দীর্ঘবিষ্ণু, পদ্মনাভ, স্বায়ংভুব প্রমুখ দেবমূর্তি, একানংশা দেবী, যশোদা ও দেবকীর মূর্তি, ভুতেশ্বর ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি দর্শন করলেন। তারপর সকলে এলেন মহাতীর্থ বিশ্রান্তিতে। এখানে 'সন্ন্যাসী শিরোমণি' শ্রীগৌরচন্দ্র উপস্থিত হলে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর করুণা লাভ করেছিল। এরপর নিম্নোক্ত তীর্থগুলি এঁরা পরিক্রমা করেন

প্রধান ২৪টি তীর্থ—অবিমুক্ত, গুহ্য, প্রয়াগ, কনখল, তিন্দুক, সূর্য, বটস্বামী ধ্রুব, ঋষি, মোক্ষ, কোটি, বোধি, নব, সংযমন, ধারাপতন, নাগ, ঘণ্টাভরণ, ব্রহ্ম, সোম, সরস্বতীপতন, চক্র, দশাশ্বমেধ, বিঘ্নরাজ ও (দ্বিতীয়) কোটিতীর্থ।

মথুরার অপরাপর তীর্থ—গোকর্ণাখ্য, কৃষ্ণগঙ্গা, বৈকুণ্ঠ, অসিকুণ্ড, চতুঃসামুদ্রিক কূপ ইত্যাদি।

মথুরামণ্ডলের দ্বাদশ বন—(১) মধুবন, (২) তালবন, (৩) কুমুদবন (নামান্তর দতিহা), কুমুদবনের দর্শনীয় স্থানাদি, আয়োরে, গৌরবাই, ষষ্ঠীকরাবটী, শকটাগ্রাম, গরুড়গোবিন্দ, গন্ধেশ্বর গ্রাম, সাতোঞা। (৪) বহুলাবন, এখানে দর্শনীয় স্থান কুণ্ড, কূপ ইত্যাদির নাম ময়ূর, দক্ষিণ, বসতি, রাওল প্রভৃতি গ্রাম, আরিট (দর্শনীয় রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, মানসপাবনঘাট) সখীস্থলীগ্রাম (মালাহরি কুণ্ড, শিবখোর কুণ্ড, ভানুখোর কুণ্ড) মুখরাইগ্রাম, গোবর্দ্ধন গ্রাম (কুসুম সরোবর, নারদকুণ্ড, শ্রীরাধার রত্নসিংহাসন), পালিগ্রাম, অত-গ্রাম (ইন্দ্রধ্বজবেদী, সংকর্ষণ কুণ্ড), পরাসৌলিগ্রাম (চন্দ্রসরোবর, গন্ধর্বকুণ্ড), পৈঠগ্রাম, গৌরীতীর্থ (নৃপকুণ্ড), আনিয়োব গ্রাম (অন্নকূট স্থান, গোবিন্দকুণ্ড, দাননিবর্তন কুণ্ড), গাঠুলিগ্রাম (অপ্সরাকুণ্ড, সুরভিকুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড), কদমখণ্ডি (দানঘাটি—কৃষ্ণবেদী, ব্রহ্মকুণ্ড, মানসগঙ্গা), গোবর্দ্ধনক্ষেত্র, চক্রতীর্থ। সোঁকরাই, সখীথরা, নিমগ্রাম, পাটলগ্রাম, ডেরাবলি, নবাগ্রাম, কুঞ্জরা, সূর্যকুণ্ডগ্রাম (বা মোরনাখ্যা), কেঙনাই (বা কোনাই), ভদায়ব, মগহেরা (মঘেরা), গাঠুলিগ্রাম (দর্শনীয় গুলালকুণ্ড), রেহেজ (দেবশীর্ষকুণ্ড), প্রমোদনা প্রভৃতি গ্রাম সেতুকন্দরা (কদম্বকানন), ইন্দ্রোলি ও কনোয়ারা

গ্রাম। (৫) কাম্যবন—দর্শনীয় রত্নসিংহাসন, শ্রীচরণকুণ্ড, শিবকামেশ্বর মূর্তি, ধর্মকুণ্ড, বিশোকাবেদী, মণিকর্ণিকা (পঞ্চপাণ্ডবের কুণ্ড), বিমলকুণ্ড, যশোদাকুণ্ড, নারদকুণ্ড, কামনাকুণ্ড, সেতুবন্ধকুণ্ড, লুকলুকানমিচলীস্থান। বিভিন্ন কুণ্ড, যেমন, কাশীকুণ্ড, গয়াকুণ্ড, প্রয়াগকুণ্ড, পুষ্করকুণ্ড, গোমতী, দ্বারকা, তপ, ধ্যান, ক্রীড়া, গোপ, ঘোষরাণী, বিহ্বল, শ্যাম, ললিতা ও বিশাখা-কুণ্ড। মানকুণ্ড, মোহিণী-বলভদ্র-সূর্যকুণ্ড, কামসরোবর, সুরভি-চতুর্ভুজ কুণ্ড, ভোজনস্থলী, বাজনশিলা, পরশুরামস্থান, সন্তন-বেদ-দামোদর-গন্ধর্ব-পৃথুদক-অযোধ্যা-নৃসিংহ-অর্ঘ্য-মধুসূদন-রোহিণী- গোপাল - গোদাবরী - দেবকী - কুণ্ড, চৌর্য্যখেলা স্থান, প্রহ্লাদ-লক্ষ্মী প্রভৃতি কুণ্ড। ধূলাউড়া গ্রাম, উধাগ্রাম, আটোর গ্রাম, কদমখণ্ডী (স্বর্ণহারগ্রাম-রত্নকুণ্ড, চতুর্মুখ স্থান), বৃষভানুপুর, সাকরিখোর গ্রাম (দান-মান-বিলাস পর্বত), চিকসৌলী গ্রাম (গহ্বর বন, শীতলা-দোহনী কুণ্ড), ডভরানো গ্রাম (মুক্তাকুণ্ড, ভানুখোর, পিয়াল ও পিলুখোর সরোবর, প্রেম সরোবর, বিহ্বলকুণ্ড, সংকেতকুঞ্জ), নন্দীশ্বর গ্রাম—(তড়াগতীর্থ, ক্ষুন্নাহার সরোবর, ধোয়ানি-কৃষ্ণ-ললিতা-সূর্য-বিশাখা-পৌর্ণমাসী কুণ্ড, নান্দীমুখীর আলয়, যশোদা-করেল-মধুসূদন-পানিহারি-সাহসি-মুক্তা প্রভৃতি কুণ্ড, যোগিয়া-উধোক্রিয়া-গোশালা স্থান), নন্দগ্রাম (গেন্দুখোর, কদম্বকানন, গুপ্তকুণ্ড), মেহেরানগ্রাম, যাবটগ্রাম (কৃষ্ণ-মুক্ত-পীবন-লাড়িলী-নারদকুণ্ড, কোকিলাবন), আঁজনকগ্রাম, বিজোআরি গ্রাম, পরশো-শী-কামাই-করালা-লুধৌনী-পিয়াসো সাহার গ্রাম, সাঁখিগ্রাম, ছত্রবন (উমরাও গ্রাম)। (৬) খদিরবন—(সঙ্গমকুণ্ড) কদম্বখণ্ডি, বকথরা, নেওছাক ভাণ্ডাগোর গ্রাম, বৈঠানগ্রাম (নীপবন, কৃষ্ণকুণ্ড, কুণ্ডল কুণ্ড, বেডাখোর কুঞ্জ, চরণপাহাড়ি পর্বত), হারোয়ালগ্রাম, সাতোঞাগ্রাম (সূর্যকুণ্ড, নন্দনকূপ, বাত্মাশিলা), পাইগ্রাম, কামরি-বিছোর-তিলোয়ার গ্রাম (শৃংগারবট), ললাপুরবাসোসী গ্রাম, পয়গ্রাম (কেটিরবন), দধিগ্রাম (ক্ষীরসমুদ্র), খানিগ্রাম, খরেরো গ্রাম, (উজানিস্থান, খেলণ বন, রামঘাট, কশ্ছরণ, ভূষণবন, ভাণ্ডীর অক্ষয়বট), আরাগ্রাম, মুঞ্জাটবী, ভাণ্ডারীগ্রাম (তপোবন, গোপীঘাট, চীরঘাট, নন্দঘাট) ভয়গ্রাম (বৎসবন), উনাই-বলহারা-পরিখম-সেইগ্রাম, এচোমুহা-জয়েত-সোয়ানো-তরৌলী-বরোলীগ্রাম, কৃষ্ণকুণ্ডটীলা, মঘেরাগ্রাম, আটস্যুগ্রাম, বরাহর-হরাসলী-সুরুখুরু গ্রাম। (৭) ভদ্রবন, (৮) ভাণ্ডীরবন (ছাহেরী

ও মাঠগ্রাম), (৯) বিল্ববন, (১০) লোহবন (নৌকাক্রীড়াঘাট), (১১) মহাবন—'কৃষ্ণজন্মস্থল', ব্রহ্মাণ্ড ঘাট, যমলার্জ্জুন ভঞ্জন তীর্থ, রমণক, গোপকূপ, রেণুকা-রাজ-সকরৌলী-রাবল-অক্রুর প্রভৃতি গ্রাম। (১২) বৃন্দাবন—বৃন্দাবনস্থলী-যোগপীঠ ও গোবিন্দদেব, গোপীনাথ, মদনগোপাল মূর্তি, মনোরথ গ্রাম, কালীয় হ্রদ, দ্বাদশাদিত্যতীর্থ, প্রস্কন্দন ক্ষেত্র॥

(তিন) সংগীত-বিজ্ঞান ও নরহরি চক্রবর্তী

নরহরি চক্রবর্তীর তিনটি গ্রন্থে সংগীতশাস্ত্র আলোচিত হয়েছে—১। 'সংগীত সারসংগ্রহ', ২। 'ভক্তিরত্নাকর' (৫ম তরঙ্গ, রাসবর্ণনা প্রসঙ্গ), ৩। 'গীতচন্দ্রোদয়' (মঙ্গলাচরণ পুথি)। আলোচনার বিস্তৃতি অনুসারে তন্মধ্যে 'ভক্তিরত্নাকর'ই শ্রেষ্ঠ, 'গীতচন্দ্রোদয়' সংক্ষিপ্ত। আবার গীতবিদ্যার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা (সকল বিষয়েরই) 'সংগীতসার সংগ্রহে'ই পাওয়া যায়।

নরহরি সম্ভবতঃ তাঁর গ্রন্থগুলি শ্রীধাম বৃন্দাবনে বসবাসকালেই রচনা করেন। তাঁর আলোচনায় উত্তরভারতীয় সংগীতের প্রভাব থাকা স্বাভাবিক।

নরহরি কৌতূহলী গবেষক, অনুসন্ধিৎসু শাস্ত্রবিৎ এবং পণ্ডিত কবি। তাই সংগীত বিদ্যার এমন কোনো দিক নেই, যা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

আলোচনার প্রারম্ভেই নরহরি সংগীত সম্পর্কে প্রাচীন লোক-ধারণাটির অবতারণা করেছেন। 'গীতচন্দ্রোদয়ে' না বললেও 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'সংগীতসার সংগ্রহে' বলেছেন যে, সংগীতের উৎপত্তি হয় বেদ থেকে। পুরাকালে ব্রহ্মা চারটি বেদের সার সংগ্রহ করে 'সংগীতবেদ' নামক 'পঞ্চমবেদ' সৃষ্টি করেন। ঋক্‌বেদ হতে 'পাঠ্য' বা 'আবৃত্তি', সামবেদ হতে 'গান', যজুর্বেদ হতে 'অভিনয়', এবং অথর্ববেদ হতে 'রসে'র উৎপত্তি ঘটে। স্বয়ং ব্রহ্মা এবং শিব, নন্দী, ভরত, দুর্গা, নারদ, কোহল, রাবণ, বায়ু, রম্ভা প্রমুখ সেই নবসৃষ্ট পঞ্চবেদ-সংগীত প্রচার করেন।

এই পুরাবৃত্ত তিনি কি ভাবে জেনেছিলেন, তা উল্লেখ করেন নি। এ বিষয়ে কোনো প্রাচীন বাগ্‌গেয়কারের বচনও উদ্ধৃত হয় নি। নরহরির পরবর্তী উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের কবি রাধামোহন সেন। তিনি

সংগীতবিদ্যা ভাষায় আলোচনা করেছেন তাঁর 'সংগীততরঙ্গ'[১] নামক গ্রন্থে। সংগীতের উৎপত্তি সম্পর্কে মোটামুটি অনুরূপ একটি পুরাবৃত্ত এই গ্রন্থেও আছে। এখানে বলা হয়েছে যে, সোমেশ্বর গানবিদ্যারস সৃষ্টি করেছেন। অষ্টাদশ সংহিতাকার তাঁরই শিষ্য। দেবতাদের মধ্যে দুর্গা, সরস্বতী, নাগলোকের বাসুকি, দেবর্ষি নারদ, ভরত, হনুমান, গন্ধর্বদের মধ্যে কলানাথ, তুম্বুরু, আমোষ, দেসা, হাহা হুহু, রাবণ, কোহল, অর্জুন—এদের সমবেত এক সভায় শিব সেই গান আরম্ভ করেন, শিবানুচরেরা নৃত্যবাদ্য করেন, এই ভাবে গান বিদ্যা প্রকাশিত হয়। কলিযুগে অনেকেই তা শিক্ষা করেন এবং কালায়ত লোক তা লৌকিক ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন।[২]

সংগীতের মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও নরহরি 'সংগীতসার সংগ্রহ' ও 'ভক্তিরত্নাকরে' উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। তাঁর মতে, সংগীত সকল বিদ্যার পরাকাষ্ঠা। শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি সাহিত্য এবং নানাশাস্ত্রবিদগণ যাঁরা সংগীত শাস্ত্র অবগত নন, তাঁরা দ্বিপদ বিশিষ্ট হয়েও মৃগতুল্য। তিনি 'সংগীতদামোদরে'র বচন উদ্ধার করে তাঁর অভিমত প্রমাণ করেন। দামোদরের সাহায্যে বোঝাতে চান যে, সুন্দর সংগীতে যার অন্তঃকরণে সুখ সঞ্চারিত হয় না, সে পৃথিবীতে মনুষ্যরূপী বৃষভ মাত্র। ব্রহ্মা কর্তৃক সে বঞ্চিত।

সংগীত সম্পর্কে তাঁর সর্বোচ্চ ঘোষণা এই যে, দান যজ্ঞ স্তবাদি ধর্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের ফল প্রদান করে, কিন্তু সংগীতবিদ্যা একক ভাবেই মোক্ষ সহ চতুর্বর্গের ফলদানে সমর্থ। দামোদরের আরেকটি উক্তির সাহায্যে তিনি প্রমাণ করেন যে, তাঁর বহু পূর্ববর্তী কালেও সংগীতকে বাঞ্ছিত ফল প্রদানকারী ও মুক্তির বীজস্বরূপ বলে দামোদরকার শুভঙ্কর অভিনন্দিত করে গেছেন।

সংগীতের প্রভাব যে সর্বত্র ও সর্বজীবে, এ কথা তিনি 'সংগীতসার সংগ্রহে' নানা মহাজন-বাক্য উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা করেছেন॥

---

১. সংগীত তরঙ্গ (রাধামোহন সেন রচিত, ১ম মুদ্রণ—১২২৫, ২য়—১২৫৬ ৩য়—১৩১০)। তৃতীয় মুদ্রণের সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। রাধামোহন-এর জীবৎকাল ১২৫৬-র পূর্ববর্তী। সম্পাদক লিখেছেন, "১২৫৬ সালের গ্রন্থ প্রকাশকালে গ্রন্থকার জীবিত ছিলেন না।...১২২৫ সালের গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের জীবনকালেই প্রকাশিত হয়।" (ভূমিকা, পৃঃ ৮)।

২. সঙ্গীততরঙ্গ (১৩১০ সং, পৃঃ ৫)।

সঙ্গীত স্বরূপ

সংগীতের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে নরহরি 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'সংগীতসার সংগ্রহে' একই তথ্য ও প্রমাণাদি গ্রহণ করেছেন। 'ভক্তিরত্নাকরে' লিখেছেন

সংগীতস্বরূপ—গীতবাদ্য নৃত্যত্রয়।
গীতবাদ্য দ্বয়ে কেহ সংগীত কহয়॥ (ভ. র., পৃঃ ২৩১)

অর্থাৎ সেকালে সংগীত বলতে শুধু সুরসম্পৃক্ত গানকেই বোঝাত না, সেই গানের সঙ্গে বাদ্য ও নৃত্যের গভীরতর সমন্বয় ছিল। নিজের অভিমতের পক্ষে নরহরি তাঁর উভয় গ্রন্থেই 'সংগীত পারিজাত' ও 'সংগীতশিরোমণি'র বচন উদ্ধৃত করেছেন। পারিজাতে বলা হয়েছে, 'গীত বাদিত্র নৃত্যানাং ত্রয় সঙ্গীতমুচ্যতে'। এবং শিরোমণিতে আছে, গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ ত্রয়ং সঙ্গীত মুচ্যতে'। এই দুই আকর গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে যে, গীত-বাদ্য-নৃত্যের মধ্যে গীতের প্রাধান্যহেতু এগুলি সংগীত নামে কথিত।

সংগীতের প্রকারভেদ

সংগীতের প্রকারভেদ সম্পর্কে নরহরি তাঁর 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'সংগীতসার সংগ্রহে' বলেছেন, সংগীত দ্বিবিধ, 'মার্গ' ও 'দেশী'। 'মার্গ সংগীত' স্বর্গলোকে প্রচলিত। ব্রহ্মা এই সংগীতের আচার্য। তিনি ভরতকে তা শিক্ষা দেন। শিক্ষাপ্রাপ্ত ভরত অপ্সরা ও গন্ধর্বদের সঙ্গে শিবের সামনে তা প্রয়োগ করেন। 'দেশী সংগীত' মর্তলোকে প্রচলিত। দেশ ভেদে তা সৃষ্ট। এই আলোচনার সমর্থনে নরহরি 'সংগীতসার', 'সংগীত পারিজাত' থেকে প্রমাণ উদ্ধার করেছেন।

লক্ষণীয় যে, রাধামোহন সেন মার্গ ও দেশী ভেদে সংগীতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি।

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে দেখা যায়, সেকালে দ্বিবিধ সংগীতের নাম ছিল, 'বৈদিকী' (বৈদিক), 'লৌকিকী' (লৌকিক)। সামগান ও তার বিচিত্র রূপকে 'বৈদিকী' এবং দেশভেদে লোকায়ত সংগীতকে 'লৌকিকী' বলা হতো। 'লৌকিকী'র আবার দুটি বিভাগ ছিল, 'গান্ধর্ব' বা 'মার্গ' ও

'দেশী'। বৈদিক-সংগীতই সেকালের শ্রেষ্ঠ সংগীত বিদ্যা। তা থেকেই গান্ধর্ব বা মার্গ সংগীতের সৃষ্টি। ধীরে ধীরে এই 'মার্গ'ই বৈদিকীর সমান মর্যাদা লাভ করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্ল্যাসিক্যাল যুগে এই সংগীতের প্রচলন হয়। আচার্য মতঙ্গের সময় এর অনুশীলন কমে যায়। সম্ভবতঃ সপ্তম শতাব্দী বা তার নিকটবর্তী সময়েই তা ধীরে ধীরে লোপ পায়। মার্গ সংগীতের এই বিলোপের জন্যেই তাকে 'দেবলোকাশ্রিত' বলা হতে পারে।

সেকাল-প্রচলিত 'দেশী' সংগীত ছিল দু রকমের : (ক) অভিজাত দেশী, যা মার্গ প্রকৃতিসম্পন্ন, দশ লক্ষণ ও নিয়মসম্মত গান, যা সম্ভবতঃ উক্ত মার্গেরই ক্ষয়িতরূপ। এবং (খ) লোকায়ত দেশী, যা বাঁধাধরা নিয়মের বহির্ভূত। একে সেকালীন লোক বা গ্রাম্য সংগীত বলা যেতে পারে। তাই নরহরি বলেন

নানা দেশ ভেদে দেশী ভূতল আশ্রিত।
মার্গে দেশীদ্বয় ঐছে শাস্ত্রে সুবিদিত॥ (ভ. র., পৃঃ ২৩১)

গীতাদির উৎপত্তির কারণ

নাদ : 'গীতাদির উৎপত্তি কারণ নাদ হয়।' অর্থাৎ 'নাদ' থেকে সংগীতের জন্ম। 'গীতচন্দ্রোদয়ে' এই নাদতত্ত্ব থেকে সংগীতালোচনা আরম্ভ হয়েছে। নরহরি প্রাচীন শাস্ত্রবিদ্‌দের বাক্য উদ্ধার করে বলেছেন যে, নাদময় এই জগৎ। নাদ ব্যতীত গীত, ষড়জাদি স্বর, রাগরাগিণী হয় না নাদ ছাড়া জ্ঞানেরও পৃথক সত্তা নেই, শিবকে জানা যায় না। জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মা নাদময়, স্বয়ং হরিও নাদরূপী। আঞ্জনেয়ের শ্লোকে আছে, 'সরস্বতীও নাদসমুদ্রের পরপারে এখনো পৌঁছাতে পারেন নি। তিনি ঐ সমুদ্রে নিমগ্ন হবার ভয়ে বুকে বীণার তুম্ব বহন করছেন।'

তিনটি সংগীতগ্রন্থেই নরহরি নাদোৎপত্তি আলোচনা করেছেন। 'সংগীত-সারে'র প্রমাণ উদ্ধার করে দেখিয়েছেন যে, 'ন'-কার অর্থ প্রাণবায়ু, 'দ'-কার অর্থ অগ্নি। এই প্রাণ ও অগ্নি হতে নাদের উৎপত্তি। 'সংগীতমুক্তাবলী'র শ্লোক গ্রহণ করে নরহরি আরো বলেন যে, যা আকাশ অগ্নি বায়ু হতে উৎপন্ন, নাভির ঊর্ধ্বদেশে বিচরণপূর্বক মুখে প্রকাশিত তা-ই নাদ। 'গীতচন্দ্রোদয়ে' উদ্ধৃত ভরতের উক্তিটিও উল্লেখযোগ্য

আত্মা বিবক্ষমানোহয়ং মনঃ প্রেরয়তে যতঃ।

দেহস্থং বহ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্॥ (রাগ ও রূপ ২য়, পৃঃ ১৭৯)

কিন্তু নাদোৎপত্তি সম্পর্কে রাধামোহনের অভিমত পৃথক। তিনি সংগীত-তরঙ্গে লিখেছেন যে, মহাশূন্যে একদা এক শব্দ সৃষ্ট হয়, তা-ই নাদ বা প্রণব। তা শুনে দেবতারা স্তম্ভিত হন। সেই শব্দ সকল জীবের অন্তরে ও সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে বায়ুসহ বিচরণ করতে থাকে। তিনি নাদ শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন

আকার উকার নাদ মকার শব্দ সম্বাদ এ চারি প্রণব জন্মদাতা।
বিষ্ণু সে অকার স্বর উকারেতে মহেশ্বর নাদশক্তি মকার বিধাতা॥
অকার পরে উকার সন্ধি পায়া গুণ তার দুয়ে মিলি হইল ওকার।
শিরে নাদ অর্ধ ইন্দু তাহাতে ম কার বিন্দু এইরূপে প্রণব আকার॥
(সংগীততরঙ্গ, পৃঃ ৭)

রাধামোহন একাক্ষর কোষ অভিধানের ব্যাখ্যাও উদ্ধার করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে 'অ' = কেশব, 'উ' = শংকর, 'ম' = ব্রহ্মা (সংগীততরঙ্গ পৃঃ ৭)

নরহরি বলেন, নাদ তিনভাবে জন্মগ্রহণ করে, নাদতিন প্রকার—(ক) প্রাণী বা জীবদেহ জাত, (খ) অপ্রাণীজাত বা বীণাজাত এবং (গ) প্রাণী ও অপ্রাণী উভয় জাত বা বংশাদি জাত।

আবার লৌকিক ব্যবহারেও এই নাদ তিন প্রকারে অভিব্যক্ত হয়।

ব্যবহারে নাদ ত্রিধা—মন্দ্র মধ্য তার।
হৃদি কণ্ঠে মূর্দ্ধি স্থান ক্রমে এ প্রচার॥
মন্দ্র হইতে দ্বিগুণ উচ্চ মধ্য হয়।
মধ্য হইতে দ্বিগুণ তারাখ্য—এই ত্রয়॥ (ভ. র., পৃঃ ২৩৩)

অর্থাৎ লোকব্যবহারে নাদ তিন শ্রেণীর—(১) মন্দ্র, যা হৃদয়ে ধীরভাবে অবস্থান করে, (২) মধ্য যা কণ্ঠে মধ্যমভাবে অবস্থান করে, এবং (৩) তার, যা মস্তকে উচ্চশব্দে অবস্থান করে। এই তিন শ্রেণী নাদের বৈশিষ্ট যে, মন্দ্র কণ্ঠে সঞ্চারিত হলে তা মন্দ্রের দ্বিগুণ রূপে এবং মধ্য মস্তকে সঞ্চারিত হলে তা মধ্যের দ্বিগুণ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তখন পরিবেশ গুণে একই নাদ মন্দ্র বা তার রূপে আখ্যা লাভ করে। এই নাদতত্ত্ব নরহরি তাঁর তিনটি গ্রন্থেই উল্লেখ করেছেন।

এই সঙ্গে তিনি কোহলের মতামত গ্রহণ করে বলেছেন যে, নাদধ্বনি আরো দু প্রকারে বিচার্য। (ক) আহত, (খ) অনাহত। "যেখানে উভয়ের সংযোগ তাই আহত, আর আকাশ সম্ভূত নাদ। সেই আহত নাদকে আকর্ষণ করলে অনাহত নাদ নামে কথিত হয়।" কোহলের এই উক্তিটি নরহরি তাঁর 'ভক্তিরত্নাকরে' গ্রহণ করেন নি, অপর দুটি গ্রন্থে আছে।

অপর পক্ষে রাধামোহন বলেছেন যে, সেই নাদ দুপ্রকারের: (ক) আকৃতি বা ধ্বন্যাত্মক, (খ) সুকৃতি বা বর্ণাত্মক। ধ্বন্যাত্মক আবার দুপ্রকার: নার্থ ও সার্থ। অর্থহীন নাদ নার্থ, যেমন পতনের শব্দ। অর্থযুক্ত নাদ সার্থ, যেমন বাদ্যাদি, সুমৃদঙ্গ জয়ঢাক ইত্যাদির শব্দ। বর্ণাত্মক নাদ নিরাকার, তবে সেগুলির প্রতিমূর্তি ৫০টি—অ-ক ইত্যাদি বর্ণগুলি।

বিশেষজ্ঞদের মতে ধ্বন্যাত্মক বা বর্ণাত্মক—উভয় প্রকার নাদই আহত। কেবল প্রণব বা ওঁকার অনাহত ধ্বনি॥

গীত লক্ষণ

নরহরি ভূয়োদর্শী পণ্ডিত। গীত লক্ষণ সম্পর্কে তিনি নানা মুনির নানা মত লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু সেই সব বিচিত্র মতের উল্লেখে তিনি নিজের আলোচনা জটিল করেন নি। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তিনি বহু সম্মত মতামতগুলিই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। গীত লক্ষণ সম্পর্কে তিনি সংক্ষেপে বলেছেন

গীতের লক্ষণ হয় অনেক প্রকার।
ধাতু মাতু সহ গীত প্রসিদ্ধ প্রচার॥
অনুরাগজনক এ ধাতু মাতু হয়।
গীত অবয়ব ধাতু, মাতু রাগাদয়॥ (ভ. র., পৃঃ ২৩৪)

অর্থাৎ সংগীত 'ধাতু' ও 'মাতু' সহযোগে সৃষ্ট। এর অবয়ব বা কাঠামোকে বলে 'ধাতু' এবং রাগাদয় বা বাক্যাংশকে বলে 'মাতু'। নিজের অনুভবের সমর্থনে তিনি 'সংগীতসার' ও 'নারদ সংহিতা'র উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছেন। 'নারদ সংহিতা' থেকে ধাতু মাতু বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়। 'নাদ ধ্বনি বিশিষ্ট গানের যোগ্য বস্তুই ধাতু। গুণাদি ধারণ করার জন্যে ধাতুই সংগীতের

অবয়ব। আর গুণ ও অলংকার বিশিষ্ট বাক্যসমূহ দ্বারা যদি রঞ্জন ও ওজস্বিতা প্রকাশ পায়, মানুষের প্রমোদনের জন্যে তাকে মাতু বলে।'

লক্ষণীয় যে, এ যুগে 'মাতু' শব্দের একেবারেই প্রচলন নেই, 'ধাতু' শব্দের ব্যবহারও কম। এখনকার গানে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ-অংশগুলি 'ধাতু' নামে চলিত।

গীত লক্ষণ আলোচনায় ধাতু মাতুর পরে নরহরি আরো কিছু বিষয়ের উত্থাপন করেছেন, যেমন, শ্রুতি, স্বর, মূর্ছনা, তাল ও গ্রাম। এগুলি উত্থাপনের কারণ, গীতোৎপত্তির প্রধান কারণ যে নাদ, সেই নাদ থেকেই ২২টি শ্রুতি, শ্রুতিগুলি থেকে ৭টি ষড়জাদি স্বর, স্বরগুলি থেকে ২১টি মূর্ছনা, মূর্ছনা থেকে ৪৯টি তাল (গ্রাম ভেদে ৫০৩৩টি) এবং এগুলির সঙ্গে বর্ণ, গ্রহস্বর, অংশস্বর, ন্যাসস্বর, জাতি ও রাগ ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়, এবং জনচিত্তরঞ্জকগীত সৃষ্টি করে।

উল্লেখ্য যে, 'গীতচন্দ্রোদয়ে' মঙ্গলাচরণ পুথিতে এই সব বিষয়গুলির নামমাত্র উল্লেখ আছে, কোনো রকম আলোচনা নেই। সেখানে মাত্র ৬৮টি চরণে নামগুলি উল্লিখিত হবার পরই গীত লক্ষণ এবং তারপরই "অর্থ গীতস্য ভেদানাহ"—অনিবদ্ধ নিবদ্ধ গীত প্রসঙ্গ। সুতরাং এই বিষয়গুলি আলোচনায় তাঁর 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'সংগীতসার সংগ্রহ'ই গৃহীত হবে।

শ্রুতি

নাদ হতেই শ্রুতির উৎপত্তি। নরহরি শ্রুতির সংজ্ঞা দেন নি। শার্ঙ্গদেব তাঁর 'সংগীতরত্নাকরে' বলেছেন: 'শ্রবণাৎ শ্রুতয়ো মতাঃ'—অর্থাৎ শ্রবণগ্রাহ্য ধ্বনিই হলো শ্রুতি। শ্রুতি ২২টি। নরহরি লিখেছেন যে, সেই নাদ মারুতাহত হয়ে ২২টি শ্রুতিতে পরিণত হয়। যতগুলি নাড়ী ততগুলি শ্রুতি। এই সকল শ্রুতি ক্রমে ক্রমে উচ্চ হতে উচ্চতর হয়ে বীণা প্রভৃতি যন্ত্রেই প্রকাশিত হয়। কারণ কফ্ প্রভৃতি দুষ্ট কণ্ঠে শ্রুতির প্রকাশ হয় না। ৭টি স্বরে ২২টি শ্রুতি অবস্থান করে। বাগ্‌গেয়কারদের বিভাগ ব্যবস্থার সাহায্যে নরহরি শ্রুতিগুলির উল্লেখ করেছেন

মধ্যম, পঞ্চম, ষড়জে প্রতি স্বরে ৪টি করে—১২টি শ্রুতি
ঋষভ, ধৈবতে প্রতি স্বরে ৩টি করে—৬টি শ্রুতি
গান্ধার, নিষাদে প্রতি স্বরে ২টি করে—৬টি শ্রুতি

তবে শ্রুতিগুলির নাম সকল দেশেই এক রকম নয়। তাই নরহরি বলেন

শ্রুতি নাম ভিন্ন ভিন্ন দেশ বিশেষেতে।
কহি বহু সম্মত-ষড়জাদি জন্মে যাতে॥ (ভ. র, পৃঃ ২৩৫)

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই সব শ্রুতি যে পৃথক পৃথক নামে ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত হতো, তা ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র', নারদের 'সংগীত-মকরন্দ', নরহরির 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'সংগীতসার সংগ্রহে' ধৃত নামগুলি পাশাপাশি গ্রহণ করলেই ধরা যাবে। এমনকি, দুই গ্রন্থের একই লেখক নরহরি, যিনি সেকালের একজন শ্রেষ্ঠ সচেতন গ্রন্থকার, তাঁর দুই রচনাতেও কয়েকটি শ্রুতির নামে পার্থক্য আছে। নামগুলি যে কালে কালে পরিবর্তিত হয়েছিল, তা নিম্নোক্ত ছকটি দেখলেই বোঝা যায়

স্বরের নাম		ভরতের নাট্যশাস্ত্র (খ্রীঃ ২য় শঃ)	নারদের সংগীত মকরন্দ (খ্রীঃ ১২শ শঃ)	ভক্তিরত্নাকর (১৮শ শঃ)	সংগীতসার-সংগ্রহ (১৮শ শঃ)
ষড়জ[৩]	১।	তীব্রা	সিদ্ধা	নান্দী	(ভ. র.
	২।	কুমুদবতী	প্রভাবতী	বিশালা	মতো বা
	৩।	মন্দ্রা	কান্তা	সুমুখী	নতুন নাম
	৪।	ছন্দোবতী	সুপ্রভা	বিচিত্রা	মাত্র লেখা হলো)
ঋষভ	১।	দয়াবতী	শিখা	চিত্রা	”
	২।	রঞ্জনী	দীপ্তিমতী	ঘনা	
	৩।	রক্তিকা	উগ্রা	চালনিকা	
গান্ধার	১।	রৌদ্রী	হ্লাদী	সরসা	”
	২।	ক্রোধী	নির্ঝিরী	মালা	

৩. কোহলীর গ্রন্থে ষড়জ স্বরের ৪টি শ্রুতির নাম আছে—সিদ্ধি, প্রভাবতী, কান্তা ও সুভদ্রা (দ্রঃ ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ২৬৬)।

স্বরের নাম		ভরতের নাট্যশাস্ত্র (খ্রীঃ ২য় শঃ)	নারদের সংগীত মকরন্দ (খ্রীঃ ১২শ শঃ)	ভক্তিরত্নাকর (১৮শ শঃ)	সংগীতসার-সংগ্রহ (১৮শ শঃ)
মধ্যম	১।	বজ্রিকা	দিবা	মাগধী	
	২।	প্রসারিণী	সর্পসহা	শিবা	
	৩।	প্রীতি	ক্ষান্তি	মাতঙ্গিকা	
	৪।	মার্জনী	বিভূতি	মৈত্রেয়ী	মৈত্রী
পঞ্চম	১।	ক্ষিতি	মালিনী	বালা	
	২।	রক্তা	চপলা	কলা	
	৩।	সন্দীপনী	বালা	কলরবা	
	৪।	আলাপিণী	সর্বরত্না	শার্ঙ্গ'বরী	সারেঙ্গি
ধৈবত	১।	মদন্তী	শান্তা	জায়া	মাতা
	২।	রোহিণী	বিকলিনী	রসা	
	৩।	রম্যা	হৃদয়োম্মালিনী	অমৃতা	
নিষাদ	১।	উগ্রা	বিদারিণী	মাত্রা	বিজয়া
	২।	ক্ষোভিনী	প্রস্থনী	মধুকরী	

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ভরতের উল্লিখিত নামগুলির একটিও মকরন্দকার নারদের কালে প্রচলিত ছিল না। কিংবা থাকলেও, নারদ আপন রুচি ভেদে নতুন নাম গঠন করে নিতে পারেন। তবে নরহরিরই দুই গ্রন্থ রচনাকালের সামান্য কয়েক বছরের ব্যবধানেই অন্ততঃ দুটি শ্রুতির নাম সংক্ষেপিত এবং দুটির নাম পরিবর্তন ঘটেছিল।

শ্রুতি থেকেই স্বরের জন্ম। তাই শ্রুতি ও স্বরের সম্পর্কটি নরহরি সচেতন ভাবেই নির্ণয় করেছেন। 'সংগীত সার সংগ্রহে' তিনি স্পষ্ট ভাবে লিখেছেন

স্বরাণামিত্যত্র পুত্রাণাং পিতা ইতিবৎ জন্য জনক সম্বন্ধে ষষ্ঠী।
স্বরাণাং জনিকা ইত্যর্থঃ॥

অর্থাৎ পিতা পুত্রের যেমন জনক-জন্য সম্পর্ক, তেমনি এ দুয়ের মধ্যে শ্রুতি জনক, স্বর জন্য। অবশ্য রাধামোহনের গ্রন্থে এই প্রসঙ্গের ইঙ্গিতও নেই।

স্বর

শ্রুতি থেকে স্বরের জন্ম। যা শ্রুতি স্থানে হৃদয়াভ্যন্তরে ধ্বনিত হয়ে চিত্তরঞ্জক হয়, তার নাম স্বর। শার্ঙ্গদেব স্বরের সংজ্ঞা দিয়েছেন, 'স্বতো রঞ্জয়তি শ্রোতৃচিত্তং স স্বর উচ্যতে'। নরহরি শার্ঙ্গদেবকেই অনুসরণ করেছেন।

স্বর সাতটি, ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। সংক্ষেপে এগুলির নাম যথাক্রমে, স, রি, গ, ম, প, ধ, নি।

রাধামোহন বলেছেন, লোকে স্বরকে চলতি ভাষায় সুর বলে এবং ষড়জকে 'খরজ', ঋষভকে 'রিখভ' ও নিষাদকে 'নিখাদ' উচ্চারণ করে। তবে তিনি এও বলেন যে, 'খর মানে গর্দভ, তার রব-পরিমাণ খরজ, কিন্তু সাধনকালে তাকে ষড়জই বলতে হবে'। ষড়জকে নরহরি সংক্ষেপে বলেছেন 'স', কিন্তু রাধামোহন বলেছেন 'সা' এবং 'সা' বলার কারণও রাধামোহন দিয়েছেন

সাধিবারে খরজ অকার ভাল নয়।
আকারে উত্তম রূপে বিস্তরণ হয়॥ (সংগীততরঙ্গ, পৃঃ ১১)

নরহরি জানিয়েছেন

সপ্তস্বরে মন্দ্র মধ্য তার ভাবত্রয়॥
ক্রমে এ তিনের হৃৎকণ্ঠ-মস্তক স্থান।
মন্দ্র হৈতে দ্বিগুণ দ্বিগুণ উচ্চ গান॥ (ভ. র. পৃঃ ২৩৭)

অর্থাৎ স্বরগুলি তিন ভাবকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়—মন্দ্র, মধ্য ও তার। এ তিনটির অবস্থানক্ষেত্র যথাক্রমে হৃদয়, কণ্ঠ ও মস্তক। এই তিন প্রকার স্বরও পর পর দ্বিগুণীভূত হয় অর্থাৎ 'মন্দ্র'স্বর হৃদয়ে ধীরভাবে প্রকাশ পায়, তা কণ্ঠে গেলে দ্বিগুণ হয় ও 'মধ্য' নাম গ্রহণ করে। আবার 'মধ্য' স্বর কণ্ঠে মধ্যমভাবে প্রকাশ পায়, তা মস্তকে গেলেই দ্বিগুণ হয় এবং 'তার' নাম গ্রহণ করে।

স্বরের নামকরণ বিচার করতে গিয়ে নরহরি এগুলির উৎপত্তিস্থল লক্ষ্য করেছেন। এজন্যে তিনি 'সংগীতদামোদরে'র প্রমাণ উদ্ধার করে দেখিয়েছেন যে,

১। নাভি, হৃদয়, পার্শ্বদ্বয়, নাড়ী ও মস্তক—এই ছটি স্থানের বায়ু সংমূর্ছিত হয়ে ষড়জস্বর উৎপন্ন করে।

২। নাভি-উদ্ভূত বায়ু যখন মুখে সহজে বের হয় ও বৃষভবৎ ধ্বনি সৃষ্টি করে, তখন সে স্বরকে ঋষভ স্বর বলে।

৩। নাভি-উত্থিত বায়ু নাসিকা, কর্ণকে সঞ্চালিত করে নির্গত হলে গান্ধার।

৪। ঐ বায়ু শরীরের মধ্যস্থান দিয়ে গম্ভীর ও কিছু উচ্চরূপে নির্গত হলে মধ্যম।

৫। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পাঁচটি প্রাণের সম্মিলনে উৎপন্ন স্বর পঞ্চম। (হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যে অপান, নাভিতে সমান, কণ্ঠে উদান ও সর্বশরীরে ব্যানের অবস্থিতি)।

৬। নাভির অধোভাগে গিয়ে বস্তিদেশ স্পর্শ করে যে স্বর পুনরায় ঊর্দ্ধগতি হয়ে সবেগে কণ্ঠে উপস্থিত হয়, তা ধৈবত।

৭। এই ছটি মনোহর স্বর যে স্বরে অবস্থান করে, তাকে নিষাদ স্বর বলে।

প্রাচীন বাগ্‌গেয়কারদের এই অভিমত রাধামোহনের গ্রন্থে নেই। তিনি বলেছেন যে, উক্ত ৭টি স্বর অবস্থান করে যথাক্রমে নাভি, নাভির ঊর্দ্ধদেশ, হৃদয়, কণ্ঠ, তালু, ললাট ও ব্রহ্মরন্ধ্রে।[৪]

স্বরগুলির সাম্যধ্বনি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মহলে মতভেদ আছে। নরহরি তা লক্ষ্য করেছিলেন। তাই আপনার 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'সংগীতসার সংগ্রহে' সেই পার্থক্যেরও নির্দেশ রেখেছেন। এই বৈষম্য রাধামোহনের সময় আরো প্রকট হয়েছিল, তার প্রমাণ 'সংগীত তরঙ্গে' আছে। আমরা পাশাপাশি এই মতামতগুলি উদ্ধৃত করলাম

স্বরের নাম	ভক্তিরত্নাকর	সংগীত-দামোদর	সংগীত তরঙ্গ	(রাধামোহন[৫]) (মতান্তরে)
১। ষড়জ	ময়ূর	ময়ূর	গর্দভ	ময়ূর
২। ঋষভ	চাতক	বৃষ	গাভী	ভেক
৩। গান্ধার	ছাগ	ছাগ	ছাগ	গাভী
৪। মধ্যম	ক্রৌঞ্চ	ক্রৌঞ্চ	বক	কোকিল
৫। পঞ্চম	কোকিল	কোকিল	কোকিল	
৬। ধৈবত	ভেক	ঘোটক	ঘোটক	
৭। নিষাদ	হস্তী	হস্তী	হস্তী	

৪. সংগীততরঙ্গ, পৃঃ ১৪।

৫. সংগীততরঙ্গ, পৃঃ ১৫-১৬।

নরহরি পুনরায় স্বরগুলির আরেক প্রকার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন

পুনঃ এই সপ্তস্বর সংজ্ঞা চতুষ্টয়।
বাদী সম্বাদী বিবাদী অনুবাদী হয়॥ (.ভ. র., পৃঃ ২৩৯)

অবশ্য এই ভাবনা তিনি দত্তিল মুনির (২য় শতাব্দী) "দত্তিলম্" গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছেন। এই চারটির সংজ্ঞা এইরূপ—যে স্বরের বহুল উচ্চারণ, যা রাগসমূহের রাগত্ব প্রকাশ করে তাই বাদী। পঞ্চমের সমান শ্রুতি বিশিষ্ট স্বর সম্বাদী। নরহরি বিবাদী ও অনুবাদীর সংজ্ঞা দেন নি। কেবল উদাহরণ দিয়েছেন

গান্ধার নিষাদ আর ঋষভ ধৈবত।
এ চারি বিবাদী শত্রু শাস্ত্র সুসম্মত॥
এই সব স্বরের অবশিষ্ট যেই স্বর।
অনুবাদী স্বর সেই কহে বিজ্ঞবর॥ (ভ. র., পৃঃ ২৩৯)

দত্তিল মুনি স্বরের এই বৈশিষ্ট্যকে 'বাদীনৃপস্তথাপাত্রং' ইত্যাদি যে শ্লোকে তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন, নরহরি তা গ্রহণ করে সুন্দর অনুবাদ করেছেন। এই শ্লোকানুসারে, বাদীস্বর—রাজা, সম্বাদীস্বর—পাত্র, বিবাদী স্বর—শত্রু, অনুবাদীস্বর—রাজাও আত্রের অনুচর।

এই বিষয়টি রাধামোহনের গ্রন্থে স্পষ্ট আলোচিত দেখা যায়। রাধামোহন বলেন যে, বাদীস্বর হলো স্বর বা সুরের রাজা—অন্য সুর তার অনুগত, তা রাগের জীবন, রাগ অঙ্গে প্রধান সুর হলো বাদী। আর বাদী সুরের সঙ্গে যাদের মিলন, তারাই সম্বাদী। দু সুরের মধ্যে সম্বাদী সুর—খরজ হতে পঞ্চমে উঠতে বা পঞ্চম হতে খরজে নামতে মধ্যে যে তিন সুর—রি, গ, ম। যে সুর অন্যের পাশে প্রয়োগ হলে রাগের হানিকর অবস্থা হবে তারা বিবাদী। এবং 'সকলের শেষে যেই সুরের মিলন তা অনুবাদী'।[৬]

গ্রাম

নরহরি বলেন: 'স্বরের অদ্ভুত গতি গ্রামেতে প্রচারা'। গ্রাম বলতে তিনি বোঝান: 'স্বর সূক্ষ্ম-ভাব সংযোজন' অর্থাৎ স্বরগুলির অতি সূক্ষ্মভাবে সংযোজনকে গ্রাম বলে। "স্বরাণাং সুব্যবস্থানাং সমূহো গ্রাম ইষ্যতে"—সুব্যবস্থিত স্বর হলো গ্রাম।

৬. সংগীততরঙ্গ, পৃ. ২৪-২৫।

গ্রাম তিনটি—ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধার। তন্মধ্যে প্রথম দুটি মর্তে ও তৃতীয়টি স্বর্গে প্রচলিত। তিনটির মধ্যে ষড়জ গ্রামই শ্রেষ্ঠ। গ্রাম মূর্ছনার আধার। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে নরহরি 'সংগীতপারিজাতে'র "অথ গ্রামাস্ত্রয়ঃ প্রোক্তা" ইত্যাদি বিখ্যাত শ্লোকটি উদ্ধার করেছেন।

কিন্তু গ্রন্থকার গ্রামগুলির কোনো বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেন নি। এগুলির শ্রুতি বিভাগও দেখান নি। অর্থাৎ ২২টি শ্রুতির কোন্ কোন্ শ্রুতিতে কোন্ কোন্ স্বর উৎপন্ন হলে গ্রামগুলির সৃষ্টি হবে, তার কোনো পরিচয় নরহরির গ্রন্থে নেই।

রাধামোহন আবার গ্রামগুলির আরেক প্রকার ভেদ উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে গ্রামগুলির তিন ভাগ—'উদারা' (উদর হতে নির্গত), 'মোদারা' (মধ্যস্থান হতে নির্গত) এবং 'তারা' (ব্রহ্মরন্ধ্র হতে নিঃসৃত)। এঁর বিবেচনায় সর্বোচ্চ গ্রামের নাম গান্ধার॥[৭]

মূর্ছনা

এই প্রসঙ্গে নরহরি গ্রামগুলির মূর্ছনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। 'মূর্ছনা আধার গ্রাম'। মূর্ছনা বিষয়টি 'গীতচন্দ্রোদয়ে' একেবারেই নেই, 'ভক্তি-রত্নাকরে'র আলোচনাও বিশদ নয়, বরং 'সংগীতসারসংগ্রহে'র আলোচনা মোটামুটি বিস্তৃত।

গ্রামত্রয়ে সপ্তস্বর মূর্ছনা প্রচার।
ষড়জগ্রামে স-রি-গ-ম-প-ধ-নি নির্ধার॥
ম-প-ধ-নি-স-রি-গ মধ্যম গ্রামে হয়।
গ-ম-প-ধ-নি-স-রি গান্ধারে সুনিশ্চয়॥ (ভ.র. পৃঃ ২৪০)

এজন্যে নরহরি 'সংগীতপারিজাত' এবং অপর একটি ('অন্যেঽপি') গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। সংগীতসারসংগ্রহে গ্রাম তিনটির মূর্ছনা উদাহরণযোগে আলোচিত হয়েছে।

যেমন—

৭. সংগীততরঙ্গ পৃঃ ১৪-১৫।

ব. বি. / ন. চ. (২) / ৪১-১১

(ক) ষড়জগ্রাম মূর্ছনা—স রি গ ম প ধ নি— স - নি ('স' দিয়ে আরম্ভ,
নি স রি গ ম প ধ—নি - ধ 'স' দিয়ে শেষ)
ধ নি স রি গ ম প—ধ - প
প ধ নি স রি গ ম—প - ম
ম প ধ নি স রি গ—ম - প
গ ম প ধ নি স রি—গ - রি
রি গ ম প ধ নি স—রি - স

(খ) মধ্যমগ্রাম মূর্ছনা— ম প ধ নি স রি গ—ম - গ ('ম' দিয়ে আরম্ভ,
গ ম প ধ নি স রি—গ - রি 'ম' দিয়ে শেষ)
রি গ ম প ধ নি স —রি - স
স রি গ ম প ধ নি—স - নি
. নি স রি গ ম প ধ—নি - ধ
ধ নি স রি গ ম প—ধ - প
প ধ নি স রি গ ম—প - ম

(গ) গান্ধার গ্রাম মূর্ছনা—গ ম প ধ নি স রি—গ - রি ('গ' দিয়ে আরম্ভ,
রি গ ম প ধ নি স—নি - স 'গ' দিয়ে শেষ)
স রি গ ম প ধ নি—স - নি
নি স রি গ ম প ধ—নি - ধ
ধ নি স রি গ ম প—ধ - প
প ধ নি স রি গ ম—প - ম
ম প ধ নি স রি গ—ম - গ

এর পর গ্রন্থকার মূর্ছনার সংজ্ঞা ও পরিচিতি দিয়েছেন। বলেছেন, স্বর যখন সংমূর্ছিত হয়ে রাগে পরিণত হয়, ভরতাদি মুনিগণ সেই গ্রামোৎপন্ন রাগকে মূর্ছনা বলেন। এ বিষয়ে তিনি 'অপরঞ্চ' বলে অন্য এক গ্রন্থেরও প্রমাণবাক্য তুলেছেন: "যত্র স্বরো মূর্ছিত এব রাগতাং প্রাপ্তশ্চ তামাহু মুনিশ্চ মূর্ছনাম্। গ্রামোদ্ভবাস্তাঃ স্বরসপ্তসংযুতাঃ গ্রামত্রয়ে স্যুঃ পুনরেকবিংশতিঃ॥" এই শ্লোকের শেষ চরণে পাই, সেই মূর্ছনা তিন গ্রামে মোট ২১টি। মতটি বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গের।

এই ২১টি মূর্ছনার নাম—ললিতা, মধ্যমা, চিত্রা, রোহিণী, মতঙ্গজা, সৌবীরী, বর্ণমধ্যা, ষড়জমধ্যা, পঞ্চমী, মৎসরী, মৃদুমধ্যা, শুদ্ধান্তা, কলাবতী, তীব্রা, রৌদ্রী, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, খেচরী, বরা, নাদবতী ও বিশালা।

মূর্ছনা আলোচনায় গ্রন্থকার বার বার আচার্য ভরতের ঋণ স্বীকার করেছেন। কিন্তু ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে'[৮] (২৮৷৩১) যে বিস্তৃত ও সম্পূর্ণভাবে মূর্ছনা প্রসঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে, নরহরির আলোচনা তার তুলনায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। শুধু তাই নয়, ভরত প্রদত্ত নামগুলিও নরহরি গ্রহণ করেন নি। উভয় গ্রন্থে কেবল 'সৌবীরা' ও 'মৎসরী'—এই দুটি নামের মিল আছে।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মূর্ছনাগুলির যে আভিচারিক ও আভ্যুদয়িক প্রবৃত্তির কথা উল্লেখ করেছেন,[৯] নরহরি সে-বিষয়েও তেমন আলোকপাত করেন নি। কেবলমাত্র একটি শ্লোকে একবার বলেছেন, শিবের সামনে মূর্ছনা গান করে ব্রহ্মঘাতী ও পাপ মুক্ত হয় (ভ.র. পৃঃ ২৪২)।

আবার নারদীয়-শিক্ষাগ্রন্থে ৭টি মূর্ছনার ৭ জন অধি-দেবতার প্রসঙ্গও আছে। নরহরি সে কথাও বলেন নি। এমন কি মূর্ছনার যে তিনটি প্রসিদ্ধ বিভাগ আছে—সম্পূরণ (৭টি স্বরে), ষাড়ব (খাড়ো,৬টি স্বরে), ঔড়ব (ওড়ো, ৫টি স্বরে), মূর্ছনার সঙ্গে গ্রামের সম্পর্ক, স্বরের আরোহ বা অবরোহ অনুসারে মূর্ছনার কীরূপ গতি সৃষ্টি হয়—এ সম্পর্কে নরহরি নীরব রয়েছেন। এমন কি তাঁর পরবর্তী কবি রাধামোহন সেনও মূর্ছনার বিভাগ বা গোষ্ঠ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করেন নি॥ [১০]

তাল বা তান

'মূর্ছনা এব তালাঃ স্যুঃ শুদ্ধা আরোহনাশ্রিতাঃ॥' অর্থাৎ স্বরের আরোহণ মুখে মূর্ছনা সকলই শুদ্ধ 'তাল' হয়। তালের আলোচনায় নরহরি প্রধানতঃ 'সংগীতদামোদরে'র প্রমাণ উদ্ধার করেছেন। দামোদরের উদ্ধৃতিতে

৮. নাট্যশাস্ত্র, ভরত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বেনারস (১৯২৯ খ্রীঃ)।

৯. 'সংগীত ও সংস্কৃতি', পৃঃ ২২২-২২৩ (১ম): গান্ধার গ্রাম মূর্ছনার প্রয়োগ—মেঘদূত ৯১ নং শ্লোকে যক্ষিণীর যক্ষ আবাহন—(আভিচারিক ব্যাপার); ৭৭ নং শ্লোকে কিন্নরদের কুবেরের যশোগান—(আভ্যুদয়িক ব্যাপার)।

১০. সংগীততরঙ্গ, পৃঃ ২৫-৩৪।

বলা হয়েছে যে, যাদের দ্বারা মূর্ছনার শেষভাগের আশ্রয়ে স্বর প্রয়োগের বিস্তার হয়, তারাই ৭টি স্বরোদ্ভূত ৪৯ সংখ্যক তান। তান হতেই পৃথক পৃথক কূটতানগুলির উৎপত্তি। তাদের ভেদ বহু প্রকারের। নরহরি তালাধিকার গ্রন্থের (তদুক্তং তালাধিকারে) উদ্ধৃতি নিয়ে দেখিয়েছেন যে, ঐ সকল তান সংখ্যায় ৫০৩৩টি। কিন্তু তালাধিকারেও সেগুলির নাম পরিচয়াদি নেই। এতে শুধু একটিমাত্র তানের নাম করে বলা হয়েছে, 'অগ্নিষ্টোমিক তালে শিবের স্তব করলে শিবত্বপ্রাপ্তি হয়'।

রাধামোহন সেন বলেছেন যে, তানের সংখ্যা ৫০৪০, তন্মধ্যে ২৪টির ব্যবহার আছে। অবশ্য অনেক প্রাচীন সংগীতকারও তানের সংখ্যা ৫০৪০ ধরেছেন। কিন্তু নরহরি কেন যে কূটতানের সংখ্যা ৫০৩৩ গ্রহণ করে ৭টিকে বাদ দিয়েছেন, বোঝা যায় না। নরহরি তানের প্রকারভেদ, ব্যবহারবিধি ও ব্যবহারিক উদ্দেশ্য—এ সম্পর্কে কোনো কথা বলেন নি ॥

বর্ণ ও অলংকার

নরহরি বলেন : 'গানক্রিয়া—আরম্ভ প্রযুক্তস্বর বর্ণ'। বর্ণ চার শ্রেণীর—

(ক) স্থায়ী (এক-ই স্বর থেকে থেকে প্রয়োগ হলে—স স স স),
(খ) আরোহী (নীচ থেকে উপরে স্বরের ওঠা—স রি গ ম প ধ নি),
(গ) অবরোহী (উপর থেকে নীচে স্বরের নামা—নি ধ প ম গ রি স)
(ঘ) সঞ্চারী (উক্ত তিন বর্ণের মিলনে সৃষ্ট—স রি স রি গ ম নি ধ স রি গ)

বর্ণের এই ভেদগুলি প্রমাণ করতে নরহরি 'সংগীতপারিজাতে'র আশ্রয় নিয়েছেন। 'সংগীতসারসংগ্রহে' নতুন কথা বলেছেন যে, সেই আরোহী ও অবরোহী বর্ণ সংযুক্ত হলে যে নতুন বর্ণের উদ্ভব ঘটে, তাকে "পরাবর্ণস্থ" বলে।

রচনা বৈশিষ্ট্য হেতু বর্ণগুলির বিশেষ বিশেষ অলঙ্কার আছে। স-রি-গ-মাদি সাত স্বর উত্তমরূপে সংগঠিত বা সুগ্রথিত হলে অলঙ্কার সৃষ্ট হয়। নরহরি বলেন, স্থায়ী বর্ণের ২৬টি, ও অন্য তিনটি বর্ণের ১২টি করে মোট ৬২টি অলঙ্কার আছে।

অলঙ্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁর অভিমত যে, স্বর জ্ঞানে অভ্যাস দৃঢ় ও আনন্দ লাভ হয়, অলঙ্কারের প্রয়োজনে বর্ণজ্ঞানের বৈচিত্র্য প্রয়োজনীয়। 'সংগীতপারিজাতে'র বচন উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, অলংকার ব্যতীত রাগ বিস্তার-লাভ করতে পারে না।

'সংগীতসারসংগ্রহে' বর্ণালঙ্কার সম্পর্কে আর কিছু না বললেও 'ভক্তি-রত্নাকরে' অলঙ্কারগুলির কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। স্থায়ী বর্ণের একটি অলঙ্কারের নাম করেছেন 'ভদ্র'—যার লক্ষণ হলো: "এক এক স্বরে হানি—ক্রম এ প্রস্তার"। লক্ষণ প্রকাশে তিনি হনুমানের মত উল্লেখ করেছেন। এবং উদাহরণ দিয়েছেন—স-রি-গ, রি-গ-রি, গ-ম-গ, ম-প-ম, প-ধ-প, ধ-নি-ধ, নি-স-নি।

আরোহী বর্ণের 'বিস্তীর্ণাখ্য,' 'প্রচ্ছাদন', 'উদ্বাহিত' নামক তিনটি বর্ণের উল্লেখ উদাহরণযোগে বিবৃত হয়েছে। সঞ্চারীর 'প্রসাদ', 'আক্ষেপ', 'কোকিলাখ্য' নামক তিনটি অলঙ্কার বিশ্লেষিত দেখা যায়। এগুলি বিশদ করতে গ্রন্থকার 'সংগীতপারিজাতে'র প্রমাণ উদ্ধার করেছেন।

অবরোহী সম্পর্কে পারিজাতের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে বাহুল্যভয়ে নরহরি তা বিশ্লেষণ করেন নি।[১১]

গ্রহস্বর অংশস্বর ন্যাসস্বর

এই প্রসঙ্গে গ্রহস্বর অংশস্বর ও ন্যাসস্বর আলোচিত হয়েছে। জাতি বা রাগের প্রধান ১০টি লক্ষণের মধ্যে এই ৩টি লক্ষণ ধরা হয়। তাই জাতি

---

১১. শার্ঙ্গদেব প্রমুখ বাগ্গেয়কারেরা স্থায়ীর ৭টি (প্রসন্নাদি, প্রসনান্ত, প্রসন্নাদ্যন্ত, প্রসন্নমধ্য, ক্রমরেচিত, প্রস্তার ও প্রসাদ), আরোহীর ১২টি (বিস্তীর্ণ, নিষ্কর্ষ, বিন্দু, অভ্যুচ্চয়, হসিত, প্রেঙ্খিত, আক্ষিপ্ত, সন্ধিপ্রচ্ছাদন, উদ্গীত, উদ্বাহিত, ত্রিবর্ণ, বেণী), সঞ্চারীর ২৫টি (মন্দ্রাদি, মন্দমধ্য, মন্দ্রান্ত, প্রস্তার, প্রসাদ, ব্যাবৃত্ত, স্খলিত, পরিবর্তক, আক্ষেপ, বিন্দু, উদ্বাহিত, ঊর্মি, সম, প্রেংখ, নিষ্কুজিত, শ্যেন, ক্রম, উদ্‌ঘটিত, রঞ্জিত, সন্নিবৃত্ত, প্রবৃত্তক, বস্নুরম, ললিতস্বর, হুংকার, হ্রাদমান, অবলোকিত) এবং আরো বিশেষপ্রকার ৭টি (তারমন্দ্র-প্রসন্ন, মন্দ্রতার-প্রসন্ন, আবর্তক, সম্প্রদান, বিধুত, উপলোলক, উল্লাসিত) অলংকারের উল্লেখ করেছেন। অবরোহীর কোনো অলংকার উল্লিখিত হয় নি। রাজ্যেশ্বর মিত্র—'সঙ্গীত সমীক্ষা' (মিত্রালয়, ১৩৬৬) পৃঃ ৪৬-৪৭।

আলোচনার প্রারম্ভেই এগুলির আলোচনা। গীতের প্রারম্ভিক স্বর-গ্রহস্বর ; অনুরাগ প্রকাশক স্বর—অংশস্বর এবং সমাপ্তিসূচক স্বর—ন্যাসস্বর।

সপ্তস্বরে যে স্বর গীতাদৌ সমর্পয়।
সেই গ্রহস্বর মুনি ভরতাদি কয়॥
অংশস্বর অনুরাগ প্রকাশক গানে।
ভরতাদি ঐছে বহু প্রভাব বাখানে॥
ন্যাসস্বর গীতাদিক সমাপ্ত করয়।
সে পায় আনন্দ যার ইথে জ্ঞান হয়॥

(ভক্তি রত্নাকর, পৃঃ- ২৪৬)

ভরত মুনির মত, সংগীতপারিজাত ও অপর একটি ('অপরঞ্চ') সংগীত গ্রন্থের প্রমাণ এই আলোচনার বিশুদ্ধির জন্য কলিত হয়েছে।

জাতি

সংগীত বিজ্ঞানে জাতি ও রাগ শব্দ দুটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। শ্রুতি, স্বর, গ্রাম ইত্যাদি থেকে যে গীত রূপের উৎপত্তি—তাকে 'জাতি' বলে। জাতি থেকেই 'রাগ' জন্মে। যা উত্তরভারতীয় সংগীতের প্রাণবস্তু। তাই রাগের ইতিবৃত্ত জানতে হলে জাতির বিশদ পরিচয় গ্রহণ করতে হয়। নরহরি তাঁর আলোচনার প্রথম পর্যায়ে তাই নাদ, শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মূর্ছ‌না, তাল, বর্ণ ও অলঙ্কার এবং গ্রহস্বরাদি আলোচনা করে জাতির ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

জাতি সম্পর্কে বলেছেন—

যাহা হৈতে জন্মে রাগ তারে জাতি কয়।
সে রাগের মাতা—পুনঃ জাতি ভেদত্রয়॥
শুদ্ধা, বিকৃতাখ্যা হয়, এ দুয় মিলনে।
সংকীর্ণাখ্যা—এই ত্রয় কহে বুধগণে॥ (ভ. র. পৃঃ ২৪৬-২৪৭)

অর্থাৎ যা থেকে রাগ জন্মে, সংগীতশাস্ত্রে তাকে জাতি বলে। জাতি তিন প্রকার—শুদ্ধা, বিকৃতা ও সঙ্কীর্ণা। কিন্তু শুদ্ধা ও বিকৃতার লক্ষণ কিছু

আলোচিত হয় নি। কেবল সঙ্কীর্ণা বলতে অপর দুটির মিলন—এই কথাই উক্ত হয়েছে।

শুদ্ধা জাতি ৭টি, বিকৃতা ১১টি, উভয় মিলে ১৮টি কিন্তু সঙ্কীর্ণার বিশেষ কোনো বিভাগ বলা হয় নি। তবে একটি স্থলে গ্রন্থকার বলেছেন যে, বিকৃতার মিশ্রণে সঙ্কীর্ণার উদ্ভব হয়, সেই হিসেবে সঙ্কীর্ণা দু প্রকারের—এমন অভিমতও পূর্বাচার্যেরা রেখেছেন। জাতি তিনটি বিভাগ নির্ণয়ে তিনি হরিনায়কের সাহায্য ও সমর্থন গ্রহণ করেছেন।

শুদ্ধা জাতি ৭টি হলো—ষাড়জ, আর্ষভী, গান্ধারী, মাধ্যমী, পাঞ্চমী, ধৈবতী, নৈষাদী।

বিকৃতা ১১টি হলো—ষডজকৈশিকী, ষড়জমধ্যমা, গান্ধার পঞ্চমান্ত্রী, ষড়জা, ধৈবতী, কার্মাবরী, নন্দয়ন্তী, গান্ধারোদীশ্চবা, মধ্যমোদীশ্চবা, রক্তগান্ধারী, কৈশিকী। কিন্তু শার্ঙ্গদেব প্রমুখেরা এই ১১টির যে নাম করেছেন—তাতে গান্ধারপঞ্চমান্ত্রী, ষডজা ও ধৈবতী নেই, তার পরিবর্তে আছে গান্ধার পঞ্চমী, আন্ত্রী, ষড়জোদীচ্যবা।[১২]

নরহরি তিনটি বিকৃতার উপাদানগুলি দেখিয়েছেন :

ষড়জকৈশিকী = ষাড়জী + গান্ধারী
ষডজমধ্যমা = ষাড়জী + মধ্যমা
গান্ধার পঞ্চমী = গান্ধারী + পঞ্চমী।

শার্ঙ্গদেবের গ্রন্থে তাঁর উল্লিখিত ১১টি বিকৃতারই উপাদান পৃথক করে দেখানো হয়েছে, নরহরি গ্রন্থবাহুল্যহেতু সেগুলির পরিচয় দানে বিরত রয়েছেন। এবং তিনি জাতির প্রধান ১০টি লক্ষণ, জাতিগুলির পূর্ণত্ব, ষাড়বত্ব ও ঔড়বত্ব এবং জাতিগুলির গ্রাম-অন্তর্ভুক্তি—এসব বিষয়ও গ্রহণ করেন নি।

এ অষ্টাদশের গ্রাম-সম্বন্ধ বিচার।
বিস্তারি বর্ণিলা ভরতাদি গ্রন্থকার॥ (ভ. র. পৃঃ ২৪৮)

নরহরি বলেন, শ্রুতি হতে জাতি পর্যন্ত বীণাযন্ত্রেই জানা যায়, অন্যভাবে নয়।

---

১২. সংগীতসমীক্ষা (মিত্রালয় ১৩৬৬), রাজ্যেশ্বর মিত্র পৃঃ ৫০।

রাগ

সংগীত বিজ্ঞানে রাগ রাগিণীই মুখ্য আলোচ্য বিষয়। এগুলি নিয়ে বেশ কিছু মতবাদ গড়ে ওঠে। ব্রহ্মা মত, শিব মত, ভরত মত, নারদ মত, হনুমান মত, কল্লিনাথ মত, সোমেশ্বর মত সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই সব বিভিন্ন মতগুলিতে রাগ রাগিণীর সংখ্যা, নাম, চারিত্র্যলক্ষণ, রূপ ও ধ্যান নিয়ে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। যদিও এই ব্রহ্মা, শিব, ভরত, নারদ প্রমুখের সত্যনিষ্ঠ কোনো পরিচয় মেলে নি, তবু প্রাচীন সংগীতজ্ঞেরা এদের অস্তিত্ব এক বাক্যে মেনে নিয়েছেন। এই সব মতগুলির কোনোটিতে ৬ রাগ, ৩৬ রাগিণী, কোনোটিতে ৮ রাগ উল্লেখ করা হয়েছে।

নরহরি এই সব বিভিন্ন মতবাদের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন। তন্মধ্যে যেগুলি তাঁর সময়ে বিশেষভাবে স্বীকৃত বা গৃহীত হচ্ছিল, বা যে-গুলিকে তিনি যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছিলেন, সেগুলিই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রন্থভুক্ত করেছেন।

রাগের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে নরহরি বলেছেন যে, যদ্দারা এই ত্রিজগৎবর্তী চিত্তসমূহ অনুরঞ্জিত হয়, তাকেই ভরতাদি মুণিগণ রাগ নামে অভিহিত করেছেন। "রঞ্জকো জনচিত্তানাং স রাগ উদাহৃতঃ"।

রাগগুলিকে পুরুষ হিসেবে গ্রহণ করে বাজ্ঞেয়কারেরা প্রতিরাগের ৫।৬টি করে ভার্যা কল্পনা করেছেন, এগুলিই রাগিণী।

নরহরি লিখেছেন—রাগ ৬টি, রাগিণী ৩০; প্রতিরাগের ৫টি করে ভার্যা—

> ষট্‌ত্রিংশতে রাগ ছয়, রাগিণী ত্রিংশৎ।
> প্রতি রাগে পঞ্চ ভার্যা—এহো সুসম্মত॥ (ভ.র., পৃঃ ২৪৯)

'সংগীতদামোদরে' এই মত ব্যক্ত হয়েছে, আপনার গ্রন্থে নরহরি তার প্রমাণ উদ্ধার করেছেন। এই গ্রন্থের শ্লোকে রাগরাগিণীর নামগুলি হলো—

রাগ	রাগিণী
১। ভৈরব	ভৈরবী, কৌশিকী, বিভাষ, মেঘ, নটনারায়ণ।
২। বসন্ত	আন্দোলিতা, দেশাখ্যা, লোলা, প্রথম মঞ্জরী, মল্লারী।
৩। মালবকৌশিক	গৌরী, গুণকরী, বরাড়ী, ক্ষমাবতী, কর্ণাটী।
৪। শ্রী	গান্ধারী, দেবগান্ধারী, মালবশ্রী, আশাবরী, রামকিরী।

৫।	মেঘ	ললিতা, মালসী, গৌরী, নাটী, দেবকিরী।
৬।	নটনারায়ণ	তারামনী, সুধাভীরী, কামোদী, গুর্জরী, ককুভা॥

কিন্তু এই মত সকলেই গ্রহণ করেন নি। নরহরি বলেন—

কেহ কহে—ষট্‌রাগ, রাগিণী ষট্‌ত্রিংশৎ।
প্রতিরাগে ভার্যা ছয়, এহো সুসঙ্গত॥

এই মত আছে নারদপঞ্চম সংহিতায়। নরহরি এ থেকে রাগরাগিণীর তালিকাটি উদ্ধৃত করেছেন :

	রাগ	রাগিণী
১।	মালব	ধানসী, মালসী, রামকেরী, সিন্ধুড়া, আশাবরী, ভৈরবী।
২।	মল্লার	বেলাবেলী, পূরবী, কানড়া, মাধবী, কোড়া, কেদারিকা।
৩।	শ্রী	বেলোয়ারী, গৌড়ী, গান্ধারী, সুভগা, কৌমারী, বৈরাগী।
৪।	বসন্ত	তোড়ী, পঞ্চমী, ললিতা, পঠমঞ্জরী, গুর্জরী, বিভাষা।
৫।	হিন্দোল	মায়ূরী, দীপিকা, দেশকারী, পাহিড়া, বরাড়ী, মারহট্টা।
৬।	কর্ণাট	নাটিকা, ভূপালী, রামকেরী, গড়া, কামোদী, কল্যাণী॥

'ভক্তিরত্নাকরে' উল্লেখ না করলেও নরহরি তাঁর 'সংগীতসারসংগ্রহে' মম্মটভট্টের 'সংগীতমালা'য় উদ্ধৃত ৬ রাগ ও ৩৬ রাগিণীরও উল্লেখ করেছেন। সংগীতমালায় আছে—

	রাগ	রাগিণী
১।	কর্ণাট	চন্দনী, মালবশ্রী, সিন্ধু, বেলাবেলী, প্রপাতনী, বিভাষ।
২।	নাট	কম্বোজী, নাটভাষা, নায়িকা, গুণমঞ্জরী, শেখরী, মুখরী।
৩।	মল্লার	মাল্লারী, ললিতা, প্রাচীন মঞ্জরী, মধুকরী, তুঙ্গকারী, দেশী।
৪।	দেশী	গুর্জরী, রামকেরী, গুণ্ডকেরী, শুভেহিকা, ধনাসী, বরাড়ী।
৫।	মালব	শ্রী, কেদার, মেঘমার্জনিকা, কন্দু, চিন্তামর্চি, নবনী।
৬।	বসন্ত	ভৈরবী, বঙ্গহারী, মেঘতালা, সুপঞ্চমী, অমরা, তোড়িকাগৌড়ী।

আবার 'সংগীতকৌমুদী'তে পুং রাগ ধরা হয়েছে ৮টি। নরহরি তারও উল্লেখ করেছেন—ভৈরব, ভূপতি, শ্রী, পঠমঞ্জরী, বাসন্তিকা, ভূপাল, সারঙ্গ ও মালব। এবং এ গ্রন্থে উল্লিখিত ৩০টি রাগিণীর কথাও নরহরি জানিয়েছেন।

আবার দাক্ষিণাত্য নিবন্ধ 'রাগবিবেক' গ্রন্থে উল্লিখিত ৮টি পুংরাগের নামেও পার্থক্য আছে ; নরহরি আপন গ্রন্থে তাও সংযোজিত করেছেন। ভৈরব, ভূপাল, শ্রী, পাঠমঞ্জরী, বাসন্তী, মালব, বঙ্গালী, নাট।

নরহরি লিখেছেন যে, হরিনায়কের গ্রন্থেও অনুরূপ পার্থক্য দেখা যায়। তবে এই সব বিচিত্র মতামত প্রয়োজনহীন ভেবে গ্রন্থকার উল্লেখ করেন নি। তিনি তাই বলেছেন :

ঐছে নানা প্রকার কহয়ে বিজ্ঞাবান।
কল্পান্তরাভিপ্রায়ে এ হয় সাবধান ॥
দেশে দেশে রাগ গণ নাম ভিন্ন হয়।
কেহ না করিতে পারে রাগের নির্ণয় ॥

রাগরাগিণীর বিশদ পরিচয় দিতে গিয়ে রাধামোহন সেন 'রাগ পরিবার' বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে প্রতি রাগেরই একটি করে নিজস্ব পরিবার আছে। সেখানে আছে ১ পুংরাগ, ৬ স্ত্রীরাগিণী, ৬ পুত্র, ৬ পুত্রবধূ, ১ সখা ও ১ সখী মোট ২১ জন। ৬ রাগের পরিবারে মোট আছে ১২৬ জন। তিনি পুংরাগের নাম করেছেন— ভৈরব, মালকৌশ, হিণ্ডোল, দীপক, মেঘ ও শ্রী। এই ছয়টি রাগের পরিবার বর্ণনায় তিনি হনুমান ও ভরত মত পৃথক পৃথকভাবে গ্রহণ করেছেন। এগুলির মধ্যে আমরা উদাহরণস্বরূপ 'ভৈরব' রাগের পারিবারিক পোষ্য উল্লেখ করলাম :[১৩] 'ভৈরব রাগ—

৬	রাগিণী—	বঙ্গালী, ভৈরবী, বরাটী, মধ্যমা, মধ-মাধবী, সিন্ধবী।
৬	পুত্র—	কোশক, অজয়পাল, শ্যাম, খরতাপ, শুদ্ধ, ঢোল।
৬	পুত্রবধূ—	অষ্টী, রেওয়া, বহুলা, মোহিণী, রম্ভেলী, পুহ।
১	সখা—	গান্ভারী।
১	সখী—	রেখব ॥

নরহরি অনুরূপ কোনো পরিবারের কথা উল্লেখ করেন নি। রাধামোহন রাগের ৬টি লক্ষণ (বিনাশ, বর্জিত, অংশ, মূর্দনা, গমক, পুহ) নির্ণয় করেছেন, শুদ্ধ, সালংক ও সংকীরণ ভেদে রাগের তিন বর্ণের কথা বলেছেন, রাগের ধ্যানরূপের পরিচয় দিয়েছেন, এছাড়া 'রাগাধ্যায়' অংশে রাগের ৪টি উপাঙ্গ

১৩. সংগীততরঙ্গ, পৃঃ ১২০।

(রাগঅঙ্গ, ভাখা অঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ, অপাঙ্গ)-এর কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু নরহরির রচনায় এসব তথ্যের কোনো ইঙ্গিত নেই।

নরহরির 'ভক্তিরত্নাকরে' রাগের তিনটি শ্রেণীবিভাগ দেখিয়েছেন—(১) সম্পূর্ণ—যে সকল রাগ ৭টি স্বরে গীত হয়। উদাহরণস্বরূপ তিনি শ্রী, নট, কর্ণাট, গুপ্তবসন্ত, শুদ্ধভৈরব ইত্যাদির নামোল্লেখ করেছেন। রাধামোহন সম্পূর্ণ রাগকে বলেছেন 'সম্পূরণ', এই বিভাগে তিনি ৮০টি রাগের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। কোহলের অনুসরণে নরহরি পূর্ণরাগগুলির ফলাফল ঘোষণা করেছেন। (২) ষাড়ব রাগ—৬ স্বরে উত্থিত রাগ। যেমন—গৌড, কর্ণাট গৌড়, দেশী, ধন্যাসিকা প্রভৃতি। রাধামোহন এই রাগকে বলেছেন 'খাড়ো'—এই পর্যায়ের ৩০টি রাগের তিনি নাম দিয়েছেন। (৩) ঔড়ব—৫ স্বরে গীত। যেমন—মধ্যমাদি, মল্লার, দেশপাল ইত্যাদি। রাধামোহনের গ্রন্থে এর নাম 'ওড়ো'—তিনি এ পর্যায়ের ১৫টি রাগের নাম উল্লেখ করেছেন। নরহরি এই তিন শ্রেণীর রাগেরই (কোহলকে অনুসরণ করে) ফলাফল নির্ণয় করেছেন, রাধামোহন তা করেন নি।

এই প্রসঙ্গে নরহরি 'সঙ্কীর্ণ' নামক রাগের এক পৃথক শ্রেণীর কথা জানিয়েছেন। উক্ত তিন শ্রেণীর রাগ পরস্পর মিশ্রণে এই সঙ্কীর্ণ রাগ সৃষ্টি।

কহিল যে রাগ—এ অন্যোহন্য সংসর্গেতে।
সঙ্কীর্ণ কহয়ে বিজ্ঞ, শ্রুতি শোভা যাতে॥ (ভ. র., পৃঃ ২৫২)

সঙ্কীর্ণ রাগের উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি পৌরবী, কল্যাণী, সারঙ্গ, গৌরী, নটমল্লারিকা, বল্লবী, কর্ণাটিকা, সুখাবরী, আশাবরী, রামকেলী, প্রভৃতির নাম ও পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি আরো জানিয়েছেন যে, আরো বহুতর সংকীর্ণ রাগ আছে ; যে দেশে যে সকল সঙ্কীর্ণ রাগ যেরূপে শোনা যায়, বিশেষজ্ঞেরা তাদের সেইরূপেই গ্রহণ করে থাকেন। তিনি সেগুলির নাম প্রকাশ করেন নি।

এই সঙ্কীর্ণ রাগগুলি যে ভাবে সৃষ্ট হয়েছে, নরহরির প্রদত্ত বর্ণনা থেকে তা উদ্ধৃত হলো—

	সঙ্কীর্ণ রাগ	মিশ্রণ
১।	পৌরবী	দেশী + মল্লারী
২।	কল্যাণী	বারাটী + নাটকর্ণাট।
৩।	সারঙ্গ	তোড়ী + ধন্নাসিকা।
৪।	গৌরী	শ্রী + গৌড়।
৫।	নট মল্লারিকা	নাট + মল্লার।
৬।	বল্লবী	দেশাখ্য + শাবরী।
৭।	কর্ণাটিকা	কর্ণাট + ভৈরবী।
৮।	সুখাবরী	সৈন্ধবী + তোড়িকা
৯।	আশাবরী	মল্লার সৈন্ধবী + তোড়ী।
১০।	রামকেলি	গুর্জরী + দেশিকা ॥

এই সঙ্গে নরহরি রাগগুলির গাইবার উপযুক্ত কাল সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। অজ্ঞতাবশত অনেক নতুন গায়কই কাল বিচার না করে ইচ্ছানুসারে রাগ ধরেন। কিন্তু "অসময় গানে গায়কের দোষ হয়।" তবে শাস্ত্রে তার প্রতিকার বিধিরও উল্লেখ আছে। নরহরি সে কথায় জানিয়েছেন—

সম্মিলিতভাবে গানে, রাজাদেশে বা রঙ্গস্থলে গান করলে ব্যতিক্রম দোষ হয় না।

অর্থলোভে, অজ্ঞতাবশত ও শোকের সময় গান করলে গায়কদোষ জন্মে, সুরসা, গুর্জরী রাগিণী তাদের সেই দোষ নষ্ট করে।

রত্নমালার উদ্ধৃতিতে আছে—বসন্ত, রামকেলি, সুরসা, গুর্জরী সর্বকালেই গীত হবে, তাতে কোনো দোষ হবে না।

লক্ষণীয় যে, রাধামোহনও অনুরূপভাবে রাগের সময় নির্ণয় করেছেন। সেজন্যে তিনি সংগীতপারিজাত, সোমেশ্বর ও নাদপুরাণের অভিমতের আশ্রয় নিয়েছেন ॥[১৪]

১৪. সংগীততরঙ্গ, পৃঃ ১২৩-১২৪; ১৬৫-১৬৭।

সংগীত

সংগীতের আলোচনার সূচনায় নরহরি সংগীতের সংজ্ঞা, লক্ষণ ও উপাদান সম্পর্কে তাঁর তিনটি গ্রন্থেই বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সেই 'পরিচিতি'র কয়েকটি কথা পুনরায় উল্লিখিত হলো, যাতে সংগীত সম্পর্কে ধারণাটি পুষ্ট হতে সাহায্য করবে।

গীত-বাদ্য-নৃত্যের সমন্বয়ে সংগীতের সৃষ্টি। সংগীতের অবয়বকে 'ধাতু' এবং রাগাদিকে 'মাতু' বলা হয়। এর সূক্ষ্ম উপাদান হলো নাদ, শ্রুতি, স্বর, মূর্ছ´না, তাল, গ্রাম, বর্ণ, জাতি ও রাগ।

এই আলোচনার পর নরহরি দুই প্রকার সংগীতের কথা বলেছেন—'অনিবদ্ধ নিবদ্ধ—দ্বিবিধ গীত হয়।'

(ক) **অনিবদ্ধ :** অনিবদ্ধ সম্পর্কে 'ভক্তিরত্নাকরে' বলা হয়েছে—

অনিবদ্ধ রাগালাপ রূপী নিরূপয় ॥
বদ্ধহীন যে গীত সে অনিবদ্ধ হন।
রাগালাপ কহি রাগ প্রকটী করণ ॥ (ভ.র., পৃঃ ২৫৪)

এই সংজ্ঞাই আছে তাঁর 'সংগীতসারসংগ্রহে'। 'গীতচন্দ্রোদয়ে' তিনি আরো বলেছেন—

বর্ণাদি নিয়ম নাই অনিবদ্ধ গীতে।
কেবল আলাপ রাগ প্রকট যাহাতে ॥ (গী. চ. পুথি, পত্র ১২খ)
তত্রৈব—
আলপ্তিরনিবদ্ধং স্যাদ্রাগালপণরূপিণী
তদুক্তং—
আলপ্তির্বদ্ধহীনত্বাদি নিবদ্ধমিতি রিতমিতি। (ঐ)

অর্থাৎ রাগের আলাপ মাত্রকেই অনিবদ্ধ বলে। তা বন্ধনহীন গীত। এতে বর্ণাদির কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। কেবল রাগের আলাপকেই তা প্রকট করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এ সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে, অনিবদ্ধগীতে তাল থাকে না, কিন্তু ছন্দ ও যতি থাকে, এবং তা নিয়মিত—অক্ষর সমন্বিত হয়।[১৫]

১৫. নাট্যশাস্ত্র, (৩২।২৮-২৯), চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বারাণসী (১৯২৯)।

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার 'আলাপ' সম্পর্কেও কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছেন। আলাপ হলো রাগের প্রকাশকার্য। এর বহু প্রকার ভেদ আছে। নরহরি সে ভেদের কথা আলোচনা করেন নি। আলাপের মুখ্য দুই ভেদের পরিচয় দিয়েছেন:

আলাপ, বর্ণালংকার দুই মত হয়।
আ-তা-না-রি এক আর স-রি-গ-মা-দয়॥ (ভ. র., পৃঃ ২৫৪)

আলাপ আ-তা-না-রি শব্দে প্রকাশিত। বর্ণালংকার স-রি-গ-ম-প-ধ-নি রূপে উদ্ভূত। হুংকারমাত্র আ-তা-না-রি। প্রাচীন সংগীতজ্ঞদের মতে এই চারটি শব্দ যথাক্রমে হরি, গৌরী, হর ও ব্রহ্মাকে নির্দেশ করে। নরহরি এই ব্যাখ্যা 'নারদসংহিতা' থেকে গ্রহণ করেছেন। 'নারদসংহিতা'র আরো একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যেমন হুংকার হতে ওঙ্কার রূপে বেদের প্রকাশ, তেমনি হুংকার হতে তা-না প্রভৃতি শব্দ ধীরে ধীরে উত্থিত হয়।

বর্ণালংকার সম্পর্কে নরহরি পূর্বেই[১৬] আলোচনা করেছেন। এখানে সংক্ষেপে বলেছেন—

স-রি-গ-ম-প-ধ-নি—সপ্ত বর্ণালংকার।
ষড়্‌জাদিক স্বর—বর্ণালাপ এ প্রচার॥ (ভ. র., পৃঃ ২৫৪)

বর্ণালংকার দু রকমের—(অ) অর্থহীন হুংকারাদি, (আ) সংগীত শাস্ত্রোক্ত স-রি-গ-ম-প্রভৃতি।

কিন্তু যথার্থই আলাপ বলতে বাগ্গেয়কারেরা কী বোঝাতে চেয়েছিলেন, নরহরি হরিনায়কের শ্লোক উদ্ধার করে তা দেখিয়েছেন। 'ভক্তিরত্নাকরে' গৃহীত হরিনায়কের বচনে ব্যক্ত হয়েছে যে, বর্ণালংকার সমন্বিত, গমকের বিচিত্রতাযুক্ত, নানা ভঙ্গীর দ্বারা মনোহর রাগ প্রকাশকে 'আলাপ' বা 'আলপ্তি' বলে। 'সংগীতসারসংগ্রহে' উদ্ধৃত হরিনায়কের সংক্ষিপ্ত বচন হলো অক্ষরশূন্য গমকের আলাপকেই যথার্থভাবে 'আলাপ' বলা হয়।

কীর্তনগানের প্রারম্ভেই এই আলাপ করা হয়। এটাই পূর্বাচার্যদের অনুমোদিত ও দেশ-প্রচলিত রীতি। নরহরির সময়ে আলাপের রীতি কেমন

১৬. বর্ণ ও অলংকার অংশ—পৃঃ ১৬৪।

ছিল, তারও বিশদ বিবরণ আছে 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাসে'র বৈষ্ণব মহোৎসবগুলির বর্ণনার প্রারম্ভে এবং 'ভক্তিরত্নাকরে'র রাস বর্ণনা প্রসঙ্গে।

রাধামোহন সেন আলাপের আরো স্পষ্ট পরিচয় 'সংগীততরঙ্গে' দিয়েছেন। নরহরি যেখানে "স-রি-গ-মাদি" বলেছেন, রাধামোহন সেখানে "আ-না-রি-না" গ্রহণ করেছেন। তাঁর আলোচনার কিছু অংশ উদ্ধৃত হলো—

আলাপ প্রকরণ—

স-রি-গ-ম-প-ধ-নি এ বোলেতে কথন।
নাহি হয় রাগরাগিণীর আলাপন॥
কারণ দণ্ডায়মান স্বরে বা তাবতে।
নাহি যায় হেলান দুলান কোন মতে॥
তীয়র কোমল হবে গমকের কোল।
অতএব আলাপণে এই মত বোল॥
প্রথমেতে আ-না-রি-না-না-দারেতে রোম।
বলিবে তাহার পরে তে-না-না-তা-লোম॥
তার পরে তা-না-তা-না না-না-না-তা-রি।
এই চতুর্বিংশতি বোলে আলাপ চারি॥
আ না রি না নাদা রে তে রোম,
আ না তা নো ম, তা না তা না না না না তারি॥[১৭]

এইভাবে সঞ্চারী আলাপেরও বিশদ ব্যাখ্যা রাধামোহন দিয়েছেন।[১৮]

(খ) **নিবদ্ধ**

ধাতু অঙ্গে বদ্ধ হৈলে নিবদ্ধাখ্যা হয়।
শুদ্ধা ছায়ালগ ক্ষুদ্র—নিবদ্ধ এ ত্রয়॥ (ভ. র., পৃঃ ২৫৫)

'নিবদ্ধ' সম্পর্কে নরহরি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ধাতু ও অঙ্গে বদ্ধ গীতকে 'নিবদ্ধ' বলে। এই বদ্ধত্ব হেতুই এর আরেক নাম 'প্রবন্ধসংগীত'।

নিবদ্ধ তিন রকম—শুদ্ধা, ছায়ালগ ও ক্ষুদ্র। এই তিনটির নাম নিয়ে বাগ্গেয়কার মহলে মতপার্থক্য আছে। নরহরির দৃষ্টি সে দিকেও পড়েছিল।

১৭-১৮. সংগীততরঙ্গ।

তিনি জানিয়েছেন যে, কেউ কেউ এই তিনটির নাম বলেছেন—শুদ্ধ, সালগ, সঙ্কীর্ণ। কেউ বা বলেছেন—প্রবন্ধ, বস্তু, রূপক।

প্রথমোক্ত নামকরণ কোন্ বাক্তেয়কারের, নরহরি তা উল্লেখ করেন নি। এ প্রসঙ্গে সংস্কৃত প্রমাণ বাক্যটি 'তথাহি' বলে গৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয়োক্ত নামগুলি সংগীতসারের এবং তৃতীয়োক্ত নামগুলি হরিনায়কের প্রমাণ গ্রহণান্তর বিবৃত।

শুদ্ধা (শুদ্ধ বা প্রবন্ধ) : নরহরি তিনটি গ্রন্থেই লিখেছেন যে, আলাপ, ধাতু ও অঙ্গের সংযোগে শুদ্ধা গীতের জন্ম। শুদ্ধগীতকেই প্রবন্ধ বলে। (এখানে 'আলাপ' অর্থে সাম্প্রদায়িকেরা 'সার্থকপদ' বলেছেন)।

শুদ্ধ প্রবন্ধের ৪টি ধাতু এবং ৬টি অঙ্গ। (এই প্রসঙ্গে নরহরি বলেছেন যে, তিন ধাতু ও ৫ অঙ্গের সংযোগে 'বস্তু' এবং ২ ধাতু ও ২ অঙ্গের সংযোগে 'রূপক' সৃষ্টি হয়। হরিনায়কের বচন গ্রহণ করে তিনি এই অভিমত প্রতিষ্ঠিত করেছেন)।

'ধাতু' হলো প্রবন্ধের অবয়ব। ধাতুর ৪টি অংশ—

১। উদগ্রাহ—(গীতের প্রথমাংশ, যা দিয়ে গান আরম্ভ হয়)

২। মেলাপক—(গীতের দ্বিয়াংশ, যা ১ম ও ৩য় কলির সংযোগ সাধক অংশ)

৩। ধ্রুব—(গীতের তৃয়াংশ, একটি কথা অবিকৃতরূপে বার বার প্রকাশিত এবং এটিই গীতের মুখ্য অংশ)

৪। আভোগ—(গীতের শেষাংশ, কবি বা নায়কের নাম প্রকাশ করে)

'ভক্তিরত্নাকরে' এই মতটি 'তথাহি' বলে উল্লিখিত হলেও 'গীতচন্দ্রোদয়ে' 'তথাহি সংগীতশিরোমনৌ' বলা হয়েছে। এবং 'গীতচন্দ্রোদয়ে' নরহরি একটি স্বরচিত গীতে এই চারটি ভাগ প্রদর্শনও করেছেন।

তত্রোদাহরণং যথা মালবঃ[১৯]

শরদ-সুধাকর নিকর-নিন্দি মুখ মঞ্জুমিলিত মৃদু হাস অমিয় ঝরু।
ভাঙ্ মদনধনু সঘনে ধুনাওত লোচনকোণে তিখিন স্মর সঞ্চরু।

উদগ্রাহ ॥

---

১৯. পাঠবাড়ী পুথি।

শিরে শিখিপিঞ্ছ খচিত কুসুমাবলি সৌরভে ভ্রমত ভ্রমরগণ ঝংকৃত।
কুণ্ডল শ্রুতি জিতি কম্বু কণ্ঠ মণিহার রুচির কর-বলয় অলংকৃত॥

মেলাপক॥

বিলসিত কুঞ্জভবনে নটনাগর।
ব্রজ নবরমণী কুঞ্জবন কুঞ্জর কেলি সুনিপুণ পিরিতি রসসাগর॥

ধ্রুব॥

ললিত ত্রিভঙ্গ অঙ্গ জনু জলধর পহিরণ বসন তড়িতসম শোহত।
বাজত মুরলী মধুর গরজন ঘনশ্যাম-নিছনি শুনি ভুবন বিমোহিত॥

আভোগ॥

নরহরি লিখেছেন যে, 'সংগীতদামোদরে' ধাতুর উক্ত চার অবয়বের নাম আছে—উদগ্রাহ, ধ্রুব, অন্তরা ও আভোগ। এবং 'গীতচন্দ্রোদয়ে' একথা বলে তিনি আরেকটি স্বরচিত গীতে এই চার অংশ দেখিয়েছেন।[২০] হরিনায়কের উক্তি নিয়ে অন্তরার সংজ্ঞা দিয়েছেন—ধ্রুব আর আভোগ অর্থাৎ এই মতে গীতের ২য় ও ৪র্থ অংশের মধ্যবর্তী সংযোজক অংশ হলো 'অন্তরা'।

পুরাকালে অনেকেই ধাতুর তিনটি অবয়ব গ্রহণ করেছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকরে' ও 'গীতচন্দ্রোদয়ে' সংগৃহীত 'সংগীতশিরোমণি'র অপর একটি শ্লোক থেকে তা জানা যায়।[২১] শিরোমণির এই শ্লোকে আছে—পূর্বাচার্যগণ গীতের প্রথম পাদকে উদগ্রাহ, মধ্যপাদকে নিশ্চলতাহেতু ধ্রুব এবং শেষ পাদকে আভোগ বলেছেন। 'ভক্তিরত্নাকরে' না-দিলেও নরহরি এই ত্রি-অংশ বিশিষ্ট একটি স্বরচিত গীত 'গীতচন্দ্রোদয়ে' উদাহরণরূপে সংযোজন করেছেন। গীতটি হলো—'মঞ্জুবদন মৃদুহাস লসত জনু বিকচ-সরোজ বরিষে মকরন্দ'। ইত্যাদি (পুথির পত্র ১৩খ)।

আবার হরিনায়কে ধাতুর পাঁচটি অবয়বের উল্লেখ আছে—উদগ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব, অন্তরা ও আভোগ। নরহরি এই মতটি 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'গীতচন্দ্রোদয়ে' গ্রহণ করে উভয় গ্রন্থে দুটি স্বরচিত গীতে তার উদাহরণ দিয়েছেন।

---

২০. পাঠবাড়ী পুথি।

২১. 'ভক্তিরত্নাকর' (২য় সং), পৃঃ ২৫৬, গী. চ. মঙ্গলাচরণ।

ভক্তিরত্নাকরের পদ

উদিত পূরণ নিশি নিশাকর কিরণ করু তম দূরি।
ভানু নন্দিনী পুলিন পরিসর শুভ্র শোভত ভূরি॥

উদ্‌গ্রাহ॥

মন্দ মন্দ সুগন্ধ শীতল চলত মলয় সমীর।
ভ্রমরগণ ঘন ঝংকরু কত কুহরে কোকিল কীর॥

মেলাপক॥

বিহরে বরজকিশোর।
মধুর বৃন্দাবিপিন মাধুরী পেখি পরম বিভোর॥

ধ্রুব॥

দেব দুলহ সুরাসমণ্ডলে বিপুল কৌতুক আজ।
বংশীকর গাহি অধর পরশত মোদভরু হিয়া মাঝ॥
রাধিকা গুণ চরিতময়বর বিরচিব বহুবিধ গীত।
গানরত রতিনাথ মদভরহরণ নিরুপম নীত॥

অন্তরা॥



কঞ্জলোচনে ললিত অভিনয় বরিষে রস জনু মেহ।
ভণব কি এ ঘনশ্যাম প্রকটত জগতে অতুলিত লেহ

আভোগ॥ (ভ. র., পৃঃ ২৫৭)

এবং 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র ৫ অবয়ব বিশিষ্ট গীতটি হলো—

মৃগমদনীল জলদ দলিতাঞ্জন তনুরুচি রুচির বিরচি নববেশ।

(ভ. র., পৃঃ ২০৪-২০৫)

এইভাবে নরহরি দেখিয়েছেন, ধাতুর অবয়ব নিয়ে সংগীতজ্ঞ মহলে মতানৈক্য আছে। কিন্তু কোন্ মতটি তাঁর বিচারে গ্রহণীয়, তা তিনি উল্লেখ করেন নি, বরং প্রতিটি মতই উদাহরণযোগে আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধের ৬টি অঙ্গ, তিন গ্রন্থেই নরহরি নামগুলির সবিশেষ পরিচয় দিয়েছেন।

১। স্বর—স-রি-গ-ম-প-ধ-নি।

২। বিরুদ—গুণ উল্লেখের ব্যবহৃত অঙ্গ।

৩। পদ—বাক্যগত শব্দ। সমগ্র গানকেই বোঝায়।

৪। তেনক—কল্যাণবাচক ও গুণবাচক শব্দ।
(বা তেন)

৫। পাঠ—বাদ্য হতে উত্থিত ধ্বনি—ধা-ধা-খিলঙ ইত্যাদি।

৬। তাল—চচ্চৎপুট যতি আদি তাল।

নরহরি এই মতের সমর্থক বাক্য গ্রহণ করেছেন 'সংগীতপারিজাত' থেকে। তবে তিনি এও দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন আচার্যদের মধ্যে কেউ কেউ উক্ত ৬টি অঙ্গের কথা না বলে প্রবন্ধের চারটি অঙ্গের কথা বলে গেছেন। এই চারটি হলো—(১) বাক্য—(সম্ভবত পদ), (২) স্বর, (৩) তাল, (৪) তেনা।

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার প্রবন্ধের জাতির কথাও উল্লেখ করেছেন। অঙ্গ ভেদে এই জাতির উৎপত্তি। প্রবন্ধে সর্বদা একের অধিক অঙ্গ থাকবেই— 'একাঙ্গ প্রবন্ধ' হয় না। নরহরি পূর্বাচার্যদের অনুসরণে জাতির পাঁচটি নাম উল্লেখ করেছেন।

১। মেদিনী—৬ অঙ্গ বিশিষ্ট (স্বর, বিরুদ, পদ, তেন, পাঠ, তাল)

২। নন্দিনী—৫ অঙ্গ বিশিষ্ট (স্বর, পদ, তেন, পাঠ, তাল)

৩। দীপনী—৪ অঙ্গ বিশিষ্ট (স্বর, পদ, তেন, তাল)

৪। পাবনী—৩ অঙ্গ বিশিষ্ট (স্বর, পদ, তাল)

৫। তারাবলী—২ অঙ্গ বিশিষ্ট (পদ, তাল)

এই আলোচনার সমর্থক-বাক্য 'সংগীতপারিজাত' থেকে গৃহীত হয়েছে।[২২]

নরহরি ষড়ঙ্গ মেদিনী গীতের উদাহরণ দিয়েছেন তিনটি স্বরচিত গীতে— 'ভক্তিরত্নাকরে' ২টি

১। জয় জনরঞ্জন কঞ্জ নয়ন ঘন অঞ্জন নিভ নব নাগর ঐ ঐ,

২। জয় জগত বন্দিনী বিদিত নৃপনন্দিনী রাধিকাচন্দ্রবদনী দুঃখমোচনী।[২২ক] এবং 'গীতচন্দ্রোদয়ে'[২২খ] একটি—'জয় জয় গোবর্দ্ধন ধর মাধব গোকুল গোপসুতা ধৃতিমোচন'।

পঞ্চাঙ্গ নন্দিনী গীতের উদাহরণে স্বরচিত দুটি গীত সন্নিবেশিত হয়েছে। 'ভক্তিরত্নাকরে' একটি: 'জয় জয় কৃষ্ণ কৃপাময় কেশব কমলেক্ষণ জনরঞ্জন আ' (পৃঃ ২৬০)। 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র মঙ্গলাচরণ পুথিতে অপরটি—'লসন্ত

২২. নরহরি উক্ত এই অঙ্গগুলির বিশদ আলোচনা করেছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর 'সংগীত ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে।

২২ক. ভ. র., পৃঃ ২৫৯।

২২খ. পাঠবাড়ী পুথি মঙ্গলাচরণ, পত্র ১৪ক।

অতি প্রচণ্ড প্রতাপে ধেন্থ ভুবন বন্দিত ইআ।' (পত্র ১৪ ক-খ)। কিন্তু উক্ত পদগুলিতে অঙ্গ বিভাগ করে দেখানো হয় নি। এবং চতুর্থাঙ্গ, তৃতীয়াঙ্গ ও দ্ব্যঙ্গ গীতের উদাহরণও নেই।

প্রবন্ধের ভাগ ও নিয়ম

অতঃপর নরহরি প্রবন্ধের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। শক্তি ও বর্ণনার যোগ্যতা বিশেষে প্রবন্ধের নানা বিভাগ করা হয়েছে। ভরত ও হরিনায়কের অনুসরণে নরহরি জানিয়েছেন যে, এলা প্রভৃতি ২৬ প্রকার প্রবন্ধ আছে

এলাদি দুষ্কর তাহে গীত ষড়বিংশতি।
সুগম দুর্গম শাস্ত্রে প্রকাশিল ইথি॥ (ভ. র., পৃঃ ২৬০)

'ভক্তিরত্নাকর' ও 'সংগীতসারসংগ্রহে' এই ২৬ প্রকার প্রবন্ধের নাম দেওয়া হয়েছে—পঞ্চতালেশ্বর, বর্ণস্বর, অঙ্গচারিণী, স্বরার্থমাতৃকা, রাগকদম্ব, স্বরাঙ্ককরণ, তালার্ণব, শ্রীরঙ্গ, শ্রীবিলাস, পঞ্চভঙ্গি, পঞ্চানন, মাতিলক, সিংহনীল, ত্রিভঙ্গি, হংসনীল, হরিবিলাস, সুদর্শন, স্বরাঙ্গ, শ্রীবর্দ্ধন, হর্ষবর্ধন, বীর, শ্রীমঙ্গল, লাহড়ী, নবরত্ন, সরভনীল, কণ্ঠাভরণ।

আরো বলা হয়েছে যে, এগুলি ছাড়াও 'চন্দ্রপ্রকাশক' প্রভৃতি আর ৪টি প্রবন্ধ আছে। তা ছাড়াও 'কায়বাল' নামক একটি প্রবন্ধের পরিচয় বিবৃত হয়েছে। 'ভক্তিরত্নাকরে' স্বরার্থ প্রবন্ধ ছাড়া অন্য কোনো প্রবন্ধের পরিচয় নেই। 'সংগীতসারসংগ্রহে' এগুলির কয়েকটি সম্পর্কে সংজ্ঞাদি আছে। 'গীতচন্দ্রোদয়ে' প্রবন্ধের কোনো নির্দিষ্ট বিভাগের কথা বলা হয় নি। নরহরি অতিরিক্ত আর একটি প্রবন্ধের নাম করেছেন 'সুশ্রাবক'।

নরহরি বলেছেন, প্রথমে পঞ্চতালেশ্বর, তারপর বর্ণস্বর, তারপর স্বরার্থমাতৃকা এবং এই ক্রমানুসারে প্রবন্ধ সংগীত গীত হয়।

১। **বর্ণস্বর প্রবন্ধ:** স্বর, পাট, পদ ও তেনার অভিলষিত রচনাক্রমহেতু যার বহুবার প্রয়োগ হয়, তাকে বর্ণস্বর বলে। স্বর প্রভৃতির পূর্বপূর্ব প্রয়োগ ভেদে তা চার প্রকারের—স্বরাদি, পাটাদি, পদাদি, ও তেনাদি। 'গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণে' বর্ণস্বরের উদাহরণস্বরূপ নরহরি একটি স্বরচিত গীত সন্নিবেশ করেছেন।

তদ যথা। ভৈরবরাগেণ—

জয় জয় কংসনিসূদনকৃষ্ণ কৃপাময় কামদদেব বিভো।

২। স্বরার্থ প্রবন্ধ—এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, নরহরি এলাদি যে ২৬ প্রকার প্রবন্ধের নাম করেছেন, তাতে 'স্বরার্থমাতৃকা' নামক প্রবন্ধটি আছে। কিন্তু আলোচনা কালে দেখা যাচ্ছে, তিনি তাঁর তিনটি গ্রন্থেই 'স্বরার্থ' ও 'মাতৃকা' নামক দুটি পৃথক পৃথক প্রবন্ধের আলোচনা করেছেন। কোথাও 'স্বরার্থমাতৃকা'র আলোচনা নেই। এ থেকে মনে হয়, পূর্বে মূল প্রবন্ধ ছিল 'স্বরার্থমাতৃকা' নরহরির কালে তা থেকেই উক্ত দুটি প্রবন্ধের জন্ম হয়।

যে প্রবন্ধে স-রি-গ-মাদি স্বরাক্ষর দ্বারাই বাঞ্ছিত বা ইষ্টার্থ ব্যক্ত হয়, তাকে স্বরার্থ বলে। শুদ্ধ ও মিশ্র ভেদে স্বরার্থ দু রকমের। 'ভক্তিরত্নাকরে' একটি স্বরচিত গীতে' নরহরি স্বরার্থ প্রবন্ধের উদাহরণ দিয়েছেন।

তদ যথা। রাগ কেদার—জয় রসিক শেখর কৃষ্ণ কোমল অঙ্গ অঞ্জন ঘন ত্বিষা।

(গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ পুথি)

'সংগীতসারসংগ্রহে' এগুলি ছাড়া মাতৃকা, রাগকদম্ব, তালার্ণব, শ্রীরঙ্গ, শ্রীবিলাস, পঞ্চভঙ্গি, পঞ্চানন, সিংহনীল, হংসনীল, লাহন্ডী,—এই ১০টি প্রবন্ধের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এ গ্রন্থে প্রবন্ধ আলোচনার প্রথমেই গ্রন্থকার আরো ৩।৪টি প্রবন্ধের পরিচয় দিয়েছেন যেমন—বিষ্ণুপ্রকাশক, রাগযুক্ত প্রবন্ধ, কায়বাল প্রবন্ধ।

নরহরি শুদ্ধগীতের আলোচনার শেষে লিখেছেন, "শূড" নামক একটি প্রবন্ধ গীত আছে, এটিকে কেউ শুদ্ধ প্রবন্ধের, কেউ বা ছায়ালগের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

(খ) **ছায়ালগঃ**

শুদ্ধস্য লগতি ছায়াং যত্তু ছায়ালগং বিদুঃ ॥
রঞ্জকং তত্তবেত্তালৈর্বাদ্যাদৈঃ শূড়কল্পিতম্ ॥

অর্থাৎ ছায়ালগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে নরহরি বলেছেন যে, শুদ্ধ প্রবন্ধের যা প্রতিবিম্বিত রূপ, তার নাম ছায়ালগ। তাল বাদ্য প্রভৃতির যোগে শূড় (বহুতালের গুম্ফন) রচিত হয়ে তা চিত্তরঞ্জক হয়। অর্থাৎ ছায়ালগে শুদ্ধ

প্রবন্ধের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যায়। ভরত প্রমুখ মুনিগণ এই মতই পোষণ করে গেছেন।

ছায়ালগ-কে 'সালগ'ও বলা হয়। উদ্ধৃত হরিনায়কের বাক্যে আছে, যা সালগশূড় তা-ই সালগ। নরহরি বলেছেন, ছায়ালগের নামান্তর 'রসালগ'। অবশ্য এই রসালগ অভিধাটি কবিপ্রদত্ত নাম অথবা অন্যত্র প্রাপ্ত নাম, তার সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলা সম্ভব নয়।

'সংগীতদামোদর' ও 'পঞ্চমসার সংহিতায়' সালগশূড়ের ৯টি প্রকার ভেদের কথা আছে। নরহরি তা উদ্ধৃত করেছেন। ৯টি সালগশূড়ের নাম—ধ্রুবক, মঠক, প্রতিমঠ, নিশারুক, বাসক, প্রতিতাল, একতালী, যতি, ঝুমরি।

এরপর নরহরি উক্ত ৯ প্রকার সালগের আভ্যন্তরীণ প্রকারাদি উল্লেখ করেছেন। ধ্রুবক ১৬ প্রকার, মঠক ৬ প্রকার, প্রতিমঠ ৫ প্রকার, নিশারুক ৭ প্রকার, বাসক ৪ প্রকার, প্রতিতাল ৪ প্রকার, একতালী ৩ প্রকার, যতি ৪ প্রকার এবং ঝুমরি ১ প্রকার। মোট ৫০ প্রকার। এ ছাড়াও চর্চরীকাদি অপর ১০ প্রকার সালগ আছে।

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার "শূড" সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করেছেন। 'তথাহি' বলে একটি সংস্কৃত বচনে জানিয়েছেন যে, আদি, যতি, নসারু, অড্ড, ত্রিপুট, রূপক, ঝম্পক, মঠ ও একতালী—এই ৯ প্রকার তালে রচিত গীতকে 'শূড়' বলে। গানে বাদ্যে ও নৃত্যে তা চিত্তরঞ্জক হয়। উল্লেখ্য যে, 'ভক্তিরত্নাকরে' এরপরই তালের আলোচনা আছে; কিন্তু 'গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ' পুথিতে পৃথক এক পর্যায়ে এবং 'সংগীতসারসংগ্রহে' ধ্রুবকাদির আলোচনার শেষে তাল আলোচনা দেখা যায়।

'ভক্তিরত্নাকরে' সালগের ধ্রুবকাদি নটি গীতের কোনো লক্ষণ বা উদাহরণ দেওয়া হয় নি। কিন্তু 'গীতচন্দ্রোদয়' ও 'সংগীতসারসংগ্রহে' অন্ততঃ ধ্রুবক ও মঠক—এই দুটির আলোচনা আছে।

ধ্রুবক ঃ এই সংগীতের প্রথমকলি 'উদগ্রাহে'র দুটি খণ্ড হবে। দুটি খণ্ডই উচ্চৈস্বরে গীত হবে, তবে তুলনায় দ্বিতীয় খণ্ডটি আরো বেশী উচ্চৈস্বরে গাওয়া হবে। এই দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রথমটি থেকে ২ বা ৩ মাত্রা সমান বা অধিকও হতে পারে। নরহরি এই দ্বিতীয় খণ্ডটির নাম উল্লেখ করেন নি।

শার্ঙ্গদেব, সিংহভূপাল এই অংশের নাম দিয়েছিলেন 'অন্তর'। ধ্রুবকের আরো নানা লক্ষণের কথা তাঁরা বলেছেন যা নরহরির আলোচনায় পাই না।

নরহরি ধ্রুবকগীতির উদাহরণস্বরূপে একটি স্বরচিত গীত 'গীতচন্দ্রোদয়ে' (পত্র ১৫খ) ও 'সংগীতসারসংগ্রহে' (পৃঃ ২৯) সন্নিবেশ করেছেন

জয় জয় সুন্দর নন্দতনুজ দলিতাঞ্জন নিভ জনরঞ্জনু আ॥
কমলদলেক্ষণ গোকুল বল্লভ গোপসুতাধৃতি ভঞ্জন নু আ রে॥ ১ম খণ্ড।

যমুনাপুলিন বিভূষণ রসময় বেনু বাদ্যরত নৃত্যন্তরো।
মুরহর গোবর্দ্ধনধর অভ্রমুপতি মদমর্দন তি আই আই আ রে॥

ইত্যুত্তর খণ্ড॥

নরহরি বলেন: এখানে দুটি খণ্ডই দুবার গীত হবে, প্রথম খণ্ড হতে দ্বিতীয় খণ্ড উচ্চস্বরে গীত হবে।

মধুরানন মানদ মুদবর্দ্ধন মধুসূদন ভববন্দ্যো বিভো।
শরণাগত রক্ষক বর-করুণাময় নরহরি ইতি গায়তি আরে॥

নরহরি লিখেছেন: 'এই আই আই আরে আরে' ইত্যাদি অর্থহীন, তালসহ মাধুর্যের জন্য গায়কেরা প্রয়োগ করেন, এগুলি লক্ষণের মধ্যে নয়।

'সংগীতসারসংগ্রহে' নরহরি ধ্রুবকের চার প্রকার লক্ষণের কথা বলেছেন, বিনোদ, বরদ, নন্দক ও কঞ্চুক। 'সংগীতসারের' শ্লোক উদ্ধৃত করে এগুলির বিশ্লেষণও করেছেন—আলাপাদি ধ্রুব করুণাভাবে গীত হলে 'কঞ্চুক', আলাপ শেষের ধ্রুব 'বরদ' (যা দেবস্তুতিতে প্রযুক্ত), উদগ্রাহ প্রভৃতি দুখণ্ড যুক্ত হলে সেই আলাপকে 'নন্দক' (উৎসবে গীত), এবং নন্দকের মতোই যা আনন্দ-প্রকাশক তা 'বিনোদ' নামে পরিচিত (ছন্দের বিচারে ব্যতিক্রম অবশ্য আছে)।

মণ্ঠক: এই সংগীতে উদগ্রাহ ও আভোগে সম মাত্রা, ধ্রুব দুই বা দেড় গুণ মাত্রায় হবে। 'গীতচন্দ্রোদয়' ও 'সংগীতসারসংগ্রহে' একটি স্বরচিত গীতে নরহরি মণ্ঠকগীতির উদাহরণ দিয়েছেন—"উদাহরণমাদিতালেন মল্লার রাগেন"

কৃষ্ণ কৃপাময় মঙ্গলবিগ্রহ বিশ্বভয় গ্রহ দেব হরে।
গোপকুলোৎসব-বর্ধন-মাধব গোবর্দ্ধনধর তি আই আই আরে॥

উদগ্রাহ॥

শ্রীবৃন্দাবন ভূপতি আ আ।

রাধামুখ সরসীরুহ মধুকর নন্দতনুজ রসকন্দ তি আ রে॥

ইতি সার্দ্ধৈক গুণমাত্রে ধ্রুব॥

পীতাম্বর সুর বন্দ্য গদাস্রজ সুন্দর নটবর সৌরে।

কংসরিপো মুরমর্দন ঘননিভ ঘনশ্যাম সব ঐ ই আরে॥ আভোগ॥

(গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ পুথি, ১৫থ পত্র)

(গ) ক্ষুদ্র বা সংকীর্ণ গীত ঃ

ক্ষুদ্রগীতের লক্ষণ সম্পর্কে 'ভক্তিরত্নাকরে' (পৃঃ ২৬৫) বলা হয়েছে

তাল ধাতু যুক্ত বাক্যমাত্র ক্ষুদ্রগীত।
ধাতুপূর্ব উক্ত উদগ্রাহাদি যথোচিত॥
শুদ্ধ সালগের প্রায় ক্ষুদ্রগীত হয়।
অন্ত্যানুপ্রাস প্রশস্ত শাস্ত্রেতে কহয়॥

গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ পুথিতে (পত্র ১৫থ) আছে

তালধাতু যুক্ত বাক্যমাত্র ক্ষুদ্রগীত।
ইথে ধ্রুব মণ্ঠকাদিক লক্ষণ কিঞ্চিৎ॥
ক্ষুদ্রগীতে অন্ত্য অনুপ্রাস সুনিশ্চয়।
দেখহ শাস্ত্রজ্ঞগণ বিবরিয়া কয়॥

অর্থাৎ ক্ষুদ্রগীত হবে তাল ও ধাতু যুক্ত বাক্য। ধ্রুব মণ্ঠকাদি শুদ্ধ সালগের কিছু কিছু লক্ষণ এতে থাকবে। তবে অন্ত্যানুপ্রাস একান্তই বাঞ্ছনীয়। 'সংগীতসারসংগ্রহে' আরো বলা হয়েছে যে, ক্ষুদ্রগীতে খণ্ড, অক্ষর, মাত্রা প্রভৃতির বাঁধাধরা নিয়মও গ্রাহ্য করা হয় না। 'সংগীতসার', 'গীতপ্রকাশ' প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রানুসারে নরহরি দেখিয়েছেন যে, সেখানে আদি নিঃসরু মণ্ঠ বর্জিত ক্ষুদ্রগীত আছে। অন্ত্যানুপ্রাস প্রসঙ্গে গ্রন্থকার 'সাহিত্যদর্পণে'র সাহায্য নিয়েছেন, এবং বলেছেন পজ্ঝটিকা, বিরদাবলী প্রভৃতি ক্ষুদ্রগীতে গীতজ্ঞগণ অন্ত্যানুপ্রাসের অবশ্য প্রয়োগ করে গেছেন।

ক্ষুদ্রগীত ৪ প্রকার—চিত্রপদা, চিত্রকলা, ধ্রুবপদা ও পাঞ্চালী।

১। **চিত্রপদা ঃ** এই ক্ষুদ্রগীতে কেবল পদের বৈচিত্র্য (কোমল অনুপ্রাস ও প্রসাদাদিগুণ বিশিষ্টতা) থাকে, ধাতু প্রভৃতির কোনো বৈচিত্র্য নেই।

'সংগীতসারসংগ্রহে' নরহরি 'জগন্নাথবল্লভ নাটক' থেকে এর উদাহরণ দিয়েছেন। রাগ গুন্তকিরী। কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতম্......ইত্যাদি (পৃঃ ৪০) এবং 'গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ' পুথিতে চিত্রপদার উদাহরণস্বরূপে গোবিন্দদাসের একটি বিখ্যাত পদ 'কুন্দল কনক কলিত করকংকণ কালিন্দীকূল বিহারী'...ইত্যাদি গৃহীত হয়েছে।

২। **চিত্রকলা**—এই ক্ষুদ্রগীতে উদগ্রাহ ও আভোগে কলা (মাত্রা) সমান, কিন্তু ধ্রুব পদে মাত্রা কম এবং পদ সংখ্যা ৩-৮ পর্যন্ত হয়। পদের বৈচিত্র্য হেতু যে গীত চিত্রপদা, কলা বা মাত্রার বৈচিত্র্য হেতু তাই চিত্রকলা। এই দুই জাতের গীতই সেকালে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়।

'সংগীতসারসংগ্রহে' চিত্রকলার উদাহরণে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' থেকে একটি গীত উদ্ধৃত হয়েছে ঃ রাগ গুর্জরী।

হরি রভি সরতি বহতি মৃদু পবনে—... ইত্যাদি (পৃঃ ৪০)

উপরের 'জগন্নাথ বল্লভের' গীত ও বর্তমান জয়দেবের গীত সেকালে ক্ষুদ্রগীতের অন্তর্ভূক্তি লাভ করেছিল, নরহরির গ্রন্থ দেখে তাই মনে করা চলে। 'গীতচন্দ্রোদয়ে' (পত্র ১৬ক) চিত্রকলার উদাহরণে গোবিন্দদাসের বিখ্যাত পদ "মুখরিত মুরলী-মিলিত মুখমোদনে মরকত মুকুর মিলান" ইত্যাদির সন্নিবেশ দেখা যায়।

৩। **ধ্রুবপদা** ঃ 'ভক্তিরত্নাকরে' ধ্রুবপদা ও পাঞ্চালী গীতির আলোচনা নেই। হয়তো এই গ্রন্থ রচনার সময় এই দুই গীতির প্রচলন কম ছিল।

ধ্রুবপদার সংজ্ঞা নিয়ে সেকালের গীতজ্ঞ মহলে দুই ধরণের অভিমত ছিল। নরহরি তা লক্ষ্য করেছিলেন। এই দুই অভিমতেই স্বীকৃতি লাভ করে ও ধ্রুবপদার দুটি পৃথক রূপ গড়ে ওঠে।

(এক) এক প্রকার ধ্রুবপদায় প্রথমে ধ্রুবগান করে পরে পৃথক ধাতুতে আভোগ গীত হয় এবং তা চিত্রপদা চিত্রকলার লক্ষণযুক্ত।

(দুই) আরেক প্রকার ধ্রুবপদায় ভিন্ন ধাতু যুক্ত উদগ্রাহ ধ্রুব ও আভোগ দেখা যায়। (ধাতু অর্থে তাল বিশেষকে বোঝানো হয়েছে।)

এক ভাগে ভঙ্গী বা অঙ্গসঞ্চালন, অপরভাগে গান—এ দুয়ের পার্থক্য এই রকম।

ধ্রুবপদাগীতির কলি বা পদ বা ধাতু নিয়েও মতভেদ ছিল। কবি

'গীতচন্দ্রোদয়ে' সে কথা জানিয়েছেন। কোনো মতে ধ্রুবপদায় দুটি কলি—ধ্রুব ও আভোগ। কোনো মতে তিনটি কলি—উদগ্রাহ, ধ্রুব ও আভোগ। কেউ কেউ এই তিনটিকে বলেছেন—ধ্রুব, অন্তরা ও আভোগ।

দ্বিধাতু (কলি) যুক্ত ধ্রুবপদার দুটি উদাহরণ নরহরির দুটি গ্রন্থে আছে :

১। সুজন বদ মধু রিপুনাম……ইত্যাদি। পুরুষোত্তম মিশ্রের পদ (সংগীতসার সংগ্রহ, পৃঃ ৪১)।

২। জয় জয় নটনাগর রসসাগর গিরিধারী। (স্বরচিত পদ)

(গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ, পত্র ১৬খ)

এই দুই ধাতুবদ্ধ ধ্রুবপদ সম্পর্কে নরহরি বলেছেন, "ইয়মেব পাশ্চাত্ত্য ভাষায়াং ছুটি কিলেতি বদন্তি" অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য ভাষায় একেই 'ছুটিকিলা' বলে। সংগীত-ঐতিহাসিকেরা মনে করেন, এই 'ছুটিকিলা' হচ্ছে 'চুটকলা' যা সুলতান হোসেন শর্কী প্রবর্তন করেছিলেন। সেকালে হিন্দুস্থানী ধ্রুবপদের চেয়ে চুটকলা জাতীয় গান বাংলায় অধিকতর জনপ্রিয় ছিল।[২৩]

ত্রিধাতু (উদগ্রাহ, ধ্রুব, আভোগ) বিশিষ্ট আরেক প্রকার ধ্রুবপদার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে—কবির স্বরচিত একটি গীতে :

'কেশব কমলদলেক্ষণ কামদকান্ত মুরান্তক কলিত সুবেশ' ইত্যাদি। পদটি 'গীতচন্দ্রোদয়' (পত্র ১৬খ) ও 'সংগীতসারসংগ্রহ' উভয় গ্রন্থেই সজ্জিত হয়েছে।

আরেক প্রকার ত্রিধাতু (ধ্রুব, অন্তরা, আভোগ) যুক্ত ধ্রুবপদার উদাহরণ কেবলমাত্র 'গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণে' আছে। পদটি হরিবল্লভের—

'দেখ দেখ সোই মুরতিময় নেহ'। ইত্যাদি (পত্র ১৬খ)।

নরহরি আরো দেখিয়েছেন যে, চারটি পদের (ধাতুর) ধ্রুবপদাও আছে। 'গীতাবলী'তে তার উদাহরণ পাওয়া যায়। যথা : ধানসীরাগেণ নন্দন তালেন,

'ন কুরু কদর্থনমত্র সরণ্যাম।' ইত্যাদি (সংগীতসারসংগ্রহ, পৃঃ ৪২)

ধ্রুবপদা গীতির আরো বহু প্রকার ভেদ আছে। গ্রন্থ বিস্তৃতির জন্যে নরহরি সেগুলি উল্লেখ করেন নি। তিনি বলেছেন যে, আগ্রহশীল ব্যক্তিগণ যেন 'গীতগোবিন্দ', 'জগন্নাথবল্লভ নাটক' এবং 'গীতাবলী' ইত্যাদি গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেন।

২৩. প্রাচীন বাংলার সংগীত, (কথাশিল্প, ১৩৭১), রাজ্যেশ্বর মিত্র, পৃঃ ৫২।

ধ্রুবপদা যে বহু রকমের ছিল, তা শার্ঙ্গদেবের 'সংগীতরত্নাকর' থেকে বোঝা যায়। তাঁর গ্রন্থে ১৬ প্রকার ধ্রুবগীতির নাম ও লক্ষণাদি দেওয়া হয়েছে। যেমন, জয়ন্ত, শেখর, উৎসাহ, মধুর, নির্মল, কুণ্ডল, কামল, চার, নন্দন, চন্দ্রশেখর, কামোদ, বিজয়, কন্দর্প, জয়মঙ্গল, তিলক ও ললিত।[২৪] কল্লিনাথের সময় কিন্তু এই সব গীতিগুলির প্রচলন ছিল না।

আবার রাধামোহন সেন তাঁর 'সংগীততরঙ্গে' ৪ প্রকার ধ্রুবপদের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন—প্রবন্ধের দুটি ধারা—প্রবন্ধ (কোনো কোনো মতে বিবন্ধ) এবং বন্ধ। বন্ধের দুইভাগ—মার্গ ও দেশী। আবার মার্গের তিনটি ভেদ—গীত, ধ্রুবপদ ও ছন্দ। তন্মধ্যে ধ্রবপদের পাঁচ অঙ্গ

দ্বিতীয় ধারায় যেই ধ্রুবপদ গান।
তার মধ্যে আছে পাঁচ প্রকার বিধান॥

এই পাঁচটি হলো, (১) একতোক (নাম, উধ্ব'গ্রহ), (২) দুইতোক (নাম, মিলাকুক), (৩) তিনতোক (নাম, অন্তরা), (৪) চারতোক (নাম, ভোগ), (৫) পাঁচতোক (নাম, আভোগ)

তিনি ৪ প্রকার ধ্রুবপদের নাম দিয়েছেন

এক ধ্রুবপদের নাম ফুলবন্ধ হয়।
দ্বিতীয় যুগলবন্ধ নামে পরিচয়॥
তৃতীয় রাগ সাগর অতি গুণপনা।
রাগাদির নামে সেই কবিতা রচনা॥
চতুর্থেতে বিষ্ণুপদ সুরদাসকৃত।
পদ্যের নাহিক পদ্য গদ্যেয় আবৃত॥[২৫]

সেকালে বাঙ্গালী কবিরা এই ধ্রুবপদা রচনায় উৎসাহ বোধ করতেন, উল্লাস বোধ করতেন পাঠক ও শ্রোতৃবৃন্দ।

৪। **পাঞ্চালী ঃ**

বহুপদে পাঞ্চালী শাস্ত্রেতে নিরূপয়।
সধ্রুব অধ্রুব সে দ্বিবিধ সুনিশ্চয়॥ (গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ)

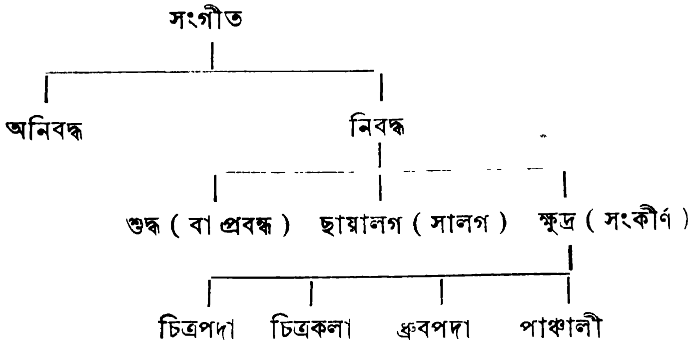
---

২৪. সঙ্গীত সমীক্ষা, (মিত্রালয়, ১৩৬৬), রাজ্যেশ্বর মিত্র, পৃঃ ২১৫-২১৬।

২৫. সংগীততরঙ্গ, (১৩১০, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত), পৃঃ ২১৬-২১৭।

অর্থাৎ বহুপদ বা অতি দীর্ঘপদ ('অতিবিস্তীর্ণ পদ') যুক্ত গীতকে পাঞ্চালী বলে। 'গীতচন্দ্রোদয়' ও 'সংগীতসারসংগ্রহে' নরহরি হরিনায়কের প্রমাণ উদ্ধার করে এর নিয়মাদি বিবৃত করেছেন : পাঞ্চালী বহুপদযুক্ত। তা দ্বিবিধ, সধ্রুব ও অধ্রুব, এ দুটির অন্য নামও শোনা যায়—ধ্রুব-সহিতা ও ধ্রুবরহিতা। নরহরি লিখেছেন, গৌড়দেশে পাঞ্চালী 'সুলভ' এবং একারণেই তিনি পাঞ্চালীর উদাহরণ দেন নি।

নরহরি বিবৃত আঙ্গিক বা গঠনকৌশল বিচারে গীতের বিভাগগুলির ছক :



গীতের দ্বিতীয় প্রকার ভেদ : ভাষা বিচার

নরহরি চক্রবর্তী ভাষা বিচার করে সেকালের সংগীতের তিনটি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন, দিব্য, মানুষ, দিব্য-মানুষ। 'সংগীতরত্নাকরে'র প্রমাণ উদ্ধার করে তিনি এই তিনের পরিচয় দিয়েছেন—

> সংস্কৃত বা দেব ভাষায় রচিত গীত 'দিব্য' ('সংগীতসারসংগ্রহে' এর অপর নাম 'স্বর্গীয়'), প্রাকৃত বা জনগণের মুখের ভাষায় রচিত গীত 'মানুষ' (বা 'মানুষী') এবং সংস্কৃত-প্রাকৃত মিলিয়ে মিশ্রভাষায় রচিত গীত 'দিব্য-মানুষ' (বা 'দিব্য-মানুষী')।

নরহরি আরো জানিয়েছেন যে, অনেকে দেশ বিশেষের নিজস্ব ভাষায় রচিত গীতকে মানুষ-গীত বলে থাকেন। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের দেশীভাষায় এই গীত প্রকাশ হয়। যে সকল দেশে যে সকল মৌখিক ভাষা এবং প্রধান ভাষা যেগুলি মানুষের কথোপকথনে ব্যবহৃত হয়, তা দিয়ে এই মানুষগীতের সৃষ্টি।

এই তিন শ্রেণীর গীতের উদাহরণ একমাত্র 'গীতচন্দ্রোদয়ে'ই সংযোজিত দেখা যায়। দিব্যগীতের উদাহরণটি 'জগন্নাথবল্লভনাটক' (১।২৮) থেকে গৃহীত হয়েছে। যথা

বসন্তরাগেণ

কলয়ে সখে ভুবি সারম্।

ত্বদুপগমাদিব সরসমিদং মম বৃন্দাবনমনুবারম্॥ ইত্যাদি (পত্র ১৭ক)

গীতটি সম্পূর্ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

মানুষ-গীতের উদাহরণ নরহরির স্বরচিত। যথা

গৌড়ভাষায়াং ধানসীরাগেণ

কি মধুর বৃন্দাবিপিন শোভা।

আহা মরি মুনিমানস লোভা॥······ইত্যাদি (পত্র ১৭ক)

এই গীতকে নরহরি পাঞ্চালীরও উদাহরণ বলেছেন—'ইয়মেব পাঞ্চালী' —গীতটির ভাষা বাংলা।

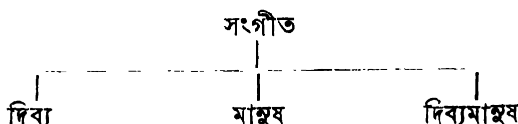
দিব্যমানুষ গীতের উদাহরণটিও নরহরির স্বরচিত। যথা

জয় জয় শ্রীনদীয়া সুখধাম।

অদ্ভুত বসতি বসত চতুরাশ্রম যহি নিতি নিতি উৎসব অনুপাম॥···ইত্যাদি (পত্র ১৭খ)

গীতটির ভাষা নরহরির কথায় 'কিছু সংস্কৃত মিশ্র হয়'।

ভাষা বিচারে সংগীতের বিভাগগুলির ছক :



মাত্রা গণনার দিক থেকে সংগীতের বিভাগ

প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ কোহল মাত্রাগণনার দিক থেকে সংগীতের তিনটি শ্রেণী প্রদর্শন করেছেন—সম, অর্দ্ধসম ও বিষম। নরহরি আপনার আলোচনায় কোহলের মতটিকেও সাদরে প্রচার করেছেন। কোহলের বচন তুলেই তিনি এই তিন শ্রেণীর সংগীতের বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন।

(ক) সম-গীত : যে গীতের ৪টি চরণের প্রতিটির মাত্রাসংখ্যা সমান

হয়। গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণে একটি স্বরচিত গীতে কবি এর উদাহরণ দিয়েছেন।

তত্র সমোদাহরণং যথা (ধানসীরাগেণ)—(গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ পত্র, ১৭খ)

জয় জয় সুন্দর গৌরকিশোর।
নিখিল ভুবন মনলোচন চোর ॥১ (২৬ মাত্রা)
সংকীর্তন রস লম্পট দেব।
পশুপতি চতুরানন কৃতসেব ॥২ (২৬ মাত্রা)
করুণালয় কলি কলমষহারী।
শরণাগত রক্ষক সুখকারী ॥৩ (২৬ মাত্রা)
চন্দ্রানন জনরঞ্জন রূপ।
নরহরি পতিতনাথ গুণভূপ ॥৪ (২৬ মাত্রা)

সমগীতির আরেকটি উদাহরণ দিয়েছেন গোবিন্দদাসের "কুটিল কুন্তল কুসুম কাঁচনি কান্তি কুবলয় ভাস" ইত্যাদি পদটির দ্বারা (গী. চ., পত্র ১৮ক)

(খ) **অর্দ্ধসম-গীত**ঃ এই গীতের ১ম ও ৩য় পদের মাত্রা সমান, এবং ২য় ও ৪র্থ পদের মাত্রা সমান—'গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণে' অর্ধসম গীতির তিনটি উদাহরণ আছে (পত্র ১৮ক)। তন্মধ্যে প্রথমটি কবির স্বরচিত।

দেশীরাগেণ

রসময় নন্দকিশোর।
ত্রিভুবন জনচিত চোর ॥ ১০ + ১০ = ২০ মাত্রা
জয় জয় সুন্দর শ্যামশরীর।
গোকুল কুলজা রতিরণবীর ॥ ১৪ + ১৪ = ২৮ "
চন্দ্রবদন গুণধাম।
মনমথমোহন শ্যাম ॥ ১০ + ১০ = ২০ "
বংশী বাদ্য নিপুণ সুখকারী।
নরহরি বল্লভ বিপিনবিহারী ॥ ১৪ + ১৪ = ২৮ "

অর্ধসমগীতির আর দুটি উদাহরণ হলো

১। জয় জয় ব্রজকুলচন্দ্র।
ব্রজরমণীগণ লোচন ফন্দ ॥ (স্বরচিত)

২। কৃষ্ণনন্দ গোপনন্দনা।

জয় জয় মন্দহাস বদনা ।। (ভণিতাহীন)

(গ) **বিষম-গীত :** যে গীতের চারটি পদেরই মাত্রা সংখ্যা অসমান। 'সংগীতসারসংগ্রহে' এই গীতকে 'মিশ্রগীত' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 'গীতচন্দ্রোদয়ে' (পত্র ১৮খ) রামানন্দ রায়ের একটি পদে বিষম গীতের উদাহরণ সংযোজিত হয়েছে

অথ বিষমোদাহরণং যথা (নটরাগেণ)

মৃদুল-মলয়জ-পবন-তরলিত চিকুর-পরিগত-কল্যপকম্।
সাচি-তরলিত-নয়ন মন্মথ-শংকু সংকুলচিত্ত-সুন্দরীজন জনিত কৌতুকম্ ।।
মনসিজ কেলি নন্দিত মানসম্।
ভজত মধুরিপুমিন্দু সুন্দর বল্লভীমুখ লালসম্ ।। ধ্রুব ।।
লঘু তরলিত কন্দরং হসিত লবমতি সুন্দরম্।
গজপতি প্রতাপরুদ্র হৃদয়ানুগত মনুদিনম্ ।।
সরসং রচয়তি রামানন্দ রায় ইতি চারু সংগীতম্ ।।

এরপর গ্রন্থকার সংগীতের দোষ গুণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। গীতের বহু প্রকার গুণ আছে। 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'সংগীতসারসংগ্রহে' তা আলোচিত হয়েছে। প্রাচীন শাস্ত্রকারদের অনুসরণে নরহরি গীতের ৯টি গুণের পরিচয় দিয়েছেন—গ্রহ, লয়, যতি, মান, ধাতু, পুনরুক্তি, মাতুর অনেকার্থতা, রাগের সুরম্যতা, গমক এবং অর্থনৈর্মল্য।

১। **গ্রহ :** নরহরি গ্রহের কোনো সংজ্ঞা দেন নি। তবে নানা ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায় যে, গ্রহ হলো সংগীতের রাগান্তরিক সুর। গ্রহ তিন রকমের—অনাগত, সম ও অতীত। গীতারম্ভের পূর্বে দুটি অক্ষর উচ্চারণ করে তালের স্থাপন হলে অনাগত গ্রহ হয়। 'সংগীতসারসংগ্রহে' এর উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে

জয় জয় কমলাকুচ চন্দন মণ্ডল বক্ষঃস্থল দুর্জন খণ্ডন পন্থা সনদগুণ
পণ্ডিত পুণ্ডরীক লোচনায় আ।

এখান নিঃসারুতালে "জয় জয়"—এই চারটি অক্ষর তালবাদ্য স্বরূপ ; "কমলা"-- এই পদ থেকে আরম্ভ করে তাল আরম্ভ হয়েছে।

সমগ্রহ—গীত উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তালের প্রয়োগ হলে একই সময়ে

তালোদ্ভব হেতু সমগ্রহ হয়। এর কোনো উদাহরণ না দিয়ে গ্রন্থকার মঠ প্রভৃতি গীতিতে তা লক্ষ্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

অতীতগ্রহ—তালের যে অংশ পরে পড়বে, তা যদি পূর্বেই স্থাপন করে তাল গৃহীত হয়, তখন অতীত গ্রহ হয়। 'ভক্তিরত্নাকরে' এটি "তালগ্রহ" নামেও আখ্যাত হয়েছে। 'সংগীতসারসংগ্রহে' ধৃত এর উদাহরণটি 'গীতগোবিন্দ' থেকে গৃহীত

শিশির শীতল মঞ্জুবঞ্জুল মৃদুল কিশলয় সংকুলম্ ইত্যাদি।

নরহরি আরো বলেছেন যে, কুড্ডকা প্রভৃতি তালে অতীতগ্রহ, যতি প্রভৃতি তালে অনাগতগ্রহ অবশ্য গীত হয়। কোনো কোনো মতে, নিঃসারু তালের প্রথমে অনাগত ও অতীতগ্রহের বিপরীত ভাব দেখা যায়, অর্থাৎ অনাগতে অতীত লক্ষণ এবং অতীতে অনাগতের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

২। **লয়ঃ** বাচস্পতি ও হরিনায়কের অনুসরণে নরহরি লয়ের পরিচয় দিয়েছেন। বাচস্পতির মতে, গ্রহাদির পরস্পর সমতা রক্ষা করাই লয়। হরিনায়কের বচনে, সংগীতের মধ্যে যে বিরাম, তাই লয়। লয় তিন প্রকার —দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত। দ্রুত লয়ে এক মাত্রা, দ্বিগুণ বিশ্রাম বুঝালে মধ্য লয় এবং দ্রুতলয়ের দ্বিগুণে বিলম্বিত লয়। সকল তালেই লয়ের অবস্থান ঘটে।

৩। **যতিঃ** লয় প্রবর্তনের নিয়মই যতি। যতির তিন ভাগ—স্রোতোবহা, সমা ও গোপুচ্ছিকা।

৪। **মানঃ** তালের বিশ্রাম কারক ক্রিয়ার নাম মান। সুতরাং মান তালের সমাপ্তি জ্ঞাপক ক্রিয়া। 'ভক্তিরত্নাকরে' মানকে দুই রূপে দেখানো হয়েছে —(ক) যখন মান ধ্রুবপদে দ্বিতীয় কলায় পড়ে, তখন সেই তালের তালজ্ঞসম্মত নাম "বর্ধমান (বিস্তৃত) আবর্ত"। (খ) আর যখন মান ধ্রুবপদে শেষকলায় পড়ে, তখন তার নাম "হীয়মান (হ্রাসমান) আবর্ত"।

৫। **ধাতু-পুনরুক্ততাঃ** সংগীতে ধাতুর (স-রি-গ-মাদি) পুনরুক্তি অর্থাৎ সংগীতাংশের বার বার নতুন নতুন ভাবে গান করা ও নবনবতা সৃষ্টি করা

গীত-অবয়ব পুনঃ পুনঃ গান নব্য।

৬। **মাতুর অনেকার্থতাঃ** একটি মাত্র অর্থযুক্ত বাক্যকে নানা ভঙ্গীতে প্রয়োগ।

৭। **রাগ-সুরম্যতা ঃ** শ্রুতিমাধুর্য, যতিযুক্ত, সুখাবহ, মন্দ্র-মধ্য-তারাখ্য এই সব রাগরম্যতার লক্ষণ।

৮। **গমক ঃ** শ্রোতাদের হৃদ্‌সুখকর স্বরের কম্পনকে গমক বলে। গমক পনের রকম। যথা, তিরিপ, স্ফুরিত, কম্পিত, লীল, আন্দোলিত, বলি, ত্রিভিন্ন, কুবল, আহত, উল্লাসিত, প্লাবিত, হুংকৃত, মুদ্রিত, নামিত, মিশ্রিত। 'ভক্তিরত্নাকর' এবং 'সংগীতসারসংগ্রহে' এই ১৫টি গমকের লক্ষণও বলা হয়েছে।

কিন্তু পরবর্তীকালের রাধামোহন সেন তাঁর গ্রন্থে ২৩ প্রকার গমকের নাম করেছেন। নরহরি প্রদত্ত নামের সঙ্গে এগুলির তেমন কোনো মিল নেই।[২৬]

৯। **অর্থ-নৈর্মল্য ঃ** উচ্চারণে বাক্য যখন সুখকর, নির্দোষ, রসযুক্ত, সম্যক অর্থ প্রকাশক হবে, তখন তাকেই বলা হবে অর্থনৈর্মল্য। এতে তেন, পাট ও স্বরের বিচিত্র সন্নিবেশ ঘটে।

এই ৯টি বৈশিষ্ট্য থাকলে গীত মনোহর ও সর্বজনআস্বাদ্য হয়। এগুলির অভাবে গীত গাওয়া যায় না। এগুলি না থাকলে গীতে দোষও জন্মে, নরহরি বলেন যে, এই রকম দোষ অনিত্য, কিন্তু পণ্ডিতদের মতে যেগুলি নিত্য দোষ, তা হলো—তালহীন হলে গঠনদোষ, ধাতু (স-রি-গ-মাদি) হীন হলে ধ্বনিগত দোষ হয়। ধাতু মাতুহীন গীত সম্পূর্ণ দোষযুক্ত, তা রিপুসদৃশ।

গীতদোষ

সংগীতের দোষ সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। 'সংগীতসারে' বলা হয়েছে যে, বাণী বা কথার স্খলন বা বিকৃত উচ্চারণ, তালহীন রচনা, ধাতুমাতু প্রভৃতির অভাব, কটূক্তি, রসশূন্যতা ও শ্রুতি-কর্কশতা ইত্যাদি সংগীতের দোষরূপে গণ্য হয়। নরহরি এই কথাগুলি গ্রহণ করেও বলেছেন যে, সংগীতে এই সমস্ত দোষও গ্রাহ্য করা হয় না, যখন সেই সব সংগীতে গ্রহ প্রযুক্ত হয়। 'সংগীতসারসংগ্রহে' গ্রন্থকার হরিনায়কের বাক্য উদ্ধার করে জানিয়েছেন যে, সংগীতে কখনো কখনো হ্রস্বস্বর দীর্ঘ বা দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়ে থাকে, কিংবা একমাত্রার দ্বিমাত্রিক বা দুই মাত্রার একমাত্রিক উচ্চারণ হয়, কোথাও শ্লেষযুক্ত বিষয় সংশয়হীন রূপে প্রকাশ পায়, কিংবা কঠোরতার মধ্যে কোমলতা বা

২৬. সংগীততরঙ্গ, (১৩১০), পৃঃ ৩৪-৩৫।

ব. বি. / ন. চ. (২) /৪১-১৩

কোমলতার মধ্যে কঠোরতা প্রকাশিত হয়—এগুলিও গীতের পক্ষে দোষাবহ। তবে এগুলি সম্পর্কেও তেমন জোর দেওয়া হয় না। তেমনি 'গীত প্রকাশ' ও 'সংগীতদামোদরের' প্রমাণ গ্রহণ করে গ্রন্থকার বলেন যে, পুনরুক্তি দোষ বা বর্ণসমূহের দ্রুত বা বিস্তৃত উচ্চারণ ঘটলেও সংগীতে তা দোষ বলে বিবেচিত হয় না। আবার লিঙ্গান্তর, সন্ধিবিচ্ছেদ, সংযুক্তাক্ষরের বিভাজন এবং মিশ্রিত স্বরের বিশ্লেষণে হ্রস্ব দীর্ঘ ব্যতিক্রম হলেও সংস্কৃত বা প্রাকৃতে তা সর্বত্র দোষযুক্ত নয়। তবে এগুলি দুই-এর অধিকবার ব্যবহৃত হলে দোষ বলে গণ্য হয়।

গায়ক লক্ষণ

'ভক্তিরত্নাকরে' বলা হয়েছে—'গীত গায় যে জন গায়ক কহি তারে'। শাস্ত্রমতে গায়ক তিন রকমের—উত্তম, মধ্যম ও অধম। 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'সংগীতসারসংগ্রহে' এই তিন শ্রেণীর গায়কের লক্ষণ বিবৃত হয়েছে।

(ক) উত্তম গায়ক—মার্জিত স্বর বিশিষ্ট, সুগঠিত দেহ, বিবিধরাগে অভিজ্ঞ, গ্রহ-লয়-মান প্রভৃতি প্রয়োগে নিপুণ, তালে ব্যুৎপন্ন, শ্রমশীল, গমকে সহজ অধিকার, প্রবন্ধ গানে দক্ষ, গানক্রিয়ায় দোষ রহিত ও মেধাবী—এই সকল গুণ থাকলে গায়ক 'উত্তম' নামে আখ্যাত হন।

(খ) মধ্যম—এই গুণগুলির কয়েকটি মাত্র যাব মধ্যে লক্ষিত হয়, সে মধ্যম শ্রেণীর গায়ক।

(গ) অধম—এই গুণগুলির কিছু কিছু যে গায়কের আছে, কিন্তু এগুলি অপেক্ষা যার দোষই অধিক, সে অধম শ্রেণীর গায়ক। গায়কের এই দোষগুলি পরে আলোচনা করা হয়েছে।

গায়কদের 'ব্যক্তিত্ব' লক্ষ্য করেও পাঁচটি শ্রেণী করা হয়েছে।

১। শিক্ষাকার—যে সমগ্রভাবে সংগীত শিক্ষাদানে সমর্থ।

২। অনুকার—যে অপর গায়কের অনুকরণে গীত পরিবেশন করে।

৩। রসজ্ঞ—রসাবিষ্ট গায়ক।

৪। রঞ্জক—যে শ্রোতৃগণের আনন্দ বিধানে সমর্থ।

৫। ভাবক—যে চিন্তাশীল এবং সংগীতকে 'অতিশয়' বা একমাত্র বলে গ্রহণ করেই গান গায়।

রাধামোহন সেন নিম্নোক্ত পাঁচ শ্রেণীর গায়কের কথা উল্লেখ করেছেন।[২৭]

১। মেচ্ছাকার—সংগীতবিদ্যার প্রদত্ত বিধানানুযায়ী যে যথার্থরূপে (বিধানের কম বেশী না করে) গান করে।

২। অংকার—যে বিধানগুলির ন্যূনাধিক করে অথচ গানে মগ্ন হয়, যার গান শোনামাত্রই শ্রোতা মুগ্ধ হয়।

৩। রসিক—যে তাল বোল সুর, এই তিন মিলিয়ে গায়।

৪। রঞ্জক—যে সুর সৌন্দর্য ও মাধুর্য উত্তমরূপে প্রকাশ করে শ্রোতাদের মন হরণ করে।

৫। ভাবক—রঞ্জকের গুণ আছে, নিজে কবি, এবং সংগীত বিদ্যায় নিপুণ।

গায়কের সংখ্যা ও গানক্রিয়া লক্ষ্য রেখে নরহরি গায়কের আরেক ধরণের শ্রেণী বিভাগ করেছেন ১। **'একল'** (যে একাকী গান করে), ২। **'যমল'** (যে অপর একজন গায়কের সঙ্গে গান করে), ৩। **'বৃন্দ'** (যে বহু গায়কের সঙ্গে দল বেঁধে গান করে)। রাধামোহন সেনও এই তিন শ্রেণীর গায়কের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বৃন্দকে 'বরন্দল' আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আবার বলেছেন যে, একল গায়কই উত্তম শ্রেণীর, যমল গায়ক মধ্যম শ্রেণীর এবং বরন্দল অধম শ্রেণীর গায়ক। তাঁর মতে 'একল' গায়ক যন্ত্র স্পর্শ করে না, দোসরও চায় না। 'যমল' গায়ক যন্ত্র নেয় বা দোসর চায়, এবং 'বরন্দল' যন্ত্র ও দোসর দুই-ই গ্রহণ করে।[২৮]

অতঃপর নরহরি গায়কের দোষ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনটি গ্রন্থেই মোটামুটি একই লক্ষণগুলি ব্যক্ত হয়েছে।

গান ক্রিয়াকালে ভীত হয়ে ওঠা, পদগুলি স্পষ্ট উচ্চারণ করতে না পারা, মাথা কাঁপা, বিকৃত স্বর প্রকাশ, চোখ বন্ধ হয়ে আসা, তার উপর বিকৃতকণ্ঠ, বিকৃত আনন, অশান্তচিত্ততা, নাকীসুর প্রকাশ, সংগীতে অমনোযোগ, একরাগে অন্যরাগের মিশ্রণ ঘটানো বা স্বরসাম্য রক্ষা করতে না পারা,

২৭-২৮. সংগীততরঙ্গ, (১৩১০), পৃঃ ২১০।

তালজ্ঞানহীনতা ও রসে অনভিজ্ঞতা ইত্যাদি লক্ষণগুলি গায়কের দোষ রূপে গণ্য করা হয় ।।[২৯]

(আ) বাদ্য

সংগীত গীত, বাদ্য ও নৃত্যের সমন্বয়ে সৃষ্ট। সুতরাং বাদ্য সংগীতের একটি প্রধান অঙ্গ। বাদ্য ব্যতীত গীত ও তাল শোভন হয় না : 'ন বাদ্যেন বিনা যস্মাদ্ গীতং তানশ্চ শোভতে'।

ঘনশ্যাম-নরহরি তাঁর তিনটি গ্রন্থে এই বাদ্যের আলোচনা করেছেন

'সংগীতসারসংগ্রহ' (২য় অধ্যায়, বাদ্যপ্রকরণ)

'ভক্তিরত্নাকর' (৫ম তরঙ্গ, ব্রজপরিক্রমা, রাসলীলা বর্ণনায়) এবং

'গীতচন্দ্রোদয়' (মঙ্গলাচরণ পুথি, বরাহনগর ২৫৩৪।৩ নং প্রারম্ভে)

তন্মধ্যে 'সংগীতসারসংগ্রহে'র আলোচনা বিশদ ও বিস্তৃত। তদপেক্ষা সংক্ষিপ্ত আলোচনা 'ভক্তিরত্নাকরে'। এ গ্রন্থে রাসলীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে বাদ্যের উপস্থাপনা। প্রথমটি সংগীতালোচনাগ্রন্থ সুতরাং সেখানে বিস্তৃত বর্ণনা স্বাভাবিক। 'ভক্তিরত্নাকরে'র মুখ্য প্রতিবাদ্য বিষয় বৈষ্ণব ইতিহাস রচনা, সংগীতবাদ্যাদি নয়। তেমনি 'গীতচন্দ্রোদয়' পদসংকলন গ্রন্থ, সেখানেও গীতবাদ্যাদি আলোচনা উদ্দিষ্ট বিষয় নয়। এজন্যে এ গ্রন্থের আলোচনা নিতান্ত প্রসঙ্গরক্ষা মাত্র।

---

২৯. রাধামোহন সেন গায়কের ১৮টি দোষ উল্লেখ করেছেন। এক একটি দোষের জন্যে গায়কের পৃথক পৃথক নামকরণও করেছেন। তাঁর মতে—কর্কশ স্বর (করণ গায়ক), নীরস কর্কশ স্বর (রুক্ষত গায়ক), স্বর একমিল না হলে (নিঃসার), গ্রামজ্ঞানহীন (কেৎ), গর্দভ স্বরবিশিষ্ট (জনার), স্বব মিষ্ট নয় (ওদেষ্ট), ভীত হয়ে গায় (ভেষ্ট), তাড়াতাড়ি গায় অথচ স্বর কাঁপে (শংকট), দেহ কাঁপে স্বরও কাঁপে (কম্পিত), স্বস্থানে স্বর বেরোয় না (কপল), কাক স্বরবিশিষ্ট (কাকী), বেসুরো, নাকীস্বর বিশিষ্ট (অধর), সুরতাল জ্ঞানহীন (বিতালা), কান্নার মত বোল (অপকৃষ্ট), গান গায় কিন্তু শাস্ত্র বিধি জানে না (অনূঢ়া) এবং শুদ্ধ সম্পূরণ বোধহীন (মিশ্রক)। নামগুলি তাঁরই প্রদত্ত কি-না বলা যায় না।

তিনি আরও বলেছেন যে, গানকালে মুখ সুবিস্তৃত হয় ও দাঁত বের হয় (করালী বা কুমুদ্রা গায়ক), গানে ঘন ঘন শ্বাস বয়, দাঁত চেপে স্বর প্রকাশ করে, স্বর যেন নাকে বেরুচ্ছে মনে হয় (মত্তকারী গায়ক), গানকালে গলা বা শরীর যেন উচ্চ হয় (করবিন্না), গলা ফুলে যায় (জেকত গায়ক), গ্রীবা বাঁকে (বেক্রি) ইত্যাদিও গায়কের দোষ ।। সংগীততরঙ্গ, (১৩১০), পৃঃ ২১৩-৪।

বাদ্য চার প্রকারের

১। তত—(বা তার নির্মিত বাদ্যযন্ত্র, যেমন বীণা ইত্যাদি)

২। আনদ্ধ—(বা চামড়ার আবরণযুক্ত বাদ্যযন্ত্র, যেমন মর্দলাদি)।

৩। শুষির—(বা ফুৎকার বাদ্যযন্ত্র, যেমন বাঁশী ইত্যাদি)।

৪। ঘন—(বা ধাতু নির্মিত বাদ্যযন্ত্র, যেমন করতাল প্রভৃতি)।

গ্রন্থকার এই প্রকারভেদ তাঁর তিন গ্রন্থেই উল্লেখ করেছেন এবং 'সংগীত-দামোদরে'র শ্লোক উদ্ধার করে প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আলোচনার শেষে তিনি এ-ও জানিয়েছেন যে, এই চার শ্রেণী বাদ্যের উপর সকলের বা যে কোনো লোকেরই অধিকাব নেই। তত বাদ্য দেবতারা, আনদ্ধ রাক্ষসেরা, শুষির গন্ধর্বেরা এবং ঘনবাদ্য মানুষেরা ব্যবহার করে।

নরহরি 'সংগীতদামোদরে'র তিনটি শ্লোক গ্রহণ করে তত শ্রেণীর বাদ্যগুলির একটি নাম-তালিকা দিয়েছেন। যথা, অলাবনী, ব্রহ্মবীণা, কিন্নরী, লঘুকিন্নরী, বিপঞ্চী, বল্লকী, জ্যেষ্ঠা, চিত্রা, ঘোষবতী, জয়া, হস্তিকা, কুব্জিকা, কূর্মী, শারঙ্গী, পরিবাদিনী, ত্রিশরী, শতচন্দ্রী, নকুলৌষ্ঠী, কংসরী, উডুম্বরী, পিনাকী, নিবদ্ধ, পুষ্কল, গদাবারণহস্ত, রুদ্রবীণা, শর (-স্বর)-মণ্ডল, কপিলাস, মধুস্যন্দী ও ঘোনা ইত্যাদি।

এই নাম-তালিকাটি 'সংগীতসারসংগ্রহ' ও 'ভক্তিরত্নাকরে' আছে, 'গীতচন্দ্রোদয়ে' নেই। এই তত বাদ্যগুলি ছাড়া আরো যে বেশ কিছু এই জাতের বাদ্য ছিল, তা নরহরির আলোচনা থেকেই বোঝা যায়। তিনি উভয় গ্রন্থেই এ কথা লিখেছেন

তথা চ অপরা কচ্ছপী বীণা সৈর রূপবতী ক্বচিৎ

অর্থাৎ অপর একটি বাদ্য কচ্ছপী বীণা, তা-ই রূপবতী বীণা নামে পরিচিত।

নরহরি উল্লেখ করেন নি এমন কিছু তত বাদ্যের নাম পাই পুরোনো বাংলা সাহিত্যগুলিতে—বিশেষভাবে মঙ্গলকাব্যগুলিতে, 'চৈতন্যভাগবত', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', কবিশেখরের 'গোপালবিজয়ে'। যেমন, রবাব, সপ্তস্বরা, ঢ়ুসরী (-ধুসরী, ধুসারেকা), খমক, দোতারা, সেতারা, একতারা, পিনাকিনী (পিনাকী জাতীয়)।

নরহরি উল্লিখিত বাদ্যগুলির মধ্যে অনেকগুলি তাঁর সময়ে বা তার পূর্বেই অন্য নামে পরিচিত হয়। যেমন, 'মধুস্যন্দী' মধুস্রবা, 'ত্রিশরী' ত্রিতন্ত্রী-যন্ত্র।

কপিলাস কৈলাস আন্তাবীণা। চণ্ডীমঙ্গলে পিনাক, পিনাকী ও পিনাকিনীর উল্লেখ দেখে মনে হয় এ তিনটি হুবহু এক যন্ত্র নয়। সর্বানন্দ সপ্ততন্ত্রীকে 'সররসিআ' ও চণ্ডালবীণাকে 'কিন্দরা' বলে উল্লেখ করেছেন।[১]

নরহরি তাঁর উল্লিখিত বাদ্যগুলির থেকে কেবলমাত্র 'অলাবনী' বাদ্যটির গঠনপ্রণালী ও বাদন রীতির পরিচয় দিয়েছেন। পুরোনো বাংলা সাহিত্যে এই 'অলাবনী' বাদ্যটির বিশেষ উল্লেখ নেই, এ থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সেকালে এর ব্যবহার কম ছিল। কিন্তু তা নয়, অলাবনীর ব্যবহার আজ পর্যন্ত দেখা যায়। গ্রামের লোকেরা এর নাম দিয়েছেন "গুপীযন্ত্র"।

নরহরি প্রদত্ত 'অলাবনী'র পরিচয় নিম্নরূপ

অলাবনী নাতিদীর্ঘ বীণা-জাতীয় বাদ্য, দশ মুষ্টি পরিমিত, খদির কাঠের দণ্ডবিশিষ্ট। দণ্ডের মাঝখানে একটি ছিদ্র, উপরে রেখাচিত্র, নীচে হস্তীচিহ্ন। এই দণ্ডের নয় আঙ্গুল নীচে ছিদ্রের উপরে একটি অর্ধ চন্দ্রের মতো কাষ্ঠখণ্ড যোজিত। এরই সঙ্গে যুক্ত হবে একটি শক্ত ও সুন্দর এবং বারো আঙ্গুল পরিমিত অলাবু। আগের দণ্ডছিদ্রটিতে ক্ষুদ্র এক কাষ্ঠখণ্ড যুক্ত করে চুম্বিকাখণ্ডের মাঝখান দিয়ে অলাবুর মাঝটিতে একটি তার দিয়ে যুক্ত করতে হবে। তারপরে আগের সেই ছোট্ট কাষ্ঠখণ্ডটিকে এমনভাবে ঘুরোতে হবে, যাতে হস্তীচিহ্নিত অংশের উর্ধ্বভাগ এবং অলাবুখণ্ড খুব দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হয়। এই যন্ত্রটিকে যথার্থ কার্যকরী করতে হলে অলাবু থেকে দণ্ডটির মধ্যভাগ পর্যন্ত পাঁচ আঙ্গুল অন্তর দৃঢ়ভাবে বাঁধতে হবে। এর তারগুলি হবে রেশমী সুতোর মতো সূক্ষ্ম অথচ দৃঢ় ও সুগ্রথিত।

এটিকে বাজাতে হবে বুকে রেখে, ডান হাতের মধ্যমা ও অনামিকা দিয়ে। এই পরিচয় একমাত্র 'সংগীতসারসংগ্রহে' আছে, 'ভক্তিরত্নাকর' বা 'গীতচন্দ্রোদয়ে' নেই। এবং আর কোনো তত বাদ্যের পরিচয় গ্রন্থকার দেন নি।[২]

বাদ্যযন্ত্রের দ্বিতীয় প্রকার আনদ্ধ বা চামড়ার আবরণযুক্ত বাদ্য। 'সংগীতসারসংগ্রহ' ও 'ভক্তিরত্নাকরে' একই শ্লোকে নরহরি আনদ্ধ যন্ত্রগুলির নাম-তালিকা দিয়েছেন। যথা, মর্দল, মুরজ, ঢক্ক, পটহ, চাঙ্গ, পণব,

---

১. বঙ্গভূমিকা, (১৯৭৪), শ্রীসুকুমার সেন, পৃঃ ৩০৫।

২. বাদ্যযন্ত্রের অনেকগুলির পরিচয় আছে সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'যন্ত্রকোষ' নামক গ্রন্থে।

কুণ্ডলী, ভেরী, ঘণ্টাবাদ্য, ঝর্ঝর, ডমরু, টমকি, মন্থ, হুড়ুকা, মড্ডু, ডিণ্ডিম, উপাঙ্গ, দর্দুর ইত্যাদি।

এগুলির মধ্যে মর্দল আলোচনাকালে গ্রন্থকার বলেছেন যে, যে-বাদ্য মর্দল তা কাঠের তৈরী ('বডি' অংশ) তা-ই মাটির তৈরী হলে 'মৃদঙ্গ' নামে পরিচিত হয়। এ বিষয়ে 'সংগীতসারসংগ্রহ' ও 'ভক্তিরত্নাকরে' 'সংগীতদামোদরে'র 'মৃত্তিকা নির্মিতাশ্চৈব' ইত্যাদি একই শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে, এবং 'গীত-চন্দ্রোদয়ে' তারই বঙ্গানুবাদ পয়ারে গ্রথিত হয়েছে

মর্দলে মৃদঙ্গ কহি ভেদ কিছু নয়।
কাষ্ঠ আর মৃত্তিকাতে নির্মাণ এ হয় ॥ (পত্র ১৯খ)

মর্দল ও মুরজ এক জাতীয় বাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বকর্মার বচন উদ্ধার করে নরহরি এ দুয়ের পার্থক্যটিও প্রদর্শন করেছেন। মর্দলের বাম মুখের বিস্তার তেরো আঙ্গুল, কিন্তু মুরজের বামমুখের বিস্তার আট আঙ্গুল, এবং ডানমুখের বিস্তার মর্দলের বারো আঙ্গুল, কিন্তু মুরজের সাত আঙ্গুল। এই পার্থক্য তিনি 'সংগীতদামোদরে'র শ্লোক উদ্ধৃত করেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে মুরজের 'অঙ্ক্য', 'উদ্ধক' ও আলিঙ্গ্য' নামে তিনটি প্রকারভেদের কথাও বিশ্বকর্মার উক্তি দিয়ে উত্থাপিত হয়েছে। ভরতের একটি শ্লোক গ্রহণ করে এই তিনের আকৃতির পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে। 'অঙ্ক্যে'র আকৃতি হরীতকীতুল্য, 'উদ্ধকে'র যবের মধ্যভাগসদৃশ এবং 'আলিঙ্গ্যে'র আকৃতি গোপুচ্ছের মতো।

এভাবে একজাতের বাদ্য মর্দল, মৃদঙ্গ ও মুরজের পার্থক্য ও সম্পর্ক নির্ণয় করে নরহরি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা, কৃতিত্ব ও সচেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন।

নরহরি-উল্লিখিত আনদ্ধ বাদ্যগুলি ছাড়া আরো কিছু এই শ্রেণীর বাদ্যের নাম পাই পুরোনো বাংলা সাহিত্যে। যেমন, দুন্দুভি, জয়ঢাক, বীরঢাক, দগড়, কাড়া, পাখোয়াজ, ডম্ফ, আনক, দমড়সা, ঢোল, জগঝম্প, দামা, পড়া, জোড়া (বা জোড়ঘাই), ছাপড়।

নরহরির নামগুলি মধ্যবাংলায় পরিবর্তিত হয়েছে। মর্দল > মাদল, মৃদঙ্গ > খোল, মড্ডু (বড় ডমরু, সর্বানন্দে নাম আছে 'চুচুংক'[৩]) > মোড়া, ডিণ্ডিম

৩. বঙ্গভূমিকা, (১৯৭৪), অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন, পৃঃ ৩০৫।

>ডেঙ্গুরী বা ডেঙ্গুনী। ডমরুর মধ্যে ছোটগুলিকে চর্যাগীতিতে 'ডমরুলি' বলা হয়েছে। 'টমকি' বাদ্যটি 'নিঃসাণ' নামক বাদ্যের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ মাত্র।[৪]

উল্লিখিত বাদ্যগুলির মধ্যে মর্দলকে 'আনদ্ধ-শ্রেষ্ঠ' বলেছেন

মর্দল আনদ্ধশ্রেষ্ঠ—মৃদঙ্গাখ্যা তার।

'সংগীতসারসংগ্রহে' মর্দল ও মৃদঙ্গ সম্পর্কেই বিস্তৃত আলোচনা আছে। 'সংগীতদামোদরে'র শ্লোক উদ্ধার করে মর্দলের নির্মাণকার্য ব্যক্ত হয়েছে। বলা হয়েছে, মর্দল খদির বা রক্তচন্দন কাষ্ঠে নির্মিত হয়। রক্তচন্দন কাষ্ঠে নির্মিত মর্দল সুন্দর ও উচ্চ গম্ভীর ধ্বনিযুক্ত হয়, কিন্তু খদির নির্মিত মর্দলই সর্বোৎকৃষ্ট। মর্দল দেড় হাত দীর্ঘ, এর বাম ও ডান মুখের বিস্তার যথাক্রমে তেরো ও বারো আঙুল। এর মধ্যভাগ স্থূল ও গোলাকৃতি। দুই মুখ চামড়ায় আবৃত। এই চামড়া ছ-মাস বয়স্ক মৃত গোবৎসের। একে 'করণ' বলে।

মর্দলেরই মতো মৃদঙ্গের নির্মাণকার্য, পার্থক্য কেবল মৃদঙ্গের বডিটি মাটি দিয়ে তৈরী। তবে মৃদঙ্গের গায়ে গিরিমাটি চূর্ণ নরম ও ঘনভাবে লেপন করতে হয়। মর্দলে তা দরকার হয় না।

মর্দল বা মৃদঙ্গের দুই মুখের চামড়ায় প্রলেপ দেওয়া হয়। ডান মুখের প্রলেপকে 'খরলি' ও বাম মুখের প্রলেপকে 'পুরিকা' বা 'বজ্র' বলে। 'খরলি' হলো হরিতকী ('জীবনী') র মর্দিত সত্ত্ব। ভাত, খই, চিড়ে—এই তিনটির সর্বোৎকৃষ্টটির সঙ্গে জল দিয়ে যে সত্ত্ব প্রস্তুত হয়, তা-ই 'পুরিকা'। 'বজ্র' প্রলেপটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বিশেষজ্ঞদের সৃষ্টি। ভাত, ছাগবিষ্টা ভস্ম, পুরাতন ভস্ম (একসঙ্গে বহুদিনস্থিত কোনো কিছুর চূর্ণ, মুষা বা লোহা-তামাদি গলানোর পাত্রের চূর্ণের মিশ্রণ) এবং লোহাচূর্ণের মিশ্রিত মণ্ডকে 'বজ্র' বলে।

এরপর নরহরি মৃদঙ্গ বাদনের নিয়মগুলি বিবৃত করেছেন। এই বাদনের চারটি নিয়ম

'ঘট্টিতা'—অর্থাৎ করমূলের চালন।

'বিপ্রকৃষ্টা'—অর্থাৎ অঙ্গুলিমূল হতে করমূলের চালন।

'গোমুখী'—অর্থাৎ বিপ্রকৃষ্টার অধিক চালন।

এবং 'আলপ্তিকা'—অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলির সংযোগে সর্বাঙ্গুলির চালন।

৪. উত্তর ভারতীয় সংগীত, (১৯৭০), রাজ্যেশ্বর মিত্র, পৃঃ ৮৪।

এই সঙ্গে গ্রন্থকার মৃদঙ্গে আঘাত দেবার রীতিটি উল্লেখ করেছেন। মৃদঙ্গে আঘাত তিন রকমের দেওয়া হয়।

'নিগৃহীত'—অর্থাৎ দুই হাতের মুষ্টি দ্বারা আঘাত।

'অর্ধনিগৃহীত'—অর্থাৎ এক হাত মুক্ত করে অন্য হাতের মুষ্টিতে আঘাত।

'মুক্ত'—অর্থাৎ দুই হাত মুক্ত করে মধ্যস্থলে আঘাত, যাতে প্রতিমুহূর্তে "কলাস" নামক বিশেষ বাদন সৃষ্টি হয়।

ভরতমুনি আরো বিভিন্ন প্রকার বাদ্যপাঠের কথা বলে গিয়েছেন। নরহরি সেগুলি বাহুল্যবোধে উল্লেখ করেন নি।

'সংগীতসার সংগ্রহে' 'স্ত্রী', 'পুরুষ' ও 'ক্লীব' ভেদে আরেক প্রকার মৃদঙ্গ ধ্বনির উল্লেখমাত্র আছে, বিশ্লেষণ নেই।

নরহরি মৃদঙ্গ-বাদকের লক্ষণটিও প্রকাশ করতে ভোলেন নি। তাঁর তিনটি গ্রন্থেই লক্ষণগুলি ভরতের শ্লোক উদ্ধার করে ব্যক্ত হয়েছে। এই শ্লোকে আছে যে, মৃদঙ্গবাদক হবেন ধীর, বাদননিপুণ, বাক্‌পটু, বাদ্যাক্ষর বা বোল-প্রকাশক, বাদ্যের পরিবর্তিত ভঙ্গির সঙ্গে সমন্বিত নৃত্যে কুশল, গানের গতির সঙ্গে সঙ্গতে উত্তমরূপে অভ্যস্ত, সন্তুষ্ট চিত্ত ও লঘুহস্ত।

বাদ্যের তৃতীয় প্রকার শুষির বা 'মুখবাদ্য' বা ফুংকারবাদ্য। 'সংগীতসার-সংগ্রহ' ও 'ভক্তিরত্নাকরে' 'সংগীতদামোদরের' দুটি শ্লোক উদ্ধার করে নরহরি এই প্রকার বাদ্যের একটি তালিকা দিয়েছেন

বংশ (বাঁশি), পারী, মধুরী, তিত্তিরী, শংখ, কাহল, তোডহী, মুরলী, বুক্কা, শৃঙ্গিকা, স্বরনাভি, শৃঙ্গ, লাপিক-বংশ, চর্মবংশ ইত্যাদি।

এগুলির মধ্যে অনেক বাদ্যের নামই পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন, তিত্তিরী > তুরতুরী > তুরী, মধুরী > মধুকরী (মহুরী বা মুহরী), শৃংগ > শিংগা।

নরহরি প্রদত্ত বাদ্যগুলি ছাড়া আর কিছু নাম পাই পুরানো বাংলা সাহিত্যে। যেমন

সানাঞি (সানাই), কসাল (চর্যাগানে),উপাঙ্গ, করনাল (কুর্ণা), বিষাণ, ভুরঙ্গ (ভরঙ্গ)।

শুষিরের প্রসঙ্গ 'গীতচন্দ্রোদয়ে' নেই। অন্য দুটি গ্রন্থে শুষিরের তালিকার পর গ্রন্থকার শ্রেষ্ঠ শুষির বংশ বা বাঁশির পরিচয় দিয়েছেন। বাঁশি হবে সুন্দর সরল ও গ্রন্থি দোষ রহিত। তা বেণু (এক প্রকার বাঁশ), খদির, রক্তচন্দন,

শ্বেতচন্দন প্রভৃতি কাঠ, সোনা, রূপো, তামা এবং হাতির দাঁত দিয়ে তৈরী করা হয়।

বাঁশীতে অনেকগুলি ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রগুলি সম্পর্কে গ্রন্থকার নির্দেশ দিয়েছেন। বাঁশির উপরের দিক (বন্ধ মুখ) হতে দু আঙ্গুল ছেড়ে আঙ্গুলের এক পাব (পর্ব) সমান ফুঁ দেবার ছিদ্র করতে হয়। তারপর পাঁচ আঙ্গুল ছেড়ে আর ছ-টি ছিদ্র পাশাপাশি হবে। প্রতিটি ছিদ্র কুল-বীজের মতো ছোটো ছোটো, এক একটির দূরত্ব এক আঙ্গুল স্থানের চার ভাগের এক ভাগের সমান। উত্তম ধ্বনি সৃষ্টির জন্যে বাঁশীর দুটি-মুখ সোনা প্রভৃতি ধাতু দিয়ে বেঁধে দিতে হয় এবং মোম দিয়ে মুখের বাঁধন মজবুত করতে হয়।

বাঁশির দৈর্ঘ কম পক্ষে পাঁচ আঙ্গুল, বেশী হলে আঠারো আঙুল। এক থেকে চার আঙুল দীর্ঘ বাঁশি অতি উচ্চরব প্রকাশক বলে বাদকেরা পরিত্যাগ করেছেন। তেমনি তেরো, পনেরো ও সতেরো আঙ্গুল দীর্ঘ বাঁশিও তাঁদের দ্বারা নিন্দিত হয়েছে। দৈর্ঘের বিচারে বাঁশিকে তিনটি শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে

(ক) **সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণী**—(১) 'মহানন্দ' (দশ আঙ্গুল দীর্ঘ), (২) 'নন্দ' (এগার আঙ্গুল দীর্ঘ), (৩) 'বিজয়' (বারো আঙ্গুল দীর্ঘ), (৪) 'জয়' (চৌদ্দ আঙ্গুল দীর্ঘ)। আচার্য মতঙ্গের মতে এই চারিটি বাঁশিই সর্বোৎকৃষ্ট।

(খ) **মধ্যম শ্রেণী**—পাঁচ থেকে নয় আঙ্গুল দীর্ঘ বাঁশি ।

(গ) **নিকৃষ্ট শ্রেণী**—এক থেকে চার, তেরো, পনেরো, সতেরো, আঙ্গুল দীর্ঘ বাঁশি।

এই শ্রেণী বিচারের উল্লেখ 'সংগীতসারসংগ্রহে'র মতোই 'ভক্তিরত্নাকরে' আছে।

এই সঙ্গে বংশীবাদকের লক্ষণ, তার দোষগুণ সম্পর্কেও নরহরি প্রমাণসই আলোচনা করেছেন। 'সংগীতসারসংগ্রহে' 'সংগীতদামোদরে'র শ্লোক উদ্ধার করে বাদকের গুণ বা লক্ষণ বলা হয়েছে। সংগীতে দক্ষতা, উত্তমস্বর প্রকাশ ও সুষ্ঠুভাবে আঙ্গুল চালনের ক্ষমতা, সব রকম স্বর কম্পনে, রাগ-রাগাঙ্গ-রাগিণী-বিকল্প রাগিণীতে অভিজ্ঞতা, সংগীতের যুক্ত মুক্ত স্থানে ধ্বনি সৃষ্টির কৌশল, গায়কদের বিরতিতে স্থান পূরণ বা আসর রক্ষার উপযোগী

নিপুণতা, গায়কদের গীতদোষ ঘটলে, বাঁশির মাধ্যমে তাকে ছাপিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখবার মতো যোগ্যতা ইত্যাদি হবে বাদকের গুণ।

অন্যদিকে বাদনের সময় বার বার মাথানাড়া, মূলগীতের সঙ্গে সমান বাদন সৃষ্টির অক্ষমতা, বৃথা অভিনয়ের আধিক্য ঘটানো, গীতবাদনে অল্পভাব প্রকাশ ইত্যাদি বংশীবাদকের দোষরূপে পরিজ্ঞাত।

এই প্রসঙ্গে 'অনুরক্ত'-বাদকের কথা বলা হয়েছে। যে বাদকের উপরোক্ত বাদক-লক্ষণগুলির মধ্যে বাদ্যের সুসন্নিবেশকরণ, স্বঃকম্পন, নৃত্যাদিতে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকবে, যে স্পষ্টাক্ষরভাষী ও দ্রুতহস্ত হবে, তাকে বলা হবে 'অনুরক্ত'-বাদক।

'সংগীতসারসংগ্রহে' বাঁশির উপর আঙ্গুলচালনা ও ফুৎকারের দোষগুণ সম্পর্কেও আলোচনা দেখা যায়। 'প্রযুক্তি', 'অর্ধযুক্তি' এবং 'মিলন'—এই তিনটি হলো আঙ্গুলের গুণ। কিন্তু গুণ তিনটির কোনো রকম বিশ্লেষণ এ গ্রন্থে নেই।

ফুৎকারের গুণ হলো—অবিচ্ছিন্নতা, নিপুণতা, সুন্দর স্বর প্রকাশ, দ্রুততা ও মধুরতা। এই পাঁচটি শব্দের মধ্যে 'নিপুণতা' শব্দটির অর্থ বোঝা যায় না।

অপরপক্ষে ফুৎকারের দোষও কম নয়। বহুপ্রকার অব্যক্ত শব্দ, জড়ীভূত বা বিকৃত শব্দ প্রকাশ, কম্পন, নীরসতা ও মাধুর্যহীনতা—এই ছ-টি দোষ সর্বজনজ্ঞাত। অন্যান্য বহু দোষ আছে, গ্রন্থকার বাহুল্যবোধে তা প্রকাশ করেন নি।

চতুর্থপ্রকার বাদ্যের নাম 'ঘন' বা ধাতুনির্মিত বাদ্য। 'গীতচন্দ্রোদয়ে' ঘন বাদ্যের প্রসঙ্গ না থাকলেও নরহরির অপর দুটি গ্রন্থে বারোটি ঘনবাদ্যের তালিকা মেলে। যেমন, করতাল, কাংস্যবল (কাঁসি), জয়ঘণ্টা, শুক্তিকা, কম্পকা, ঘটবাদ্য, ঘণ্টাতোদ্য, ঘর্ঘর, ঝঞ্ঝাতাল, মঞ্জীর, কর্তরী ও অংকুর।

'সংগীতসারসংগ্রহে' ঘনবাদ্যকে দুভাগ করা হয়েছে—'অনুরক্ত' যা গীতাশ্রয়ী এবং 'বিরক্ত' যা তালাশ্রয়ী। কিন্তু এই দুভাগের বিশ্লেষণ ও উদাহরণ দেওয়া হয় নি।

এই বারোটি ছাড়া অন্য ঘনবাদ্যের নাম নরহরির গ্রন্থে নেই। এই প্রকার

বাদ্যের কিছু নতুন নাম প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে আছে। যেমন, মন্দিরা খঞ্জ, মৃচঙ্গ (মোচঙ্গ), করড, (করণ্ড)[৫]।

ঘনবাদ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করতাল। সম্ভবতঃ সে কারণেই গ্রন্থকার 'সংগীতসারসংগ্রহে' এর বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন।

করতাল তেরো আঙ্গুল ব্যাসযুক্ত বিশুদ্ধ কাঁসার বাদ্য। এরা মাঝখানে স্তনাকার মুখ। মুখে ছিদ্র, তাতে দড়ি বা সুতো পরানো হয়।

অন্য প্রকারেও করতালের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এর ব্যাস তেরো আঙ্গুল; মুখ এক আঙ্গুল, গভীরতা পাঁচ আঙ্গুল, এবং মাঝের অংশ সাত আঙ্গুল পরিমিত। এটি গোলাকার অথচ ঈষৎ চাপা, তিন আঙ্গুল পরিমিত নীচু, পেছন দিকের মাঝের স্থানটি শিবলিঙ্গের মতো। ঠিক মাঝখানে কুঁচতুল্য (গুঞ্জাফল) ছিদ্র, ছিদ্রে পাটের দড়ি সংযুক্ত করতাল দুটি। একটি দড়ি দিয়েই দুটিকে একত্রিত করা হয়। করতাল নির্মাণেরও একটি বিশেষত্ব আছে। সাধারণ কাঠে সাধারণভাবে তাপ দিয়ে এর ধাতু (কাঁসা) নির্মাণ করা যায় না। অত্যন্ত টক এবং শক্ত কাঠ দিয়ে এই ধাতু প্রস্তুত করতে হয়।

দুটি করতালের মধ্যে ডানহাতে ব্যবহৃতটি সুন্দর ধ্বনিযুক্ত, বামহাতেরটি তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। দুই হাতের তর্জনী ও বুড়ো আঙ্গুলের সহযোগে দুটি করতাল বাজানো হয়। বামহাতেরটি মধ্যভাগ ঈষৎ নত করে এবং ডান-হাতেরটি সোজা রেখে চালনা করে তাল দিতে হয়। এই ভাবে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত বাজাতে হয়॥

(ই) নৃত্য

গীত-বাদ্য-নৃত্যের সমন্বয়ে সংগীত সৃষ্টি। নৃত্য সংগীতের এক প্রধান অঙ্গ। নরহরি তাঁর 'সংগীতসারসংগ্রহে'র তৃতীয় অধ্যায় 'নৃত্যনাট্যপ্রকরণে' এবং 'ভক্তিরত্নাকরে'র ৫ম তরঙ্গে নৃত্যের আলোচনা করেছেন।

সেকালে নৃত্যের উদ্ভব সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারণা প্রচলিত ছিল। ইন্দ্রের অনুরোধে ব্রহ্মা বেদগুলিকে আশ্রয় করে 'নাট্যবেদ' নামক পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করেন। তাঁর কাছে ভরত নাট্যবেদ শিক্ষা করে মহাদেবের সামনে তা প্রয়োগ করেন। এই পুরাবৃত্তটি 'সংগীতসারসংগ্রহে' সংকলিত।

নরহরি প্রাচীন শাস্ত্রকারদের অনুসরণে লিখেছেন, নৃত্য তিন রকমের, নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত।

৫. বঙ্গভূমিকা, (১৯৭৪), ডঃ শ্রীসুকুমার সেন, পৃঃ ৩০৫।

নাট্য : নাট্য হলো নানা অবস্থাযুক্ত লোকের স্বভাবগুলির আঙ্গিক অনুকরণ বা অভিনয়। নাট্যকার ভরতের প্রদত্ত সংজ্ঞাটি নরহরি গ্রহণ করেছেন। ভরত বলেছেন, নাট্যে দুরকম অনুকরণ আছে—বাক্যার্থের ও পদার্থের। রসাশ্রয় বাক্যার্থ অভিনয় ও ভাবাশ্রয় পদার্থ অভিনয়। ভরতের নাটকে এই দুটি-ই প্রযুক্ত হয়েছে।

'সংগীতসারসংগ্রহে' নাট্যের বিশেষ আলোচনা প্রসঙ্গে নরহরি কোহলের অভিমতটি উদ্ধার করেছেন। কোহল বলেছেন, অতি প্রধান বা অভিজ্ঞ নট বা অভিনেতার ক্রিয়া-ই 'নাট্য'।

নৃত্য : নৃত্য সম্পর্কে নরহরি বলেন, দেশীয় রীতিতে প্রসিদ্ধ তাল মান লয়ের অনুসারী যে স-বিলাস অঙ্গ সঞ্চালন, তা-ই নৃত্য নামে অভিহিত। এখানে 'বিলাস' অর্থে প্রিয়তমের দর্শনাদিতে নায়িকার শৃংগার চেষ্টাযুক্ত বিশিষ্টতা বোঝানো হয়েছে।

নৃত্ত : নৃত্ত হলো সকল প্রকার ছলাকলাযুক্ত অভিনয় বর্জিত যথারীতি যে শরীর সঞ্চালন।

এরপর নরহরি বলেছেন, এই নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত তিনটিকেই 'মার্গ' ও 'দেশী' ভেদে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয় -

এতদ ত্রয়ং দ্বিধা প্রোক্তং মার্গো দেশীতি ভেদত :।

যে নৃত্য (গীতবাদ্য) ব্রহ্মাদি কর্তৃক সৃষ্ট, যা মহাদেবের সম্মুখে ভরতাদি কর্তৃক প্রযুক্ত, তা 'মার্গ' নামে অভিহিত। এবং যে নৃত্য দেশে দেশে রাজাদের আনন্দের জন্যে সাধারণ মানুষ কর্তৃক প্রযুক্ত, তা-ই 'দেশী' নামে পরিচিত।

কোহলের অনুসরণে নরহরি জানিয়েছেন, মার্গনাট্য ২০ প্রকার, এবং দেশীনাট্য ১৬ প্রকার। ২০টি মার্গ নাট্যের নাম হলো—নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ডিম, ব্যায়োগ, সম্বকার, বীথি, অংক, ইহামৃগ, নাটিকা, প্রাকরণিকা, হাসিকা, বিয়োগিণী, ডিমিকা, কলোৎসাহবতী, চিত্রা, জুগুপ্‌সিতা, বিচিত্রা ও অর্থা।

এই নামগুলি 'সংগীতসারসংগ্রহে' প্রদত্ত। 'ভক্তিরত্নাকরে' বলা হয়েছে

মার্গ-নাট্য বিংশতি—কোহলে নিরূপয়।
নাটক, প্রকরণ, ভাণ, প্রহসনাদয়॥

কেহ কহে মার্গনাট্য দশ পরকার।
নাটিকা প্রাকরণিকাদিক এ প্রচার॥ (পৃঃ ২৭৭)

নরহরির এই আলোচনায় মনে হয় যে, কোহল প্রমুখ আচার্য মার্গ-নাট্যকে ২০ প্রকার রূপে বর্ণনা করলেও অনেকেই সেই ২০টিকেই গ্রহণ করেন নি। 'সংগীতসার সংগ্রহে' লিখিত নাটিকা প্রাকরণিকা ইত্যাদি ১০টিকেই তাঁরা প্রচার করেছেন।

দণ্ডিল প্রদত্ত ১৬ প্রকার দেশী-নাট্য 'সংগীতসার সংগ্রহে' উল্লিখিত হয়েছে। যেমন, ষট্টক, ত্রোটক, গোষ্ঠী, বৃন্দক, শিল্পক, প্রেক্ষণ, সংলাপক, হল্লীস, বাসিকা, দুর্লজ্ঘ্যক, শ্রীগদিত, নাট্য, রসিক, দুর্মল্লী, প্রাস্থান ও কাব্য লাসিকা। 'ভক্তিরত্নাকরের' আলোচনায় এগুলির মধ্যে প্রথমোক্ত ৪টি দেশী নাট্যের নাম আছে।

নৃত্য ১২ (বারো) প্রকারের। 'সংগীতসারসংগ্রহে' এগুলির নাম আছে, ডোম্বিকা, আভিনিক, ভাণক, প্রস্থানক, লাসিকা, বাসক, দুর্মাল্লিকা, বিদগ্ধ, শিল্লিনী, হণ্ডিনী, ভিন্নকী ও তিন্দুকী।

নৃত্য সম্পর্কে পরবর্তী আলোচনা উভয়গ্রন্থে মোটামুটি এক। 'ভক্তিরত্নাকরে' আছে

নৃত্য নৃত্ত দ্বয়েতে তাণ্ডব লাস্যদ্বয়।
কহয়ে নৃত্যজ্ঞ যাতে সর্ব সুখোদয়॥

অর্থাৎ নৃত্য ও নৃত্ত এই দুটি তাণ্ডব ও লাস্য ভেদে দুপ্রকার। উদ্ধৃত নারদসংহিতার শ্লোকে আছে যে, পুরুষের নৃত্যকে তাণ্ডব ও স্ত্রীলোকের নৃত্যকে লাস্য নামে অভিহিত করা হয়।

তাণ্ডবের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, বর্ধমান (যন্ত্রবিশেষ) ও সারিকা (যবনিকাবিশেষ) যুক্ত নাটকের ধ্রুবাগীতিতে ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে অঙ্গগুলির প্রাধান্যানুসারে সঞ্চালন, শিবানুচর তণ্ডু কর্তৃক উদ্ধতপ্রায় প্রয়োগকে 'তাণ্ডব' বলে।

('সংগীতসারসংগ্রহে' এই ধ্রুবার লক্ষণ নাট্যদর্পণ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। ধ্রুবা একটি বিশেষ ধরণের নাটক, যা কোনোও বিশেষ পাত্রকে প্রসিদ্ধি দেয়, রসব্যঞ্জনার দ্বারা সহৃদয় ব্যক্তিদের মনোরঞ্জন করে)।

উভয় গ্রন্থে তাণ্ডবের দুটি ভাগের কথা বলা হয়েছে—প্রেরণী ও বহুরূপ।

যে তাণ্ডবে অঙ্গ সঞ্চালন অধিক, অথচ অভিনয়শূন্য, তাকে 'প্রেরণী' বলে। সাধারণ লোকে একেই 'দেশী' বলে থাকে।

বহুরূপ তাণ্ডব নৃত্যের সংজ্ঞা 'সংগীতদামোদর', 'সংগীত কৌমুদী', সংগীত-সারে'র লক্ষণ 'সংগীতসারসংগ্রহে' সংকলিত হয়েছে। দামোদরের উক্তিতে আছে যে, যেখানে নাট্যের বাক্‌পংক্তি বহু প্রকারের, সেই উদ্ধৃত বাক্যগত ছিন্নভিন্ন অবস্থায় নৃত্যকে বহুরূপ বলে। অপর দুটি গ্রন্থের ব্যাখ্যা একত্রে উল্লিখিত। এতে ব্যক্ত যে, যা অল্প গান-বাদ্য-পাত্রযুক্ত, পরিবর্তিত ভঙ্গীযুক্ত, অদ্ভুত কৌশলযুক্ত, সূত্রধার কথিত, যা বিস্ময় বীর বা শৃঙ্গার রস প্রধান ও নানাবিধ ভাষা সমন্বিত, তাকে বহুরূপ তাণ্ডব বলা হয়।

লাস্য সম্পর্কে গ্রন্থকার বলেন, 'লাস্য কন্দর্প বর্ধন' অর্থাৎ সুকোমল অঙ্গের লাস্য কাম বর্ধন করে। লাস্য দু রকমের—স্ফুরিত ও যৌবত।

যে শৃঙ্গার-রস প্রধান অভিনয়ে নায়ক নায়িকা ভাব ও রসবিষ্ট হয়ে আলিঙ্গন চুম্বনের সঙ্গে নৃত্য করে, তাকে 'স্ফুরিত' লাস্য বলে। 'স্ফুরিত' অর্থ শোভিত। দামোদরে ব্যবহৃত নাম 'ছুরিত'।

আর যেখানে নটিগণ মধুরভাবে নানা লীলা ভঙ্গীতে নৃত্য করে, যা বশীকরণ বিদ্যাযুক্ত সেই নৃত্যকে 'যৌবত' লাস্য বলে।

নৃত্ত তিন রকমের—বিষম, বিকট ও লঘু। রজ্জুভ্রমণের সঙ্গে যে নৃত্ত তা বিষম, বিরুদ্ধবেশ ও দেহসজ্জা বিষয়ক নৃত্ত বিকট এবং অল্পবক্র-ভঙ্গীযুক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া বিশেষের সঙ্গে সমন্বিত যে নৃত্ত তা-ই লঘু নামে পরিচিত।

নৃত্য নাট্য নৃত্ত প্রসঙ্গ 'ভক্তিরত্নাকরে' বিস্তৃত হয় নি। 'সংগীতসার-সংগ্রহে' আরো বলা হয়েছে যে, কোহলের সময় 'ডোম্বিকা', 'ভাণিকা' প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নৃত্য ছিল।

'সংগীতসারসংগ্রহে' আলোচনার শেষে নরহরি আরো পাঁচ প্রকার নৃত্যের উল্লেখ করেছন। যেমন

১। কাষ্ঠানৃত্য— আটজন গোপনারী ও আটজন কৃষ্ণমূর্তি ব্যক্তিদের মঙ্গলকর নৃত্য।

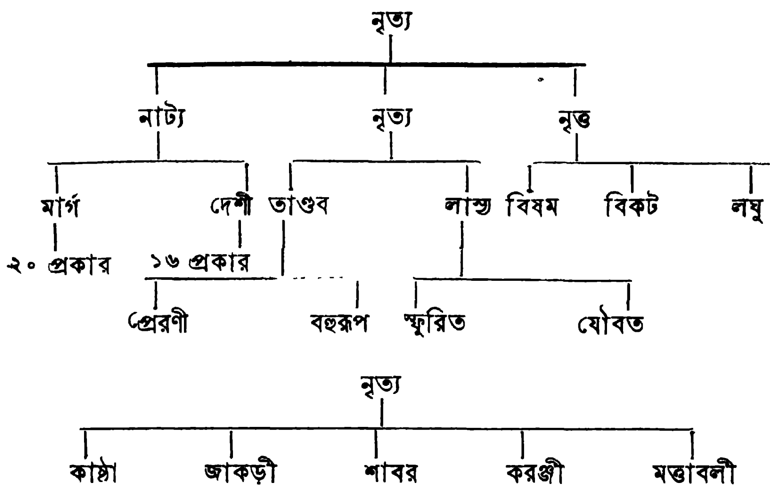
২। জাকড়ী নৃত্য—পানমত্ত দুজনের নৃত্য—যাদের হাতে গুচ্ছাকারে ময়ূরপুচ্ছ, যারা নিজ ভাষায় গান করতে করতে নৃত্য করে।

৩। শাবর নৃত্য— ব্যাধ বা নীচু জাতির লোকেদের নিজ ভাষায় গান করতে করতে নৃত্য।

৪। করঞ্জী নৃত্য—ব্যাধ-বেশ ধারিণী, ঢক্কাসমূহকে ভূষণরূপে ধারণ-কারিণী দুই নারীর নিজ ভাষায় গান করতে করতে নৃত্য।

৫। মত্তাবলী নৃত্য—মাদকদ্রব্য গ্রহণান্তর উন্মত্ত তুর্কী (তুরস্ক দেশীয়) দের অনরূপ নৃত্য ॥

নৃত্যের ছক



নৃত্য

কাষ্ঠা	জাকড়ী	শাবর	করঞ্জী	মত্তাবলী

(ঈ) আঙ্গিকাভিনয় প্রকরণ

অঙ্গ সঞ্চালন ছাড়া সংগীত স্পষ্ট হয় না। গান গাওয়া হয় মুখে, বাদ্য বাজানো হয় হাতে এবং নৃত্য চলে সমস্ত শরীরের সাহায্যে। বিশেষতঃ নৃত্যে রস ও ভাব সৃষ্টির জন্যে অঙ্গাভিনয়ই প্রধান। 'অভিনয়দর্পণে' সে কথা স্পষ্ট উল্লিখিত হয়েছে। মুখ দ্বারা সংগীত গীত হয়; হস্ত সঞ্চালনে সেই সংগীতের অর্থ, চোখের সাহায্যে তার ভাব, এবং পা-এর দ্বারা তার তালের প্রকাশ ঘটে। যেখানে হাত সেখানেই দৃষ্টি, যেখানে দৃষ্টি সেখানেই মন যেখানেই মন সেখানেই ভাব, আর যেখানে ভাব সেখানেই রসের উৎপত্তি।[1]

১. অভিনয় দর্পণ, নন্দিকেশর, (সম্পাদিত অশোকনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ১৯-২০, ৩২-৩৩ নং শ্লোক)।

সুতরাং সংগীত আলোচনার পূর্ণতা বিধানের জন্যে মানবাঙ্গের পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয়। ঘনশ্যাম-নরহরি তাঁর 'সংগীতসারসংগ্রহে'র চতুর্থ অধ্যায় 'আঙ্গিকাভিনয় প্রকরণে' এবং 'ভক্তিরত্নাকরে'র পঞ্চম তরঙ্গে নৃত্যালোচনার পরেই এই অঙ্গাদির বিবরণ প্রদান করেছেন। এই আলোচনায় তিনি শার্ঙ্গদেবের অভিমতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

মানবাঙ্গের পরিচয় দেওয়া হয়েছে তিন প্রকারে—অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গ নামে। তন্মধ্যে অঙ্গ ৭টি, প্রত্যঙ্গ ৯টি এবং উপাঙ্গ ১২টি। মতটি শার্ঙ্গদেবের। উভয় গ্রন্থেই তা উল্লিখিত হয়েছে।

অঙ্গ ৭টির নাম—শির (মস্তক), অংস (স্কন্ধ), বক্ষ, পার্শ্ব, হস্ত, কটি ও পদ। 'সংগীতসারসংগ্রহে' উদ্ধৃত শুভঙ্করের মতে দেখা যায়, অঙ্গ ৬টি—শির, হস্ত, হৃদয়, উদর, উদরের দুই পার্শ্ব ও কটি।

প্রত্যঙ্গ ৯টি। শার্ঙ্গদেব প্রদত্ত নাম—গ্রীবা, বাহু, অংস, মণিবন্ধ, পৃষ্ঠ, উদর, উরু, জঙ্ঘা ও হাঁটু। এ সম্পর্কে একটি ভিন্নমত 'সংগীতসারসংগ্রহে' উদ্ধৃত হয়েছে। এই মতে প্রত্যঙ্গ ১০টি—বাহু, অংস, মণিবন্ধ, উরু, জঙ্ঘা, জানু, কূর্পর (কনুই), হস্তাঙ্গুলি, চরণদ্বয় ও চরণাঙ্গুলি। মতটি সংগীতদামোদরের।[২]

শার্ঙ্গদেব প্রদত্ত উপাঙ্গ ১২টির নাম—মূর্ধা, দৃক (চক্ষু), তারা, ভ্রুকুটি, মুখ, নাসিকা, নিঃশ্বাস, চিবুক, জিহ্বা, গণ্ড, দন্ত, অধর ও মুখরাগ। 'সংগীত-সারসংগ্রহে' আরো ব্যক্ত হয়েছে যে, কোনো কোনো শাস্ত্রকার করতল, অঙ্গুলি ও করভ (মণিবন্ধ হতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্যন্ত)-কেও উপাঙ্গরূপে গ্রহণ করেছেন। কেউ বা হস্তদ্বয়ের ইন্দ্রিয় সঞ্চালনকর্ম, পদদ্বয়ের নিম্নাঙ্গ, গোড়ালি ও পাতার অঙ্গুলি, স্তনযুগল ও কটি-পার্শ্বস্থ স্থানগুলিকেও উপাঙ্গ বলেছেন। একদল পণ্ডিত নিম্নোক্ত ২৩টিকে উপাঙ্গরূপে উল্লেখ করেছেন—কেশ, স্তনযুগল, চুলের খোঁপা, ললাট, ভ্রু-যুগল, চক্ষু, নেত্রকোণ, দৃষ্টি, তারা, কর্ণ, গলদেশ (শঙ্খ), গণ্ডদেশ, হনু (গালের উপরিভাগ), নাসিকা, কপোল, ওষ্ঠ, নাসারন্ধ্র, জিহ্বা, চিবুক, মুখ, মুখ গহ্বর ও গ্রীবা।

এরপর নরহরি উভয় গ্রন্থেই অঙ্গ ৬টির আলোচনা করেছেন। প্রথমে শির

---

২. নন্দিকেশ্বরের 'অভিনয়দর্পণে' ৬ প্রকার প্রত্যঙ্গের উল্লেখ আছে : স্কন্ধদ্বয়, বাহুদ্বয়, পৃষ্ঠ, উদর, উরুদ্বয় ও জঙ্ঘাদ্বয়। কেউ কেউ মণিবন্ধদ্বয়, জানুদ্বয়, কূর্পরদ্বয় নামে আরও তিনটি প্রত্যঙ্গের কথা বলেন।

ব. বি. / ন. চ. (২) /৪১-১৪

বা মস্তক সম্পর্কে। মস্তক ১৪ প্রকারের। যেমন, ধূত, বিধূত, আধূত, অবধূত, কম্পিত, আকম্পিত, উদ্বাহিত, পরিবাহিত, অঞ্চিত, নিকুঞ্চিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, অধোমুখ ও লোলিত।

মস্তক সম্পর্কে 'সংগীতদামোদরে'র অভিমতটি 'ভক্তিরত্নাকরে' উদ্ধৃত হয় নি, 'সংগীতসারসংগ্রহে' তা কলিত হয়েছে। 'দামোদরে' ১৪ প্রকার মস্তকের যে তালিকা আছে তাতে নরহরি উল্লিখিত 'উদ্বাহিত' ও 'অধোমুখ' নাম দুটি নেই, আছে 'প্রকৃতি' ও 'অধোগত'। বাকী ১২টি নাম এক।

'ভক্তিরত্নাকরে' কেবলমাত্র 'ধূত'—মস্তকের লক্ষণ বলা হয়েছে। 'সংগীতসারসংগ্রহে' ১৪ প্রকারেরই পরিচয় আছে।

১। ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে বক্রভাবে কম্পিত শিরকে 'ধূত' বলে। নিষেধ, অনিচ্ছা, বিষাদ ও বিস্ময় প্রকাশে ধূতের প্রয়োগ।

২। শীতার্ত, জ্বরগ্রস্ত, ভীত, সদ্য মাদক দ্রব্য পানের অবস্থা বুঝাতে যে দ্রুত সঞ্চালিত শির, তাকে 'বিধূত' বলে।

৩। অহংকার, নিজাঙ্গ দর্শন, পার্শ্বস্থ বস্তু ও উর্দ্ধ নিরীক্ষণ, স্বয়ং সমর্থ ইত্যাদির সম্মতি জ্ঞাপনে একবার বক্রভাবে মস্তকের উর্দ্ধদিকে চালিত শির 'আধূত'।

৪। প্রকৃত অর্থনির্দেশ, আলাপ, গ্রহণ, বসে থাকা বা স্বল্পনিদ্রায় ও সংকেত বুঝাতে (মস্তক নীচের দিকে একবার আনয়ন) ব্যবহৃত শির 'অবধূত'।

৫। কোনও বিষয় জ্ঞানে, স্বীকারে, রাগে, তর্কে, শাসনে মস্তকের বহুবার দ্রুত নীচের দিকে সঞ্চালনের নাম 'কম্পিত' শির।

৬। সামনের বস্তু নির্দেশে ও মনের ভাব প্রকাশে 'কম্পিত' মস্তকের দ্বিগুণভাবে ধীরে ধীরে প্রয়োগকে 'আকম্পিত' শির বলে।

৭। 'আমি এ কাজে সমর্থ'—এই আত্মপ্রত্যয় প্রকাশে মস্তক একবার উধ্ব'দিকে সঞ্চালিত হলে তা 'উদ্বাহিত' শির।

৮। বিচার বিবেচনাকালে, বিস্ময়, ক্রোধ বা আনন্দ প্রকাশে, মৃদু হাস্যে, স্বীকৃতি জ্ঞাপনে মস্তকের মণ্ডলাকার ভাবে সঞ্চালনকে 'পরিবাহিত' বলা হয়।

৯। রোগ-চিন্তা, মোহ, মূর্ছা প্রভৃতিতে সেই সেই কাজের উপলব্ধিতে গ্রীবা কিছুটা পার্শ্বে নত করলে, সেই শিরকে 'অঞ্চিত' বলে।

১০। বিলাস, শৃঙ্গারক্রিয়া, অহংকার, কোনোও ভাব-বিশেষে (যেমন নায়িকা-ভাব), হর্ষ হেতু হাস্য ত্রাস প্রভৃতি, নায়ক সংসর্গে সন্তোষ হলেও নিষেধার্থ মস্তকাদি সঞ্চালনে, সম্ভ্রম, প্রতিরোধ প্রভৃতিতে বাহুর অগ্রভাগ উঠিয়ে গ্রীবাকর্ষণে শির 'নিকুঞ্চিত'।

১১। ক্রোধ, লজ্জা, পশ্চাৎ দর্শন, বিপরীত দিকে মুখ ফেরানোতে মস্তক 'পরাবৃত্ত'।

১২। চন্দ্র প্রভৃতি ঊর্ধ্বস্থিত বা আকাশচারী বস্তু দর্শনে ঊর্ধ্বমুখ হলে মস্তকের 'উৎক্ষিপ্ত' নাম হয়।

১৩। লজ্জা, দুঃখ, প্রণাম প্রভৃতিতে সম্পূর্ণভাবে মাথা নত করলে সেই মস্তককে 'অধোমুখ' বলে।

১৪। নিদ্রা, ঔষধ, অধ্যবসায় প্রভৃতিতে আবিষ্ট অবস্থা, মত্ততা, মূর্ছা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে মস্তক সঞ্চালনের নাম 'লোলিত'।

'সংগীতসারসংগ্রহে' নরহরি মস্তকের আরো এক প্রকার প্রকার-ভেদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। কেউ কেউ পাঁচ প্রকার মস্তকের নাম বলেছেন—

১। সম (সমান)-পার (প্রান্ত)-অতি-কিঞ্চিৎ-বক্র স্কন্ধযুক্ত শির,

২। আনতশির, ৩। উন্নত শির, ৪। পার্শ্বশির, ৫। ঊর্ধ্বমুখ শির।

নরহরি তন্মধ্যে সম-স্কন্ধ শিরের পরিচয় দিয়েছেন। পূজা, ধ্যান, জপ ও প্রভুসেবা প্রভৃতি কাজে বিকারহীন স্বভাবস্থির মস্তক 'সমস্কন্ধ'।

অংস (স্কন্ধ) আরেক অঙ্গ। স্কন্ধ ৫ প্রকার, একোচ্চ, কর্ণলগ্ন, উচ্ছ্রিত, স্রস্ত ও লোলিত।

মুষ্টি ও অস্ত্র প্রহারে স্কন্ধাভিনয়ের নাম 'একোচ্চ' (একদিক উচ্চতাযুক্ত),

আলিঙ্গনে ও শীতে 'কর্ণলগ্ন' (কানের কাছাকাছি হয়)।

হর্ষ-গর্বাদিতে 'উচ্ছ্রিত' (উন্নত)।

দুঃখে, পরিশ্রমে ও মত্ততায় 'স্রস্ত', (চ্যুত)।

মূর্চ্ছা, লম্পটের নর্তন, হাস্য ও হড়ুকাবাদ্যে 'লোলিত' (শ্লথ) স্কন্ধ হয়।

তৃতীয় অঙ্গ উর বা বক্ষ ঃ বক্ষ পাঁচ প্রকার—সম, আভুগ্ন, নির্ভুগ্ন প্রকম্পিত ও উদ্বাহিত। তন্মধ্যে 'ভক্তিরত্নাকরে' 'সম' এবং 'সংগীতসার-

সংগ্রহে' 'সম' ও 'আভুগ্ন' বক্ষের পরিচয় আছে। সৌষ্ঠবযুক্ত সকল প্রকার দোষশূন্য স্বভাবশান্ত বক্ষ হলো 'সম'। আনন্দ, লজ্জা, শীৎকার (অব্যক্ত ধ্বনি), শেলাঘাত, শোক, মূর্ছা, নিঃশংক, গৌরব, ব্যাধি ও দুঃখে নিম্ন-শিথিল বক্ষ 'আভুগ্ন' নামে অভিহিত।

চতুর্থ অঙ্গ পার্শ্ব: পার্শ্বাঙ্গও পাঁচ প্রকার—বিবর্তিত, অপসৃত, প্রসারিত, নত ও উন্নত। তন্মধ্যে একমাত্র বিবর্তিত-পার্শ্বাঙ্গের পরিচয় উভয় গ্রন্থেই সম-শ্লোকে প্রদত্ত। পার্শ্ব পরিবর্তনে ত্রিকের (মেরুদণ্ডের নিম্নাংশের) বিবর্তন হেতু বিবর্তিত সংজ্ঞা হয়।

পঞ্চমাঙ্গ হস্ত: নৃত্যভেদে হস্ত ৩ প্রকার—অসংযুত, সংযুত ও নৃত্যহস্ত। অভিনয় কর্মাদি একহস্তে সম্পাদিত হলে 'অসংযুত', দুই হস্তে সম্পাদিত হলে 'সংযুত', এবং অভিনয় বা নৃত্যকালে হস্তনির্দেশ না করে শুধু অঙ্গভঙ্গি করলে তা 'নৃত্যহস্ত' নামে পরিচিত।

'ভক্তিরত্নাকর' ও 'সংগীতসারসংগ্রহ' উভয় গ্রন্থেই নরহরি জানিয়েছেন যে, ভরত তিন প্রকার হস্ত-সঞ্চার বর্ণনা করে গেছেন, 'উত্তান', 'পার্শ্বগ' ও 'অধোমুখ'।

নরহরি আরো জানিয়েছেন যে, কোনো কোনো শাস্ত্রকারের মতে হস্ত ১৫ প্রকার। 'ভক্তিরত্নাকরে' সেগুলির নাম নেই, কিন্তু 'সংগীতসারসংগ্রহে' আছে: অধস্তল, পার্শ্বতল, অগ্রতস্তল, সুসম্মুখাতল, উর্দ্ধমুখ, অধোবদন, পরাঙ্‌মুখ, সম্মুখ, পার্শ্বতোমুখ, উধর্বগ, অধোগত, পার্শ্বগত, তিরোগত এবং সম্মুখাগত।

কেউ কেউ আরো পাঁচ প্রকার হস্তের কথা বলেছিলেন, নরহরি বাহুল্য বোধে তা উল্লেখ করেন নি।

(ক) অসংযুত হস্ত: ২৪ প্রকারের। উভয় গ্রন্থেই নামগুলি সম শ্লোকে উদ্ধৃত হয়েছে। যথা, পতাক, ত্রিপতাক, অর্ধচন্দ্র, কর্তরীমুখ, অরালমুষ্টি, শিখরমুখ, কপিত্থমুখ, খটকামুখ, শুকতুণ্ড, কাঙ্গুল, পদ্মকোষ, পল্লব, সূচিমুখ, সর্পশিরা, চতুর, মৃগশীর্ষক, হংসাস্য, হংসপক্ষ, ভ্রমর, মুকুল, উর্ণনাভ, সংদংশ, তাম্রচূড় ও কবি।

নরহরি আরো উল্লেখ করেছেন যে, কোনো কোনো শাস্ত্রকার উপধান, সিংহমুখ, কদম্ব ও নিকুঞ্জক—এই চারটিকে অসংযুত হস্তের নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, শুভঙ্করের 'সংগীতদামোদরে' ও 'হস্তমুক্তা-বলী'তে ৩০ প্রকার অসংযুত হস্তের নাম আছে। নরহরি প্রদত্ত ২৪টি নামের সঙ্গে এই গ্রন্থদ্বয়ের ২১টি নামের মিল আছে। নরহরি কথিত পল্লব, সূচীমুখ, ও কবি—এই তিনটি নাম উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে নেই, এবং অন্যান্য ৯টি নাম আছে—অলপদ্ম, মুষ্টিক, সূচ্যাস্য, কদম্ব, কৃষ্ণসার মুখ, ত্রোণিক, সিংহাস্য, অংকুশ ও তন্ত্রীমুখ।[৩]

নরহরি উভয়গ্রন্থেই সম শ্লোকে পতাক অসংযুত হস্তের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। 'পতাক' হলো সেই অসংযুত হস্তাভিনয়, যেখানে অঙ্গুষ্ঠ (বৃদ্ধাঙ্গুলি) বক্র এবং তর্জনীমূলাশ্রিত, অন্যান্য অঙ্গুলি সকল সরল ও সংযুক্ত থাকে। পতাকের প্রয়োগও সমশ্লোকে গ্রথিত।

'সংগীতসারসংগ্রহে' পতাক ছাড়া 'ত্রিপতাক' ও 'অর্ধচন্দ্র' সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনা আছে। অনামিকা অঙ্গুলি বক্র হলে ত্রিপতাক হয়। অন্যান্য অঙ্গুলিসমূহ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সঙ্গে ধনুকের মতো নত হয়ে অর্ধচন্দ্রের আকার ধারণ করলে 'অর্ধচন্দ্র' হয়। এ দুটির প্রয়োগবৃত্তান্ত এ গ্রন্থে ব্যক্ত হয়েছে। অন্যান্য অসংযুত হস্তাভিনয়গুলি আলোচিত হয় নি।

(খ) সংযুত হস্তাভিনয় ১৩ প্রকার। গ্রন্থকার সমশ্লোকে উভয় গ্রন্থেই নামগুলি জানিয়েছেন—অঞ্জলি, কপোত, কর্কট, স্বস্তিক, দোল, পুষ্পপুটোৎসঙ্গ, খটকা, বর্ধমানক, গজদন্ত, অবহিত্থ, নিষধ, মকর ও বর্ধমান।[৪]

এগুলির মধ্যে ভক্তিরত্নকরে কেবলমাত্র 'অঞ্জলি' এবং সংগীতসারসংগ্রহে অঞ্জলি ও কপোতের লক্ষণ বিবৃত হয়েছে। পতাক হস্তের তলদ্বয়ের সংযোগ-সাধনে 'অঞ্জলি' হয়। নমস্কারাদিতে অঞ্জলির ব্যবহার। দেবতাকে নমস্কারে তা মস্তকলগ্ন, গুরুজনকে নমস্কারে তা মুখমণ্ডল-লগ্ন, ব্রাহ্মণকে নমস্কারে তা হৃদয়লগ্ন হয়। অন্যান্যকে নমস্কারে কোনো নিয়ম নেই।

হস্তমূলের পার্শ্বের অগ্রভাগ সংলগ্ন হয়ে তুলাদণ্ডের পার্শ্বাংশের ন্যায় হলে

---

৩. সংগীতসারসংগ্রহ (নরহরি), স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সম্পাদিত, পৃঃ ১৬। পাদটীকা ১-এ সংগীতদামোদর ও হস্তমুক্তাবলীর নামগুলি শ্লোকবদ্ধভাবে কলিত হয়েছে।

৪. সংগীতদামোদর ও মুক্তাবলীতে বলা হয়েছে যে, সংযুত হস্তাভিনয়, ১৪টি; গজদন্ত, কপোত, বর্ধমান, অঞ্জলি, স্বস্তিক, নিষধ, মকর, দোল,—এই ৮টি (এগুলি নরহরিও বলেছেন); আর ৬টি নরহরি প্রদত্ত নামের সঙ্গে মেলে না—কর্কশ, উৎসঙ্গ, অহিত্থক, পুষ্পপুট, মরাল, খটকা-বর্ধমানক।

তাকে কপোত হস্ত বলে (কারো কারো মতে 'কূর্ম' হস্ত)। গুরুর আলাপনে, প্রণামে ও তাঁর প্রতি বিনয় প্রদর্শনে কপোতহস্ত সম্মুখবর্তী হয়। শীতে বা ভয়ে কম্পিত হলে এই হস্ত হৃদয়লগ্ন হয়। অন্যান্য হস্তের লক্ষণ বলা হয় নি।

(গ) **নৃত্যহস্ত** ৩০ প্রকার। তন্মধ্যে 'ভক্তিরত্নাকরে' 'চতুরস্র' ও 'উদ্বৃত্ত' এই দুটির নামমাত্র উল্লেখ আছে। 'সংগীতসারসংগ্রহে' প্রদত্ত ৩০টি নাম হলো—চতুরস্র, উদ্বৃত্ত, তলমুখ, স্বস্তিক, বিপ্রকীর্ণ, অবালখটকামুখ, আবিদ্ধ-বক্ত্র, সূচ্যাস্য, রেচিত, অর্ধরেচিত, নিতম্ব, পল্লব, কেশবন্ধ, উত্তানবঞ্চিত, লতাখ্য, করিহস্ত, পক্ষবঞ্চিতক, পক্ষ প্রদ্যোতক, দণ্ডপক্ষ, গরুড়পক্ষক, ঊর্ধ্ব-মণ্ডলিক, পার্শ্বমণ্ডলিন, উরোমণ্ডলিন, উরঃপার্শ্বার্ধমণ্ডল, মুষ্টিকস্বস্তিক, নলিনী-পদ্মকোশক, অলাপদ্ম, উল্বন, বলিত ও ললিত।

নরহরি আরো লিখেছেন যে, চতুরস্র নৃত্যহস্ত দু প্রকার, বরদা ও ভয়দা। কোনো কোনো অঙ্গাভিজ্ঞ আচার্যের মতে প্রাঙ্‌মুখ ও খটকামুখ (খটকাবক্ত্র) নামক দুটি চতুরস্র আছে।

ষষ্ঠ অঙ্গ কটি ঃ ৫ প্রকার। উভয় গ্রন্থেই সমশ্লোকে সেগুলি উল্লিখিত। যথা—কম্পিত, উদ্বাহিত, ছিন্ন, বিবৃত ও রেচিত। 'ভক্তিরত্নাকরে' একটির পরিচয় বলা হয় নি। 'সংগীতসারসংগ্রহে' একমাত্র 'কম্পিতে'র লক্ষণ প্রদত্ত হয়েছে।

দ্রুত গমনকালে কটি পার্শ্বে চালিত হলে তাকে 'কম্পিত' বলে। কুব্জব্যক্তি, বামন প্রভৃতির গমনাগমনে তা দেখা যায়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, শুভঙ্করের 'সংগীতদামোদরে' ৬ প্রকার কটির নাম পাই। নরহরি প্রদত্ত উক্ত ৫ প্রকারের সঙ্গে ৬ষ্ঠ কটির নাম 'সমচ্ছিন্ন'।

সপ্তমাঙ্গ পদ ঃ নৃত্য বিশেষজ্ঞদের মতে পদ ১৩ প্রকার—গ্রন্থকার উভয় গ্রন্থেই সমশ্লোকে তার তালিকা দিয়েছেন। যথা—সম, অঞ্চিত, কুঞ্চিত, সূচ্যগ্রতল-সঞ্চর, মদিত, উদঘাটিত, অগ্রগ, পার্শ্বগ, পার্ষ্ণিগ, তাড়িত, উদঘট্টিত, উচ্ছেদ ও উদঘাটিত।

স্বাভাবিকভাবে স্থিত পদদ্বয়কে 'সম' বলে। পদ সম্পর্কে আর কোনো আলোচনা গ্রন্থকার করেন নি।

অঙ্গের পর প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গের আলোচনা। এ আলোচনা নরহরি 'ভক্তিরত্নাকরে' করেন নি,[৫] করেছেন 'সংগীতসারসংগ্রহে'।

গ্রন্থকার পূর্বেই প্রত্যঙ্গ ৯টির নাম বলেছেন।[৬] এবারে এক একটির প্রকারভেদ উল্লেখ করে একমাত্র প্রথম প্রকারের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

১ম প্রত্যঙ্গ গ্রীবা ৯ প্রকার—সম, নিবৃত্ত, বলিত, রেচিত, কুঞ্চিত, অঞ্চিত, ত্র্যস্রা, নতা, উন্নতা। তন্মধ্যে মাত্র সমগ্রীবার লক্ষণ বলা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে ধ্যানে, জপে ও কর্মে সমগ্রীবা লক্ষিত হয়।

২য় প্রত্যঙ্গ বাহু। বাহু ১৬ প্রকার—উর্ধ্বাস্য, অধোমুখ, তির্যক, অপবিদ্ধ, প্রসারিত, অঞ্চিত, মণ্ডলগতি, স্বস্তিক, উদ্বেষ্টি, পৃষ্ঠানুসারী, সরল, আন্দোলিত, নম্র, কুঞ্চিত, আবিদ্ধ ও উৎসারিত। তন্মধ্যে 'উর্ধ্বাস্য বাহু'র লক্ষণে বলা হয়েছে যে, মস্তকের উর্ধ্বে চালিত বাহু চূড়াদর্শনে উর্ধ্বাস্য।

৩য় প্রত্যঙ্গ মণিবন্ধ ৫ প্রকার—নিকুঞ্চ, আকুঞ্চিত, চল, অসম ও ভ্রমিত। ধনদান, অভয়দান-কালে যে মণিবন্ধ বহির্দিকে নিম্নগত হয়, তা-ই 'নিকুঞ্চ'।

৪র্থ ও ৫ম প্রত্যঙ্গ যথাক্রমে পৃষ্ঠ ও উদর। পৃষ্ঠ উদরের সংলগ্ন অঙ্গ বলে গ্রন্থকার এদের একত্রে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে পৃষ্ঠের কোনো উপ-বিভাগের কথা নেই। উদর ৪ প্রকারের—ক্ষাম, খল্ল, পূর্ণ ও রিক্ত। হাস্য, ক্রন্দন ও নিঃশ্বাসে নিম্ন গমনহেতু জঠরের নাম 'ক্ষাম'। আর ক্ষুধার্ত বা ক্লান্ত অবস্থায় তালহীন ভ্রমর গুঞ্জনানুকরণে নিম্নগতি উদরকে 'খল্ল' বলে।

৬ষ্ঠ প্রত্যঙ্গ উরু ৫ প্রকার—কম্পিত, বলিত, স্তব্ধ, বর্তিত, বিবর্তিত। নীচশ্রেণীর ব্যক্তিদের গমনে পার্শ্বদ্বয় বার বার নত বা উন্নত হলে 'কম্পিত উরু' প্রকাশ পায়।

---

৫. এ সম্পর্কে কবির বক্তব্য

প্রত্যঙ্গ উপাঙ্গে অভিনয় যে প্রকার।
নৃত্যজ্ঞগণেতে তাহা করিল বিস্তার ॥
আর যে যে নাট্যক্রিয়া প্রচারিল ইথে।
সে সকল বিস্তারিয়া নারি জানাইতে ॥

(ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ২৮৭)

৬. প্রত্যঙ্গ ৯টি—গ্রীবা, বাহু, অংস, মণিবন্ধ, পৃষ্ঠ, উদর, উরু, জঙ্ঘা ও হাঁটু।

৭ম প্রত্যঙ্গ জঙ্ঘা ১০ প্রকারের—আবর্তিত, আনত, ক্ষিপ্ত, উদ্বাহিত, পরিবর্তিত, নিঃসৃত, পরাবৃত্ত, তিরশ্চিত, বহির্গত ও কম্পিত। তন্মধ্যে আবর্তিত জঙ্ঘা হলো—বিদূষকের বিচরণে পা বার বার দক্ষিণ থেকে বামে এবং বাম হতে দক্ষিণে করলে যে জঙ্ঘার প্রকাশ পায়।

সপ্তম প্রত্যঙ্গ জানু ৭ প্রকার—সংহত, কুঞ্চিত, অর্ধকুঞ্চিত, নত, উন্নত, বিবৃত ও সম। তন্মধ্যে 'সংহত'-জানু হলো রাগ, ঈর্ষা প্রভৃতিতে স্বাভাবিক জানু যদি অন্য প্রকার হয়।

উপাঙ্গ আলোচনায় নরহরি শার্ঙ্গদেব কথিত মস্তকের উপাঙ্গগুলিরই পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম 'দৃষ্টি'। দৃষ্টি ৩ প্রকার—স্থায়ী, রস ও ব্যাভিচারী। স্নিগ্ধ, হৃষ্ট, দীন, ক্রুদ্ধ, দীপ্ত, ভয়ান্বিত, জগুপ্সিত, বিস্মিত—এগুলি স্থায়ী দৃষ্টি—স্থায়ীভাব হতে জাত। গ্রন্থকার প্রতিটি স্থায়ী দৃষ্টির লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। যেমন

রতিভাব জাত বিলাসযুক্ত দৃষ্টি 'স্নিগ্ধ' (এখানে ভ্রু দুটির উর্ধ্বগতি হয়)।
হর্ষোৎফুল্ল ঈষৎ হাস্যযুক্ত অবস্থায় চক্ষুতারকার কিঞ্চিৎ কুঞ্চন ও চঞ্চলতা প্রকাশে দৃষ্টি 'হৃষ্ট'।
দৃষ্টি ঈষৎ শিথিল, তারকা উর্ধ্বপুটে অপ্রকাশিত অথচ নির্মলবাষ্পযুক্ত হলে 'দীনা' দৃষ্টি হয়।
স্থির, কক্ষগত, রুক্ষ, কিঞ্চিৎ চঞ্চলতারকাযুক্ত ভ্রুকুটি কুটিল দৃষ্টির নাম 'ক্রুদ্ধ'।
স্থির, উজ্জ্বল, ধৈর্য প্রকাশক ও উৎসাহযুক্ত দৃষ্টি 'দীপ্ত'।
চোখের মধ্যভাগ যেন বেরিয়ে আসছে এরূপ স্থির তারকাযুক্ত উভয় কক্ষ বিস্ফারিত দৃষ্টি 'ভয়ান্বিত'।
অস্পষ্ট দর্শনকারী, মুদিত তারকা, সংকুচিত কক্ষ এবং দৃশ্য দেখে অতি উদ্বিগ্ন দৃষ্টি 'জুগুপ্সিত'।
সম্মুখে বিস্ফারিত, উজ্জ্বল, স্থির, উদ্গত তারকাযুক্ত দৃষ্টি 'বিস্মিত'।

রস-দৃষ্টির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে গ্রন্থকার বলেছেন যে, স্থায়ী দৃষ্টিগুলিই স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হলে রসদৃষ্টি হয়। রসদৃষ্টি আট প্রকার—কান্ত (বা শান্ত), হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত।

কামবর্ধক, দর্শনীয় বস্তুকে যেন গ্রাস করছে এমন, পরিষ্কার, ভ্রুক্ষেপ ও কটাক্ষ যুক্ত দৃষ্টির নাম 'কান্ত'। (কটাক্ষ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, একটি

ভ্রু ঈষৎ উন্নত হলে অভিলাষযুক্ত কটাক্ষ দৃষ্টি হয়। গমনাগমন বিশ্রাম প্রভৃতির বৈচিত্র্য অনুসারে চক্ষুতারকার যে পরিবর্তন, তাকে কটাক্ষ বলে)।

ঈষৎ কুঞ্চিত চক্ষু-পুট, অন্যের তুলনায় উদ্ভাসিত মধ্যভাগযুক্ত, ভ্রান্ত, অন্তর্গত তারাযুক্ত দৃষ্টি 'হাস্য'।

করুণরসে ঊর্ধ্বপুট পতিত, ঈষৎ অশ্রুযুক্ত, শোককাতর তারকাযুক্ত নাসিকার অগ্রভাগে নিবদ্ধ দৃষ্টি 'করুণ'।

স্তব্ধ তারকাযুক্ত, স্তব্ধ উভয় পুটযুক্ত, রক্তাভ ভয়ংকর-ভ্রুকুটি যুক্ত, উগ্র, অতি-ধূসরবর্ণ দৃষ্টির নাম 'রৌদ্র'।

স্থির, উদ্ভাসিত, গম্ভীর, সমান তারকা বিশিষ্ট, তেজঃপ্রকাশক, উজ্জ্বল, সংকুচিত অপাঙ্গ বিশিষ্ট—এই সাত প্রকার বৈশিষ্ট্যযুক্ত দৃষ্টির নাম 'বীর' (বা বীররস দৃষ্টি)।

স্তব্ধ, উন্নত পুটযুগল, অতিচঞ্চল, উন্নততারকা যুক্ত, দর্শন-ভীত দৃষ্টির নাম 'ভয়ানক'।

যে দৃষ্টিতে ঈষৎ চঞ্চল পক্ষ যেন মিলিত প্রায়, তারকা পরিষ্কার, দর্শনে উদ্বেগজনিত অপাঙ্গ কুঞ্চিত ও পুটযুগল উন্নত হয়, তাকে 'বীভৎস' দৃষ্টি বলে।

ব্যাভিচারী দৃষ্টিগুলি শৃংগার প্রভৃতি রসে উদ্ভূত হয়। ব্যাভিচারী দৃষ্টি ২০ প্রকার—মলিন, শঙ্কিত, ম্লান, জিহ্ম, শূন্য, বিষণ্ণ, লজ্জিত, মুকুল, শ্রান্ত, অভিশপ্ত, কুঞ্চিত, আকেকর, বিকাশার্দ্ধ, মুকুল (২য় ?), বিতর্কিক, বিভ্রান্ত, বিপ্লুত, ত্রস্ত, ললিত ও মদির। নরহরি এগুলির মধ্যে প্রথম তিন প্রকারের লক্ষণ উল্লেখ করেছেন।

ঈষৎ উন্মীলিত পুট যুগলের অগ্রভাগ কম্পিত, ছায়াহীন অপাঙ্গযুক্ত দৃষ্টিকে 'মলিন' বা 'বিকৃত' বলে। প্রিয়জনের সঙ্গে নিরালাপে এই দৃষ্টি প্রযুক্ত হয়।

বারবার চঞ্চল, স্থির পার্শ্ববিশিষ্ট, নাসিকাগ্র নিবদ্ধ, বাইরের দিকে উন্নত মুখ, মূর্খের মতো দৃষ্টি, ভয়ে ভীত দৃষ্টিকে 'শঙ্কিত' বলে।

ভ্রু পক্ষ ও পুট যুগল শিথিল মলিন মৃদুচঞ্চল ও তারকাদ্বয় অন্তর্গত—এমন দৃষ্টিকে 'ম্লান' দৃষ্টি বলে।

উপাঙ্গ আলোচনার শেষে নরহরি সংগীতদামোদরের অনুসরণে নৃত্যাঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। নৃত্যাঙ্গ ৫ প্রকার—স্থানক, চারী, করণ, মণ্ডল ও অঙ্গহার। নৃত্যাঙ্গগুলিও প্রতিটি নানা প্রকারের হয়। নরহরি বাহুল্যভয়ে সেগুলির আলোচনা করেন নি ॥

(উ) **ভাষা**

'সংগীতসারসংগ্রহে'র পঞ্চম অধ্যায় 'ভাষানিরূপণ'। এই অধ্যায়ে গ্রন্থকার নরহরি চক্রবর্তী সংগীতের ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

মূল বা আদি ভাষা সংস্কৃত। সংস্কৃত 'দেবভাষা' নামে অভিহিত। তা থেকেই প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি। প্রাকৃত জনগণের মুখের ভাষা। কিন্তু সংস্কৃত নিত্যদিন ব্যবহারের ভাষা নয়।

গ্রন্থকার তাই ব্যবহারিক ভাষাকে দু-ভাগে বিভক্ত করেছেন—'তদ্ভব' ও 'তৎসম'। তিনি আরো জানিয়েছেন যে, 'দেশী' নামক তৃতীয় এক প্রকার ভাষা ভাষাবিদগণ স্বীকার করেছেন। এই তিন ভাষা 'সংগীতদামোদরে'র শ্লোক দ্বারা সমর্থিত ও আলোচিত হয়েছে।[১]

তদ্ভব ভাষার লক্ষণে বলা হয়েছে যে, তা সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত এবং সমজাতীয়ত্ব রক্ষা করেও তা অন্যরূপ প্রাপ্ত। উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, যেমন —শৃঙ্গারঃ > সিঙ্গারো, চন্দ্রঃ > চন্দো, ব্রহ্মণঃ > বমহণো, কণকং > কণঙ্গং, বনং > বণং, সিন্দুরং > সেন্দুরং, সেফালিকাঃ > সেহালিআ, স্বরতি > সুরহী, লক্ষ্মী > লচ্ছী।

তৎসম ভাষা হলো সংস্কৃত ভাষার সমান বা অনুরূপ বৈশিষ্ট্য রক্ষাকারী ভাষা। যেমন—তরল, তরঙ্গ, মন্দার, হর, হীর, হার, কীর, কেরল, রমণী, মণি প্রভৃতি।

শুধু প্রমাণবাক্য গ্রহণ নয়, এই দুই ভাষার অনুরূপ আলোচনা 'সংগীত-দামোদরে' দেখা যায়।[২]

দেশী ভাষা সম্পর্কে নরহরি বলেছেন যে, ভাষা নিয়মে (সংস্কৃত রীতিতে)

১. সংগীতদামোদরের অন্য পাঠ এইরূপ : ভাষা ৪ প্রকার—সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও পৈশাচিক।

২. 'সংগীতসারসংগ্রহে' গ্রন্থকার দামোদরের শ্লোকটি উদ্ধার করেছেন।

যা অপ্রসিদ্ধ (ব্যাকরণগত নয়), অথচ বিশেষ বিশেষ দেশে চলিত এবং মহাকবি কর্তৃক প্রযুক্ত, তাকে দেশী ভাষা বলে। এখানে ভোজদেব ও 'সংগীত-দামোদরে'র শ্লোক উদ্ধার করে দেশী ভাষার এই সংজ্ঞা নিরূপিত হয়েছে। উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, লড়হ, পেট্ট, চোক্য প্রভৃতি। গুজরাট প্রভৃতি দেশে অদ্বন্দ্ব, প্রেমবিছোলী, পড়িক্ক, কজ্জোট্ট, উৎপল ইত্যাদি দেশী ভাষা।

এরপর দেশী ভাষার বিভাগ আলোচিত হয়েছে। দেশী চার প্রকার—ভাষা, বিভাষা, অপভ্রংশ ও পৈশাচী। এগুলির মধ্যে ভাষা ও বিভাষা পৃথক পৃথক ভাবে ৫ প্রকার এবং অনুরূপভাবে অপভ্রংশ ও পৈশাচী ৩ প্রকার। সুতরাং দেশী ভাষা মোট ১৬ প্রকার।

কিন্তু ভাষা বিভাষাদির নামোল্লেখ কালে নরহরি ৮ প্রকার ভাষা, ৭ প্রকার বিভাষা, ২৭ প্রকার অপভ্রংশ এবং ১১ প্রকার পৈশাচীর নাম বলে গেছেন। যেমন ৮ প্রকার ভাষার নাম—মহারাষ্ট্রী, আবন্তী, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, বাহ্লীকী, মাগধী, প্রাচ্যা ও দাক্ষিণাত্য। ৭ প্রকার বিভাষার নাম—শকার, আভীর, চাণ্ডাল, শাবর, দ্রাবিড়, টাক্কী, উড্রজ এবং হোন। ২৭ প্রকার অপভ্রংশের নাম—ব্রাচড়, নাট, বৈদর্ভ, উপনাগর, নাগর, বার্বর, আবন্ত্য, পাঞ্চাল, টাক্ক, মালব, কৈকেয়, গৌড়, উড্র, দৈব, পাশ্চাত্ত্য, কাঞ্চ্য, দ্রাবিড়, গৌর্জ্জর, আভীর, মধ্যদেশীয়, সূক্ষ্মদেশীয়, পাণ্ড্য, কৌণ্ডল, সৈংহল, কালিঙ্গ্য, প্রাচ্য ও কার্ণাট। ১১ প্রকার পৈশাচীর নাম—কাঞ্চীদেশীয়, পাণ্ডেয়, পাঞ্চাল, গৌড়, মাগধ, ব্রাচড, দাক্ষিণাত্য, শৌরসেন, কৈকেয়, শাবর এবং দ্রাবিড়।

এরপর গ্রন্থকার প্রথমে কেন ৫ প্রকার ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, তার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। বলেছেন যে, মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, প্রাচ্যা, আবন্তী ও মাগধী—এই পাঁচ প্রকারকেই প্রকৃতপক্ষে ভাষা রূপে গ্রহণ করা হয়। এবং বাকি তিন প্রকার উক্ত পাঁচ প্রকার ভাষা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। মাগধীরই কথ্যভঙ্গী অর্ধমাগধী এবং দাক্ষিণাত্য ভাষা মাগধীরই সম লক্ষণ সম্পন্ন। এবং আবন্তীতে অন্তর্বর্তী রেফ্-এর 'ল' প্রাপ্তিমাত্র বাহ্লীকী ভাষার উৎপন্ন হয়।

তেমনি বিভাষাগুলির মধ্যে উড্রজ এবং হোন পৃথক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত নয়। কারণ উড্রজ (ঔড্র) শাবর (শাবরী) ভাষার লক্ষণ ও ভাব যুক্ত। লক্ষণীয় যে, গ্রন্থকার 'হোন' বিভাষা অপর কোন্ বিভাষার লক্ষণযুক্ত তা উল্লেখ করেন

নি। এবং এই প্রসঙ্গে টক্কদেশীয় বিভাষাকে দ্রাবিড়ী না বলে 'টাক্কী' বলার কারণ নির্দেশ করেছেন।

উল্লিখিত ২৭ প্রকার অপভ্রংশকে নরহরি স্বীকার করেন নি। তিনি নাগর, ব্রাচড় ও উপনাগর—এই তিনটিকে প্রধান ও উল্লেখযোগ্য অপভ্রংশ মনে করেছেন। বলেছেন যে, এই তিনটির মধ্যেই বা অন্য ২৪টির মধ্যে পারস্পরিক অন্তর্ভাব লক্ষ্য করা যায় এবং সাধারণভাবে এদের পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

তেমনিভাবে কৈকেয়, শৌরসেন ও পাঞ্চাল—এই তিনটিকেই গ্রন্থকার উল্লেখযোগ্য পৈশাচী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এবং বলেছেন যে, সাধারণভাবে বাকি ৮টির মধ্যে আদৌ পার্থক্য নেই। এই ভাবে নরহরি নিজের মতই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

পরিশেষে গ্রন্থকার ভাষা বিভাষাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং 'সকল ভাষার উপযোগী' মহারাষ্ট্রী সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছেন। আচার্য দণ্ডীর মতামত উদ্ধার করে মহারাষ্ট্রীর লক্ষণ নির্দেশ করেছেন।।

(উ) ছন্দ

নরহরি চক্রবর্তী তাঁর দুটি গ্রন্থে ছন্দতত্ত্ব আলোচনা করেছেন—(ক) 'সংগীত-সারসংগ্রহ'—ষষ্ঠ অধ্যায়, 'ছন্দঃপ্রকাশ প্রকরণ' ও (খ) 'ছন্দঃসমুদ্র' (খণ্ডিত পুথি)।

উভয় গ্রন্থের আলোচনা পদ্ধতি অনেকটা অভিন্ন। পার্থক্য হলো প্রথম গ্রন্থে কেবলমাত্র ছন্দের নিয়ম ও লক্ষণাদি সংস্কৃত ভাষায় বিবৃত হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত গ্রন্থে বাংলা পয়ারে প্রতিটি ছন্দের নিয়ম ও লক্ষণ সহ এক বা একাধিক উদাহরণ বিভিন্ন প্রাচীন পুস্তক থেকে সংকলিত হয়েছে। উভয় গ্রন্থ পাঠে বোঝা যায়, 'ছন্দঃসমুদ্রে'র আলোচনা 'সংগীতসারসংগ্রহ' অপেক্ষা ব্যাপকতর। পুথিটি খণ্ডিত বলে সেই বিস্তৃত আলোচনার পূর্ণরূপ পাবার উপায় নেই।

'ছন্দ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্পর্কে নরহরি 'ছন্দঃসমুদ্রে' বলেছেন

চাঁদ আহ্লাদনে ধাতু অসুন প্রকরণে।
'চন্দ আদেশ্চ ছ' উণাদিক সূত্রে ভণে।।

এই প্রকারে ছন্দঃ শব্দ সিদ্ধি হয়।
অতি আহ্লাদক ছন্দ সর্বশাস্ত্রে কয় ।।[১]

উভয় গ্রন্থেই বলা হয়েছে যে, বৈদিক (বৈদিকী) ও লৌকিক বা (লৌকিকী) ভেদে ছন্দ দু প্রকারের। কিন্তু এ দুয়ের ব্যবহার সম্পর্কে একমাত্র ছন্দ:সমুদ্রে গ্রন্থকার বলেছেন

বৈদিক প্রয়োগ গ্রন্থে বৈদিক বিস্তার ।।
পিঙ্গলাদি গ্রন্থে এ লৌকিক বিস্তারিল।
... ...
বহু লোকে প্রয়োগ লৌকিক এই হেতু।[২]

বেদের অন্যতম অঙ্গ 'ছন্দ'। তাতে বৈদিক ছন্দের নাম, লক্ষণ, মাত্রাদির পরিমাণ ও প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা আছে। পরবর্তীকালে সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত ছন্দের নাম লৌকিক। পিঙ্গল প্রমুখ ছান্দসিকদের গ্রন্থে লৌকিক ছন্দের লক্ষণাদি বিবৃত হয়েছ।

নরহরি ছন্দের প্রধান উপকরণকে বর্ণ ও মাত্রা রূপে অভিহিত করেছেন।

ছন্দ-মূল কাব্যে কীর্ত্যানন্দ পুরুষার্থ।
নিয়ম বিশিষ্ট বর্ণ ছন্দের এ অর্থ ।।
বর্ণ শব্দ অত্র মাত্রা বর্ণ সাধারণ।
বর্ণ মাত্রা ছন্দ ইথে অশেষ লক্ষণ ।।[৩]

যা শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনি, তা-ই দৃষ্টিগ্রাহ্য বর্ণ এবং তাকেই অক্ষর (Syllable) বলা হয়েছে। এই বর্ণ বা অক্ষর মাত্রার (কাল-দৈর্ঘ) আশ্রয়ে পরিমাপ করা হয়।

লঘু গুরুবিচার

নরহরি তাঁর উভয় গ্রন্থেই বর্ণসমূহের লঘু-গুরু বিচার করেছেন। তন্মধ্যে 'ছন্দঃসমুদ্রে'র আলোচনা ব্যাপক ও বিশদ।

১। এক মাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ লঘু বা হ্রস্ব,

২। দু মাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ গুরু বা দীর্ঘ,

---

১. ছন্দঃসমুদ্র, শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (৪), ৪৭১ গৌরাব্দ, হরিদাস দাস সংকলিত, পৃঃ ২০০০।

২-৩. ঐ, পৃঃ ২০০০।

৩। তিন মাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ প্লুত (যা গানে ব্যবহৃত হয়), এবং

৪। অর্ধ মাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ ব্যঞ্জন।

লঘু ও গুরু বর্ণের সাংকেতিক চিহ্ন যথাক্রমে 'ল' (✓ বা ı) এবং গ (—বা ऽ)

'ছন্দঃসমুদ্রে' নরহরি বলেছেন

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ।

অকারাদি ষোড়শেতে পঞ্চ লঘু লেহ।
একাদশ গুরু সংযোগাদি পদান্তেহ॥
এ দুই মিলিত ত্রয়োদশ গুরু হন।
পুন বিস্তারিয়ে ইহা সুদৃঢ় কারণ॥
দীর্ঘযুক্ত পরবর্ণ বিন্দুযুক্ত মানো।
পদান্তের লঘু বিকল্পেতে গুরু জানো॥
সে গুরু দ্বিমাত্র বক্র অন্যত্র এক মাত্রা।
লঘু ঋজু সংকেত কহয়ে গ্রন্থকর্তা॥[৪]

এ বিষয়ে নরহরি পিঙ্গল, বাণীভূষণ, বৃত্তরত্নাকর, ছন্দোকৌস্তভ, ছন্দোমঞ্জরী, ছন্দোদীপক, আগ্নেয়, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, বৃত্তরত্নমালা প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রের প্রমাণ বাক্য উদ্ধার করেছেন। অনুস্বারযুক্ত, দীর্ঘ, বিসর্গযুক্ত বর্ণ এবং সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্ণ গুরু হয়। পদের অন্তস্থিত লঘু বর্ণ বিকল্পে গুরু এবং গুরু বর্ণ বিকল্পে লঘু হয়ে থাকে (ছন্দের অনুরোধে)। প্র, হ্র শব্দের পূর্ববর্তী বর্ণ বিকল্পে হ্রস্ব বা লঘু হয়।

বিন্দুযুক্ত (বিসর্গানুস্বার) ই-কার বা হি, র, হ ব্যঞ্জন সংযুক্ত হলে গুরু হয়ে থাকে। দ্রুত পাঠকালে সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্ণ লঘু হিসেবে গৃহীত হয় এবং তাতে ছন্দোভঙ্গ দোষ হয় না। 'ছন্দঃসমুদ্র' গ্রন্থে এই সব নিয়মের ক্রমানুসারে উদাহরণ সজ্জিত হয়েছে। উদাহরণগুলি গীতগোবিন্দ, পিঙ্গল, কুমারসম্ভব, মাঘ ও দোহা থেকে গৃহীত।

বর্ণবৃত্তের গণ

এর পর নরহরি বর্ণবৃত্তের গণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

সংস্কৃত ছন্দের সঠিক পরিচয়ের একমাত্র উপায় গণ। লঘু বা গুরু বা লঘু

৪. ছন্দঃসমুদ্র, শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (৪) পৃঃ ২০০০।

গুরু মিলিয়ে তিন তিনটি বর্ণে এক একটি গণ হয়। গণ ৮টি— ম, য, র, স, ত, জ, ভ, ন। উভয় গ্রন্থেই নরহরি গণগুলির পরিচয় দিয়েছেন এবং ৭টি প্রাচীন প্রমাণবাক্য গ্রহণ করে তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ম—৩টি বর্ণই গুরু.........SSS	যথা, ধীঃ শ্রীঃ স্ত্রী।
য—আদি লঘু, মধ্য অন্ত্য গুরু......ISS	যথা, ব রা সা।
র—মধ্য লঘু, আদি অন্ত্য গুরু......SIS	যথা, কা গ হা।
স—অন্ত্য গুরু, আদি মধ্য লঘু... ...IIS	যথা, ব সু ধা।
ত—অন্ত্য লঘু, আদি মধ্য গুরু......SSI	যথা, সা চে ক।
জ—মধ্য গুরু, আদি অন্ত্য লঘু......SIS	যথা, ক দা স।
ভ—আদি গুরু, মধ্য অন্ত্য লঘু......SII	যথা, কি স্ব দ।
ন—৩টি লঘু........................III	যথা, ন হ স।

গণসমূহের উৎপত্তি, সত্বরজাদি গুণ, গণ ও ঋষি, জাতি, রস, বর্ণ, দেশ, লিঙ্গ, নেত্র, বাহন, গ্রহ, অধীশ্বরদেবতা, ফলাফল, পারস্পরিক শত্রুমিত্র সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় 'ছন্দঃসমুদ্রে' আলোচিত হয়েছে। 'সংগীতসারসংগ্রহে' গণগুলির দেবতা, শত্রুমিত্র সম্পর্ক ও ফলাফল মাত্র সংক্ষেপে বলা হয়েছে।

গণের উৎপত্তি সম্পর্কে গ্রন্থকার বৃত্তমুক্তাবলীর শ্লোক প্রমাণস্বরূপ উদ্ধার করে বলেছেন যে, চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি—শিবের এই ত্রিনেত্র থেকে তিন গুরুবর্ণ যুক্ত 'ম' -গণের উদ্ভব ঘটেছে। এবং ম থেকে য, য থেকে র, র থেকে স—এরূপে এক থেকে অন্য একটি গণের উৎপত্তি হয়।

মুক্তাবলীর বাক্য গ্রহণ করে নরহরি গণগুলির সত্ব রজ তামসাদি গুণের পরিচয় দিয়েছেন, র, স, ম, ন—এই ৪টি গণ রাজস এবং ভ, জ, ত, য—এই ৪টি গণ তামস গুণের অধিকারী।

বৃত্তমহাদধির মতানুসরণে নরহরি অষ্ট গণকে অষ্ট ঋষিরূপে পরিচায়িত করেছেন। ম য র স ত জ ভ ন—যথাক্রমে কশ্যপ, আত্রেয়, কুৎস, কৌশিক, বশিষ্ঠ, গৌতম, অঙ্গিরা ও ভৃগুসুত। মতটি মুক্তাবলীর একটি শ্লোক উদ্ধারে প্রতিষ্ঠিতও হয়েছে।

বৃত্তমহাদধি ও মুক্তাবলীর পর পর দুটি শ্লোক উদ্ধার করে গণ সমূহের জাতি নির্ণীত হয়েছে। ন, র, য—ব্রাহ্মণ, জ—ক্ষত্রিয়, ভ—বৈশ্য, স, ত, ম—শূদ্র।

---

৫. ছন্দঃসমুদ্র, শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (৪) পৃঃ ২০০০।

এই দুটি গ্রন্থেরই অপর এক একটি শ্লোকের সাহায্যে গণগুলির রস সম্পর্কে বলা হয়েছে, ম—রৌদ্র, য—করুণ, র—শৃঙ্গার, স—ভয়, ত—সাত্ত্বিক, জ—বীর, ভ—হাস্য এবং ন—গণ মোদক রস প্রকাশ করে।

মুক্তাবলীর অপর একটি শ্লোকের প্রমাণে ও বৃত্তমহাদধির মত গ্রহণ করে নরহরি গণের রক্তগৌরাদি বর্ণের পরিচয় দিয়েছেন। জ, র—রক্ত; ভ, য—গৌর; ম, ত—পীত; স—সিত এবং ন—নীল বর্ণের।

এই দুই গ্রন্থের সাহায্যেই গণসমূহের দেশ, লিঙ্গ, নেত্র, বাহন ইত্যাদি বিষয় কথিত হয়েছে। দেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে, ম—মগধ, ভ—যমুনে, স—সুরাষ্ট্র, র—অবন্তী, জ—কলিঙ্গ, য—কেকয়, ত—সিন্ধু, ন—সুমেরু রাজ্যের অধিপতি। লিঙ্গ সম্পর্কে বলা হয়েছে, ভ, জ—নারী, ম, স—নপুংসক, র, য, ত, ন—পুংলিঙ্গ। দিঙ্‌মুখ সম্পর্কে উক্ত হয়েছে, জ, ম, য এদের বদন পূর্ব, ভ—এর পশ্চিম, স, র—দক্ষিণ, ত—উত্তর এবং ন গণের মুখ সর্বদিকে। নেত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে, স গণের এক, ত গণের দুই এবং য, ভ, জ, র, ম, ন—এদের প্রত্যেকের তিনটি করে নয়ন। বাহন সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে, ম থেকে ন পর্যন্ত অষ্ট গণের যথাক্রমে আটটি বাহন—কমঠ (কচ্ছপ) মকর, রণ (রণতরী), মৃগ, বৃষ, তুরগ, শশক ও গজ।

বৃত্তমহাদধির শ্লোক উদ্ধৃত করে নরহরি গণের গ্রহ পরিচয় দিয়েছেন। ম থেকে ন পর্যন্ত ৮টি গণের গ্রহের নাম যথাক্রমে, কুজ (ভৌম), কবি (শুক্র), শনি, বুধ, রাহু, রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি।

গণসমূহের দেবতা সম্পর্কে নরহরি উভয় গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। 'সংগীতসারসংগ্রহে' একমাত্র পিঙ্গলের বাক্য উদ্ধৃত হয়েছে। 'ছন্দঃসমুদ্রে' পিঙ্গল ছাড়াও বাণীভূষণ, ত্রিতয়ার্ণ প্রস্তারের শ্লোক গৃহীত হয়েছে।

৮টি গণের দেবতার নাম যথাক্রমে—ভূমি, জল, শিখী, পবন, গগন, সূর্য, চন্দ্র ও ফণী। এই প্রসঙ্গে নরহরি ছন্দঃসমুদ্রে উল্লেখ করেছেন যে, কোনো কোনো গ্রন্থে 'স' ও 'ন' -গণের দেবতা 'বায়ু' ও 'ফণী' না বলে যথাক্রমে 'যম' ও 'ইন্দ্র' উল্লেখ করা হয়েছে।

গণগুলির ফলাফল সম্পর্কে স্ব-মত জানানোর সঙ্গে ছন্দঃসমুদ্রে পিঙ্গল, বাণীভূষণ, শ্রুতবোধ, সংগীতপারিজাত, বৃত্তরত্নাকর প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের

মতামত উল্লিখিত হয়েছে। 'সংগীতসারসংগ্রহে' এগুলির মধ্যে পিঙ্গল ও বৃত্তরত্নাকরের মত উদ্ধৃত হয়েছে।

'ছন্দঃসমুদ্রে'	'সংগীতসারসংগ্রহে'
ম গণ—ঋদ্ধি, কার্যসিদ্ধি	সম্পদ
য—সুখ	জয়লাভ
র—মৃত্যু	হত্যা
স—সহবাস-বিবাস	রাষ্ট্রবিনাশ
ত—শূন্যতা	অর্থহানি
জ—সন্তাপ	নির্বাসন
ভ—অমঙ্গলনাশ	কল্যাণ
ন—ঋদ্ধিবৃদ্ধি নাশ	যশ

উল্লেখ্য যে, পিঙ্গলের অভিমতের সঙ্গে 'ছন্দঃসমুদ্রে'র মতটির কোনো পার্থক্য নেই। সম্ভবতঃ নরহরি পিঙ্গলের অভিমতকেই ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এবং পিঙ্গলের সঙ্গে অন্যান্য গ্রন্থের মতের পার্থক্য নেই। উদ্ধৃত বৃত্তরত্নাকরের শ্লোকে র স ত জ-গণ চারটিকে অশুভ বলা হয়েছে। সেগুলির দ্বারা কাব্যের আরম্ভ কার্য নিষেধ করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, দৈবক্রমে যদি উক্ত দুষ্ট গণ দিয়েই কাব্যারম্ভ ঘটে থাকে, তাহলে অপর (ম ন ভ য) চারটি শুভ গণের সাহায্যে তা পরিশোধন করলে দোষ ক্ষয় হবে।

'সংগীতসারসংগ্রহে' গ্রন্থকার আরো জানিয়েছেন যে, 'জ' এবং 'ত' একই সঙ্গে অমঙ্গল সূচনা করে, তেমনি 'ত' এবং 'স' একত্রে বৃদ্ধিহানি ঘটায়।

গণগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে উভয় গ্রন্থে পিঙ্গল-বাক্য গ্রহণ করে বলা হয়েছে যে, 'ম' 'ন' মিত্র, 'ভ' 'য' ভৃত্য, 'জ' 'ত' উদাসীন এবং 'স' 'র' পরস্পর শত্রুরূপে পরিচিত। 'ছন্দঃসমুদ্রে' বাণীভূষণ ও বৃত্তরত্নাকরের শ্লোক উদ্ধার করে মতটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ গ্রন্থে এই সম্পর্ক-ব্যাপারে আরো বলা হয়েছে যে, দুটি গণে মোট ৬টি অক্ষর। মিত্রের সঙ্গে মিত্র সম্পর্কে সমৃদ্ধি ও সুমঙ্গল হয়,-মিত্র ভৃত্য সম্পর্কে কার্যসিদ্ধি ও যুদ্ধে জয়লাভ ঘটে, কিন্তু মিত্র ও উদাসীন মিলনে কার্যে বন্ধন ও শ্রী ক্ষয় হয়, এবং শত্রুমিত্র সম্পর্কে

ব. বি. / ন. চ. (২) /৪১-১৫

গোত্র-বান্ধবাদি পীড়িত হয়। ভৃত্য ভৃত্য সম্পর্কে শেষ জীবনে স্থবিরতা দেখা যায় (উত্তরকাল বৃদ্ধ), ভৃত্য উদাসীন সম্পর্কে ধননাশ হয়, ভৃত্য বৈরি মিলনে হাহাকার ও ক্রন্দন উৎপন্ন হয়, উদাসীন-মিত্রে কার্যে শৈথিল্য জন্মে, এবং উদাসীন-ভৃত্যে 'পরতন্ত্রাদি করয়'। উদাসীন-উদাসীনে কোনো ফলই হয় না, উদাসীন-শত্রুতে গোত্র বা নিকটাত্মীয় বৈরী হয় ও বলক্ষয় ঘটে, তবে সেই শত্রু পরে মিত্র হলে শূন্যফল দেখা যায় ; শত্রু-ভৃত্যে গৃহিণীনাশ, শত্রু-উদাসীনে ধননাশ, শত্রু-শত্রুতে নায়ক-নিপাত হয়। নরহরি এই ভাবে অষ্ট গণের ফলাফল নির্ণয় করেছেন এবং তা পিঙ্গল, বাণীভূষণ, বৃত্তরত্নাকরের শ্লোক উদ্ধারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বর্গ

বর্গ সম্পর্কে কোনো আলোচনা 'সংগীতসারসংগ্রহে' নেই। খণ্ডিত 'ছন্দঃসমুদ্রে' বর্গ, বর্গের জাতি, ফলাফল ও দেবতাফল ইত্যাদি দামোদর, ছন্দোদীপক ও পারিজাতের সাহায্যে আলোচিত হয়েছে।

বর্গ ৮টি—অ, ক, চ, ট, ত, প, য, শ (সংক্ষেত—অকুচুটুতুপুযশ)।

বর্গের জাতি হলো—অ-ক বিপ্র, চ-ট ক্ষত্রিয়, ত-প বৈশ্য এবং য-শ শূদ্র।

বর্গের ফল বলা হয়েছে, বিপ্র বর্গে চিরায়ু লাভ, ক্ষত্রিয়বর্গে দ্রবিণায়ু (বা দ্রবিণসখায়ু), বৈশ্যে শত (বা শতশত) পুত্রলাভ, এবং শূদ্রবর্গে নিশ্চিত মৃত্যু ঘটে।

বর্গ ৮টির দেবতার নাম বলা হয়েছে—যথাক্রমে, গুরু, ভার্গব, চন্দ্রমা, কুজ ও সূর্য, বুধ, শনি, রাহু এবং কেতু। এই নামগুলি উদ্ধৃত দামোদরের শ্লোকে আছে। কিন্তু উদ্ধৃত ছন্দোদীপক ও পারিজাতের শ্লোকে নাম পাই—যথাক্রমে, সোম, ভৌম, সৌম্য (বুধ), জীব, শুক্র, শনি, রবি ও রাহু। বিভিন্ন গ্রন্থের সতর্ক পাঠক নরহরি এই পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন—"নানা গ্রন্থ মতে বর্গ দেবঅন্য মানো"—এজন্যেই সাবধানে পৃথক পৃথক মতগুলি উদ্ধার করেছেন।

বর্গদেবতা ফল সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, গুরু ও ভার্গব ইষ্টার্থ প্রদান করে, চন্দ্রমা যশ বৃদ্ধি করে, কিন্তু কুজ ও সূর্য—এ দুই অনন্ত দুঃখ সৃষ্টি করে। বুধ শুভপ্রদ কিন্তু শনি রাজ্য বিনষ্ট করে, এবং রাহু ও কেতু সর্বনাশ সাধন

করে। তেমনি ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ১১শ স্থানের দুষ্ট বর্ণ মৃত্যু ঘটায়। কিন্তু একমাত্র জগন্নাথে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারলে চতুর্বর্গের ফল লাভ হয়। সংগীত-দামোদর, ছন্দোদীপক ও সংগীতপারিজাতের শ্লোক এই আলোচনায় প্রমাণ-স্বরূপ গৃহীত হয়েছে।

বর্ণ

অ-ক্ষ পর্যন্ত সকল বর্ণের লিঙ্গভেদ মহাদধি প্রভৃতি গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। এবং বর্গ আলোচনায় বর্ণের প্রায় সকল বিবরণই প্রদত্ত হয়েছে। গ্রন্থকার সে কথা জানিয়েই পৃথক পৃথক বর্ণের ফলাফল আলোচনা করেছেন।

হ জ ধ র ঘ ন খ ভ—এই আটটি দগ্ধ বর্ণ। কাব্যারম্ভে এগুলির প্রয়োগ করা উচিত নয়। কারণ হ জ ধ—এগুলি অ-হিতকারী, জীবন ও ধন নষ্ট করে। র—রাজরোষের সম্মুখীন করে। ঘ ন খ—দেহকষ্ট, রোগ জ্বালা ও ব্রণাদির উৎপত্তি ঘটায়। ভ—সর্বদা দূরদেশে ভ্রমণ করায়। উদ্ধৃত ছন্দঃকৌস্তভের শ্লোকে এই বিবরণের প্রকাশ ঘটেছে।

নরহরি উল্লেখ করেছেন যে, এ নিয়ে গ্রন্থকারেরা একমত নন, 'বহুগ্রন্থে বহু মত'। বৃত্তচন্দ্রিকার উদ্ধৃত শ্লোকে ঝ ঙ উ ভ ষ ট ঠ ড ণ থ ফ ব ম জ ন ইত্যাদিকে কাব্যারম্ভে অশুভ বলা হয় নি। আবার নরহরি বলেন যে, অগস্ত্যের মতে ট ঠ ঢ থ ঝ ষ হ ল ঙ ঞ ণ এবং প-বর্গ কাব্যাদিতে দুষ্ট ফল দেয়। তেমনি কাব্যান্তে য ব ল ঘ খ ত ভ পরিত্যজ্য।

এরপর গ্রন্থকার কাব্যারম্ভের পক্ষে শুভবর্ণের নামাদি বলেছেন। আদি পংক্তিতে বায়ুবীজ, দ্বিতীয়ে বহ্নিবীজ, তৃতীয়ে ভূমিবীজ, চতুর্থে বারিবীজ এবং অন্ত্যবর্ণস্থিত বর্ণ খ-বীজ এবং এই ভাবে কাব্য রচনা করা উচিৎ। যদিও "বায়ু ভ্রম, বহ্নি মৃত্যু, ভূমি লক্ষ্মী জানো। জলে সুখ, খ-ধনহানি—এ সত্য মানো ৷৷"

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার ন, হ, মে—এই তিন দুষ্ট বর্ণকে লক্ষ্মীনাশ যশনাশ ও সর্বনাশ হেতু পরিত্যাগ করার বিধি জ্ঞাপন করেছেন। এই সমস্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পারিজাতের দীর্ঘ বচন উদ্ধৃত হয়েছে।

'সংগীতসারসংগ্রহে' নরহরি বর্ণদোষ-ক্ষালনের কথাও বলেছেন। উদ্ধৃত পারিজাতের শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে যে, যদি বর্ণগুলি দ্বারা কোনোও দেব-

সম্পর্কিত কথা প্রকাশ পায়, কিংবা মানুষের ক্ষেত্রে সেগুলি মঙ্গল সূচনা করে, তাহলে সেই বর্ণগুলি দোষণীয় হয় না।

এই প্রসঙ্গে নরহরি গীতবর্ণনায় বর্ণদোষগুণের কথাও উল্লেখ করেছেন। উদগ্রাহে ন গ র, অন্তরায় স ত ল, আভোগে হ ট ক—এই নটি বর্ণ পরিত্যাজ্য। এবং উদগ্রাহ আভোগ ও অন্তরায় দ ভ ব গ্রহণ করাই বিধেয়। এ বক্তব্যের প্রমাণার্থে উভয় গ্রন্থে নরহরি সংগীতপারিজাতের শ্লোক উদ্ধার করেছেন।

গীত

এই প্রসঙ্গে ছন্দঃসমুদ্রে গীত-বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। ধাতু-মাতু যুক্ত গীত, গীতের উদগ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব, আভোগ—এই চার অংশ, চিত্রপদা, চিত্রকলা গীত, গীতদোষ ইত্যাদি সংগীতসার প্রভৃতি নানা প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণবাক্যের সাহায্যে এই আলোচনা।

কিন্তু গীত বিষয়টি আমরা বর্তমান অধ্যায়ে পূর্বেই আলোচনা করেছি। বিষয়টির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মাত্রার গণ

ছন্দঃসমুদ্রে নরহরি মাত্রার গণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

ট, ঠ, ড, ঢ, ণ—এই পাঁচটি মাত্রার গণ নামে অভিহিত। এবং গণগুলি যথাক্রমে ষড, পঞ্চ, চতুঃ, ত্রয় ও দ্বি (৬, ৫, ৪, ৩, ২) কলা বিশিষ্ট। গ্রন্থকার প্রতি গণের কলাগুলির ভেদ সম্পর্কে বলেছেন যে, ট-গণের ষট্ কলার ত্রয়োদশ ভেদ, ঠ-গণের পঞ্চকলার অষ্ট ভেদ, ড-গণের চার কলার পঞ্চ ভেদ, ঢ-গণের তিন কলার তিন রকম ভেদ, এবং ণ-গণের দুই কলার দুই প্রকার ভেদ আছে। পিঙ্গল ও বাণীভূষণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

পাদ-লক্ষণ

বৃত্ত ও জাতি

নরহরি উভয় গ্রন্থেই পাদ-লক্ষণ আলোচনা করেছেন। 'ছন্দঃসমুদ্রে' পাদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—'পদ্যের তুর্যাংশ পাদঃ'। উদ্ধৃত বৃত্তকৌস্তভের শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে, 'চতুর্থ পদ্যভাগস্তু পাদঃ' অর্থাৎ পদ্যের চতুর্থ ভাগকে

'পাদ' বলে। সাধারণতঃ পদ্যের চারটি 'পাদ'—সুতরাং পদ্যের চার ভাগের এক ভাগকে 'পাদ' বলা হয়। প্রসঙ্গতঃ গ্রন্থকার জানিয়েছেন যে, দুই পাদেও পদ্যপূর্তি দেখা যায়, গায়ত্রী তিন পাদ ও বৈতালী প্রভৃতি চার পাদ বিশিষ্ট।

উল্লেখ্য যে, নরহরি ছন্দঃসমুদ্রে যাকে 'পাদঃ' বলেছেন, 'সংগীতসার-সংগ্রহে' তাকেই 'চরণ' নামে অভিহিত করেছেন: 'যথা সমাপ্তি ভাগস্তু ছন্দসাং চরণো ভবেৎ' অর্থাৎ পদ্যের সমাপ্তি ভাগকে ছন্দের চরণ বলে। সংস্কৃত ছন্দ শাস্ত্রে অবশ্য পাদ ও চরণ সমার্থক শব্দ।

নরহরি ছন্দোমঞ্জরীর শ্লোক গ্রহণ করে বলেছেন যে, চার-পাদ বিশিষ্ট যে পদ্য, তা বৃত্ত ও জাতি ভেদে দ্বিবিধ। অক্ষর গণনা নিয়মে নিবদ্ধ পদ্যের নাম "বৃত্ত" এবং মাত্রার সংখ্যানুসারে রচিত পদ্যের নাম "জাতি"।

যতি

বৃত্তের বিভাগ আলোচনার পূর্বেই গ্রন্থকার তাঁর উভয় গ্রন্থেই 'যতি'র পরিচয় দিয়েছেন। 'জিহ্বা ৺ষ্ঠ বিশ্রামের স্থান—নাম যতি'। গ্রন্থকার আরো জানিয়েছেন যে, পণ্ডিতেরা যতিকে 'বিরাম', 'বিরতি', 'বিশ্রাম,' 'বিচ্ছেদ' প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করেছেন। শ্বেতমাণ্ডব্য প্রমুখ শ্রেষ্ঠ মুনিগণ যতিকে স্বীকার করেন নি। তবে উদ্ধৃত ভরতবাক্যে যতির সংজ্ঞার সঙ্গে এও বলা হয়েছে যে, যতি ভিন্ন কাব্য সুন্দরতর হতে পারে না। জয়দেব ও পিঙ্গল সংস্কৃতে যতি স্বীকার করে গেছেন।

ছন্দোমঞ্জরীর উদ্ধৃত শ্লোকে বলা হয়েছে, যতি ছন্দের সর্বত্র থাকে না। পদান্তে যতি থাকলে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়, পদমধ্যে থাকলে কাব্য শোভা নষ্ট হয়, কিন্তু তা যদি স্বরবিহিত সন্ধি সমন্বিত হয়, তবে তাতে উৎকর্ষ বৃদ্ধিই পায়। যেমন, 'কৃষ্ণঃ পুষ্ণাত্বতুলমহিমা মাং করুণয়া'। নরহরি উল্লেখ না করলেও ছন্দোমঞ্জরীর টীকাকার বলেছেন যে, এটি শিখরিণী বৃত্ত, 'পুষ্ণেতি' পর্যন্ত প্রথম যতি।[৬]

এই প্রসঙ্গে 'সংগীতসারসংগ্রহে' সম ও বিষম চরণের কথা উত্থাপিত

---

৬. ছন্দোমঞ্জরী, (গুরুনাথবিদ্যানিধি ভট্টাচার্য সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ১৯৫৬), প্রথম স্তবক ১৯নং শ্লোক। পৃঃ ১৩, টীকা অংশ দ্রঃ।

হয়েছে। যোড় স্বরযুক্ত চরণকে 'সম' ও বিজোড় স্বরযুক্ত চরণকে 'বিষম' বলে। 'ছন্দঃসমুদ্রে' উভয়বিধ চরণের যতিস্থান উদাহরণযোগে প্রদর্শিত হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ নরহরি তাঁর 'ছন্দঃসমুদ্রে' ০-১৬ পর্যন্ত সংখ্যাগুলির নিম্নোক্ত অর্থ উল্লেখ করেছেন। ০ = আকাশ, ১ = চন্দ্র, ২ = নেত্র, পক্ষ, ৩ = শিখি, গুণ, ৪ = বেদ, সমুদ্র (অব্ধি), যুগ, ৫ = শর, ভূত, ইন্দ্রিয় (করণ), ৬ = ঋতু, রস, গৃহবক্ত্র, ৭ = স্বর, মুনি, লোক, (সমুদ্র), ৮ = ভোগী, অঙ্গ, বসু, ৯ = রন্ধ্র, গ্রহ, ১০ = দিক (দিশা), ১১ = শিব, ১২ = সূর্য, ১৩ = বিশ্বদেবা, ১৪ = ভুবন, ১৫ = তিথি, ১৬ = নৃপ। ('সংগীতসারসংগ্রহে' ১৩, ১৫, ১৬-এর অর্থ বলা হয় নি)।

পদ্যের বৃত্ত

'ছন্দঃসমুদ্রে'র দ্বিতীয় তরঙ্গের প্রারম্ভেই গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে, ছন্দ প্রধানতঃ দু রকমের—বর্ণছন্দ ও আর্যাছন্দ।

বর্ণছন্দকেই বৃত্ত বলা হয়। পদ্যের বৃত্ত ত্রিবিধ—সম, অর্ধসম ও বিষম।

সমবৃত্তের লক্ষণ বলা হয়েছে, এই ছন্দের চারটি পাদই সমান অর্থাৎ বর্ণ, মাত্রা ও গণ সমান সমান। নরহরি সমবৃত্তের উদাহরণ এই প্রসঙ্গে দেন নি, ছন্দোমঞ্জরী ও বাণীভূষণে 'অনুষ্টুপ' প্রভৃতির নাম বলা হয়েছে। 'ছন্দঃসমুদ্রে' সমবৃত্তের অন্য নামও উল্লিখিত হয়েছে—"যুক্, অনোজ, যুগ্ম,—সম নাম সে নির্ধার"।

অর্ধসমবৃত্ত সম্পর্কে নরহরি বলেছেন, যে ছন্দের অর্ধেক অপর অর্ধেকের সমান অর্থাৎ চারটি পাদের মধ্যে ১ম-৩য় এবং ২য়-৪র্থ পাদ বর্ণ, মাত্রা ও গণের বিচারে সমান সমান। এই বৃত্তের পৃথক কোনো নাম বা উদাহরণ উল্লিখিত হয় নি। ছন্দোমঞ্জরীতে উদাহরণ আছে—'বিয়োগিণী' ('সুন্দরী') নামে।

বিষমবৃত্তের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, যে বৃত্তের চারটি পাদের প্রতিটিই অসমান অর্থাৎ যার চারটি চরণই চার প্রকার বর্ণ, মাত্রা, গণ বিশিষ্ট। ছন্দঃসমুদ্রে বিষম-বৃত্তের অন্যান্য নাম বলা হয়েছে—'অযুগ্ম, অযুক্, ওজ বিষম প্রচার'। এই আলোচনায় গ্রন্থকার ছন্দোমঞ্জরী, বৃত্তরত্নাকর ও ছন্দোদীপকের প্রমাণ বাক্য গ্রহণ করেছেন। কিন্তু নরহরির গ্রন্থে এবং ছন্দোমঞ্জরী বা বাণীভূষণে এই বৃত্তের উদাহরণ নেই।

সমবৃত্ত ছন্দের ক্রমবিকাশ

সমবৃত্তছন্দে এক অক্ষর বিশিষ্ট পাদ যেমন থাকে, তেমনি প্রতি পাদে এক এক অক্ষর বাড়িয়ে ছাব্বিশ অক্ষর পর্যন্ত বিস্তৃত পাদ সৃষ্টির রীতি আছে। 'ছন্দঃসমুদ্রে' উদ্ধৃত ছন্দোমঞ্জরীর ৪টি শ্লোকে জানানো হয়েছে যে, অক্ষরের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে সমবৃত্ত ছন্দের নাম নির্দেশিত হয়—যে ছন্দের প্রতিপাদে ১টি বর্ণ বা অক্ষর তাকে 'উক্থা', প্রতিপাদে ২টি করে থাকলে 'অত্যুক্থা,' ৩টি থাকলে 'মধ্যা', ৪টি থাকলে 'প্রতিষ্ঠা' এবং এই ভাবে ২৬টি অক্ষর পর্যন্ত ২৬ প্রকারের নাম। নরহরি তাঁর উভয় গ্রন্থেই নামগুলির তালিকা দিয়েছেন। তন্মধ্যে 'ছন্দঃসমুদ্রে' প্রথম পাঁচটিকে 'দিব্যেতর,' পরবর্তী ৭টিকে (৬-১২ পর্যন্ত) 'দিব্য' এবং শেষ ১৪টিকে (১৩-২৬) 'দিব্যমানুষ' নামে অভিহিত করেছেন।

দিব্যেতর (৫টি)ঃ উক্থা (১ অক্ষর), অত্যুক্থা (২ অক্ষর), মধ্যা (৩ অক্ষর), প্রতিষ্ঠা (৪ অক্ষর), সুপ্রতিষ্ঠা (৫ অক্ষর)।

দিব্য (৭টি)ঃ গায়ত্রী (৬ অক্ষর), উষ্ণিক (৭), অনুষ্টুপ (৮), বৃহতী (৯), পংক্তি (১০), ত্রিষ্টুপ (১১), জগতী (১২)।

দিব্য মানুষ (১৪টি)ঃ অতি জগতী (১৩ অক্ষর), শর্করী (১৪), অতিশর্করী (১৫) অষ্টি (১৬), অত্যষ্টি (১৭), ধৃতি (১৮), অতিধৃতি (১৯), কৃতি (২০) প্রকৃতি (২১), আকৃতি (২২), বিকৃতি (২৩), সংস্কৃতি (২৪), অতিকৃতি (২৫), এবং উৎকৃতি (২৬ অক্ষরযুক্ত)।

২৬ অক্ষরের উর্ধ্বে "চণ্ডবৃষ্টি" প্রভৃতি আরো কয়েকটি ছন্দের নাম করেছেন নরহরি :

কিন্তু ষড়বিংশতি উর্ধ্বে দণ্ডকে গমন।
চণ্ডবৃষ্টি আদি নাম অশেষ লক্ষণ।

(ছন্দঃসমুদ্র)

নরহরি তাঁর উভয় গ্রন্থে মোটামুটি একই পদ্ধতিতে ছন্দগুলির আলোচনা করেছেন। ছন্দোমঞ্জরী ও ছন্দঃকৌস্তভের আলোচনাপদ্ধতিও এই রকমই ছিল। অর্থাৎ বিশ্লেষণ প্রভৃতিতে নরহরি প্রাচীন ছান্দসিকদের সম্পূর্ণ অনুবর্তী। তবে নরহরির কৃতিত্ব এই যে, তিনিই প্রথম সংস্কৃত রীতির সর্ববিধ ছন্দের বিভাগ উপবিভাগগুলিরও আলোচনা করেছেন। তাঁর পূর্ববর্তী ছান্দসিকেরা

উপবিভাগগুলির দু-একটি করে আলোচনা করেছিলেন। যেমন, একাক্ষর যুক্ত উক্থা ছন্দের দুটি ভাগ—শ্রী ও মধু। ছন্দোমঞ্জরী প্রভৃতিতে মধু ছন্দের নাম পর্যন্ত নেই। কিংবা দুই অক্ষর যুক্ত স্ত্রী, মহী, সারু ও মধুচ্ছন্দা (বা মধু) নামক অত্যুক্থা রীতির মাত্র স্ত্রী উপবিভাগটির আলোচনা আছে ছন্দোমঞ্জরীতে। এমনি ভাবে দেখানো যায়, নরহরি পূর্ব কোনো ছন্দ গ্রন্থেই ছন্দের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নেই। নরহরির উভয় গ্রন্থ মিলে ছন্দের একটি পরিপূর্ণ পরিচয় লাভ করা সম্ভব।

নরহরির ছন্দ আলোচনার রীতিও সুন্দর, যা অন্য কোনো গ্রন্থে দেখা যায় না। যেমন প্রথমে তিনি ছন্দের প্রধান বিভাগের নাম বলেছেন। তার পরে একের পর এক তার উপবিভাগগুলির পরিচয় দিয়েছেন। ছন্দঃসমুদ্রে দেখি, তিনি ছন্দের সংজ্ঞাটি ভাষায় লিখেছেন। উদাহরণগুলি সংস্কৃত বা প্রাকৃত কাব্য থেকে সংকলন করেছেন। উদাহরণ একাধিক ভাবে সংকলিত হয়েছে। যেমন, "দ্ব্যক্ষরাত্যুক্থা—অথ স্ত্রী ছন্দঃ—দ্বিগুরু স্ত্রী, কাম-দ্বিনাম। যে ব্রজরমণিগণ সহে মগ্ন ঘনশ্যাম॥ রত্নাকরে—(৩।২) গৌ স্ত্রী। পিঙ্গলে—(২। ৩) দীহা বীহা কামো রামো। উদা.—গোপস্ত্রীণাং শ্রীত্বং কস্মাৎ॥ ১॥ গোপস্ত্রীশঃ। শ্রীশো যস্মাৎ॥ ২॥ প্রাকৃতে—জুঝ্‌ঝে তুঝছে॥ সুম্ভং দেউ॥"[৭]

(ক) **সমবৃত্ত ছন্দ**

১। **এক অক্ষরযুক্ত 'উক্থা'ঃ** দুটি ভাগ—শ্রী ও মধু। প্রতিচরণে এক অক্ষর গুরু হলে **'শ্রী'** এবং এক অক্ষর লঘু হলে **'মধু'** ছন্দ। যথাক্রমে উদাহরণ—'সী সো জঙ্গো' এবং 'মধু পিব'। মধু ছন্দের প্রসঙ্গ পিঙ্গল, ছন্দোমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থে নেই।

২। **দুই অক্ষরযুক্ত 'অত্যুক্থা'ঃ** চারটি ভাগ—প্রতিচরণে দুই অক্ষর গুরু হলে **'স্ত্রী'** (নামান্তর 'কাম'), যথা, 'গোপস্ত্রীনাং শ্রীত্বং কস্মাৎ'। প্রতিচরণের প্রথম অক্ষর লঘু, পরেরটি গুরু হলে **'মহী'** ছন্দ, যথা, 'সঙ্গ উমা রকৃখো তুমা'। প্রতি চরণের প্রথম অক্ষর গুরু ও পরেরটি লঘু হলে **'সারু'** ছন্দ, যথা, 'সম্ভু দেউ সুম্ভ দেউ'। দুটি অক্ষরই লঘু হলে **'মধু' বা 'মধুচ্ছন্দা'** ছন্দ যথা, 'হর হর মহ মল'। ছন্দোমঞ্জরীতে শেষোক্ত তিনটি ছন্দের আলোচনা নেই।

---

৭. ছন্দঃসমুদ্র, (গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, পৃঃ ২০১২)।

৩। **তিন অক্ষরযুক্ত 'মধ্যা'** ঃ এর আট ভাগ। প্রতি চরণে একটি করে 'ম' গণ (তিন গুরু) থাকলে **'নারী'**—গোবিন্দং বন্দেঽহম্। ত্যক্তাস্তঃ সন্দেহম্॥ প্রতি চরণে একটি করে 'য'-গণ (লঘু গুরু গুরু) থাকলে **'শশী'** —"ব্রজেন্দ্রাত্মজং তং। ভজে কঞ্জনেত্রম্"॥ প্রতি চরণে একটি করে 'র' গণ (গুরু লঘু গুরু) থাকলে **'মৃগী'**—"বেণুনা কর্ষিতা। মৃগ্যপি তৎপ্রিয়া॥" প্রতি চরণে একটি করে 'স' গণ (লঘু লঘু গুরু) থাকলে **'রমণ'**—"সসিণা রঅনী। পইণা তরুণী"॥ প্রতি চরণে একটি করে 'ত'-গণ (গুরু গুরু লঘু) থাকলে **'পাঞ্চাল'**—"সো দেউ সুক্খাই। সংহারি দুক্খাই॥" প্রতি চরণে একটি করে 'জ' গণ (লঘু গুরু লঘু) থাকলে **'মৃগেন্দ্র'**—"দুরন্ত বসন্ত। সুকন্ত দিগন্ত্'॥ প্রতি চরণে একটি করে 'ভ' গণ (গুরু লঘু লঘু) থাকলে **'মন্দর'**—"কৃষ্ণ কৃপালয়। মাং পরিপালয়"॥ প্রতি চরণে একটি করে 'ন' গণ (তিন লঘু অক্ষর) থাকলে **'কমল'**—"মদন দমন। রসিকরমণ"॥ এই ৮টি ছন্দের মধ্যে 'সংগীতসারসংগ্রহে' 'নারী' ও 'মৃগী'—নামক মাত্র দুটি ছন্দের পরিচয় আছে। ছন্দোমঞ্জরী প্রভৃতিতে এই দুটি ছাড়া অন্য ৬টি ছন্দের উল্লেখ পাই না।

৪। **চার অক্ষরযুক্ত 'প্রতিষ্ঠা'** ঃ মোট ১৬টি ভাগ। তন্মধ্যে 'কন্যা' ও 'সতী'—নামক মাত্র দুটির এবং 'ছন্দঃসমুদ্রে' এই দুটির সঙ্গে 'ধারি' ও 'নগানি' নামক আরো দুটির পরিচয় আছে। প্রথমোক্ত ছন্দ দুটির বিশ্লেষণ আছে ছন্দোমঞ্জরীতে। শেষোক্ত দুটির প্রসঙ্গ আছে বাণীভূষণ ও পিঙ্গলে। **'কন্যা'**—প্রতি চরণে একটি করে গ (গুরু অক্ষর) ও 'ম' গণ (তিন গুরু) মোট চারটি গুরু অক্ষর যেমন, "কান্ত্যা নাম্না। সাম্যং প্রাপ্তা॥" **'সতী'**---প্রতি-চরণের প্রথমে একটি ন-গণ (তিন লঘু) ও পরে এক গুরু অক্ষর। যেমন, "মধুরিপো। তব বচঃ"॥ **'ধারিঃ'**—প্রতিচরণের প্রথমে র-গণ (গুরু লঘু গুরু) ও পরে একটি লঘু অক্ষর। যথা, "দেব দেব কৃষ্ণদেব"। **'নগানি'**—প্রতি চরণের প্রথমে 'জ'-গণ (লঘু গুরু লঘু) পরে একটি গুরু অক্ষর। যথা, "জগৎ পেতে মহাপ্রভো।"

৫। **পাঁচ অক্ষর যুক্ত সুপ্রতিষ্ঠা** ঃ মোট ৩২টি ভাগ। 'ছন্দোঃসমুদ্রে'র এই অংশ, পত্র ১৮—মেলে নি। ১৭শ পত্রে এই ছন্দের 'পংক্তি'র পরিচয় ও 'প্রিয়া'র নামটি মাত্র আছে। 'সংগীতসারসংগ্রহে' এই দুটি আলোচিত

হয়েছে। ছন্দোমঞ্জরীতেও তাই। **'পংক্তি'**—প্রতি চরণের প্রথমে ভ গণ (গুরু লঘু গুরু) পরে দুটি গুরু অক্ষর। যথা, "সো মঝু কন্তা। দূর দিগন্তা"। নরহরি এর নামান্তর বলেছেন, **'হংস পংক্তি'**। (ভ গণ চরণ ছন্দ হংস পংক্তি নাম)। **'প্রিয়া'**—প্রতি চরণের প্রথমে স গণ (লঘু লঘু গুরু) ও পরে এক লঘু এক গুরু অক্ষর। 'ছন্দঃসমুদ্র' খণ্ডিত হওয়ায় এর উদাহরণটি মেলে নি। 'সংগীতসারসংগ্রহে' এর পরিচয় থাকলেও উদাহরণটি নেই। ছন্দোমঞ্জরীতে উদাহরণ আছে, "ব্রজ সুভ্রূবো বিলসৎ কলাঃ"।

৬। **ছ-অক্ষরযুক্ত 'গায়ত্রী'**: মোট ৬৪টি ভাগ। 'সংগীতসার-সংগ্রহে' তন্মধ্যে আছে ৪টি—সোমরাজী, শশিবদনা, তনুমধ্যা, বসুমতী। 'ছন্দঃসমুদ্রে' আছে ৭টি, তন্মধ্যে 'তনুমধ্যা'র নাম নেই। অপর চারটি হলো—জোহা, মন্থান, তিলকা ও দমনক। ছন্দোমঞ্জরীতে আছে ৪টি, 'সংগীতসার সংগ্রহে'র প্রথমোক্ত তিনটি ও নতুন বিদ্যুল্লেখা[১]। **'তনুমধ্যা'**—প্রতি চরণের প্রথমে ত গণ ও পরে য গণ (দুই গুরু দুই লঘু দুই গুরু অক্ষর)। 'সংগীতসারসংগ্রহে' এর উদাহরণ নেই। ছন্দোমঞ্জরী থেকে আমরা উদাহরণটি সংকলন করছি—"আত্মাং মম চিত্তে নিত্যং তনুমধ্যা"। **শশিবদনা**—প্রতি চরণের প্রথমে ন ও পরে য গণ (চার লঘু দুই গুরু অক্ষর)। যথা, "নয়ন অণন্দো তিহু অণ কংদো"। 'ছন্দঃসমুদ্রে' এর নামান্তর—'চউরংসা'। **সোমরাজি**—প্রতি চরণে দুটি করে য গণ (ল গগ ল গগ*) যথা, "ঘরে বিত্ত লগগা মহী তসৃস সগগা।" 'ছন্দঃসমুদ্রে' এর অপর নাম—'সংখনারী'। **বসুমতী**—প্রতি চরণের প্রথমে ত ও পরে স গণ (গ গ ল ল ল গ)। যথা, 'মাং পাহি কমলাক্ষ শ্রীশ নৃহরে'। **জোহা**—প্রতি চরণে দুটি করে র গণ (গ ল গ গ ল গ)। যথা, "কংস সংহারণা পকৃখি সংচারণা।" **মন্থান**—প্রতি পাদে দুটি করে 'ত' গণ (গ গ ল গ গ ল)। যেমন, "রাআ জহা লুব্ধ পণ্ডিঅ হো মুদ্ধ"। **তিলকা**—প্রতি পাদে দুটি করে স-গণ (ল ল গ ল ল গ)। যথা, "জয় কেশব গোকুলচন্দ্র হরে।" **দমনক**[১ক]—প্রতি

১. বিদ্যুল্লেখা, দুটি করে ম গণ (অর্থাৎ ৬টিই গুরু অক্ষর), ছন্দোমঞ্জরী ২।১২।

* ল=লঘু, গ=গুরুর সংকেত।

১ক. ছন্দঃসমুদ্রে এর অন্য নাম 'তিল্লু'।

পাদে দুটি করে ন-গণ (ছয় লঘু অক্ষর)। যথা, "কমল নঅনি অমিয় বঅণি।"

৭। **সাত অক্ষর যুক্ত 'উষ্ণিক'**ঃ মোট ১২৮টি ভাগ। তন্মধ্যে 'ছন্দঃসমুদ্রে' ৯টির এবং তারই ৪টির পরিচয়াদি আছে 'সংগীতসারসংগ্রহে'। **মধুমতী**—'ন-ন-গ চরণ ছন্দ মধুমতী নাম'। অর্থাৎ এর প্রতি চরণে প্রথম ৫টি লঘু ও শেষেরটি গুরু অক্ষর থাকে। যথা, "ব্যথিত মধুমতী মধুমথনমুদম॥" **কুমার ললিতা**—'কুমার ললিতা ছন্দ জ-স-গ চরণ।' অর্থাৎ এর প্রতি চরণে থাকে ল গ ল ল ল গ গ অক্ষর। যথা, "ত্বদীয় মুখ শোভা বিলোক বহু শোভা"॥ **মদলেখা**—'ম-স-গ- চরণ মদলেখা' অর্থাৎ এর প্রতি চরণের অক্ষর গ গ গ ল ল গ গ। যথা, "রঙ্গে বাহু বিরুগ্না দন্তীন্দ্রান্মদলেখা।" **চূড়ামণি**—"ত-ভ-গ- চরণ ছন্দ চূড়ামণি নাম"। অর্থাৎ এর প্রতি চরণে থাকে গ গ ল গ ল ল গ অক্ষর। যথা, "গোপেন্দ্রনন্দন হে গোবিন্দ কৃষ্ণ বিভো"। **হংসমালা**—'হংসমালা নাম ছন্দ স-র-গ চরণ'। অর্থাৎ এর প্রতি চরণের অক্ষর ল ল গ গ ল গ গ। যথা, "জয় গোবিন্দ বৃন্দা বিপিনাধীশ শৌরে।" **সমানিকা**—'র-জ-গ-চরণ ছন্দ সমানিকা হয়'। অর্থাৎ এর প্রতি চরণে থাকে গ ল গ ল গ ল গ। যথা, "কুঞ্জরা চলন্তআ পব্বআ পলন্তআ।" **সুবাসক**—প্রতি পাদে ন-ল-ভ (৪ল, গ, ২ল)। যথা, "জয় জয় কেশব কমল-দলেক্ষণ"। **শীর্ষরূপক**—প্রতি পাদে ম-ম-গ (৭টি গুরু অক্ষর থাকে)। যথা, "কৃষ্ণে চিত্তং স্থৈর্যং চেদ যস্যাঃ কিংস্যাত্তস্যা ভোঃ।" **করহংচি**—'ন-ল-জ চরণ করহংচি ছন্দনাম'। অর্থাৎ এর প্রতি পাদে থাকে ৫ল গ ল। যথা, "জিবউ জই এহু তিজউ গই দেহু।"

৮। **আট অক্ষর বিশিষ্ট 'অনুষ্টুপ'**ঃ মোট ভাগ ২৫৬। তন্মধ্যে 'ছন্দঃসমুদ্রে' ১৪টি এবং 'সংগীতসারসংগ্রহে' এগুলিরই ৯টির পরিচয় আছে। এগুলির ৮টি এবং 'গজপতি'[২] নামক অপর একটি পরিচয় আছে ছন্দোমঞ্জরীতে। পিঙ্গলে এই বৃত্তের অন্য একটি ছন্দের পরিচয় পাই—'মাণবকাক্রীড়িতক'[৩]। নরহরি আলোচিত ছন্দগুলির সূত্রাকারে পরিচয় হলো—**চিত্রপদা**—প্রতি পাদে ভ-ভ-গ-গ থাকে। যথা, "ভব্যমিতো মম ভূয়াৎ আশ্রিত এষ ইতি

২. ন-ভ-ল-গ—রবিসূতা পরিসরে ঃ বিহরতো দৃশি হরে। ছন্দোমঞ্জরী, গুরুনাথ বিদ্যানিধি পৃঃ ৩১।
৩. ভ-ত-ল-গ। পিঙ্গল ছন্দঃসূত্রম্, সীতানাথ সামাধ্যায়ি (১৯৩৫) পৃঃ ১২৮।

দ্রাক।" **বিদ্যুন্মালা**—ম-ম-গ-ন। যথা, "উ-মত্তা জোহা চুক্কস্তাঃ বিপকৃথা মজ্ঝে লুক্কস্তা।" **মাণবক**—ভ-ত-ল-গ। যথা, "চঞ্চলচূড়ং চপলৈর্বৎসকুলৈঃ কেলিপরম"। **হংসরুত**—ম-ন-গ-গ। "শ্রীরাধারমণ কৃষ্ণ শ্রীনন্দাত্মজ কিশোর।" অন্যান্য ছন্দগুলি হলো—প্রমাণিকা (জ-র-ল-গ), সমানিকা (গ-ল-র-জ), বিতার (জ-ত-গ-গ), নারাচক (ত-র-ল-গ), পদ্মমালা (র-র-গ-গ), সুচন্দ্রাভা (য-র-গ-ল), সুবিশালা (স-র-গ-ল), সিংহলেখা (র-জ-গ-গ), তুঙ্গা (ন-ন-গ-গ) এবং কমল (ন-ল-জ-গ)।

৯। **ন-অক্ষর বিশিষ্ট 'বৃহতী'** ঃ মোট ভাগ ৫১২। তন্মধ্যে 'ছন্দঃসমুদ্রে' ১৩টির এবং 'সংগীতসারসংগ্রহে' এগুলিরই ৪টির পরিচয় আছে। **হলমুখী**—র-ন-স- চরণ বৃত্ত নাম হলমুখী'। যথা, "সপ্রিয়া গমন সুখতো বিস্মৃত স্মৃতি রতিতরাম।" **ভুজগ শিশুসুতা**—'ন-ন-ম চরণ সর্ব বর্ণ অনুপাম। ভুজগ শিশু সুতা এ ছন্দ অনুপাম॥' যথা, 'শশিমুখি গগনে চন্দ্র স্তরিত গতি রহো যাতি।' **মণিমধ্যা**—('সংগীতসারসংগ্রহে' 'মণিমধ্য') ভ-স-ম চরণ মণিমধ্যা ছন্দ জানি। যথা, 'কালিয় ভোগাভোগ গতস্তন্মণি মধ্যস্ফীত-রুচা।' **ভুজগসঙ্গতা**—(সংগীতসারসংগ্রহে 'ভুজঙ্গসঙ্গতা') স-জ-র গ ণ। অন্যান্য, ভদ্রিকা (র-ণ-র), মহালক্ষ্মী (তিনটি র গণ), সারঙ্গিকা (ন-ল-গ-গ-স), পায়িত্তা (ম-ভ-স) এর নামান্তর কুসুমবতী, কমলা (ন-ন-ল-ল-গ), বিম্ব (ন-ল-জ-গ-গ), তোমর (স জ জ), রূপামালী (তিনটি ম গণ) ও কুসুমিতা (ন র র গণ)।

১০। **দশ অক্ষর বিশিষ্ট 'পংক্তি'** ঃ এর ভাগ ১০২৪টি। 'ছন্দঃসমুদ্র' খণ্ডিত হওয়ায় এই বিভাগ নির্দেশক সংখ্যাটি মেলে নি। 'সংগীতসার-সংগ্রহে' বর্ণছন্দের প্রভেদাদির যে ছক আছে (পৃঃ ১০৫), তা থেকে এটি জানা গিয়েছে। খণ্ডিত 'ছন্দঃসমুদ্রে' এই ছন্দের রুক্মবতী, সংযুতা, সারবতী ও সুষমা—এই চারটি বিভাগের পরিচয় মাত্র মিলেছে। 'সংগীতসার-সংগ্রহে' এই সঙ্গে মনোরমা, ত্বরিতগতি, মত্তা, ময়ূরসারিণী ও পণব—এই ৫টির নাম পাই। এ গ্রন্থে কোনো ছন্দেরই উদাহরণ সংযোজিত হয় নি। উদাহরণসহ আলোচনা আছে ছন্দোমঞ্জরী গ্রন্থে। **রুক্মবতী**—প্রতি চরণের ১০ অক্ষরে আছে ম-স-গণ ও একটি গুরু অক্ষর।[৪] নরহরি 'ছন্দঃসমুদ্রে'

৪. ছন্দটি অন্যত্র মেলে নি।

রুক্মবতীর অন্য দুটি নাম বলেছেন চম্পকমালা ও বিশালা। এর উদাহরণে আছে, "পূর্ণকলাবামুজ্জলাবেশঃ শারদ ইন্দু শোভত এবঃ।" **সংযুতা**—প্রতি চরণে স-জ-জ-গ। যথা, "তুহু জাহি সুন্দরি অপ্পণা পরিতেজ্জি দুজ্জন থপ্পনা।" **সারবতী**—প্রতিচরণে গ-ল-ল, ভ-ভ-গণ ও গ অক্ষর। যথা, "পুত্তপবিত্ত বহুত্ত-ধনা ভত্তি কুটুম্বিণি সুদ্ধমনা।" **সুষমা**—"গ-গ-ল-ল-ম-স পাদ ছন্দ এ সুষমা"। মনোরমা (ন-র-জ-গ) ত্বরিত গতি (ন-জ-ন-গ), মত্তা (ম-ভ-স-গ), ময়ূরসারিণী (র-জ-র-গ), পণব (ম-ন-য-গ)।[৫]

১১। **এগার অক্ষর বিশিষ্ট 'ত্রিষ্টুপ্'**ঃ 'সংগীতসারসংগ্রহে' ত্রিষ্টুপের ১৫টি বিভাগেব সংজ্ঞামাত্র আছে, কোনো উদাহরণ নেই। সূত্রাকারে সেগুলি হলো, ইন্দ্রবজ্রা (ত-ত-জ-গ-গ) উপেন্দ্রবজ্রা (জ-ত-জ-গ-গ), উপজাতি (ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রার চরণের মিশ্রণে গঠিত। বাণীভূষণের উদ্ধৃত শ্লোকে ১৪ প্রকার উপজাতির নাম জানানো হয়েছে যেমন, 'কীর্তি'—চার চরণের প্রথমটি উপেন্দ্রবজ্রার, পরের তিনটি ইন্দ্রবজ্রার; 'বাণী'—প্রথম, ৩য় ও ৪র্থ চরণ ইন্দ্রবজ্রার, ২য়টি উপেন্দ্রবজ্রার; 'বুদ্ধি'—প্রথম চরণ ইন্দ্রবজ্রার, পরের তিনটি উপেন্দ্রবজ্রার; অন্যান্য মালা, সালা, হংসী, মায়া, জায়া, বালা, আদ্রা, ভদ্রা, প্রেমা, বামা, ঋদ্ধি। পিঙ্গল-প্রদীপের উদ্ধৃত শ্লোকে বলা হয়েছে যে, বাতোর্মী ও শালিনী, কিংবা স্বাগতা ও রথোদ্ধতার মিশ্রণেও উপজাতি সৃষ্ট হয়; বাতোর্মী (ম-ভ-ত-গ-গ), শালিনী (ম-ত-ত-গ-গ), স্বাগতা (র-ণ-ভ-গ-গ), রথোদ্ধতা (র-ন-র-ল-গ), দোধক (ভ-ভ-ভ-গ-গ), সুমুখী (ন-জ-জ-ল-গ), ভ্রমর বিলাসিতা (ম-গ-ন-ন-গ), রচিতা (ন-ন-স-গ-গ), ভদ্রিকা (ন-ন-র-ল-গ), শ্যেণী (র-জ-র-ল-গ), অনুকূলা (ভ-ত-ন-গ-গ), মোটনক (ত-জ-জ-ল-গ)।[৬]

---

৫. অন্যান্য গ্রন্থে এই বৃত্তের আরো ৪টি ছন্দের নাম পাই—শুদ্ধবিরাট (ম স জ গ; ছন্দোমঞ্জরী ৬।৩৫, 'ছন্দঃকৌস্তুভ ২।৩৫, পিঙ্গল ৬।১০), উপস্থিতা (ত জ জ গ; মঞ্জরী ৬।৩৮, কৌস্তুভ পরিশিষ্ট ৯, পিঙ্গল ৬।১৫), দীপকমালা (ভ ম জ গ); হংসী (মঞ্জরী ৬।৪০, কৌস্তুভ পরিশিষ্ট ১৪)।

৬. এগুলি ছাড়াও ছন্দোমঞ্জরীতে আরো ১০টির নাম আছে—বৃত্তা (ন-ন-স-গ-গ), উপস্থিত (জ-স-ত-গ-গ), শিখণ্ডিক, উপচিত্র, কুপুরুষজনিতা, অনবসিতা, বিধ্বঙ্কমালা, সান্দ্রপ্রদ, দ্রুতা, ইন্দিরা (গুরুনাথ বিদ্যানিধি সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃঃ ৫১-৫৪)। পিঙ্গলছন্দঃসূত্রমে আরেকটি নাম 'বিলাসিনী' (জ-র-জ-গ-গ), সীতানাথ সামাধ্যায়ি সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃঃ ১৪১।

১২। **বারো অক্ষর বিশিষ্ট 'জগতী'ঃ** 'সংগীতসারসংগ্রহে' এই বৃত্তের মোট ১৯টির সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়েছে। বংশস্থবিল (জ-ত-জ-র গণ), ইন্দ্রবংশা (ত-ত-জ-র)। এ দুয়ের মিশ্রণে 'উপজাতি' ছন্দেরও সৃষ্টি হয়। দ্রুত বিলম্বিত (ন-ভ-ভ-র), ৪র্থ, ১০ম ও ১২শ অক্ষরে যতি পড়ে। জলোদ্ধতি-গতি (জ-স-জ-স)—প্রতি ৬ষ্ঠ অক্ষরে যতি পড়ে। মৌক্তিকদাম (চারটি জ গণ), তোটক (৪টি স-গণ), (স্রগ্বিনী (৪টি র গণ), ভুজঙ্গপ্রয়াত (৪টি য গণ), পুট (ন-ন-ম-য), কুসুমবিচিত্রা (ন-য-ন-য), তামরস (ন-জ-জ-য), মালতী (ন-জ-জ-র). মণিমালা (ত-য-ত-য), বিভাবরী (জ-র-জ-র), প্রিয়ম্বদা (ন-ভ-জ-র), ললিতা (ত-ভ-জ-র), উজ্জ্বলা (ন-ন-ভ-র), জলধরমালা (ম-ভ-স-স), নবমালিনী বা নবমালিকা (ন-জ-ভ-য)।[৭]

১৩। **তের অক্ষর বিশিষ্ট 'অতি জগতী'ঃ** 'সংগীতসারসংগ্রহে' এই বৃত্তের মোট ৯টি বিভাগের সংজ্ঞা আছে।[৮] প্রহর্ষিনী (ম-ন-জ-র-গ), ক্ষমা (ন-ন-ত-ত-গ), চণ্ডী (ন-ন-স-স-গ), গৌরী (ন-ন-ন-স-গ), মঞ্জুভাষিণী (স-জ-স-জ-গ, ছন্দোমঞ্জরীতে ২।১০২- এর নাম প্রবোধিতা), সন্ধিবর্ষিনী (জ-ত-স-জ-গ), চন্দ্রিকা (ন-ন-ত-ত-গ.), নন্দিনী (স-জ-স-স-গ, ছন্দোমঞ্জরীতে এর নাম কলহংস—২।১০১), মৃগেন্দ্রমুখ (ন-জ-জ-র-গ)।

১৪। **চৌদ্দ অক্ষর বিশিষ্ট 'শর্করী'ঃ** 'সংগীতসারসংগ্রহে' এই বৃত্তের ৬টির সংজ্ঞা আছে। অপরাজিতা (ন-ন-র-স-ল-গ), বসন্ততিলক (ত-ভ-জ-জ-ল-গ), প্রহরণকলিকা (ন-ন-ভ-ন-ল-গ), বাসন্তী (ম-ত-ন-ম-গ-গ), ইন্দুবদনা (ভ-জ-স-ন-গ-গ), নান্দীমুখ (ন-ন-ত-ত-গ-গ)।[৯]

১৫। **পনের অক্ষরযুক্ত 'অতিশর্করী'ঃ** নরহরি এই বৃত্তের ১২টি বিভাগের সংজ্ঞা দিয়েছেন। শশিকলা (পিঙ্গলছন্দঃসূত্রমে এর নাম চন্দ্রাবর্তা ৭।১১, পৃঃ ১৪৩, ন-ন-ন--ন-স) এর ৭ম ও ১৫শ অক্ষরে যতি পড়ে।

---

৭. ছন্দোমঞ্জরীতে আরো ১১টি (২।৬৫, ২।৭২-৭৩, ৭৫, ৮৬-৯১, ৯৩, ৯৪ নং) পিঙ্গলছন্দঃসূত্রমে ৪টি (৮।৫, ৭।৩৬, ৩৭, ৪৩ নং) এবং ছন্দঃকৌস্তুভে ২টি (২।৭৮, ৮৪ নং) জগতী ছন্দের নাম আছে।

৮. ছন্দোমঞ্জরীতে এই বৃত্তের অপর ৬টি ও ছন্দঃকৌস্তুভে এই ৬টি সহ আর ২টির নাম আছে।

৯. ছন্দোমঞ্জরীতে অপর ১৩টি ও ছন্দঃকৌস্তুভে ১টির নাম আছে।

স্রক (শশিকলারই ৬ষ্ঠ ও ৯ম অক্ষরে যতি পড়লে স্রক ছন্দ হয়)। মণিগুণনিকর (শশিকলারই ৮ম ও পরের ৭ম অক্ষরে যতি পড়লে এই ছন্দ হয়)। মালিনী (ন-ন-ম-য-য, ৮ম ও পরের ৭ম অক্ষরে যতি পড়ে)। প্রভদ্রক (ন-য-ভ-জ-র, ৭ম ও পরের ৮ম অক্ষরে যতি পড়ে)। অন্যান্য, মেলা, লীলাখেল, বিপিনতিলক, চন্দ্রলেখা, তূণক (র-জ-র-জ-র) মৃদঙ্গক, বৃষভ।[১০]

১৬। **ষোল অক্ষর বিশিষ্ট 'অষ্টি'**ঃ নরহরির গ্রন্থে এই বৃত্তের ৯টি বিভাগের পরিচয় আছে। চিত্র (গ-ল-র-জ-গ-ল-র-জ), পঞ্চচামর (জ-র-ল-গ-জ-র-ল-গ), চকিতা, মণিকল্পলতা, প্রবরললিত, বাণিনী, অচলধৃতি, অশ্বগতি, গরুড়রুত।[১১]

১৭। **সতের অক্ষর বিশিষ্ট 'অত্যষ্টি'**ঃ নরহরির গ্রন্থে এই বৃত্তের ৬টি বিভাগের নাম আছে। শিখরিণী (য-ম-ন-স-ভ-ল-গ, ৬ষ্ঠ পরের ১১শ অক্ষরে যতি), নর্দটক (ন-জ-ভ-জ-জ-ল-গ), কোকিলক, মন্দাক্রান্তা (অক্ষরসজ্জা দু রকমের, ম-ভ-ন-গ-গ-য-য এবং ম-ভ-ন-ত-ত-গ-গ ৪র্থ, পরের ৬ষ্ঠ ও পরের ৭ম অক্ষরে যতি। প্রথমোক্ত রীতি ছন্দোমঞ্জরী, ছন্দঃকৌস্তুভ এবং দ্বিতীয়োক্ত রীতি পিঙ্গল ছন্দঃসূত্রম সমর্থিত), হরিণী, মদবিলসিত।[১২]

১৮। **আঠার অক্ষর যুক্ত 'ধৃতি'**ঃ নরহরি এর ৫টি বিভাগের সংজ্ঞা দিয়েছেন। কুসুমলতাবেল্লিতা (ম-ত-ন-য-য-য, ৫ম, পরের ষষ্ঠ ও পরের ৭ম অক্ষরে যতি), লতা (ন-ন-র-র-র-র, ১০ম ও পরের ৮ম অক্ষরে যতি), তারকা, শার্দূলললিত, হরকুন্তন।[১৩]

১৯। **উনিশ অক্ষর যুক্ত 'অতিধৃতি'**ঃ নরহরি এই বৃত্তের মাত্র ৫টি বিভাগের নাম করেছেন। মেঘবিস্ফূর্জিতা (য-ম-ন, স-র-র-গ, ৬ষ্ঠ, পরের ৬ষ্ঠ, ও পরের ৭ম অক্ষরে যতি), শার্দূলবিক্রীড়িত (ম-স-জ, স-ত-ত-গ,—১২শ ও পরের ৭ম অক্ষরে যতি), ছায়া, ফুল্লদাম, বল্লকী।[১৪]

---

১০. ছন্দোমঞ্জরীতে অপর ৬টি ও কৌস্তুভে ১টির নাম পাই।

১১. এই বৃত্তের আর ৬টির নাম ছন্দোমঞ্জরী, ছন্দঃকৌস্তুভ ও পিঙ্গলছন্দঃসূত্রমে মেলে।

১২. অন্যত্র এই বৃত্তের অপর ৮টির নাম আছে।

১৩. অন্যত্র এই বৃত্তের আরো ১৬টির নাম আছে।

১৪. অন্যত্র এই বৃত্তের আরো ৬টির নাম আছে।

২০। **কুড়ি অক্ষর যুক্ত 'কৃতি' ঃ** নরহরি তাঁর গ্রন্থে কৃতি ছন্দের তিনটির নাম করেছেন। গীতিকা (স-জ-জ-ভ-র-স-ল-গ), বৃত্ত (র-জ-র-জ-র-জ, গ-ল) এবং শোভা (য-ম-ন-ন-ত-ত-গ-গ)।[১৫]

২১। **একুশ অক্ষর যুক্ত 'প্রকৃতি' ঃ** নরহরি এই ছন্দের দুটি বিভাগের, সংজ্ঞা দিয়েছেন। স্রগ্ধরা (ম-র-ভ-ন-য-য-য, প্রতি ৭ম অক্ষরের পরে যতি), সরসী (ন-জ-ভ-জ-জ-জ-র প্রথম ১১শ ও পরের ১২শ অক্ষরের পর যতি)। অন্যত্রও 'প্রকৃতি'র অন্য কোনো বিভাগের নাম নেই।

২২। **বাইশ অক্ষর যুক্ত 'আকৃতি' ঃ** নরহরি এই বৃত্তের ৪টি বিভাগের নাম করেছেন। হংসী (ম-ম-গ-গ ন-ন-ন-ন-গ-গ, ৮ম ও পরের ১৪শ অক্ষরে যতি), ভদ্রক (ভ-র-ন-র-ন-র-ন-গ, ১০ম ও পরের ১২শ অক্ষরের পর যতি), মদিরা ও মহাস্রগ্ধরা।

২৩। **তেইশ অক্ষর যুক্ত 'বিকৃতি' ঃ** এর দুটি ভাগের নাম উল্লিখিত। অদ্রিতনয়া (ন-জ-ভ-জ-ভ-জ -ভ-ল-গ), অশ্বচলিত।

২৪। **চব্বিশ অক্ষর যুক্ত 'সংস্কৃতি' ঃ** এর একটি মাত্র বিভাগ 'তন্বী'র নাম উল্লিখিত। এই ছন্দে ভ-ত-ন-স-ভ-ভ-ন-য গণ থাকে। ৫ম, পরের ৭ম ও পরের ১২শ অক্ষরে যতি পড়ে।

২৫। **পঁচিশ অক্ষর যুক্ত 'অতিকৃতি' ঃ** এর একটি বিভাগের নাম লিখিত হয়েছে, ক্রৌঞ্চপদা, ভ-ম-স-ভ, ৪টি ন-গণ গ। এর ৫ম, পরের ৮ম ও পরবর্তী ৭ম অক্ষরে যতি পড়ে।

২৬। **ছাব্বিশ অক্ষর যুক্ত 'উৎকৃতি' ঃ** এর দুটি বিভাগের কথা বলা হয়েছে। ভুজঙ্গবিজৃম্ভিত (ম-ম-ত-ন-ন-ন-র-স-ল-গ, প্রথম ৮ম, পরের ১১শ ও তৎপরবর্তী ৭ম অক্ষরে যতি)। অপবাহ (ম, ৬টি ন-গণ, স-গ-গ ; ৯ম, পরের ৬ষ্ঠ ও পরের ৫ম অক্ষরে যতি)।

সমবৃত্ত ছন্দের দণ্ডকবৃত্তিসমূহ ঃ 'সংগীতসারসংগ্রহে' এই বৃত্তির ৬টি নাম আছে। চন্দ্রবৃষ্টিপ্রপাত—২টি ন ও ৭টি র-গণ। উদাহরণ প্রদত্ত হয় নি। অন্যান্য দণ্ডকের নাম, প্রচিতক, অশোকপুষ্পমঞ্জরী, কুসুমস্তবক, অনঙ্গশেখর ও মত্তমাতঙ্গলীলাকর।

১৫. অন্যত্র এই বৃত্তের আরো ২টির নাম পাই।

(খ) **অর্ধসমবৃত্ত ছন্দ**

নরহরি অর্ধসমবৃত্তের ১০টি বিভাগের নাম করেছেন : উপচিত্র, বেগবতী, মালভারিণী, দ্রুতমধ্যা, কেতুমতী, আখ্যাণকী, বিপরীতাখ্যাণকী, অপরবক্র, পুষ্পিতাক্রা, যবমতী। তন্মধ্যে উপচিত্র সম্পর্কে বলেছেন, এই ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় চরণে স স স ল গ গণ, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে ভ ভ ভ গ গ গণ থাকে।

(গ) **বিষমবৃত্ত**

'সংগীতসারসংগ্রহে' তিন প্রকার বিষমবৃত্তের নাম আছে, উদ্‌গাতা (দু ভাগে সৌরভক ও ললিত), পদচতুরূর্দ্ধ, উপস্থিত-প্রচুপিত। উদ্‌গাতা সম্পর্কে নরহরি জানিয়েছেন যে, এই ছন্দের ৪টি চরণ। চরণে চরণে মিল নেই। প্রথম চরণে স জ স ল, দ্বিতীয়ে ন স জ গ, তৃতীয়ে ভ ন ভ গ এবং চতুর্থে স জ স জ গ গণ থাকে।

এরপর গ্রন্থকার **বক্ত্র প্রকরণ** আলোচনা করেছেন। যদি ৮ অক্ষরের অনুষ্টুপ ছন্দের ২য়, ৪র্থ পদে মগ, প্রতি পদের ৪র্থ অক্ষরের পর ১টি করে য-গণ যুক্ত হয় তাকে বক্ত্র ছন্দ বলে। বক্ত্র ছন্দের দু ভাগ, অর্ধসম ও বিষম। এ ছাড়া অন্যান্য বক্ত্র ছন্দের নাম, পথ্যা, বিপরীতপথ্যা, চপলা, যুগ্মবিপুলা, বিপুলা ইত্যাদি।

নরহরি জানিয়েছেন যে, মাত্রা ছন্দ, বৈতালী, উপচ্ছন্দসিক, আপাতলিকা, কলগীত প্রভৃতি আরো ৩১ প্রকার ছন্দ আছে। পরিশেষে তিনি 'গদ্য নির্ণয়' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে গদ্য ও পদ্যের পার্থক্য সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন। ছন্দোবদ্ধ পদকে পদ্য বলে। গদ্য হলো পদবিচ্ছেদরহিত, পদবিস্তৃত ও পদবর্ধিত। পদ্য তিন প্রকার, চূর্ণক, উৎকলিকাপ্রায় ও বৃত্তগন্ধি। কঠোরতাহীন স্বল্প সমাসযুক্ত ও বৈদর্ভী রীতিযুক্ত সহজবোধ্য গদ্য হলো চূর্ণক। কঠিন শব্দযুক্ত, দীর্ঘসমাসবহুল গদ্য উৎকলিকাপ্রায়। আবার কোনো ছন্দের কোনো অংশের সংগে সম্বন্ধযুক্ত গদ্যকে বৃত্তগন্ধি গদ্য বলে। নরহরি এগুলির উদাহরণ দেন নি॥

এই ভাবে দেখা যাচ্ছে নরহরি চক্রবর্তী কীর্তনের প্রত্যেকটি উপাদানের ব্যাকরণ ও ইতিহাস রচনা করেছেন। খেতুরী মহোৎসবে কীর্তনের যে পদ্ধতি

নবনবায়মানরূপে স্থষ্ট হয়েছিল, যা গোবিন্দদাস প্রমুখ কবিদের পদাবলী রচনায় প্রবৃত্ত করেছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে কীর্তনের ব্যাকরণ রচনার প্রয়োজনীয়তা ছিল। নইলে কীর্তন দিক্‌ভ্রান্ত হতো। নরহরি সেই ব্যাকরণ রচনা করে কীর্তনকে শুধু রক্ষাই করেন নি, তাকে আভিজাত্যের স্বর্ণশিখরে প্রতিষ্ঠাও করেছেন ॥

চার ॥ বৈষ্ণবজগৎ

(নরহরি চক্রবর্তীর গ্রন্থে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ)

নরহরি চক্রবর্তীর গ্রন্থে ঐতিহাসিক তথ্যের প্রচুর সমাবেশ ঘটেছে।[১] এ বিষয়ে তাঁর 'ভক্তিরত্নাকর', 'নরোত্তমবিলাস' ও 'সূচক' পদগুলি উল্লেখযোগ্য।

নরহরি বৈষ্ণব ভক্ত ও বৈষ্ণব কবি। তিনি বৈষ্ণব সমাজের ইতিহাস রচনাতেও ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থে নিম্নোক্ত দুটি যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে (ক) ষোড়শ শতাব্দীর শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্যদের জীবন ও সমকালীন ইতিহাস, (খ) চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ প্রমুখ মুখ্য বৈষ্ণব মহান্তদের জীবন ও সেকালীন ইতিহাস। এই দুই যুগের প্রধান প্রধান বৈষ্ণব কেন্দ্র, শ্রীপাট, মহোৎসব, ধর্ম, দর্শন এবং বৃন্দাবনের সঙ্গে গৌড়-বঙ্গ-উৎকলের বৈষ্ণব সমাজের ঘনিষ্ট সম্পর্ক, ভক্ত সমাবেশ ও দেশের রীতিনীতি সম্পর্কে বহু অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য তাঁর রচনায় পাওয়া যায়।

কিন্তু আধুনিক কালে নরহরি বর্ণিত ঐতিহাসিক তথ্যগুলির উপর অনেকেই নির্ভর করতে চান না। তার প্রধান কারণ হচ্ছে, নরহরি তাঁর সমকালীন ইতিহাস রচনা করেন নি। তাঁর জন্মের প্রায় দেড়-দুশো বছর আগেকার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। তাছাড়া তাঁর গ্রন্থে দৈববাণী, স্বপ্ন-দৃষ্ট ঘটনা ও অলৌকিক কাহিনীর বর্ণনা আছে। অনেক সময়ই তিনি এক অজ্ঞাত কুলশীল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখ দিয়ে প্রাচীন বিবরণ প্রদান করেছেন।

---

১. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য 'বাংলার বৈষ্ণব সমাজ সংগীত ও সাহিত্য', ডঃ শ্রীমতী বাসন্তী চৌধুরী, 'চৈতন্যোত্তর যুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণব', ডঃ মনীগোপাল গোস্বামী ॥

কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী উক্তিও আছে। এজন্যে কেউ কেউ তাঁর বর্ণিত ঘটনাবলীকে "কিংবদন্তী" হিসেবে গ্রহণ করতে চান।[২]

নরহরির গ্রন্থে যে এক বিরাট বৈষ্ণবসমাজের বহু বিচিত্র কাহিনী একত্রিত হয়েছে, এবং তিনি যে সর্বত্রই রচনাসংহতি সমানভাবে রক্ষা করতে পারেন নি, তা অবশ্য স্বীকার্য। ঘটনার পুনরাবৃত্তি, প্রসঙ্গের বাহুল্য, অলৌকিক-অতিলৌকিক ঘটনার বর্ণনা, স্বপ্ন ও দৈববাণীর ছড়াছড়ি তাঁর কাব্যে অবশ্যই দুর্লভ নয়। কিন্তু তাই বলে তাঁর বর্ণিত তথ্যগুলির কোনোরকম ঐতিহাসিক মূল্য নেই, একথাও বিচারের অপেক্ষা রাখে। এই প্রসঙ্গে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের একটি উক্তি অনুধাবনযোগ্য

> নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকর রত্নাকর সদৃশই বিরাট এবং রত্নাকরের গর্ভে যে রূপ নানা মূল্যবান ও মূল্যহীন দ্রব্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে, এই পুস্তকেও সেইরূপ নানা মূল্যবান ও মূল্যহীন কথার একত্র সমাবেশ হওয়ায় ইহার সার উদ্ধারে বিশেষ অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হইবে; সন্দেহ নাই। সমস্ত পুথি আলোডন না করিলে ইহা হইতে কোনো প্রয়োজনীয় বিষয় জানাব উপায় নাই; ভক্তিরত্নাকর পাঠারম্ভ ও নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ একইরূপ ব্যাপার।[৩]

নরহরি বর্ণিত ঘটনাগুলির ঐতিহাসিকতা অবশ্যই সাবধানতার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু তাঁর আলোচ্য সব তথ্যই অনৈতিহাসিক বা অবাস্তর বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। কারণ নরহরি প্রতিভার এমন কয়েকটি দিক আছে, যা উন্নত শ্রেণীর ঐতিহাসিকের মধ্যেই বিদ্যমান। যেমন

এক। নরহরি তাঁর আলোচ্য বিষয়গুলির উপর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ভরযোগ্য প্রমাণ উদ্ধার করেছেন। নরহরি সেকালেই বুঝেছিলেন যে, বর্ণিত ঘটনার স্থান ও কালের যে ব্যক্তি যতটা নিকটবর্তী, তাঁর রচনার ঐতিহাসিক নির্ভরতাও তত বেশি। নরহরি তাঁর বর্ণিত ঘটনার সমসাময়িক বা নিকটতর কালের কবির রচনা প্রমাণস্বরূপ উদ্ধার করেছেন। বৈষ্ণব মহান্তদের চরিত্র প্রকাশে সেই সব মহান্তদের সাক্ষাৎ শিষ্য, অনুগৃহীত ব্যক্তি বা তাঁর

২. ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, (২য় সং, ১৯৫৯), পৃঃ ৪৮৭-৪৮৮।
৩. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, (৮ম সং), পৃঃ ২১৮।

শাখাভুক্ত কোনো কবির শ্লোক গৃহীত হয়েছে। দু-একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বিশদ করা যেতে পারে

(ক) কিশোর শ্রীনিবাস মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্যে নীলাচলে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি মহাপ্রভুর তিরোধান-সংবাদ পেয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। মহাপ্রভু তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে সান্ত্বনা দান করলেন, 'ভক্তিরত্নাকরে'র তৃতীয় তরঙ্গে বিবৃত এই ঘটনাটির স্বপক্ষে তিনি প্রমাণ উদ্ধার করেছেন শ্রীনিবাসেরই সাক্ষাৎ শিষ্য নৃসিংহ কবিরাজের "নবপদ্য" থেকে। আমরা পাশা-পাশি এই দুই রচনা উদ্ধার করছি

নরহরির বর্ণনা	নৃসিংহ কবিরাজের শ্লোক (ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত)
মনের আনন্দে শ্রীনিবাসের গমন।	গন্তুং শ্রীপুরুষোত্তমং কৃতমতিঃ শ্রীশ্রীনিবাসঃ
কতদূরে শুনিল চৈতন্য সঙ্গোপন ॥···	প্রভোশ্চৈতন্য কৃপাম্বুধের্জন মুখাচ্ছ্রুত্বা
মূর্ছিত হইয়া ভূমে পড়ে বার বার।	তিরোধানতাম্।
নেত্রধারা দেখি প্রাণ বিদরে সবার ॥···	দুঃখৈঃ যৈঃ স মুহুর্মূর্চ্ছ ভগবান দৃষ্টাথ
প্রভু ইচ্ছা মতে হৈল নিদ্রা আকর্ষণ।	ভক্তব্যথামাশ্বাসাতিশয়ং দয়ামভিবদন্ স্বপ্নে
স্বপ্নচ্ছলে গৌরচন্দ্র দিলেন দর্শন ॥···	সমাদিষ্টবান ॥
শ্রীনিবাস মস্তকে শ্রীচরণ অর্পিল।	(ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ৬৪-৬৫)
প্রেমাবেশে প্রভু অতিশয় আশ্বাসিল ॥	

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শ্রীনিবাস সম্পর্কে বর্ণিত ঘটনার স্বপ্নদর্শনটিও নরহরির স্বসৃষ্ট নয়, নৃসিংহ কবিরাজের রচনা।

(খ) নিত্যানন্দের পিতা হাড়াই পণ্ডিতের অপর নাম মুকুন্দ—এই নামেও তিনি বিশেষ পরিচিত—'ভক্তিরত্নাকরে'র দ্বাদশ তরঙ্গে (পৃঃ ৬০৬-৬০৭) এই তথ্যটি পরিবেশন করতে গিয়ে নরহরি পর পর দুটি প্রমাণ উদ্ধার করেছেন

তথাহি শ্রীদেবকীনন্দনকৃত শ্রীমদ্বৈষ্ণবাভিধানে

তথাচ শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াম্।

এঁদের মধ্যে দেবকীনন্দন ছিলেন নিত্যানন্দ পার্ষদ শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শিষ্য,

এবং গৌরগণোদ্দেশদীপিকার রচয়িতা কবি কর্ণপূর ছিলেন চৈতন্ত পার্ষদ শিবানন্দ সেনের পুত্র, নিত্যানন্দের সমকালীন ব্যক্তি। নরহরি ইচ্ছা করলেই এই তথ্যটির প্রমাণ অন্যান্য বহুমান্য বৈষ্ণব চরিতকারদের গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। কারণ তিনি বুঝেছিলেন, নিত্যানন্দের সমকালীন ও তাঁর অল্প পরবর্তী দুই লেখকের রচনা উদ্ধার করলেই, আলোচ্য বিষয় অধিক নির্ভরযোগ্য হবে।

তেমনি অভিরাম ঠাকুরের চরিত্র ব্যাখ্যানে তাঁরই শিষ্যশাখা বেদগর্ভ আচার্যের শ্লোক (ভক্তি পৃঃ, ৭৯), দামোদর সেনের চরিত্র প্রকাশে তাঁরই পৌত্র গোবিন্দদাস কবিরাজের 'সঙ্গীতমাধবে'র শ্লোক (ভক্তি, পৃঃ ১১), লোকনাথ চরিত্রের জন্যে তাঁরই বন্ধুপ্রতিম সনাতন গোস্বামীর রচনাংশ (ভক্তি, পৃঃ ১৫), সন্তোষ দত্তের মহিমা প্রচারে তাঁর সমকালীন কবি গোবিন্দ দাসের 'সঙ্গীতমাধবে'র উক্তি, সনাতন-রূপ গোস্বামীর পূর্ব-পুরুষ ও গ্রন্থাদির তালিকায় তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীবের বাক্য (ভক্তি, পৃঃ ২৪-২৫, ৩৬-৪০),রঘুনাথ দাসের চরিত্র প্রকাশে তাঁরই সঙ্গী শ্রীজীবের রচনা (ভক্তি, পৃঃ ৩৫-৩৬), এবং শ্যামানন্দের জীবনী বর্ণনায় তাঁরই অন্যতম প্রধান শিষ্য রসিকানন্দের 'শ্যামানন্দশতকে'র শ্লোক (ভক্তি, পৃঃ ১৭) গৃহীত হয়েছে।

দুই। কোনো কোনো বিষয়ে নরহরি তাঁর পূর্বসূরীদের মধ্যে মতপার্থক্যও লক্ষ্য করেছেন। এরূপ স্থলে তিনি নিজে কোনো রকম মন্তব্য না করে, বা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে, সেই সব মতপার্থক্য উদ্ধার করেছেন। যেমন, ভক্তিরত্নাকরে (পৃঃ ১৬) শ্যামানন্দের বিবরণীতে তাঁর জন্মস্থানাদি বিষয়ে নরহরি লিখেছেন

দণ্ডেশ্বর গ্রামে বাস সর্বাংশে প্রবল।
মাতা দুরিকা পিতা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল॥…
ধারেন্দা বাহাদুর পুরেতে পূর্বস্থিতি।
শিষ্ট লোক কহে শ্যামানন্দ জন্ম তথি॥
কোনো মতে মণ্ডলের নাহি প্রতিবন্ধ।
পুত্র কন্যা গত হৈল হৈল শ্যামানন্দ॥

তেমনি পূর্বসূরীদের কোনো বিষয়ে দু-একটি তথ্য কম থাকলে তা নরহরির দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। তিনি আপন গ্রন্থে সেই বিষয়টির বর্ণনায় সেই

অনুল্লেখ্য তথ্যটি যো[illegible] করেও দিয়েছেন। যেমন, গোপালভট্টের বিবরণীতে (ভক্তি, পৃঃ ৬)

> সংক্ষেপে কহিয়ে এথা ভট্ট বিবরণ।
> শ্রীগোপালভট্ট হন ব্যেঙ্কট নন্দন॥
> চৈতন্যচন্দ্রের চারু দক্ষিণ ভ্রমণ।
> চৈতন্যচরিতামৃতে বিশেষ বর্ণন॥
> গোপালভট্টের নাম অব্যক্ত তথায়।
> ব্যেঙ্কট ভট্টের বংশ ঐছে ব্যক্ত তায়॥

এরপরই নরহরি 'চৈতন্যচরিতামৃত' থেকে দুটি শ্লোক (মধ্যখণ্ড, ৯ম। ৮২-৮৩) উদ্ধার করে লিখেছেন

> অন্যত্র ব্যক্ত গোপাল ব্যেঙ্কট তনয়।
> প্রভু পাদোদক পানে হৈল প্রেমোদয়॥

তিন। নরহরি যে কত বড় ইতিহাস-চেতন কবি ছিলেন তার উদাহরণ 'ভক্তিরত্নাকর'-এ সংকলিত পত্র ৫টি। তন্মধ্যে ৪টি শ্রীজীবের লেখা—২টি শ্রীনিবাসকে, ১টি গোবিন্দদাসকে এবং ১টি সমবেতভাবে নরোত্তম-রামচন্দ্র-গোবিন্দদাসকে। অপর পত্রটি বীরচন্দ্রের লেখা—শ্রীনিবাসকে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন না হলে, ইতিহাস সম্পর্কে গভীর কৌতূহল না থাকলে, কেউ এমন করে প্রাচীন পত্র সংগ্রহ ও সংকলন করেন না। তাছাড়া আরো একটি কথা স্মরণীয়। সেকালে গৌড় বৃন্দাবনের বৈষ্ণবসমাজে যে প্রচুর পত্রালাপ হয়েছিল, তা ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস, কর্ণানন্দ, নরোত্তম-বিলাস পাঠ মাত্রেই বোঝা যায়। কিন্তু নবহরি সেই সব অসংখ্য পত্রের মধ্যে এমন ৫টি পত্রের প্রতিলিপি প্রদান করেছেন, যেগুলি বৈষ্ণবধর্ম ও সমাজের ইতিহাসে নতুন আলোকপাত করেছে। এগুলি থেকে গৌড় বৃন্দাবনের ঘনিষ্ট সম্পর্কই বোঝা যায় না, সেই সঙ্গে শ্রীজীবের সাথে শ্রীনিবাসের ব্যক্তিগত সম্পর্ক, শ্রীনিবাস-পুত্র বৃন্দাবন দাসের বয়স নির্ণয়, বৈষ্ণব ধর্মাদর্শ, সেকালের অধ্যয়ন অধ্যাপনা, রামচন্দ্র-নরোত্তম-গোবিন্দদাসের সহাবস্থান ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় জানতে পারা যায়।

চার। এই সঙ্গে আরও একটি তথ্য লক্ষণীয়। নরহরি দেখিয়েছিলেন, একই নামের একাধিক কবি থাকলে, পরবর্তীকালে তাঁদের পদগুলি মিলেমিশে

একাকার হয়ে যায়। কিন্তু সেটা কখনোই কাম্য নয়। এজন্তে তিনি একই নামের একাধিক কবির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য দেখাতে চেষ্টা করেছেন। যেমন, 'ভক্তিরত্নাকরে' তিনি নরহরি সরকারের 'গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে' পদটি সংকলন করেছেন (পৃঃ-৫৭৪)। কিন্তু তাঁর নিজের নামও নরহরি। পাছে অন্তেরা বা পরবর্তীকালের পাঠকেরা সরকার ঠাকুরের পদটি তাঁর রচনা বলে ভুল না করেন, সেজন্তে পদটির নীচে তিনি একটি টীকা জুড়ে দিলেন, "শ্রীনরহরি সরকার ঠককুরস্য গীতমিদম্"। তেমনি যদুনন্দন ভণিতার "গৌরাঙ্গ চরিত আজু কি পেখলু মাই"[৪] (ভক্তি, পৃঃ ৫৬৪) পদটি উদ্ধার করতে গিয়ে আগে ভাগেই তিনি জানিয়ে দেন যে, এই যদুনন্দন দাসগদাধর ঠাকুরের শিষ্য যদুনন্দন চক্রবর্তী।

পাঁচ। নরহরি পরিশ্রমী ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রাচীন বৈষ্ণব-ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। সুতরাং এ হেন কাজের তথ্য সংগ্রহে তাঁর পরিশ্রমের অন্ত ছিল না। তাঁর ইতিহাস রচনার উৎস ছিল মোটামুটি ৩টি, (ক) প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্রাদি, (খ) প্রাচীন বৈষ্ণব ও (গ) লোকমুখে প্রচারিত ও প্রচলিত কিংবদন্তী,আখ্যান উপাখ্যান ইত্যাদি। প্রাচীন বৈষ্ণবশাস্ত্র যে তিনি উত্তমরূপেই সংগ্রহ করেছিলেন, তার প্রমাণ আছে তাঁর গ্রন্থে প্রমাণ উদ্ধারে ব্যবহৃত গ্রন্থগুলির নাম তালিকায়।[৫] বলাই বাহুল্য যে, এই সংগ্রহ কাজে বেরিয়ে তিনি এমন কিছু কিছু গ্রন্থ লাভ করেছিলেন, যে-গুলি পরবর্তীকালেও পাওয়া যায় নি। অর্থাৎ তাঁর কাব্যে এমন কিছু গ্রন্থের নাম ও শ্লোকাদি পাওয়া যায়, যেগুলির কোনো শ্লোক অন্যত্র গৃহীত হয় নি ; এবং অদ্যাপি সেগুলি আবিষ্কৃত হয় নি। এমন গ্রন্থের নাম, গোবিন্দদাস কবিরাজের 'সংগীতমাধব', নৃসিংহ কবিরাজের 'নবপদ্য', স্বরূপ দামোদরের কড়চা এবং রূপকবি, বেদগর্ভ আচার্য ও শ্রীজীব-শিষ্য কৃষ্ণদাস অধিকারী প্রমুখ কবিদের বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের শ্লোক।

নরহরি গৌড়-বৃন্দাবনের তীর্থ পরিক্রমাকালে বিভিন্ন লোকজনের সঙ্গে মিলিত ও পরিচিত হয়েছিলেন। প্রাচীন ভক্ত, বৈষ্ণব ও পণ্ডিতদের সাহায্য

৪. লক্ষণীয় যে, পদটি পদকল্পতরুতে (১৯৪৬ নং) ভণিতাহীন।

৫. দ্রঃ এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, 'বিদ্যাচর্চা ও শাস্ত্রানুশীলন' অংশ, পৃঃ ৩০-৩৫।

পেয়েছিলেন। তবে অনেক সময়ই তিনি কাহিনী বা তথ্য সংগ্রহ করলেও কে কখন কোন্ কাহিনী বলেছিলেন, তা মনে রাখবার বা পাঠকদের জানাবার দরকার বোধ করেন নি। (বলাবাহুল্য সেকালে এই ভাবে নামোল্লেখ রীতি অজ্ঞাত ছিল। মনে রাখতে হবে সেকালের মানুষের মনে ও জনসমাজে আধুনিক ইতিহাস-বোধ ছিল না। তবে সেকালের তুলনায় নরহরির ঐতিহাসিক সংস্কার ভালোই ছিল)। তিনি একালের ঐতিহাসিকের মতোই ঘুরে ঘুরে প্রাচীন গ্রন্থ, চিঠিপত্র ও পদাবলী সংগ্রহ করেছিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন বৃদ্ধ বৈষ্ণবের পদতলে বসে বৈষ্ণব ভক্তদেব নামের তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। এই সমস্ত কারণে নরহরি বর্ণিত তথ্যের ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকাব না করে উপায় নেই।

নরহরির গ্রন্থাবলী থেকে বৈষ্ণব ইতিহাসের নিম্নোক্ত বিবরণগুলিব সন্ধান মেলে

(১) বিভিন্ন বৈষ্ণব মহান্ত, আচার্য ও ভক্তদের জীবনী,
(২) বিভিন্ন বৈষ্ণব মহান্তের শিষ্য, ভক্ত ও শাখার তালিকা,
(৩) বিভিন্ন বৈষ্ণব কেন্দ্র, শ্রীপাট ইত্যাদি বিববণ,
(৪) বৃন্দাবনের সঙ্গে গৌড়-বঙ্গ-উৎকলের বৈষ্ণবসমাজের সম্পর্ক,
(৫) বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণ।

নরহরির 'ভক্তিরত্নাকরে' প্রধানতঃ শ্রীনিবাসাচার্যের ও গৌণতঃ নরোত্তম, শ্যামানন্দ, রামচন্দ্র, গোবিন্দদাস, বীরচন্দ্র, জাহ্নবা, রঘুনন্দন এবং প্রসঙ্গতঃ শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, নরহরি সরকার, লোকনাথ, গোপালভট্ট, রঘুনাথ দাস, সনাতন, রূপ, জীব প্রমুখের জীবন-ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যাদির জীবনী বর্ণনায় নরহরি কবিকর্ণপুর, মুরারি গুপ্ত, বৃন্দাবন ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের অনুসারী। এঁদের জীবনীতে খুব কম তথ্যই আছে যা তাঁর পূর্বজ কবিদের রচনায় মেলে না।[৬] আমরা এই অনুল্লেখ্য দু-একটি তথ্যের অবতারণা করছি, যেমন নিত্যানন্দেব জীবনীতে নতুন তথ্য পাই ৪টি (এক) নরহরি নিত্যানন্দের গুরুর নাম বলেছেন লক্ষ্মীপতি (ভক্তি, পৃঃ ২২১), 'লক্ষ্মীপতি স্থানে শিষ্য হৈলা নিত্যানন্দ'। কিন্তু 'চৈতন্যভাগবত'

৬. বিস্তৃত আলোচনার জন্তে দ্রষ্টব্য 'চৈতন্যপরিকর' (১৯৬২), ডঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতি।

(১।৬), 'ভক্তমাল' প্রভৃতিতে নিত্যানন্দের গুরুর নাম বলা হয়েছে মাধবেন্দ্রপুরী। নরহরি এই বিষয়টিও লক্ষ্য করেছিলেন। তাই লিখেছেন যে, প্রতিটি তীর্থে মাধবেন্দ্রের সঙ্গে নিত্যানন্দের দেখা হয়। এবং "নিত্যানন্দে বন্ধুজ্ঞান করে মাধবেন্দ্র। মাধবেন্দ্রে গুরু বুদ্ধি করে নিত্যানন্দ" (ভক্তি. পৃঃ ২২১)। নরহরি লক্ষ্মীপতির প্রসঙ্গটি পেয়েছিলেন নিশ্চয়ই কোনো প্রাচীন বৈষ্ণবের নিকট, (এই নামটির প্রমাণ দেওয়া হয়েছে "তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং" বলে) বৃন্দাবনদাস অপেক্ষাও যাঁর উক্তি তাঁর কাছে নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়েছিল। (দুই) নরহরি 'ভক্তিরত্নাকরে'র পঞ্চমতরঙ্গে আর একটি নতুন সংবাদ দেন যে, মথুরায় গোবর্দ্ধন তীর্থ পর্যটনকালে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দকে যে গোবর্দ্ধনশিলা উপহার দিয়েছিলেন, তা-ই নিত্যানন্দ কণ্ঠে ধারণ করে থাকতেন। (তিন) এই গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গে নরহরি নিত্যানন্দের বিবাহ সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন, বড়গাছির হরিহোড় পুত্র কৃষ্ণদাসের ব্যবস্থাপনায় সূর্যদাস সরখেলের কন্যাদ্বয় বসুধা জাহ্নবার সঙ্গে নিত্যানন্দের বিবাহ স্থির হয়। কিন্তু সূর্যদাস নিত্যানন্দকে সন্ন্যাসী জেনে কন্যাদানে মত পরিবর্তন করেন। পরে স্বপ্নে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব অবগত হয়ে বিবাহকার্য সম্পন্ন করেন—এই বর্ণনা 'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্য-চরিতামৃতে' নেই। 'প্রেমবিলাসে'র ২৪শ বিলাসে এবং ঈশান নাগরের 'অদ্বৈত প্রকাশে' অনুরূপ একটা বর্ণনা পাওয়া যায় মাত্র। (চার) তাছাড়া নরহরি নিত্যানন্দের একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতার (চন্দ্রশেখর পণ্ডিত) নাম করেছেন। যা একমাত্র 'বংশীশিক্ষা'য় (পৃঃ ৩৮৮) মেলে।

চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রীনিবাস নরোত্তমাদির জীবনী আলোচনায় নরহরি তেমন কোনো প্রাচীন পুস্তকের সাহায্য পান নি। এ বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহই তাঁকে সাহায্য করেছে। এই যুগের মহান্তদের জীবনী পাওয়া যায় 'অনুরাগবল্লী', 'কর্ণানন্দ', 'প্রেমবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থে। কিন্তু এমন সব নতুন তথ্যও নরহরি উল্লেখ করেছেন, যা উক্ত গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় না। শ্রীনিবাসের জীবন সম্পর্কে উদাহরণস্বরূপ দুএকটি তথ্য বিবৃত করা যায় (এক) নরহরি 'ভক্তিরত্নাকরে' জানিয়েছেন যে, বৃন্দাবন-গৌড় গমনাগমনে দুবারই

শ্রীনিবাসের সঙ্গে শ্যামানন্দ বর্তমান ছিলেন। কিন্তু 'অনুরাগবল্লী'তে[৭] একবার মাত্র শ্রীনিবাসের সঙ্গে শ্যামানন্দকে বৃন্দাবন থেকে গৌড়ে আগমন করতে দেখা যায়। 'কর্ণানন্দে' তাও নেই। আবার 'প্রেমবিলাসে'[৮] এই বর্ণনা পাওয়া গেলেও 'ভক্তিরত্নাকরে' বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে তার প্রচুর বৈসাদৃশ্য আছে। কিন্তু এই দুই তথ্য বর্ণনায় নরহরির কৃতিত্ব এই যে, তিনি ঘটনাগুলিকে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করেছেন, কিন্তু 'প্রেমবিলাস'কার তা পারেন নি। (দুই) শ্রীনিবাসের বিবাহ সম্পর্কে (প্রথম বার) নরহরি বলেন যে, বনবিষ্ণুপুরে বীরহাম্বীরাদিকে দীক্ষিত করবার পর শ্রীনিবাস যাজিগ্রামে মায়ের কাছে আসেন। এবং নরহরি সরকারের, ও পরে দাস গদাধরের সনির্বন্ধ অনুরোধে গোপাল চক্রবর্তীর কন্যা দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন (পৃঃ ৩৫৯-৩৬০)। কিন্তু 'প্রেমবিলাসে' বলা হয়েছে যে, শ্রীনিবাসের বিবাহ হয় মাতৃবিয়োগের পরে, যাজিগ্রাম উৎসবের কালে রঘুনন্দন (ও সুলোচন)-এর তত্ত্বাবধানে। কিন্তু 'প্রেমবিলাসে'র এই বর্ণনা (১৭শ বিলাস) আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ শ্রীনিবাসের দ্বিতীয় বিবাহটির বর্ণনাও করা হয়েছে প্রথমটির সঙ্গেই। দুটি বিবাহের কালগত ব্যবধানের কোনো বিবরণ নেই। এদিক দিয়েও নরহরির বর্ণনা অধিক মর্যাদার দাবী রাখে।

নরহরির কোনো কোনো সূচক পদ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। যেমন একটি, জ্ঞানদাসের সূচক ('গৌরপদতরঙ্গিণী'তে মুদ্রিত, ১ম সং, পৃঃ ৪৭০)। এটি থেকেই প্রথম জানা যায় যে, জ্ঞানদাস বীরভূমের কাঁদড়া মাদড়াবাসী, জাহ্নবাদেবীর শিষ্য এবং চিরকুমার। তাঁর বন্ধু আউল মনোহর। জ্ঞানদাস আউলের সঙ্গে খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। জ্ঞানদাস সম্পর্কে 'চৈতন্যচরিতামৃতে' তেমন কোনো সংবাদ নেই কিংবা উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণবচরিতগুলিতে জ্ঞানদাসের বিস্তৃত পরিচয় নেই। কেবল নরহরির 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাসে' বলা হয়েছে যে, খেতুরী উৎসবান্তে জ্ঞানদাস জাহ্নবার সঙ্গে বৃন্দাবনে যান। তিনি খেতুরী ছাড়া দাসগদাধরের তিরোভাব তিথিতে উদ্‌যাপিত কাটোয়া-বৈষ্ণব-সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং নরহরির সূচকটি না পেলে জ্ঞানদাস সম্পর্কে আমাদের আরো অন্ধকারে থাকতে হতো।

৭. অনুরাগবল্লী, মনোহর, স. মৃণালকান্তি ঘোষ, (৩য় সং), পৃঃ ৪০।
৮. প্রেমবিলাস, নিত্যানন্দ দাস, স. যশোদানন্দন তালুকদার।

গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়চৈতন্য সম্পর্কেও নরহরির একটি সূচক ('গৌরপরিকরগণের সূচক' পুথি, পদ ১১ নং) এবং 'ভক্তিরত্নাকর' (৭ম তরঙ্গ) ভিন্ন অন্যত্র তেমন কোনো সংবাদ মেলে না। গদাধর পণ্ডিতের কাছে তাঁর অবস্থান, গৌরীদাসের কাছে তাঁব দীক্ষা গ্রহণ, বিগ্রহ সেবা, গুরুভক্তি, উৎসবকরণে তাঁর কর্মতৎপরতা, গৌবনিত্যানন্দের কৃপাদৃষ্টিলাভ, 'হৃদয়চৈতন্য' নামকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় জানতে গেলে আমাদের নরহরির রচনাই একমাত্র অবলম্বন করতে হয়।

নরহরি তাঁর 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাসে' বৈষ্ণবাচার্যদের শিষ্য ও শাখার তালিকা দিয়েছেন। এই তালিকায় জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে বহু ভক্তের নাম আছে। রাজা বা জমিদারদেবও নাম পাওয়া যায়। তালিকাগুলি থেকে সেকালের জনমানসে বৈষ্ণবাচার্যদের প্রভাব নিরূপিত হয়। প্রাচীন ইতিহাসের বহু অনাবিষ্কৃত তথ্যেরও সন্ধান মেলে। নরহরি শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ, জাহ্নবা, বীরচন্দ্র, রঘুনন্দন, গঙ্গানারায়ণ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রমুখের শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের দীর্ঘ দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করেছেন। তন্মধ্যে নরোত্তমবিলাস থেকে নরোত্তম ঠাকুরের শাখাভুক্ত কয়েকজনের নাম উল্লিখিত হলো: পূজারী বলরাম, চক্রবর্তী গোপীরমণ, আচার্য রামকৃষ্ণ, পূজারী রবিরায়, চক্রবর্তী গঙ্গানারায়ণ, রাধাবল্লভ চৌধুরী, নবগৌরাঙ্গ দাস, নারায়ণ ঘোষ, কৃষ্ণসিংহ, সন্তোষ রায়, গোবিন্দরাম, বিনোদ রায়, ফাগু চৌধুরী, বসন্ত রায়, শীতল রায়, রাম দত্ত, ধর্মদাস চৌধুরী, ভক্তদাস, নিত্যানন্দ দাস, চণ্ডীদাস, ধিরু চৌধুরী, বোঁচা-রামভদ্র, রামভদ্র রায়, রূপনারায়ণ, জানকীবল্লভ চৌধুরী.........ইত্যাদি ; নরোত্তমের উপশাখা, রামকৃষ্ণ আচার্য-শিষ্য: কনকলতিকা (আচার্য্যের স্ত্রী), রাধাকৃষ্ণাচার্য (আচার্যের পুত্র), রাধাকৃষ্ণ চক্রবর্তী, গোপাল চক্রবর্তী। গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর শিষ্য: নারায়ণী (চক্রবর্তীর পত্নী), কৃষ্ণচরণ চক্রবর্তী (রামকৃষ্ণাচার্যের পুত্র)......ইত্যাদি।

নরহরি তাঁর গ্রন্থে সেকালীন বৈষ্ণবধর্ম প্রচার কেন্দ্রগুলির বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। বনবিষ্ণুপুর, খড়দহ, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, শ্রীখণ্ড, খেতুরী, উৎকল, যাজিগ্রাম, কালনা, কাটোয়া, কাঞ্চনগড়িয়া, দাঁইহাট, অগ্রদ্বীপ, বোরাকুলি, খানাকুল প্রভৃতি ছিল সেকালের ধর্মপ্রচারের বিশিষ্ট কেন্দ্র। তন্মধ্যে বনবিষ্ণুপুর

ও খেতুরীই প্রধান। এক একটি কেন্দ্রে এক বা দুজন করে প্রধান আচার্য বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। যেমন বনবিষ্ণুপুরে ও যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস, খেতুরীতে নরোত্তম, উৎকলে শ্যামানন্দ, খড়দহে বীরচন্দ্র ও জাহ্নবাদেবী, শান্তিপুরে অচ্যুতানন্দ, শ্রীখণ্ডে নরহরি ও পরে রঘুনন্দন ধর্মপ্রচারে নেতৃত্ব দান করেছিলেন।[৯] এঁরা ছিলেন প্রত্যেকেই এক একজন অক্লান্তকর্মা ধর্মপ্রবণ ব্যক্তি। একটি কেন্দ্রের সঙ্গে অপরটির গভীর যোগাযোগ ছিল। আচার্যেরা সময়ে সময়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে উপস্থিত হতেন।

কিন্তু এই কেন্দ্রগুলি বৃন্দাবনের গোস্বামীদের নির্দেশে পরিচালিত হতো। তখন শ্রীজীব, গোপালভট্ট, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ জীবিত ছিলেন। শ্রীজীব ছিলেন মধ্যমণি। লোক মারফৎ বা চিঠিপত্রে সংবাদ আদানপ্রদান হতো। শ্রীজীব এদেশে বিভিন্ন সময়ে গোস্বামী গ্রন্থগুলি পাঠাতেন। শ্রীনিবাসাদিকে তিনি গোস্বামী গ্রন্থ প্রচারের নির্দেশই দিয়েছিলেন। গৌড়বঙ্গের সঙ্গে বৃন্দাবনের সম্পর্ক যে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল তা নরহরির গ্রন্থ পাঠে বোঝা যায়।

নরহরি তাঁর গ্রন্থে ছটি বৈষ্ণব মহোৎসবের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। এগুলি কাটোয়া, যাজিগ্রাম, শ্রীখণ্ড, কাঞ্চনগড়িয়া, খেতুরী, বোরাকুলি ও ও ধারেন্দায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। স্থান নামেই এগুলি পরিচিত।[১০] শ্রীনিবাসাচার্য প্রতিটি উৎসবেই উপস্থিত ছিলেন। নরহরি এগুলি উদ্‌যাপনের কারণ, এগুলির উদ্যোক্তা, পরিচালক, উপস্থিত ভক্তদের নাম, উৎসবের কার্যপ্রণালী ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। ভক্তদের তালিকা থেকে তাঁদের জীবৎকাল ও উৎসবগুলির সময় নির্ণয়ে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়। তেমনি বৈষ্ণব ইতিহাসের উল্লেখ্য একটি যুগের বিশদ পরিচয় উদ্ধার করা যায়। দাসগদাধরের তিরোভাব তিথি স্মরণে যদুনন্দন চক্রবর্তীর উদ্যোগে কাটোয়ায় প্রথম বৈষ্ণব সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ব্যক্তিদের তালিকায় ৭০ জনের নাম আছে (ভক্তি, পৃঃ ৩৯৩-৩৯৪)। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েক জনের নাম শ্রীনিবাস, রামচন্দ্র, বলরামদাস, জ্ঞানদাস, বীরচন্দ্র, অচ্যুতানন্দ প্রভৃতি। এই সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই যাজিগ্রামে শ্রীনিবাসের উদ্যোগে যে বৈষ্ণব সম্মেলন হয়, সেখানেও কাটোয়ার উপস্থিত বৈষ্ণবেরা গমন করেন। এর

৯. দ্রঃ ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ১০৭-১০৯।

১০. দ্রঃ ঐ. পৃঃ ১১৪-১১৬।

অব্যবহিতপরেই রঘুনন্দনের উদ্যোগে নরহরি সরকারের তিরোভাব তিথি স্মরণে শ্রীখণ্ড সম্মেলন। এখানে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম, শ্রীনিবাস, বীরচন্দ্র, যদুনন্দন চক্রবর্তী, শ্রীলোচন প্রভৃতি। গোকুলানন্দ ও শ্রীদাসের উদ্যোগে দ্বিজ হরিদাসাচার্যের তিরোভাব তিথি স্মরণে উদ্‌যাপিত কাঞ্চন-গড়িয়া উৎসবে শ্রীনিবাস, রামচন্দ্র প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রাচীন বৈষ্ণব-সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মেলন খেতুরী মহোৎসব। রাজা সন্তোষ দত্তের সাহায্য ও তত্ত্বাবধানে ঠাকুর নরোত্তমের উদ্যোগে এই সর্ববঙ্গীয় মহাসম্মেলন দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। নরহরি তাঁর 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাসে' এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। বাংলার ইতিহাসে এই সম্মেলনের গুরুত্ব সর্বাধিক—এখানেই প্রথম রাধাগোবিন্দ বিগ্রহের পাশে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহ স্থাপিত ও পূজিত হয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রচলিত লীলাকীর্তন রীতি প্রবর্তিত হয়, গৌর-নিত্যানন্দ অদ্বৈতের কয়েকজন সহচরও উপস্থিত হন। উপস্থিত ব্যক্তিদের ৮০ জনের নাম নরহরি প্রদত্ত তালিকায় আছে।[১১] আমরা কয়েকজনের নাম মাত্র উল্লেখ করছি, শ্রীনিবাস (হোতা), জাহ্নবা-দেবী, রামচন্দ্র, শ্যামানন্দ, গোবিন্দ কবিরাজ, ব্যাসাচার্য (বীরহাম্বীরের সভা পণ্ডিত), কৃষ্ণবল্লভ (বনবিষ্ণুপুরের শ্রীনিবাসের প্রথম শিষ্য), দিব্যসিংহ, কবিকর্ণপুর, রসিকমুরারি, সূর্যদাস (নিত্যানন্দের শ্বশুর), নৃসিংহচৈতন্য, বলরামদাস (জাহ্নবা-শিষ্য নিত্যানন্দ দাস), বৃন্দাবনদাস, অচ্যুতানন্দ, হৃদয়চৈতন্য, জ্ঞানদাস, আউল মনোহর, কর্ণপুর কবিরাজ, রঘুনন্দন, বীরভদ্র, কমলাকর পিপ্পলাই ইত্যাদি। নরহরি এই সঙ্গে বাদক, নর্তক, গায়ক ও মালীর নাম, অভ্যর্থনাকারী ব্যক্তিদের নাম, কার উপর কি কি কাজের ভার পড়েছিল তার তালিকা, আহারকারী ব্যক্তিদের নাম, উৎসবের সূচী ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ের বিবরণী প্রদান করেছেন।

বোরাকুলিতে গোবিন্দ চক্রবর্তীর প্রচেষ্টায় একটি বৈষ্ণব সম্মেলন হয়। এখানে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ্য নাম, শ্রীনিবাস, নরোত্তম, রামচন্দ্র, যদুনন্দন, নয়নানন্দ মিশ্র, বলরামদাস, বীরচন্দ্র, গোকুলানন্দ,

১১. গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধির জন্যে এই সব ভক্তদের নাম-তালিকা বিস্তৃত ভাবে দেওয়া গেল না।

গোপীরমণ চক্রবর্তী প্রমুখ। নরহরি উল্লিখিত ৬ষ্ঠ বৈষ্ণব সম্মেলন শ্যামানন্দের উদ্যোগে ধারেন্দায় অনুষ্ঠিত হয়।

এই বর্ণনা থেকে সেকালের বৈষ্ণব সমাজের ইতিহাস, বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবৎকাল, বিভিন্ন শ্রেণীর সংগীতসাধক, বাদক, নর্তক, পাচকদের পরিচয়, মানুষের জীবনধারণের মান—ইত্যাদি বহু বিষয়ই নির্ণীত হতে পারে॥[১২]

১২. 'নরহরি চক্রবর্তীর কাব্যে সেকালের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক উপাদান' বিষয়ে একটি পৃথক গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছায় বর্তমান অংশ সংক্ষিপ্ত করা হলো। *

সপ্তম অধ্যায়

পরিশিষ্ট

ক. নবাবিষ্কৃত অপ্রকাশিত পদাবলী

'গৌরপরিকরগণের সূচক'

বরাহনগর পাঠপাড়ী পুথি নং—২৬১২।২৩৬, পত্র ১-৯, মোট ১৬টি পদ। তন্মধ্যে ১০ এবং ১২ নং পদ দুটি 'পদকল্পতরু'তে যথাক্রমে ২৩৭১ এবং ২৩৬৯ সংখ্যক পদ রূপে সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এজন্যে এই পদ দুটি পুনঃপ্রকাশিত হলো না। এই পুথির ৪ নং পদটি যদিও গৌরপদতরঙ্গিণীতে (২য় সং, ২৯৭ পৃষ্ঠায়) মুদ্রিত হয়েছে, তবু পাঠান্তরবাহুল্যের জন্য তা গৃহীত হলো।

১

প্রেমময়ী শচীমাতা ত্রিজগৎ মধ্যে খ্যাতা জগন্নাথমিশ্রের ঘরনী। ১।[১] গুণের নাহিক পার কি কব চরিত্র তার যেহ গৌরচন্দ্রের জননী॥ শ্রীগৌর সুন্দর বিনে অন্য কিছু নাহি জানে পূর্বমত ইথে নাহি আন। তিলেক না দেখি তায় কত যুগ বহি যায় গোরা শচীদেবীর পরাণ॥ স্নেহ অতি অদভুত এক মুখে কব কত গোরা যেন নয়ানের তারা। সে গৌর জগৎপতি শচীপ্রেমে বশ অতি ইহা বুঝে সে আশ্রয় যারা॥ বিস্তারি বর্ণিতে নারি গুণসিন্ধু গৌর হরি ভুবনমোহন রসকন্দ। সতত বালক সঙ্গে বাল্য চাপল্যাদি রঙ্গে জননীর বাঢ়ায় আনন্দ॥ লীলা কে বুঝিতে পারে কথোক দিবস পরে সন্ন্যাস করিতে হইল মন। জননীরে জানাইয়া গৃহ সুখ ত্যাগ দিয়া চলিলেন জগৎ জীবন॥১০॥ শচীর নির্মল প্রেমা নাহিক যাহার সীমা পূর্ব হৈতে অধিক হইল। না দেখি

---

১ ১, ১০, প্রভৃতি সংখ্যাগুলি পদের চরণ-সংখ্যা নির্দেশক, সংকলক প্রদত্ত। পদের শেষে বন্ধনীস্থ (১), (২) সংখ্যা পদ-সংখ্যা নির্দেশক।

গৌরের মুখ বিদরিয়া যায় এক বিরহ সমুদ্র উথলিল॥ ছটফট করে তনু প্রাণত্যাগ করে যনু স্থির হৈতে নারে একক্ষণ। নদীর প্রবাহ পারা দুনয়ানে বহে ধারা ফুকারিয়া করয়ে ক্রন্দন॥ দুই হাথ মাথে ধরি ডাকে অতি উচ্চ করি হা হা প্রাণ নিমাই বলিয়া। অনাথিনী জননীরে কেমনে ছাড়িলে মোরে নিপট কঠিন তোর হিয়া॥ কাহারে করিব রোষ আপন করম দোষ নহিলে কি হয় হেন কাজ। না দেখি তোমাব তবে কেমনে রহিব ঘরে বিহি শেল দিল বুক মাঝ॥ ও মুখ পূর্ণিমাশশী মধুর মধুর হাসি কে মোরে ডাকিবে মা বলিয়া। কহি সুমধুব কথা কে ঘুচাবে মন বেথা ঘরে রব কাহারে দেখিয়া॥২০॥ ঐছে কহি কত কত বিরহে আকুলচিত নিশ্বাস ছাড়িয়া ঘন ঘন। অবনী উপরি পড়ি ঘন যায় গডাগড়ি অঙ্গ আছাড়িয়া অচেতন॥ শ্রীবাসাদি ভক্ত যত বিরহে আকুলচিত তথাপিহ শ্রীশচীমাতারে। কহয়ে প্রবোধবাণী তাহা শচীদেবী শুনি ক্ষেণেক না স্থির হৈতে পারে॥ গৌরের গমন পথ নিরখয়ে অবিরত আর কিছু মনে নাহি ভায়। ছাডি দিল অন্নজল দেহ করে টলমল অস্থি মাত্র রহল তাহায়॥ গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস করি আসিলেন শান্তিপুরী শুনি মাতা চলিলা ধাইয়া। অদ্বৈত মন্দিরে আসি গৌরমুখ পূর্ণশশী দেখি মহা আনন্দিত হিয়া॥ জননীর যত স্নেহ বর্ণিতে নারয়ে কেহ দরিদ্রে পাইল যনু ধন। গৌরহরি গুণমণি কহি কত প্রিয় বাণী স্থির কৈল জননীর মন॥৩০॥ শচীমনে পুনঃ ক্লেশ গৌরের সন্ন্যাস বেশ ঘন ঘন করে নিরীক্ষণ। মাথে কেশ শূন্য দেখি ঝরয়ে যুগল আঁখি বিধাতারে করয়ে নিন্দন॥ মুণ্ডন করিল যেহ বুঝিয়ে নিদয় সেহ দয়ামাত্র নাহিক তাহার। ঐছে কহি বারে বারে শিরে হস্তাঘাত করে আর যত না হয় বিস্তার॥ কি কব মহিমা তার দীনহীন দুরাচার তরিল যাহার কৃপালেশে। নরহরি পাপমতি না হৈল তাহার গতি নিশ্চয় জানিহ নিজ দোষে॥ ৩৬॥ (১) পত্র ১খ-২ক

২

প্রেমময় গুণধাম বিদিত জগতে নাম জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর। ১। কে বুঝে চরিত্র তার অতুল উদার যার পুত্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥ মিশ্র মনে সদানন্দ নিরখি ও মুখচন্দ আপনাকে ধন্য করি মানে। স্নেহের নাহিক পার বিশ্বম্ভর বিনে আর সপনেহ অন্য নাহি জানে॥ ক্ষণেক বিচ্ছেদ মনে যুগসম করি মানে আর যত বর্ণন না যায়। তৈছে প্রভু গৌরহরি সদাদ্ভুতলীলা করি জনকের

আনন্দ বাড়ায়॥ একদিন মিশ্রবরে শুইয়া শয্যার পরে নিশাভাগে দেখয়ে সপন। অদ্বৈতাদি ভক্ত সঙ্গে সংকীর্তন মহারঙ্গে বিহরয়ে কমল নয়ন॥ পুনঃ গৃহত্যাগ করি গুণমণি গৌরহরি করিলেন সন্ন্যাস গ্রহণ। দূরে করি পূর্ববেশ মুড়াইল মঞ্জুকেশ দণ্ড করে করিল ধারণ॥ ১০॥ সুন্দর কোমল পায় দেশে দেশে ভ্রমি তায় পুনঃ নীলাচলে কৈল বাস। মিশ্র ঐছে দেখি কত হইয়া আকুলচিত জাগিয়া কহিল শচী পাশ॥ শুনি শচী প্রবোধিলা তাথে নাহি স্থির হৈলা নিরন্তর করে হায় হায়। বিধি মোরে বাম হবে নিশ্চয় জানিল এবে ছাড়িয়া যাইবে গৌররায়॥ ধৈরজ ধরিতে নারে অঙ্গ ছটপট করে ত্রিভুবন দেখে শূন্যাকার। বিরহ আনলে প্রাণ করে অতি আনছান দু নয়ানে বহে অশ্রুধার॥ নিকটে গৌরাঙ্গ চান্দে দেখিয়া তথাপি কান্দে সদা মনে পড়ে সেই স্বপ্ন। ভক্ষণে নাহিক মন দেহ ক্ষীণ অনুক্ষণ চিন্তা সমুদ্রেতে অতি মগ্ন॥ মিশ্রের যতেক দুঃখ বর্ণিতে ফাটয়ে বুক যাঁহার রোদনে গলে শিলা। প্রাণধন গৌরমণি তাহার বিচ্ছেদ জানি দেহে প্রাণ ধরিতে নারিলা॥ ২০॥ মিশ্রের মহিমা যত এক মুখে কব কত সর্ব জীবে দয়া অতিশয়। যাঁহার কৃপার লেশে অধম আনন্দে ভাসে দূরে যায় ভবরোগ ভয়॥ **নরহরি** দুষ্টমতি পাপে অনুরক্ত অতি সুজন সঙ্গেতে নাহি মন। এবার করুণা করো মোর মন দুঃখ হর দেওহ কিঞ্চিত প্রেমধন॥ ২৪॥ (২) পত্র ২ক

৩

শ্রীগৌর অগ্রজ নাম বিশ্বরূপ গুণধাম করুণাসমুদ্র মহাধীর। ১। প্রেমানন্দ ময় দেহ পরম পণ্ডিত যেহ নিত্যানন্দের অভেদ শরীর॥ কে বুঝে তাহার তত্ত্ব সদা কৃষ্ণরসে মত্ত গৃহে নাহি স্থির হয় মন। অদ্বৈত আচার্য্য আদি সঙ্গে থাকে নিরবধি কৃষ্ণ কথা করি আলাপন॥ অদ্বৈতাদি যত জন বিশ্বরূপে একক্ষণ ছাড়িয়া না পারয়ে রহিতে। বিশ্বরূপের কথামৃত শুনি সভে হয় তৃপ্ত না্হিলে অধিক দুঃখ চিতে॥ বিশ্বরূপ এই রূপে থাকেন শ্রীনবদ্বীপে সর্বচিত্ত করে আকর্ষণ। জনক জননী প্রতি অত্যন্ত অদভুত ভক্তি এক মুখে না হয় বর্ণন॥ বিশ্বরূপ সদা সুখী তথাপিহ মহা দুঃখী দেখি মহা পাষণ্ডীরগণে। বৈষ্ণবনিন্দন কথা সহিতে না পারি তথা নিশ্চয় করিলা যাবো বনে॥ ১০॥ অনুজ শ্রীগৌর প্রতি প্রাণ হৈতে প্রীত অতি তিলেক ছাড়িতে ফাটে হিয়া। তথাপিহ একক্ষণ গৃহে না রহয়ে মন চলিলা আপনা প্রবোধিয়া॥ বিশ্বরূপ অদর্শনে শচী জগন্নাথ

মনে যত দুঃখ কহনে না যায়। হা হা বিশ্বরূপ বলি ডাকে নিজ ভুজ তুলি কান্দি দোহে ধরণী লোটায়।। অগ্রজেরে না দেখিয়া গৌরের আকুল হিয়া খিতিতলে পড়ি গড়ি যায়। দু নয়ানে ধারা বহে গদগদ বচনে কহে কি লাগিলা ছাড়িলা আমায়।। প্রভু শ্রীঅদ্বৈত আর শ্রীবাসাদি সভাকার দুঃখের নাহিক কিছু পার। সভে কহে হেন সঙ্গ দিয়া কেনে কৈল ভঙ্গ বুঝি বিহির নাহিক বিচার।। বিশ্বরূপের গুণ যত কহে সভে অবিরত নয়ানে বহয়ে অশ্রুধার। ইহা না বুঝয়ে আনে যার হয় সেই জানে কেহো নারে ধৈর্য্য ধরিবার।। ২০।। এথা শ্রীশঙ্করারণ্য জগত করিতে ধন্য করিলা সন্ন্যাস অঙ্গীকার। নিরন্তর প্রেমাবেশে ফিরে প্রভু দেশে দেশে মহাতেজ মহিমা অপার।। একমুখে কব কত অধম দুর্গত যত যার গুণে হইল উদ্ধার। আপন করম দোষে মজিল বিষয় ফাঁসে **নরহরি** বড় দুরাচার।। ২৩।। (৩) পত্র ২ক-২খ।

৪

ধন্য ধন্য বলি মেন চারি যুগ মধ্য হেন কলির যুগের বলিহারি যাই। ১। সুন্দর নদীয়াপুরে মাধবমিশ্রের ঘরে কি কব সুখের সীমা নাই।। অতিশয় শুভক্ষণে জন্মিলা আনন্দ মনে গৌরাঙ্গের প্রিয় গদাধর। দেখিয়া পুত্রের মুখ দূরে গেল সব দুঃখ পিতামাতা হরষ অন্তর।। ৪।। তুলনা বা দিব কত শোভা অতি অদভুত অঙ্গের বলনী অনুপাম। ঝলমল করে বর্ণ জিনিয়া সে তপ্ত স্বর্ণ বুঝি এই আনন্দের ধাম।। শুনিয়া পুত্রের জন্ম তেজিয়া সকল কর্ম লোক সব আইসে ধাইয়া। সভার আনন্দচিত নিজগৃহ বিস্মরিত কেহো যাইতে নারয়ে ফিরিয়া।। ৮।। সভে মোর একমুখ কি কব মঙ্গল সুখ সভাকার প্রসন্ন অন্তর। গদাধর সুপ্রকাশ পুরয়ে সভার আশ এ চরিত্র অন্য অগোচর।। নৃত্যগীত বাদ্য অতি কে বুঝে কাহার রীতি নারিগণ করে ধাওয়াধাই। কহে **নরহরিদাস** মনে এই অভিলাষ জন্মে জন্মে যেন ইহা গাই।। ১২।। (৪) পত্র ২খ।

৫

ও মোর করুণাবান মাধব নন্দন প্রাণ গদাধর পণ্ডিত গোঁসাই। ১। প্রেমময় মূর্তি যার অতুল বৈরাগ্য আর কি কব গুণের অন্ত নাই।। পরম আনন্দ কন্দ শ্রীগৌর গোকুলচন্দ যার রসে উল্লাস সদায়। যার মুখ নিরখিয়া পড়য়ে মূর্ছিত হৈয়া প্রেমাবেশে ধরণী লোটায়।। শুনিয়া যাহার নাম কান্দে পহুঁ অবিরাম ধৈরজ ধরিতে নারে মনে। জলক্রীড়া আদি যত যার সঙ্গে

অবিরত এ ভাব না বুঝে অন্যজনে।। নবদ্বীপ মাঝে যত বিলাস কহিব কত ভুবনে ভরিল যশ যার। অদভুত রীতি যেন হেন কি হইবে যেন গদাধর পরাণ সভার।। একদিন শচীমাতা তাম্বুল অর্পণে তথা দেখি গদাধরের প্রতাপ। কহে হস্ত দিয়া অঙ্গে নিমাই চান্দের সঙ্গে সতত রহিবে মোর বাপ।। ১০।। এইরূপে নানাকর্ম কে বুঝে সে সব মর্ম গোরা বিনু না জানয়ে আন। ভোজন শয়ন গতি গোরাসঙ্গে সদা স্থিতি গোরা গদাধরের পরাণ।। শচীর দুলাল গোরা নিজ রসে সদা ভোরা সুখে বৈসে নদীয়া নগরে। যে কিছু মনের কথা গোপন না করে তথা সকল কহয়ে গদাধরে।। একদিন গৌরহরি গদাধর করে ধরি ধীরে ধীরে পুনঃ পুনঃ কয়। ছাড়ি বেশ ভুষা দেশ করিব সন্ন্যাস বেশ একাকী ভ্রমিব সুনিশ্চয়।। গদাধর শুনি ইহা অধিক ব্যাকুল হৈয়া চাহয়ে গৌরাঙ্গ মুখপানে। অন্তরে দারুণ ব্যথা মুখে নাহি সরে কথা ধারা বহে যুগল নয়ানে।। বিচারয়ে মনে মনে পূর্ণ[1] হৈল এতদিনে বিধাতা পাড়িল শিরে বাজ। এ কেশের অদর্শন দেখিবেক এ নয়ন ধিক রহু জীবনে কি কাজ।। ২০।। কান্দে প্রিয় গদাধর দেখি প্রভু বিশ্বম্ভর হাথে ধরি কত প্রবোধিয়া। করিল সন্ন্যাস তাহা কে বুঝিতে পারে যাহা বিস্তারিতে বিদরয়ে হিয়া।। প্রেমানন্দে কুতুহলে গেলেন শ্রীনীলাচলে তথা গদাধর প্রভু পাশ। সে রঙ্গ বুঝিব কেবা শ্রীগোপীনাথের সেবা নিয়ম করিয়া কৈল বাস।। প্রভু ভাগবত সুখে শুনে গদাধর মুখে পূর্বরসে সতত বিভোর। জগন্নাথ দরশনে আর প্রেম সংকীর্তনে সে সব সুখের নাহি ওর।। কথোদিনে প্রেমাবেশে চলে পহুঁ গৌড়দেশে অলৌকিক প্রভুর বিলাস। গদাধর সে তরঙ্গে চলে গৌরচন্দ্র সঙ্গে ছাড়ি শ্রীবিগ্রহ ক্ষেত্রবাস।। প্রভু কত প্রবোধিয়া দিল পুনঃ পাঠাইয়া কাতর অন্তরে ক্ষেত্র আসি। প্রবোধ না মানে মনে প্রাণনাথ গৌর বিনে আঁখিজলে ভাসে দিবানিশি।। ৩০।। নাহি ভায় অন্নজল দেহ করে টলমল অন্তর কান্দিয়া সদা উঠে। নিঃশ্বাস বহে যেন আনলের সম হেন বিরহ জ্বালায় প্রাণ ফাটে।। হা প্রাণ গৌরাঙ্গ বলি ডাকে দুই ভুজ তুলি সার্বভৌম দেখি চমৎকার। এ প্রেম বুঝিবে কেবা শ্রীগোপীনাথের সেবা ক্ষণেক নাহিক স্মৃতি যার।। প্রেমমত্ত গদাধরে কেহো প্রবোধিতে নারে গোরা বিনু' পাগলের পারা। দরশে পরম সুখ অদরশে মহাদুখ গোরা যেন

১. 'পূর্ণ' পাঠে অসঙ্গতি।

নয়ানের তারা ।। হেন কি হইবে ভাই উপমা দিবার নাই পশুপক্ষ ঝুরে যার গুণে। পণ্ডিত গোঁসাইরে আনে কি জানিতে পারে যাহারে জানায় সেই জানে ।। সত্য কহি বারে বারে গদাইর করুণা যারে সে গৌর নিতাই চান্দে পায়। ও পদ ভরসা করি জন্মে জন্মে নরহরি গদাইচান্দের গুণ গায় ।। ৪০ ।।
(৫) পত্র ২খ-৩ক।

৬

ও মোর প্রেমের খনি গৌরীদাস গুণমণি জগত বেড়িয়া যশ যার। ১। না জানিয়ে কুন বিধি সৃজিল করুণানিধি এমন দয়ালু নাই আর ।। পুরুবে সুবল নাম রূপে গুণে অনুপাম দেখি তিরপিত হয় আঁখি। অপূর্ব উন্মাদ চিতে নাহিক তুলনা দিতে রাধাকৃষ্ণ সুখে সদা সুখী ।। দোহার শয়ন ঘরে শয্যার রচনা করে তাহে দুহুঁ করায় শয়ন। উপজে পরম রঙ্গ ঘামে তিতে দুহুঁ অঙ্গ সে সময়ে করয়ে বীজন ।। অপূর্ব দোলার পরে বসাইয়া দোহাকারে মন্দমন্দ যতনে ঝুলায়। দোহাকার সুমাধুরী ঘন নিরীক্ষণ করি মধুর সুস্বরে গুণ গায় ।। শ্রীরাধিকা রসবতী যবে কৃষ্ণ সহে অতি মান করি রহেন বসিয়া। সে সময়ে সুখে ভাসি রাইএর নিকটে আসি সন্তোষ করয়ে প্রবোধিয়া ।। ১০ ।। জল বিহরণকালে কত রঙ্গ করে ছলে দেখি যা হাসয়ে বংশীধারী। করি কত ছন্দ বন্ধ উপজায় মহানন্দ যবে দোহে খেলে পাশা সারি ।। কৃষ্ণ রাধা অদর্শনে অত্যন্ত ব্যাকুল মনে স্থির হয় সুবলে দেখিতে। সুবল সে বেশ ধরি কৃষ্ণচিত্ত করে চুরি আর যত নারি বিস্তারিতে ।। সেই সুবল গৌরীদাস অম্বিকানগরে বাস সেই কৃষ্ণ শ্রীশচীকুমার। অনুক্ষণ গৌর সঙ্গে গৌরী দাস রহে রঙ্গে কে বুঝিব চরিত্র অপার ।। নিতাই চৈতন্য বিনে আর কিছু নাহি জানে জগতে বিদিত যার প্রীত। তিলার্দ্ধেক না দেখিয়া যায় বুক বিদরিয়া যুগসম হয় পরতীত॥ একদিন গৌরচন্দ্র সঙ্গে প্রিয় নিত্যানন্দ আইলেন পণ্ডিতের ঘরে। দোহার বদন হেরি নাচে বাহু ভঙ্গি করি গৌরীদাস আনন্দ অন্তরে ।। ২০ ।। পণ্ডিতের প্রেমা দেখি প্রভুর সজল আঁখি ভুজ পসারিয়া করে কোলে। নিত্যানন্দ মহামতি প্রেমে উনমত্ত অতি উচ্চ করি হরি হরি বোলে ।। সঙ্গে পারিষদ যত সভে ভেল উনমত কেহো ধৈর্য্য ধরিতে না পারে। অদভুত ভাবাবেশ বর্ণিতে না হয়ে শেষ নৃত্যে ক্ষিতি ঝলমল করে ॥ এইরূপ কতক্ষণ করি প্রেম বরিষণ স্থির হৈলা শ্রীশচীকুমার। জগতে না দেখি হেন পণ্ডিতের গৃহে যেন হইল

আনন্দ অবতার ।। প্রভু প্রিয় গৌরীদাস করয়ে যে অভিলাস তাহা পূর্ণ করে দুইভাই। একদিন স্বপ্নে কয় প্রকাশহ মূর্তিদ্বয় তোমার সেবায় সুখ পাই ।। গৌরীদাস স্বপ্নাদেশে নাম মাত্র প্রকাশে সে দুই ভাই প্রকট হইলা। সিংহাসনে বসাইয়া শোভা দেখে হর্ষ হৈয়া মহা মহোৎসবে মগ্ন হৈলা ।। ৩০ ।। একদিন গৌরীদাসে কহে প্রভু রসাবেশে শীঘ্র যাহ রন্ধন করিতে। শুনি হাসে মন্দ মন্দ নিরখি ও মুখচন্দ চলিলেন অত্যন্ত তুরিতে ।। বিবিধ ব্যঞ্জন শাক অন্ন আদি কৈল পাক সরস সুগন্ধি সুধাময়। অপূর্ব থালিতে ভরি সাজাইলা যত্ন করি হইল অপূর্ব শোভাময় ।। পুনঃ শীঘ্র গৌরীদাস চলিলা প্রভুর পাস ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়য়ে আনন্দ। তথা মহাহর্ষ মনে বসিয়াছে সিংহাসনে সুচারু বিগ্রহ পূর্ণানন্দ ।। সে অপূর্ব শোভা দেখি প্রেমজলে পূর্ণ আঁখি পণ্ডিত না রয়ে স্থির হৈতে। কতক্ষণে ধৈর্য্য ধরি ও মুখচন্দ্রমা হেরি কহে কিছু হাসিতে হাসিতে ।। এই রূপ দুইজনে চলহ ভোজনস্থানে দেখিয়া জুড়াউক এ নয়ন। শুনি পণ্ডিতের কথা গমন করিলা তথা ভোজনে বসিলা দুই জন ।। ৪০ ।। পণ্ডিতে প্রশংসা করি ভুঞ্জিলেন গৌরহরি পূর্ব সুখ পড়ি গেলা মনে। কে বুঝে ও সব রঙ্গ টলমল করে অঙ্গ সুস্থির হইলা কথোক্ষণে ।। হাসিয়া গৌরাঙ্গ রায় পণ্ডিতের পানে চায় কহে কিছু আনন্দ আবেশে। মোর প্রাণসম তুমি নিশ্চয় বলিয়ে আমি ঠেকিল তোমার প্রেমরসে ।। তুমা ছাড়ি একক্ষণ অন্যত্র না রহে মন তাহে এই বলিয়ে তুমারে। সঙ্কোচ না করো মনে নিরখিয়া দুইজনে যারে ইচ্ছা রাখহ তাহারে ।। প্রভুর বচন শুনি পরম আনন্দ মানি গৌরীদাস কহে প্রেমভরে। যে মোরে মাগিয়া খাবে মোর সনে কথা কবে সেই সে রহিবে মোর পাশে ।। পণ্ডিতের কথা শুনি হাসে গৌরগুণমণি পূর্বভাব হইল উদয়। কে বুঝে এ সব রঙ্গ পুলকে পুরিল অঙ্গ প্রেমধারা দুনয়ানে বয় ।। ৫০ ।। প্রভু কহে কহি সত্য মোরা দুই জনে নিত্য এছে মাগি করিব ভোজন। কভু না ভাড়াব তোরে রহিল তোমার ঘরে এই মোর অলঙ্ঘ্য বচন ।। শুনি সে আনন্দ মনে তাহা কে বর্ণিতে জানে পণ্ডিত হইল মহামত্ত। অনেক যতন করি কিঞ্চিত ধৈরজ ধরি পহুঁ পদে সমর্পিল চিত্ত ।। এই রূপে গৌরীদাস পুরাইল অভিলাষ ইহা বিস্তারিতে কেবা পারে। ও রূপ মাধুরী দেখি জুড়াল যুগল আঁখি নিরন্তর আপনা পাসরে ।। গৌর নিত্যানন্দ বিনে অন্য কিছু নাহি জানে দুহুঁ গুণগানে মাতোয়ারা। তিলেক না দেখি প্রাণ করে অতি আনছান

দুহু যেন নয়ানের তারা ॥ পতিত করুণাসিন্ধু অধম জনার বন্ধু প্রেমদানে সভে কৈল সুখী। পূরিল সভার আশ একা নরহরিদাস জগতের মাঝে রৈল দুখী ॥ ৬০ ॥ (৬) পত্র ৩ক-৪ক।

৭

ও মোর গোঁসাই কাশীশ্বর যার মূর্তি মনোহর মহাবলবান মহাশয়। ১। নীলাচলে মহারঙ্গে মিলিলা প্রভুর সঙ্গে প্রভু বিনা অন্য না জানয় ॥ জগন্নাথ দরশনে নিত্য যান প্রভু সনে কি বলিব পরাক্রম তার। প্রেমে ডগমগি তনু গুণের সমুদ্র জনু সুখময় পণ্ডিত উদার ॥ কথোক দিবস পরে প্রভু কহে কাশীশ্বরে শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবন। শুনি নেত্রে ধারা বয় কাতর হইয়া কয় প্রভু বিনু না রবে জীবন ॥ তিলেক না দেখি প্রাণ করে অতি আনছান কেমনে যাইব দূরদেশ। আজ্ঞা হয় কাছে থাকি এ রূপ মাধুরী দেখি নহিলে দুখের নাই শেষ ॥ শুনিয়া শ্রীবিশ্বম্ভর প্রেমে মহা গর গর করি পুন দৃঢ় আলিঙ্গন। নিজ প্রতিমূর্তি দিয়া কহেন আনন্দ হৈয়া ঐছে সদা পাবে দরশন ॥ ১০ ॥ তুয়া সঙ্গে কব কথা ঘুচাব মনের বেথা ঐছে মাগি করিব ভোজন। দুই দেহ ভিন্ন নয় জানো এই সুনিশ্চয় সব বাঞ্ছা হইবে পূরণ ॥ গোবিন্দের সেবা তথা আনন্দে করিবে এথা কহিয়া পাঠাবে সমাচার। ঐছে কত কত কয় দুনয়ানে ধারা বয় ইহা বুঝে হেন শক্তি কার ॥ গোঁসাই আনন্দ পায়া গৌরমুখ নিরখিয়া প্রেমে টলমল করে তনু। তিতিল নয়ন জলে পড়িয়া ধরণীতলে মস্তকে লইল পদরেণু ॥ প্রভু দৈন্য যুক্ত হৈয়া কাশীশ্বর পানে চায়া উঠাইল দুই ভুজে ধরি। পুন পুন করে কোলে ভাসে দুহু নেত্র জলে প্রেমের বালাই লৈয়া মরি ॥ প্রেমভরে গরগর চলিলেন কাশীশ্বর গৌরাঙ্গ বিগ্রহ হিয়ে ধরি। কথোদিনে বৃন্দাবনে প্রবেশিলা হর্ষমনে বন-শোভা দেখে নেত্র ভরি ॥ ২০ ॥ শ্রীরূপ আছেন যথা শীঘ্র করি গেলা তথা সভাকার মহাসুখ হৈলো। শ্রীগৌরবিগ্রহ দেখি সভার সজল আঁখি ভাবাবেশ বর্ণিতে নারিল ॥ সভার উল্লাস চিতে গোবিন্দের দক্ষিণেতে বসাইল গৌরাঙ্গের তরে। বিস্তারিতে নারি গুণ গোবিন্দের সেবা পুন সমর্পণ কৈল কাশীশ্বরে ॥ গোঁসাইর অদভুত রীত সেবায় পরম প্রীত সতত রহয়ে সাবধান। শ্রীগৌর গোবিন্দ দেখি প্রফুল্ল যুগল আঁখি নিরন্তর আনন্দ পরাণ ॥ বাঢ়ায় অদভুত প্রেমা নাহিক যাহার সীমা কথনু হাসয়ে নাচে কান্দে। কভু ভূমে গড়ি যায় কভু করে হায় হায়

মহাধীর ধৈরজ না বান্ধে ।। মহা উনমত্ত হৈয়া দুই ভুজ পসারিয়া গোবিন্দেরে করে আলিঙ্গন। ঐছে ভাব নিতি নিতি দেখিয়া বিস্ময় অতি হইলা শ্রীরূপসনাতন ।। ৩০ ।। প্রভুর নিকটে তার পাঠাইলা সমাচার শুনি প্রেমাবিষ্ট প্রভুর মন। প্রিয় কৃষ্ণ পণ্ডিতেরে শীঘ্র পাঠাইল তারে করিলেন সেবা সমর্পণ ।। গোঁসাই শ্রীকাশীশ্বরে সভাই মর্যাদা করে অদ্ভুত যাহার মহিমা। মথুরা মণ্ডলে যার বিশেষে খেয়াতি আর কি কহিব বৈরাগ্যের সীমা ।। প্রেমরসে নিগমন ভক্ষণে নাহিক মন তরুতলে বাস অনুক্ষণে। কারে কিছু নাহি কহে অচেতন হৈয়া রহে দিবসরজনী নাহি জানে ।। তিলেক না যায় বৃথা সদা রাধাকৃষ্ণ কথা সপনে গৌরাঙ্গ গুণ গায়। যার গুণ শ্রবণেতে মহানন্দ হয় চিতে সব দুঃখ তুরিতে পালায় ।। গোঁসাই আপন গুণে উদ্ধারে অধম জনে দান করে প্রেমরত্ন ধন। দীন **নরহরিদাসে** বঞ্চিত করম দোষে পাপ পথে ভ্রমে অনুক্ষণ ।। ৪০ ।। (৭) পত্র ৪ক-৪খ।

৮

গৌরপ্রিয় গুণমণি কেবল রসের খনি শ্রীগোবিন্দ ঘোষ মহাশয়। ১। গৌর প্রাণধন যার কি দিব উপমা তার না দেখি এমন দয়াময় ।। রসিক শেখর বর যার দুই সহোদর বাসুঘোষ মাধব বিদিত। ভুবন ভরিল যশে সদামত্ত গৌররসে সুখময় সঙ্গীত পণ্ডিত ।। গন্ধর্ব কিন্নর দূরে কেবা নাহিক ঝুরে যার গানে পাষাণ মিলায়। আর কি হইবে হেন চান্দের জলদ যেন সুধাবৃষ্টে জগত ভাষায় ।। শচীসুত গৌরচন্দ্র অদ্বৈত শ্রীনিত্যানন্দ গদাধর শ্রীবাসাদি যত। শুনিয়া যাহার গান ধরিতে নারয়ে প্রাণ প্রেমাবেশে হন উনমত ।। সংকীর্তন-প্রিয় গোরা গোবিন্দের গানে ভোরা ধরিয়া ধরিয়া করে কোলে। হিয়ার মাঝারে থুয়া গোবিন্দের মুখ চায়া ভাসে পহু নয়ানের জলে ।। ১০ ।। ধৈরজ ধরিতে নারে হুংকার গর্জন করে অদভুত প্রেমার তরঙ্গ। কনক পর্বত প্রায় ভূমে ঘন গড়ি যায় ধূলায় ধূসর গৌর অঙ্গ ।। বিদ্যুতের পুঞ্জ জনু সঘনে কাঁপয়ে তনু তিলেক ধৈরজ নাহি বাঁধে। বর্ণিতে নারয়ে শেষ দেখিয়া সে ভাবাবেশ কি নারী পুরুষ সভে কাঁদে ।। প্রেমময় গৌরহরি যতনে ধৈরজ ধরি গোবিন্দ ঘোষের গুণ গায়। নিতাই অদ্বৈত প্রতি কহে পহু প্রেমে মাতি সভে দয়া করহ ইহায় ।। গৌরপ্রিয় ভক্তগণ সভার উল্লাস মন প্রশংসে গোবিন্দ ভাগ্যরাশি। গোবিন্দের প্রেমভক্তি বর্ণিতে নাহিক শক্তি সংকীর্তনে মত্ত দিবানিশি ।। একদিন

গৌরহরি গৌবিন্দের পানে হেরি হাসিয়া কহয়ে ধরি হাথে। মোর বাক্য চিত্তে ধরি অতিশয় শীঘ্র করি প্রকাশ করহ গোপীনাথে ॥ ২০ ॥ চিন্তা না করিহ তুমি প্রকাশ করিল আমি এরূপ পাইবে দরশন। শুনিয়ে প্রভুর বাণী গোবিন্দ আনন্দ মানি বন্দিলেন যুগল চরণ ॥ ধন্য অগ্রদ্বীপ পুরে নির্মল জাহ্নবী তীরে গোপীনাথ সেবা প্রকাশিল। আনিয়া মহান্ত সব কৈল মহামহোৎসব সংকীর্তনে জগত ভাসিল ॥ শ্রীঘোষ ঠাকুর মনে যে সুখ তা কে বাখানে সেবারসে সতত বিভোর। প্রাণের পরাণ যেন গোপীনাথ মেন হেন প্রেম কি কহিতে আছে ওর ॥ শ্রীগোপীনাথের পানে হেরি ধারা দুনয়ানে আপনা নিছনি করে তায়। কি বা সে রূপের ছটা নবীন মেঘের ঘটা ভঙ্গীতে ভুবন মুরুছায় ॥ অধরে মধুর হাসি বরিষে অমিয়া রাশি যুবতি মোহন দুটি আঁখি। চূড়ার টালনি বাম ইথে কি উপমা কাম কে ধরে ধৈরজ শোভা দেখি ॥ ৩০ ॥ আর অপরূপ শুন দেখিতে দেখিতে পুন গোপীনাথ হৈলা গোরাচাঁদ। কনক জিনিয়া তনু রসের মুরতি জনু জগত জনের মন ফাঁদ ॥ কত শত চাঁদ দুরে বদনে মদন ঝুরে ভুজযুগ আজানুলম্বিত। সুচারু চাঁচর কেশ ভুবন মোহন বেশ শ্রবণে কুন্তল সুশোভিত ॥ গলে দোলে বনমাল পরিসর বক্ষ ভাল ভুবনে উপমা যার নাই। শ্রীগোবিন্দ ঘোষ সুখে নয়ান ভরিয়া দেখে গৌর গোপীনাথ এক ঠাঁই ॥ গোপীনাথ প্রেমাধীন রাখিল তাহার চিন কি কব সে জগতে বিখ্যাত। আর কি এমন হয় সকল লোকেতে কয় ঘোষ-ঠাকুরের গোপীনাথ ॥ যাহার করুণা বলে গৌর গোপীনাথ মিলে শুনি গুণ নিবেদি নিশ্চয়। **নরহরি** দীনহীনে রাখ রাঙ্গা শ্রীচরণে শ্রীঘোষ ঠাকুর কৃপাময় ॥ ৪০ ॥ (৮) পত্র ৪খ-৫ক।

৯

আরে মোর গুণমণি কেবল প্রেমের খনি বক্রেশ্বর পণ্ডিত ঠাকুর। ১। অদভুত চরিত তার কহে হেন সাধ্য কার জীবে যার করুণা প্রচুর ॥ বুঝিতে না পারে কেহ অত্যন্ত উদার যেহ শ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপাপাত্র। দুঃখ সব যায় ক্ষয় ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় যার নাম সোঙরণ মাত্র ॥ মহাপ্রভুর শ্রীচরণ কমলে ভ্রমর মন কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল সদায়। দেবাসুর আদি যত যার নৃত্যে বিমোহিত ভাবাবেশ বুঝন না যায় ॥ পুলক ঝংকার লম্ফ স্বেদ হাস্য অশ্রু কম্প মূর্চ্ছা আনন্দাদি নিরন্তর। সংকীর্তন মাঝে মত্ত যে করে অদ্‌ভুত নৃত্য একভাবে চব্বিশ প্রহর ॥ প্রভু যার নৃত্যকালে ভুজ তুলি হরিবোলে চতুর্দিগে ফিরয়ে ধাইয়া। পুন প্রভু

গৌরহরি বক্রেশ্বর পানে হেরি গান করে প্রেমে মত্ত হৈয়া ।। ১০ ।। বক্রেশ্বর যতক্ষণ নৃত্য করে ততক্ষণ বেত্রহস্তে লৈয়া গৌরচন্দ্র। করিয়া কতেক প্রীত লোক করে এক ভীত উপজয়ে সভার আনন্দ ।। বক্রেশ্বর স্থির হৈলে প্রভু ধরি রাখে কোলে তাহার অঙ্গের ধূলা লৈয়া। সে-ধূলা আপনা অঙ্গে লেপন করয়ে রঙ্গে নেত্রযুগে অশ্রু যুক্ত হৈয়া ।। প্রভু প্রেমাধীন অতি কহে বক্রেশ্বর প্রতি মুখ্য এক পাখা তুমি মোর। যদি আর পাখা পাঙ আকাশে উড়িয়া যাঙ ঐছে কত কহে নাহি ওর ।। হেন বক্রেশ্বর যাথে করুণা করয়ে তাথে চৈতন্ত চরণ ধন মিলে। কি কব মহিমা আর মহাপাপী দুরাচার কত দীনহীনে উদ্ধারিলে ।। নরহরি অকিঞ্চন করে এই নিবেদন কৃপাকর মো হেন পামরে। বৃথা জন্ম গোঙাইনু ভক্তিমর্ম না বুঝিনু মজিলাঙ এভব সংসারে ।। ২০ ।।
(৯) পত্র ৫ক।

।। ১০ ।।

ও মোর পরাণ বন্ধু কেবল গুণের সিন্ধু হৃদয়চৈতন্য দয়াময়। ১। শিশুকালে ভক্তি অতি গদাধর পাশে স্থিতি সে কথা কহিতে সুখ হয় ।। একদিন গৌরীদাস আইলা গদাধর পাশ ভাসে দুহু সুখের সায়রে। কে বুঝিবে সে বিলাস গদাধরে গৌরীদাস কহে কিছু দ্রব্য দেহ মোরে ।। পণ্ডিত গোঁসাই কয় এসব তুমার হয় কি মোরে মাগহ বলো শুনি। হাসিয়া পণ্ডিত কহে হৃদয়েরে দেহ মোরে শুনি সুখে সোপিলু তখুনি ।। গৌরীদাস গদাধর প্রেমময় দুহু কর চরিত্র বুঝিতে শক্তি কার। বিদায় হইয়া রঙ্গে আইলা হৃদয় সঙ্গে গৌরীদাস গৃহে আপনার ।। হৃদয়কে শিষ্য কৈল সভার আনন্দ হৈল সেবায়ে নিযুক্ত করি দিলা। কথোক দিবস পরে গৌরীদাস প্রেমভরে কার্যছলে প্রবাস চলিলা ।। ১০ ।। উচ্ছব নিকট হৈল পণ্ডিত না গৃহে আইল হৃদয়ানন্দের চিন্তামনে। বিচার করিয়া কত লিখি আমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়া দিল স্থানে স্থানে ।। পণ্ডিত সে দিন পরে আনন্দে আইলা ঘরে হৃদয়ে পুছিল সমাচার। আমন্ত্রণ কথা শুনি কহে ক্রোধাবেশ বাণী বিজ্ঞা মানে এই ব্যবহার ।। যাহ তুমি অন্ত স্থান শুনিয়া উড়িল প্রাণ দুনয়ানে ধারা নিরন্তর। প্রভু আজ্ঞা না লঙ্ঘিয়া গঙ্গার নিকটে গিয়া রহিলেন কাতর অন্তর ।। কুন এক ভাগ্যবানে নৌকাভরি সেই দিনে অনেক সামিগ্রি পাঠাইল। হৃদয় গঙ্গার তীরে সমাচার দিল তারে শুনি কিছু আনন্দ হইল ।। তথা এক বৈষ্ণবেরে

ত্বরিতে কহিল তারে সমাচার দেহ প্রভুস্থানে। সে অতি আনন্দ হৈয়া সমাচার দিল যায়্যা শুনিয়া কহেন ক্রোধ মনে ॥ ২০ ॥ কি কাজ আমার লৈয়া হৃদয়েরে দেহ গিয়া শুনি পুনঃ আসিয়া কহিল। হৃদয় দুঃখিত শুনি সে সব সামিগ্রি আনি মহোৎসব আরম্ভ করিল ॥ আইল বৈষ্ণবগণ আরম্ভিলা সংকীর্তন মহাপ্রভু আনন্দ শুনিয়া। মন্দিরে অস্থির হৈলা দুইভাই শীঘ্র আইলা হৃদয়ের প্রেমে বশ হৈয়া ॥ নাচে গৌর বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ হলধর হুংকার করয়ে ঘন ঘন। হৃদয়েরে কৃপা কৈলা কে বুঝে গৌরাঙ্গ লীলা বর্ণিতে পারয়ে কুন জন ॥ এথা মন্দিরেতে গিয়া দুই প্রভু না দেখিয়া পূজারী ভাবয়ে ব্যগ্র হৈয়া। পণ্ডিত ঠাকুরে কয় শুনি মনে বিচারয় হৃদয়া গিয়াছে বুঝি লৈয়া ॥ ক্রোধে এক যষ্ঠি লৈয়া পণ্ডিত চলয়ে ধায়া দেখে দোঁহে কীর্তনে নাচয়ে। পণ্ডিতেরে নিরখিয়া দুই ভাই ভয় পায়্যা শীঘ্র মন্দিরেতে প্রবেশয়ে ॥ ৩০ ॥ পণ্ডিতের জ্ঞান হেন হৃদয় হৃদয়ে যেন প্রবেশিলা শ্রীগৌর সুন্দর। পণ্ডিত হৃদয় পানে চাহি অশ্রু দুনয়ানে হইলেন আনন্দ অন্তর ॥ প্রেমে মত্ত অতিশয় কহে আজু হৈতে হয় হৃদয়চৈতন্য তোর নাম। পণ্ডিতের কৃপা দেখি সকল বৈষ্ণব সুখী সংকীর্তনে মত্ত অবিরাম ॥ হৃদয়ে আনিয়া ঘরে মহামহোৎসব করে সুখে সেবা করি সমর্পণ। হৃদয়ানন্দের যত গুরুভক্তি কব কত যার যশে ব্যাপিল ভুবন ॥ সেবারসে সদা ভোর সুখের নাহিক ওর অদ্ভুত বৈষ্ণব পিরিতি। নিমাই চৈতন্য বিনে অন্য কিছু নাহি জানে প্রেমে উনমত্ত দিবারাতি ॥ দীনহীন অকিঞ্চনে অধম দুর্গত জনে ভাসাইলা প্রেমের সায়রে। শ্রীশ্যামানন্দের নাথ সভে কৈলা আত্মসাথ ছাড়ি নরহরি দুরাচারে ॥ ৪০ ॥
(১১) পত্র ৬ক-৬খ।

১১

আরে মোর গুণমণি সে প্রেম-ধনের ধনী গৌরপ্রিয় ভট্ট রঘুনাথ। ১। আর কি হইবে হেন দয়ার সমুদ্র মেন যে কৈল অধমে আত্মসাথ ॥ শ্রীগৌরসুন্দর বিনে অন্য কিছু নাহি জানে সে গুণে ঝুরয়ে দিবানিশি। মহানন্দ কুতুহলে আইলেন নীলাচলে যথা বিলসয়ে গৌর শশী ॥ প্রভুর নিকটে গিয়া ধরণীতে লোটাইয়া বন্দিলেন চরণযুগল। ও মুখচন্দ্রমা পানে হেরি ধারা দুনয়ানে প্রেমে অঙ্গ করে টলমল ॥ প্রভু রঘুনাথে দেখি প্রেমে ছল ছল আঁখি কৈলো কোলে দুবাহু পসারি। অশেষ আনন্দ মনে স্বরূপাদি ভক্তগণে মিলাইল

পূর্ণ কৃপা করি ।। ভকত বৎসল গোরা রঘুনাথ গুণে ভোরা তিল আধ না পারে ছাড়িতে। রঘুনাথ গৌর সঙ্গে সদা রহে প্রেমরঙ্গে আর যত নারি বিস্তারিতে ।। ১০ ।। প্রভু কথোদিন পরে কহে প্রিয় শ্রীভট্টেরে যাইতে হইল বৃন্দাবনে। পূর্ণ হবে অভিলাষ তথা গিয়া করো বাস যথা রহে রূপসনাতনে ।। ভাগবত আস্বাদিবে সদা কৃষ্ণনাম লবে ঐছে প্রভু অনেক কহিয়া। শ্রীজগন্নাথের মালা প্রিয় রঘুনাথে দিলা প্রেমাবেশে অস্থির হইয়া ।। দুনয়ানে বহে ধারা কান্দিতে কান্দিতে গোরা রঘুনাথে দিলেন বিদায়। প্রভু মুখপানে চায়া ধরণীতে লোটাইয়া রঘুনাথ করে হায় হায় ।। এ সব ভকত সঙ্গ শ্রীগৌরসুন্দর অঙ্গ আর কি দেখিব রঘুনাথে। দুখ কে বর্ণিতে পারে প্রভু পদ বন্দি শিরে কান্দিতে কান্দিতে চলে পথে ।। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম জপে মাত্র অবিরাম গৌররূপ চিন্তে অনুক্ষণ। অত্যন্ত ব্যাকুল মনে আইলা শ্রীবৃন্দাবনে যথা রহে রূপসনাতন ।।২০ ।। রঘুনাথ প্রেমভরে মিলিলা সভার তরে আনন্দ হইলা ভক্তগণে। গৌরকথামৃতধনি রঘুনাথ মুখে শুনি ফুকারি কান্দয়ে সর্বজনে ।। গোরাগুণ সোঙরিয়া সভার আকুল হিয়া আর যত বিস্তার না হয়। বৃন্দাবনে রঘুনাথ রূপসনাতন সাথ সদা রহে আনন্দ হৃদয় ।। গোবিন্দের শ্রীচরণে কৈল আত্মসমর্পণে গোবিন্দ পরাণ ধন যার। প্রেমে মত্ত অহর্নিশি রূপের সভাতে বসি ভাগবত পড়ে চমৎকার ।। কোকিলের কণ্ঠ জিনি অত্যন্ত অপূর্ব ধ্বনি যেন সুধা করে বরিষণ। প্রতি শ্লোকের রাগগণে মূর্তিমন্ত করি আনে শুনি তৃপ্ত হয় কর্ণ মন ।। কৃষ্ণের সৌন্দর্য যবে শ্লোক পাঠ করে তবে স্থির হৈতে নারে মহাশয়। অঙ্গ টলমল করে ভাসয়ে নয়ান নীরে অপরূপ ভাবের উদয় ।। ৩০ ।। গোঁসাইর বৈরাগ্য অতি অদ্ভুত ভজনরীতি জগত ব্যাপিল নাই ওর। গৌরদত্ত মালা লৈয়া হিয়ার মাঝারে থুয়া গোরাগুণে কান্দিয়া বিভোর ।। নিতাই অদ্বৈত বলি কান্দয়ে দুবাহু তুলি উনমত পাগল প্রায় হৈয়া। সদাই পরাণ ঝুরে ধৈরজ ধরিতে নারে শ্রীগৌরগণের নাম লৈয়া ।। প্রেমের আবেশ যত তাহা বা কহিব কত অধমে যে প্রেমধন দিল। নরহরি নিজ দোষে মজিল বিষয় ফাঁসে সে ধন পরশ না পাইল ।। ৩৬ ।। (১৩) পত্র ৭ক।

১২

আরে মোর প্রাণরূপ গোঁসাই রসিক ভূপ গুণের সমুদ্র দয়াময় ।১। যাহার করুণা হৈলে চৈতন্যচরণ মিলে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় ॥ পরম বৈরাগ্য যার

চরিত্র নাহিক পার অসীম ঐশ্বর্য্য ত্যাগ দিয়া। মহাপ্রভুর আগমন শুনি গোঁসাই সেই ক্ষণ প্রয়াগে চলিলা হর্ষ হৈয়া॥ অনুজ বল্লভ সনে শীঘ্র আইলা প্রভু স্থানে দর্শনে আনন্দ উপজিল। গৌর পাদপদ্ম হেরি পরম বিনয় করি দোঁহে ভূমে পড়ি প্রণমিল॥ পুনঃ পুনঃ দুই জনে নিরখিয়া প্রভু পানে প্রেমাবেশে ব্যাকুল কান্দিয়া। দন্তে তৃণগুচ্ছ ধরি দৈন্য করে বেরি বেরি যা শুনিতে বিদরয়ে হিয়া॥ শ্রীরূপেরে নিরখিয়া প্রভু প্রেমে মত্ত হৈয়া দুবাহু পসারি ধাআ আইল। অজ ভব দেবগণ আরাধয়ে যে চরণ তাহা রূপের মস্তকে ধরিল॥ ১০॥ কান্দিয়া শ্রীগৌররায় উঠ উঠ বলি তায় মহাসুখে কৈলা আলিঙ্গন। শ্রীরূপ দুহাত জুড়ি স্তুতি করে শ্লোক পড়ি তাহা কিছু না হয় বর্ণন॥ রূপের যেরূপ দৈন্য শুনি প্রভু শ্রীচৈতন্য অস্থির হইল অতিশয়। প্রয়াগের ভক্ত যত দেখি সবে চমকিত রূপের মিলন রসালয়॥ কনক সুন্দর গোরা জগতের চিত্তচোরা চরিত্র বুঝিতে কে বা পারে। শ্রীরূপের প্রেমাধীন রাখিল তাহার চিন্ আলিঙ্গন করি বারে বারে॥ পুনঃ প্রভু রূপে লৈয়া নিকটেতে বসাইয়া সনাতনের পুছে সমাচার। শ্রীরূপ কহিলা পুনি শুনি গৌরগুণমণি কহে কিছু চিন্তা নাহি তার॥ এইরূপে কতক্ষণ করি বহু আলাপন শ্রীরূপের দুঃখ নিবারিলা। পরম আনন্দ মনে মিলাইল ভক্তগণে রূপে মিলি সভে সুখী হইলা॥ ২০॥ প্রেমসিন্ধু গৌরহরি রূপে পুনঃ কৃপা করি রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব শিখাইলা। কথোক দিবস পরে প্রভু কহে শ্রীরূপেরে ব্রজে যাহ বর্ণবে এ লীলা॥ কাতরে শ্রীরূপ কয় সঙ্গে থাকি আজ্ঞা হয় এত কহি লাগিলা কান্দিতে। রূপের ব্যাকুলি দেখি প্রভুর সজল আঁখি রূপেরে নারয়ে প্রবোধিতে॥ ধরিয়া রূপের করে প্রভু কহে ধীরে ধীরে চিন্তা না করিহ কিছু চিতে। তোর প্রেমাধীন আমি সদা সঙ্গে আছ তুমি পুনশ্চ আসিবে ব্রজ হৈতে॥ এইরূপ কহি কত তবে প্রভু শচীসুত কাশী চলে নৌকাতে চড়িয়া। গৌরচন্দ্র অদর্শনে শ্রীরূপ ব্যাকুল মনে ভূমে পড়ে মূর্ছিতা হইয়া॥ সে সময়ে ভেল যাহা কহিতে না পারি তাহা কতক্ষণে কিছু সম্বরিলা। মহাপ্রভুর শ্রীচরণ তাহে সমর্পিয়া মন বৃন্দাবনে গমন করিলা॥ ৩০॥ অত্যন্ত দুঃখিত চিতে শীঘ্র আইলা মথুরাতে সুবুদ্ধি মিশ্রের দেখা পাইলা। মিশ্র আনন্দিত হইয়া দুইজনে সঙ্গে লৈয়া শীঘ্র দ্বাদশ বন করাইলা॥ বিস্তারিতে নারি আর গমনাগমন তার কথোক দিন পরে বৃন্দাবনে। শ্রীরূপ শ্রীসনাতন হৈল দোঁহার সুমিলন দোহ প্রেম অন্যে নাহি জানে॥

আলিঙ্গন করি দুহে চৈতন্যের গুণ কহে যাহা শুনি পাষাণ মিলায়। দুহুঁ প্রেমভরে কান্দে ক্ষণেক না স্থির বান্ধে আর যত কহনে না যায়॥ অতি অনুরাগ মনে শ্রীরূপ শ্রীবৃন্দাবনে গৌরপ্রেমে সতত উল্লাস। ফলমূল মাধুকরি বিপ্রগৃহে ভিক্ষা করি কভু ভুঞ্জে কভু উপবাস॥ ছিঁড়া কাঁথা বহির্বাস এইমাত্র রহে পাশ তরুতলে করয়ে শয়ন। দিবানিশি অবিশ্রাম জপয়ে মধুর নাম ভাবভরে করয়ে নর্তন॥ ৪০॥ ক্ষেণে করে সংকীর্তন অন্তর্মনা অনুক্ষণ কি কব ভজন রীতি তার। প্রভুর আজ্ঞায় যত বর্ণিলেন গ্রন্থ কত প্রেমময় অক্ষর যাহার॥ মহাবীর অনুদার কে বুঝে হৃদয় তার কভু যমুনার তটে যাইয়া। হা শচীনন্দন বলি কান্দয়ে দুবাহু তুলি ডাকে রাধকৃষ্ণ নাম লৈয়া॥ অতি সুকোমল দেহ সদা ভূমে লোটে সেহ আর কি বর্ণিব এক মুখে। অধম পামর গণে পতিত দুখিত জনে নিজগুণে কৃপা করে তাথে॥ নরহরি দুরাচার কহে কর অঙ্গীকার পাপেতে হইল অতি ভোর। ও পদপংকজরজে সদা যেন মন মজে এই নিবেদন শুন মোর॥ ৪৮॥ (১৪) পত্র ৭ক-৮ক।

১৩

গোঁসাই শ্রীসনাতন দ্বিজেন্দ্র দুঃখীর ধন শ্রীকুমার দেবের কুমার। ১। দক্ষিণ দেশাধিপতি শ্রীমুকুন্দদেব খ্যাতি তাঁর পৌত্র জগতে প্রচার॥ পরম করুণাবান রসিক জনার প্রাণ শ্রীরূপ গোসাঞিের বড় ভাই। যাহার অদ্ভুত ক্রিয়া পাতসার উজির হৈয়া বিষয় বাসনা মাত্র নাই॥ বৈরাগ্রের চূড়ামণি না মানি পাতসার বাণী নিজ ইচ্ছায় মানিল বন্ধন। বন্দীশালে অনুক্ষণ চিন্তে গৌর গুণগণ অন্য না জানএ যার মন॥ শ্রীরূপ গোঁসাই তথা লিখি এক পত্রী এথা শীঘ্র করি পাঠাইয়া দিলা। পত্র পাইয়া সনাতন মহা আনন্দিত মন পালাইতে উপায় চিন্তিলা॥ সাতহাজার মুদ্রা লৈয়া রক্ষক যবনে দিয়া রাত্রিকালে হৈলা গঙ্গাপার। গৌরপদ হৃদে ধরি চলিলেন শীঘ্র করি দিবানিশি না করি বিচার॥ ১০॥ পাতড়া পর্বত আইল তাহা এক হুঁয়া ছিল তার গৃহে গমন করিলা। সে অত্যন্ত দুরাচার হুইমানি নাম তার তাহে মিলি কহিতে লাগিলা॥ দারুণ পর্বত এহ মোরে পার করি দেহ এই ধর্ম করহ আপনি। শুনি হুঁয়া দুষ্টমতি আদর করিল অতি ভক্ষণ সামিগ্রি দিল আনি॥ রাজমন্ত্রী সনাতন বিচারয়ে মনে মন কি লাগি সম্মান এত করে। ঈশানে ডাকিয়া কয় তোর ঠাঁই অর্থ হয় না রাখিহ দেহ অর্থ মোরে॥ শুনি ঈশান আনিল সপ্ত স্বর্ণমুদ্রা দিল গোঁসাই

হুঁয়ারে সমর্পিলা। মুদ্রা দেখি হুঁয়া বলে ভাল কৈলে আনি দিলে মোরে পাপ হৈতে রক্ষা কৈলা ॥ সকল পাইল আমি এবে সঙ্গে রাখ তুমি শুনি কিছু কহেন গোঁসাই। ধনের কি কাজ মোর কোথা জানি নিবে চোর ভাল কৈল দিল তুয়া ঠাঁই ॥ ২০ ॥ গোঁসাইর চরিত্র দেখি হুঁয়া অতিশয় সুখী সঙ্গে চারিজন লোক দিল। গোঁসাই চলিলা ত্রস্ত পরিধান ছেঁড়া বস্ত্র হাতে মাত্র করোআ লইল ॥ বিপথে চলিয়া যায় কণ্টকাদি বাজে পায় কভু না জানয়ে দুঃখ গন্ধ। হেন দুঃখ নাহি জ্ঞান গৌরপদ করি ধ্যান উপজয়ে পরম আনন্দ ॥ বনপর্বত পার হৈয়া ঈশানে বিদায় দিয়া হাজিপুরে শ্রীকান্তে মিলিলা। তেহোঁ মহাযত্ন করি গোঁসাঞে রাখিতে নারি যাত্রা কালে ভেট এক দিলা ॥ কাশীপুরে সনাতন চলিলা আনন্দমন মহাপ্রভুর গমন শুনিয়া ॥ চন্দ্রশেখরের ঘরে তাহার বাহির দ্বারে বসিলেন আপনি আসিয়া ॥ গোঁসাইর গমন জানি আনন্দিত গৌরমণি কহে চন্দ্রশেখরে ডাকিয়া। তোমার দ্বারেতে এক বৈষ্ণব আছয়ে দেখ মোর কাছে আনো বোলাইয়া ॥ ৩০ ॥ শুনি আইল দ্বারে দরবেশ দেখি তারে প্রভু আগে যাইয়া কহিলা। প্রভু কহে তাহে আন শুনিয়া আইলা পুন যত্নে নিজাঙ্গনে লইয়া গেলা ॥ পাইয়া প্রভুর দরশন আনন্দিত সনাতন ভূমিতলে পড়িল লোটাইয়া। সনাতনে দেখি গোরা প্রেমাবেশে মাতোয়ারা দুবাহু পসারি আইল ধাইয়া ॥ গোরা বলে ঘনঘন আইস মোর সনাতন ইহা বলি তুলি লইল কোলে। সনাতনে কোলে করি কান্দে পহু গৌরহরি ধারা বহে দুয়ানের জলে ॥ দুহুঁ গলাগলি কান্দে কেহ নাহি থির বান্ধে শ্রীচন্দ্রশেখর দেখি ধন্ধ। প্রভুর অদ্‌ভুত লীলা সনাতনে কৃপা কৈলা উপজিল পরম আনন্দ ॥ প্রভুর অঙ্গ স্পর্শনে সনাতন হর্ষ মনে গদগদ বচনে কিছু বোলে। মো বড় বিষয়ী হঙ্‌ তোমা স্পর্শ যোগ্য নঙ্‌ মোরে স্পর্শ নাহি তব চলে ॥ ৪০ ॥ প্রভু কহে পুন পুন আজু মোর শুভদিন পবিত্র হইল স্পর্শি তোহে। কাতরে গোসাঞি কয় মোর দেহ পাপময় হেনবাক্য কেন কহ মোহে ॥ মো বড় পতিতহীন মোর সম নাহি দীন মোরে বঞ্চ কিসের লাগিয়া। শুনি প্রভু কহে পুন দৈন্য ছাড় সনাতন তোর দৈন্যে ফাটে মোর হিয়া ॥ এত কহি হাতে ধরি লৈয়া পীড়ার উপরি সনাতনে আসনে বসাইয়া। বড় দুঃখ পাইলা বলি ছাড়ান অঙ্গের মলি প্রেমাবেশে আকুল হইয়া ॥ সঙ্কোচিত সনাতন দৈন্য করে পুন পুন শুনি প্রভু আনন্দে ভাসিলা। তপন মিশ্রের তরে আর

চন্দ্রশেখরেরে দোহে সনাতনে মিলাইলা ।। প্রভু কহে শেখর স্থানে লহ এই সনাতনে শুনি মিশ্র খেউর করাইলা। সনাতন স্নান কৈল মিশ্র নৌতুন বস্ত্র দিল তাহে নাহি অঙ্গিকার কৈলা ।। ৫০ ।। যবে বস্ত্র চাইয়া লইল তাহে পরিধান কৈল বহির্বাস কৌপিন করিয়া। মিশ্র আদি কহে ধন্য আনন্দিত শ্রীচৈতন্য সনাতনের বৈরাগ্য দেখিয়া ॥ তবে প্রভু ভিক্ষা কৈল শেষ সনাতনে দিল সুখে গোঁসাই করিলা ভোজন। সনাতনের ভোট গায় দেখিয়া গৌরাঙ্গ রায় পুন পুন করে নিরীক্ষণ ।। গোঁসাই বুঝিয়া মনে শীঘ্র গেলা গঙ্গাস্নানে তাহাঁ এক গৌড়িয়া দেখিলা। তারে নিজ ভোট দিয়া তার ছেঁড়া কাঁথা লৈয়া পুনঃ প্রভু নিকটে আইলা ।। সনাতনের দেখি কাঁথা প্রভু পুছে ভোট কোথা শুনিয়া সকল নিবেদিলা ।। হইয়া পরমানন্দ তবে প্রভু গৌরচন্দ্র রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব শিখাইলা ।। প্রভু কহে সনাতন যাহ এবে বৃন্দাবন শুনি বহু দুঃখ ভেল মনে। প্রভুবাক্য না লঙ্ঘিয়া বিরহে ব্যাকুল হৈয়া গমন করিয়া বৃন্দাবনে ।। ৬০ ।। প্রভাতে সে পথে চলে হা গৌরাঙ্গ সদা বলে বিরহে না স্থির হৈতে পারে। চৈতন্যচরণে মন সমর্পিয়া সনাতন কথোদিনে গেলা ব্রজপুরে ।। মথুরা প্রবেশি সুখে সুবুদ্ধি মিশ্রেরে দেখে তেহ সনাতনেরে চিনিলা। মিশ্র মহাহর্ষ মনে পুছে সব সনাতনে শুনিয়া গোঁসাই নিবেদিলা ॥ যত্নে পুন মিশ্র কহে রূপ অনুপাম দোহে এথা আসি গেলা প্রভুস্থানে। তুমি রাজপথে আইলা তেঁহ গঙ্গাপথে গেলা এ হেতু না দেখা তার সনে ।। এত কহি সনাতনে লৈয়া আইলা নিজস্থানে করাইলা স্নান সুভোজন। তথা হইতে সনাতন গেলেন শ্রীবৃন্দাবন বনে বনে করিলা ভ্রমণ ।। যত লুপ্ত তীর্থ ছিল তাহা সব প্রকাশিল সতত রহয়ে প্রেমরঙ্গে। সদা একেশ্বর ফিরে তার কথোদিন পরে মিলন হইল রূপ সনে ।। ৭০ ।। দুহুঁ দুহেঁ আলিঙ্গয়া কান্দয়ে ব্যাকুল হৈয়া দুহুঁ নারে ধৈরজ ধরিতে। দুহুঁার অদ্‌ভুত প্রেম যেন অতি শুদ্ধ হেম দুহুঁ কথা কে পারে বর্ণিতে ।। দুহুঁ কহে গৌরলীলা শুনিতে গলয়ে শিলা স্থির হৈতে নারে দুইজন। হা নাথ হা নাথ বলি কান্দে দুই ভুজ তুলি যে দশা তা না যায় কহন ।। সনাতন অনুদার পরম বৈরাগ্য যার সঙ্গে ছেঁড়া কাঁথা বহির্বাস। ব্রজপুরে বিপ্রঘরে মাধুকরি ভিক্ষা করে কভু ভুঞ্জে কভু উপবাস ।। কভু ফলমুল আনি ভুঞ্জয়ে আনন্দ মানি কভু চ না করয়ে রন্ধন। অতিশয় অনুরাগ ভোগ আদি করি লাগ আনন্দে রহেন সনাতন ।। গোঁসাই চরিত্র আর বর্ণিতে

সামর্থ্য কার ভাবগুণে কেবা নাহি ঝুরে। গৌড় হৈতে যায় যত কাঙ্গালী বৈষ্ণব কত যত্নে তাকে রাখে ব্রজপুরে ।। ৮০ ।। ভাগবতামৃত আদি গ্রন্থ লেখে নিরবধি দান করে অমূল্য ভকতি। ব্রজে মহা কুতুহঁলে একেক বৃক্ষের তলে একেক রজনী করে স্থিতি ।। অতি সুকুমার তনু শিরিস কুসুম জনু সে ধূলি লোটায় অনুক্ষণ। অষ্ট যামে কৃষ্ণরসে উনমত্ত আনন্দাবেশে চারিদণ্ড করয়ে শয়ন ।। স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ কয় তিলেক না ব্যর্থ হয় কভু সংকীর্তনে বঞ্চে নিশি। গৌরাঙ্গের গুণগণ চিন্তিতে ব্যাকুল মন একান্ত স্থানেতে রহে বসি ॥ বংশীবট তটে গিয়া ডাকয়ে ব্যাকুল হৈয়া কোথা কৃষ্ণ দেখা দেহ মোরে। নয়ন যুগলে ধারা বহে মহা নদী পারা এইরূপে আর্তনাদ করে ।। কভু নিধুবনে গিয়া রাস আদি সঙ্‌রিয়া মূর্ছিত রহয়ে ভূমে পড়ি। বিরহ বিষয় জ্বরে কান্দে অতি উচ্চ স্বরে কভু ভূমে যায় গড়াগড়ি ॥ ৯০ ॥ কভু দেখি কুঞ্জবন করি পূর্ব সঙরণ আনন্দ সমুদ্রে রহে ভাসি। ভাবের উদয় যত তাহা কে কহিবে কত অশ্রু কম্পে পূর্ণ দিবা নিশি ॥ এরূপ কি হবে আর বিদিত মহিমা যার যে গৌরগণের প্রিয় পাত্র। প্রভু আজ্ঞা ধরি শিরে প্রেমভক্তি দান করে আনন্দে ভাসএ প্রাণীমাত্র ॥ **নরহরি** কর্মদোষে মজিয়া বিষয় ফাঁসে তথাপি রহয়ে লাজ খাইআ। মুই মহা পাপাচার মোর কেহ নাহি আর উদ্ধার করুণা দিঠে চাইআ ॥ ৯৬ ॥ (১৫) পত্র ৮ক-৯খ।

১৪

ও মোর গোপাল গুরু ভকতি কল্পতরু শ্রীমকরধ্বজ নাম যার। ১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যযাকে গোপাল বলিয়া ডাকে দেখি শিশু চরিত্র উদার ।। গৌরাঙ্গের সেবারসে সদাই আনন্দে ভাসে গোরাবিনু নাহি জানে আন। তিলেক না দেখি যাঁরে ধৈরজ ধরিতে নারে গোরা যেন গোপালের প্রাণ ॥ গোপাল প্রভুর প্রতি শিক্ষা দিল এক রীতি প্রভু প্রেমাবেশে ঢুলিঢুলি। কহে সভে বারে বারে আজি হৈতে গোপালেরে ডাকিবে গোপালগুরু বুলি। গোপালে করুণা দেখি সভার সজল আঁখি সুখের সমুদ্র উথলিল। সবে কহে অনুপাম শ্রীগোপাল গুণধাম প্রভু-দত্ত জগতে ব্যাপিল ।। গোপালের গুরুভক্তি কহিতে নাহিক শক্তি সদাই প্রসন্ন বক্রেশ্বর। মহামত্ত নৃত্যগীতে নাহিক উপমা দিতে সর্বচিত্তাকর্ষ কলেবর ।। দেখিব সকল ঠাঁই এমন দয়ালু নাই

জগতে যাহার নাম ঘোষে। সভে কৈল প্রেমপাত্র হইল বঞ্চিত মাত্র **নরহরি** নিজকর্ম দোষে ।। ১২ ।। (১৬) পত্র ৯খ।

পুথি খণ্ডিত

গীতচন্দ্রোদয়

পাঠবাড়ী পুথি ২৫৩৪।৩; কবির রচিত মোট ১৭৭টি পদের মধ্যে ৩০টি 'ভক্তিরত্নাকরে', ১টি 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে, ২টি 'পদকল্পতরু'তে, ৫টি 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে এবং স্বামী প্রজ্ঞানন্দের 'রাগ ও রূপ'—'উত্তরভাগে' ১৪টি মুদ্রিত হয়েছে। সেগুলি বাদ দিয়ে বাকি ১২৬টি নতুন পদ এখানে সংকলিত হলো।

১৫

জয় জয় শ্রীগুরু পরম কৃপাময় মঞ্জু মহিম জন রঞ্জনয়া। নির্মল রুচির চরিত্র অতি দুর্গম ভব ভয় ভঞ্জনয়া ॥ নিরুপম ভাব বিভূষণ ভূষিত সুন্দরবর মুদবর্দ্ধনয়া। বিমলভক্তি ধন দায়ক সুরতরু চিন্তামণি মদ মর্দনয়া ।। দ্রাং দ্রাং দ্রাং দৃমি তৃগড তিকট থো থো ধিগি ধিগি তগ ধিকট ধিন। নিজ শরণাগত রক্ষক পতিতাধম বান্ধব গুরু ত্রিভুবন বিদিতয়া ।। হে প্রভো তব চরণ পংকজ মধুপ **নরহরিদাস**। অবিরত মাতল নাচনে গৌরকৃষ্ণ বিলাস ।। মম্ম ম্ম গধিন প-ধ-নি-প-ধ-নি-প-ধ-নি-ধ-সা-রি-রি-গ-রি-গ-তি-অই-আ। অই অইতি অই অই তেন্নাতি অই অ আই আ অই অই তি য়া ॥ (পত্র ২ক)

১৬

শ্রীগুরুদেব পরম সুখধাম। চিন্তহ সোই মুরুতি অবিরাম ।। পীঅহ চরিত অমিয় রসধার। গাঅহ অভিনব মহিম অপার ।। রটহ সুনাম ছুটব ভবত্রাস। সেবহ সতত পূরব অভিলাষ ।। যো ভেল ঐছে পহুঁক পদহীন। **নরহরি** ভণই তাক দূর দীন ।। (পত্র ২ক)

১৭

জয় গৌরকৃষ্ণ করুণাময় মানদ মদনার্বুদ মদদমন দেববৃন্দ-বন্দ্য সুন্দর শশি বদনা। শরণাগত জনতারণ গুণসাগর জিত বারণ গতি মঞ্জুন জনরঞ্জন ধৃতিভঞ্জন সুখ মদনা ।। কমলেক্ষণ নিজভক্ত কুমুদবান্ধব ভবশোকহরণ নির্মল নিজভক্তি দান নিপুণ অত্যুদারা। প্রিয় মীন কূর্মশূকর নরহরি বামন ভৃগুপতি

ব. বি. / ন. চ. (২) /৪১-১৮

রাঘব হলধর বুদ্ধ কল্কি প্রভু দশাবতারা ॥ তক থোঙ্গ থোঙ্গ অ দৃমি দৃমি কট দৃমিকট দী দী ঝেক্কু ঝেক্কু ঝং দৃগ দৃগ তাত্তাতক থৈ আ। স-রি-সা-নি-ধা-নি-নি-ধ-নি-ধ-প-ধ-প-ধ-প-ম-ম-ম-গ-রি-তেন্না তেন্না **নরহরি** ইতি গায়তি তি অ ঐ আ ॥ (পত্র ২ক-খ)

১৮

জয় জয় গৌরচন্দ্র কামদ মুদ বর্ধনা। হাটক রুচি রুচির দেহ মনমথমদ-মর্দনা ॥ মঞ্জুচিকুর চঞ্চল নব অম্বুজদল লোচনা। মধুর হাস মুক্ষিত মুখ যুবতি ধৈর্য্য মোচনা ॥ বক্ষবিপুল বন্ধুর ভুজ ভুবণজন রঞ্জনা। সুন্দরবর বন্দ্য চরণ ভব ভয় ডর ভঞ্জনা ॥ ঝিকি ঝিকি ঝিকি ঝাং রুণ রুণ ধিক্কট তক থেন্না। সপ্সরিগরি **নরহরি** ইতি গায়তি তি অ তেন্না ॥ (পত্র ২খ)

১৯

জয় জয় গৌরচন্দ্র অনুপাম। ভাতি ভকতি রথ ভূষণ অপরূপ নদীয়া উদয়ে উদয় অবিরাম ॥ ধ্রু ॥ বলি কলি কমল মলিনক নিকর নিত জীব কুমুদ প্রমুদিত অনিবার। বিষময় বিষম তাপতম ভাঞ্জন নিরমল গুণগণ কিরণ বিথার ॥ নিরবধি বিবিধ ভাবভরে গরগর বরনব কৌনব অমিয়াবিলাস। ভকতচকোর লুবধ মতি গতি নব পীবই নিরত অতি অতুল উলাস ॥ সুরগণ হৃদয় গগনমধি উদয়িতে করু কত যতন দুলহ ইহ চন্দ। বাউল পতিত কোরে করু ঝলমল হেরি করুণা **নরহরি** রহু ধন্ধ ॥ (পত্র ২খ)

২০

জয় জয় শ্রীশচীতনয় গৌরহরি নদীয়ানগর বিহরে নব নাহ। সব অবতার সার রসময় বপু গূঢ় চরিত নিরুপম জগ মাহ ॥ পামর পতিত দুখিত দূরগত জন বন্দ্য ভুবনে নব মহিম প্রচার। দেব দুর্লভ শুভ ভকতি রতন ধন দানে নিপুণ পুন করুণ অপার ॥ নিত্যানন্দ বিপদ ভয় হর প্রিয় অদ্বৈতাদি সহিত সুখে মাতি। করযুগ বীজই চারু কীর্তন ঘন প্রেমবারি বরিষএ দিনরাতি ॥ খেণে খেণে রাই ভাবভরে গরগর খেণে খেণে কাহু ভাবে পহু ভোর। **নরহরি** হিয় অভিলাস ইহ বিবিধভাব জলধি মধি ডুবব কি থোর ॥ (পত্র ২খ)

২১

জয় জয় পরম কারুণিক নিত্যানন্দ ভুবন জনরঞ্জনআ। সুন্দরবর কনকারুণ রুচি রুচি রজি যুবতি ধৃতি ভঞ্জনআ ॥ মৃদুমধুর স্মিত বদন মনোহর

কুন্দ বদন দৃগ খঞ্জনআ। তুন্দিল বক্ষ বিলক্ষণ পদনখ চন্দ্রবৃন্দযুত গঞ্জনআ। অই অই অই অ ইতি অই অই অ আ তেন্না তেন্না তি আতি অই ই আ। কলিমদমর্দন সকল রসালয় **ঘনশ্যাম** ইতি গা অতি আ ॥ (পত্র ২খ)

২২

জয় জয় শ্রীনিত্যানন্দ রাম। সুরগণ দুলহ চারু চরিতামৃত পরমানন্দ কন্দ রসধাম ॥ ধ্রু ॥ কলিযুগ ভুজগ ভয় ভঞ্জন অগতি পতিত গতি নাথ উদার। সকরুণ হিয় জগজনমনরঞ্জন নিরুপম সংকীর্তন মাতোয়ার ॥ কোটি মদন-মদ-দমন মঞ্জু রুচি গৌরপ্রেমভবে গরগর দেহ। ডগমগ অমল কমল-দল-লোচন গতি অতি অথির বচনে করু লেহ ॥ বদনচান্দ মৃদু হাস অমিয়ময় মধুর ভঙ্গি কর কলিত সুদণ্ড। চঞ্চল রুচির রচিত শ্রুতি কুণ্ডল ঝলমল অরুণ মুকুর জিতি গণ্ড ॥ পরিসব উব তাহি বিবিধ হারবব তরল সুত বুলি ধরম ধৃতিহারি। কটিতট ক্ষীণ ত্রিবলী সুনাভি নব তনুরুহ তিমির তার রুচিকারি ॥ পহিরল নীল বসন তনু বিলসত পীত অচলে যনু জলদ বিথার। চরণ নখর মণি মুনিগণ ধ্যায়ত গায়ত **নরহরি** মহিম অপার ॥ (পত্র ৩ক)

২৩

জয় জয় শ্রীমদ্বৈতচন্দ্র প্রভো প্রণত পালক পবমদীনবন্ধো। প্রবল কলিগর্ব পর্বত খর্বকারক চরিত্র দুর্গম মহাপ্রেমসিন্ধো ॥ কীর্তিনির্মল বিপুলতাপ ভঞ্জন মঞ্জ মহিম মম্ম গ প ম গ ধিকট ধেন্না। ভুবনজনবন্দ্য সুখকন্দ সুন্দর করু কৃপাং **নৃহরি** পামরে তি অই তেন্না ॥ (পত্র ৩ক)

২৪

জয় জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র সুরবৃন্দবন্দ্য যশ জগত বিথার। বলি কলিকাল বিপুলমদমর্দন প্রবল প্রতাপ সুজন হিয় হার ॥ নিন্দুক ভকতি হীন দুর্জয় পাষণ্ড ষণ্ড খণ্ডন ভবহারি। সংকীর্তনধন বিতরণ পণ্ডিত মণ্ডিত গুণ মনরঞ্জন কারি ॥ গৌরপ্রেম রস-বিবশ দিবশ নিশি রসিক ভূপ কি বুঝব পর প্রীত। নিত্যানন্দচন্দ্র সহ সুললিত কলহ উলস অতি অতুলিত নীত ॥ অবিরত বদনে গৌরহরি ভণইতে সাঙন ঘন সম ঝরএ নয়ান। হেরইতে দারু দরপে মরু **নরহরি** না দরপে ধিক ধিক কঠিন পরাণ ॥ (পত্র ৩ক)

২৫

জয় জয় রেবতিরমণ রসালয় নিখিল ভুবনজনরঞ্জন রে। অমল কমল-দল

লোচন ধৃতি ভব মোচন গজগতি গঞ্জন রে ।। চন্দ্রবদন নব তাণ্ডব পণ্ডিত হলধর যদুকুল মণ্ডন রে। কম্বুকুন্দনিভ নীলাম্বরবর মকরধ্বজমদ খণ্ডন রে।। শরণাগত রক্ষক নরহরি স্মর ঝাং ঝাং ঝাং ঝাং ত্রিগড়তি আ। এই অই অই অই আই অতি অই অ তেন্না তেন্না তি অতি অই ইআ ।। (পত্র ৩ক-৩খ)।

২৬

জয় জয় রোহিনীনন্দন রণবীর। কম্বুকুন্দ কর্পূর রজত গিরি গরব হারি রুচি রুচির শরীর ।। ধ্রু ।। মঞ্জুল কেশ অলক কুল চঞ্চল ঝলমল তিলক তরুণি চিত চোর। লোচন কমল বিশাল ভৃঙ্গ ভুরু টলমল কুণ্ডল শ্রবণ উজোর ।। নাশা খগপতি-চঞ্চু চন্দ্র জিনি আননে অমিয় বরিষে অনিবার। সুললিত বাহু বলনী বলয়াকর পরিসর বক্ষে বিলসে মণিহার ।। সিংহদরপ ভর ভঞ্জন কটিতট নীলবসন পহিরল অনুপাম। সুগঠন জানুযুগল জনরঞ্জন পদ-নখ নিকর নিছনি ঘনশ্যাম ।। (পত্র ৩খ)

২৭

জয় প্রবল বলবীর অতিধীর সুন্দর চন্দ্র চন্দন বিনিন্দি রুচি রুচির মৃদু অঙ্গ। নব অরুণকর কদন খঞ্জাখ্য ঘন ঘূর্ণিত সুবক্র অরুণোকল ভুরুযুগ ভুজঙ্গ ।। বর রচিত কুন্তল কুসুমবৃন্দ তাঁহি মধুপ ঝংকার ঝলমল অলক তিলক অভিরাম। মনমথগরব ভর হরণ বদনমণ্ডল ললিত কর্ণে কুণ্ডল সুগণ্ড অনুপাম ।। মণিময় মধুর শৃঙ্গ লস কক্ষ বক্ষ প্রচুর হার ভুজ মঞ্জুকরবলয় রুচিকারি। অতিক্ষীণ কটিদেশ কেশরীদমন কনক কিঙ্কিনী নীল বসন যুগজানু মনহারি ।। বহু দেবদুল্লভ চরণ রণিত মঞ্জীর যুবতীব্রত বিভঞ্জন সুভঙ্গি গতি থোর। উহ অনুপ গুণরূপ মধুপান মত্তাতিশয় নিরখি পহুঁ চরিত নরহরি পরম ভোর ।। (পত্র ৩খ)

২৮

জয় জয় কৃষ্ণকৃপাময় কেশব কমলেক্ষণ জনরঞ্জনুআ। যুবতি কঞ্জরণ কুঞ্জর মঞ্জুপ্রিয়া হৃদিপঞ্জর খঞ্জনুআ ॥ বন্ধুর বদন চন্দ্র মধুরস্মিত রাধাধৃতি ভর ভঞ্জনুআ। সুন্দর নটবর নন্দতনুজবর নবতরুণী নয়নাঞ্জনুআ ॥ স- রি- গ- ম- গ- ম- প- ম- ম- ম্ম- ম্ম- গ-রি-স-তেন্না তেন্না-তি-অ-তি-অই ইআ। অই নরহরি ইতি গায়তি অই অই আই অতি অই অতি অই তিআ ॥ (পত্র ৩খ-৪ক)

২৯

জয় জয় নটবর নন্দকিশোর। মনমথ ভূপ ভুবনজনরঞ্জন অঞ্জন ঘন জিনি বরণ উজোর ॥ ধ্রু ॥ রাধা বদন কঞ্জ মধু মধুকর মোহন রুচির চরিত রুচিকারি। পরমানন্দ কন্দ রসসাগর নাগরবর তরুণীধৃতি হারি ॥ গায়ক-গরব বিভাঞ্জন নব নব গীত নিপুণগুণ বিশদ বিথার। বৃন্দাবিপিন-বিনোদ-মোদকর নিরন্ত নিকুঞ্জ কেলি মাতোআর॥ চঞ্চল নয়ন চন্দ্রমুখ মঞ্জুন নিরুপম বেশ বলিত ব্রজবীর। ললিত ত্রিভঙ্গ মধুর মুরলীধর **নরহরি** প্রাণ জীবন ধন ধীর॥ (পত্র ৪ক)

৩০

জয় জগতবন্দিনী বিদিত নৃপনন্দিনী রাধিকা চন্দ্রবদনী দুঃখমোচনী। শ্যামমনরঞ্জিনী ধৈর্য্যভর ভঞ্জিনী কঞ্জ খঞ্জন মণি গঞ্জিমৃগলোচনী। কান্তিজিত দামিনী পরম অভিরামিনী ভামিনী সিন্ধু কন্যাদি মদমর্দিনী। মঞ্জু মৃদু হাসিনী ললিতকলভাষিনী ভুবনমোহিনী ললিতাদি মুদবর্ধিনী॥ শুভগ শৃঙ্গারিনী নব নব বিহারিনী বৃন্দাবিপিনবিনোদিনী গজগামিনী। রাস-রস-রঙ্গিনী মধুরতর ভঙ্গিনী একল রমণিমণি **নরহরি** স্বামিনী॥ ঝাস্তাঝাং ঝাস্তা তাৎথাবিতক থোঙ্গ থুন্না দৃমিকি তৃগড় তক তত্তা থৈয়া। স-রি-রি-গ-ম-প-ম-গ ম-ম-গ-রি-সা-স্বা-তি অই তেন্না তেন্না তেনাং তি অই ঐ আ॥ (পত্র ৪ক-৪খ)

৩১

জয় জয় রাসবিলাসিনী রাধা। মাধুরী নিরুপম চরিত অগাধা ॥ ধ্রু॥ চন্দ্রবদনী ধনী নওল কিশোরী। মধুরিম হাসিনী ভুবন উজোরি॥ কঞ্চনয়নী মোহিনী সুকুমারী। ভূধর ধর ধৃতি ভঞ্জনকারী॥ রঙ্গিনী রমণী শিরোমণি তোরি। **নরহরি** সুখী সুখবর্ধিনী গোরি॥ (পত্র ৪খ)

৩২

জয় জয় শ্রীবৃষভানু কুমারী। রঙ্গিণী রমণী-শিরোমণি রসময়ী ভুবনমোহন মনমোহিনী গোরি॥ ধ্রু॥ চম্পক কুসুম কনক নব কুঙ্কুম দামিনীদাম-দমন তনু কান্তি। মঞ্জু বদনে মৃদু হাস রসল-লস দশন জ্যোতি জিতি মোতিম পাঁতি॥ লোচন চপল চারু ভুজ ভাল সুচন্দন মৃগমদ সিন্দুর বিন্দু। ফণি জিনি বেণী ভূষিত মণি ভূষণ ভুজবর কর সুকরজ জনু ইন্দু॥ নিরুপম পীন-উরস ক্ষীণ-

কটিতট নীল জলদ মদ কদন সুবাস। ললিত নিতম্ব জানু সুবলিত পদ পংকজ নিছনি এ নরহরি দাস॥ (পত্র ৪খ)

৩৩

জয় জয় রাধা কৃতিকানন্দিনী যশোদা রোহিনী জীবন সমা। পৌর্ণমাসী নেত্র তারা মুখরার প্রাণ রূপে গুণে নিছনি রমা॥ ললিতা বিশাখা সুচিত্রা চম্পকলতা রঙ্গদেবী সুদেবী তাহে। তুঙ্গবিষা ইন্দুলেখাদিক সখি সরবস উপমা দিব কাহে॥ রূপবতী গুণ অনঙ্গ কস্তুরি মঞ্জুলালী মঞ্জুরিকাদি তারা। অনুখণ সেবারসে মগন কি কব তা সভার গলার হারা॥ বৃন্দাবনরাণী শ্যামসোহাগিনী প্রেমময়ী মহামধুর দেহা। নিকুঞ্জবিলাস রসে ভাসে সদা দাস নরহরি গাওএ তাহা॥ (পত্র ৪খ)

৩৪

জয় গৌরচন্দ্রপ্রিয় পণ্ডিত গদাধর শ্রীবাস বক্রেশ্বর শ্রীমুকুন্দ হে। শ্রীগদাধর দাস বাসুদেব শ্রীমুরারী রামানন্দ রায় কবিচন্দ হে॥ শ্রীমৎস্বরূপ দামোদর হিরণ্য হরিদাস নরহরি গৌরীদাস গোবিন্দ হে। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি শ্রীসার্বভৌম বাচস্পতি শ্রীসুখানন্দ হে॥ শ্রীপ্রবোধানন্দ সঞ্জয় নৃসিংহ জগদীশ কাশীশ্বর শ্রীশিবানন্দ হে॥ শ্রীসনাতন রূপ ভট্ট-গোপাল রঘুনাথ রঘুনাথ জীব প্রেমকন্দ হে॥ শ্রীলোকনাথ যদুনাথ শুক্লাম্বর শ্রীমদুদ্ধারণ মাধব চিদানন্দ হে। শ্রীকৃষ্ণদাস হরিদাস আচার্য ভগবান যাদব দাস বৈষ্ণবানন্দ হে॥ শ্রীবিষ্ণুদাস সারঙ্গ কংসারি রঘুনন্দন বিজয় গরুড় সুন্দরানন্দ হে। শ্রীসত্যরাজ রাঘব কাশীমিশ্র গঙ্গাদাস গৌরাঙ্গ-হরি হরানন্দ হে॥ শ্রীকর্ণপূর বৃন্দাবন কবীন্দ্র রামাদি রসময় শ্রীমদ্ভক্তবৃন্দ হে। দেহি পদপংকজ নিবাস করু আশ পূরণ ভণত দাস নরহরি দীনমন্দ হে॥ (পত্র ৫ক)

৩৫

জয় জয় লীলাশুক কবি ভূপতি মঙ্গলময় অতিশয় সুখকন্দ। সুমধুর মুরতি পিরিতি রস সাগর রসিক সমূহ নয়নমনফন্দ॥ চিন্তামণি উপদেশ লেশ হিয় মাহ সোমগিরি চরণ নিধারি। নিরুপম প্রেম মত্ত মতি গতি নব দিবস রজনী সুধি সকল বিসারি॥ বৃন্দাবন ভূবি রাস রাস রস কেলিযুগল ছবি নিরত ধিয়ান। ঝলমল বদন বিপুল পুলকাঞ্চিত টলমল অনুখণ সজল নয়ান॥ কো

বিরচব শুচি রুচির চরিত চয় যছু কবি তা ইহ জগত বিথার। নরহরি ভণ তছু নাথ গৌরহরি পরিকর সহ শুনি হরষ অপার॥ (পত্র ৬ক)

৩৬

জয় জয় পদ্মাবতী পতি শ্রীজয়দেব সুঘরবর পরম উদার। কেন্দুবিল্ব ভুবি ভূষণ অনুপম মধুর পিরিতি ময় চরিত অপার॥ রসিকসভারঞ্জন কবি-ভূপতি যাক কাব্যযশে জগত উজোর। কীর্তনরস লম্পট নট পণ্ডিত পদ্মা সহ সুখ কো কহ ওর॥ ব্রজ নব কেলি শ্রবণ পুনঃ ভণইতে বাঞ্ছই অগণিত শ্রবণ বয়ান। অনুখণ রহই বিভোর পুলককুল বলিত ললিত তনু সজল নয়ান॥ বিদিত অনন্য ধন্য করু মহিতল ভকত সঙ্গ নিত নিরজনে বাস। পরম পতিত দুখিতে অতি আদর করুণা কি কহব নরহরি দাস॥ (পত্র ৬খ)

৩৭

জয় জয় শ্রীভগবত পরিকর কবি কবিকুল ভানু ভুবনে পরচার। ভণইতে নাম হোত হিয় উলসিত খেমহ দোষ করিহু পরিহার॥ শ্রীআনন্দাচার্য্য দিবাকর রামানুজ কবিচন্দ্র কুমার। হনুমত মাধবেন্দ্রপুরী দীপক শ্রীধর স্বামী সারদাকার॥ শ্রীশংকরাচার্য্য সর্বজ্ঞ শুভাঙ্কশীল শিব মৌলি প্রবীণ। চিরঞ্জীব সঞ্জয় কবিশেখর সূর্যদাস কেশব ছত্রীন॥ শ্রীলক্ষ্মীধর পুষ্করাক্ষহরি শংকর শরণ ময়ুর জয়ন্ত। চক্রপাণি সুভোক রুদ্রহর কঙ্কণ বাণ কীর্তি নহু অন্ত॥ বিশ্বনাথ নাথক ধনঞ্জয় যাদবেন্দ্রপুরী ধন্য সুধীর। বিষ্ণু পুরীশ্বর ষষ্ঠীদাস কবিরত্ন সুদেব সরস্বতী বীর॥ শ্রীপুরুষোত্তমদেব শচীপতি সর্বাভরণ ভট্ট অভিনন্দ। অপরাজিত অবিলম্ব সরস্বতী পঞ্চতন্ত্র হৃত শ্রীআনন্দ॥ ভীমভট্ট হরিভট্ট ত্রিবিক্রম শম্ভু উমাপতি ধর দুখহারি। লক্ষ্মণ সেন দেব যাম্মাসিক রূপদেব দশরথ সুখকারী॥ মাধব রঘুপতি উপাধ্যায় কবিরাজ মিশ্র রাজত মহি মাঝ। গোবর্দ্ধনাচার্য্য যোগেশ্বর ভবানন্দ সঞ্জয় কবিরাজ॥ শ্রীগোবিন্দ ভট্ট দামোদর জগদানন্দ রায় যশভূরি। মাধব সরস্বতী কবিশেখর শাস্তিক হরিহর করু দুখ দুরি॥ অমর সর্ববিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য শ্রীগর্ভ কবীন্দ্র। শ্রীআগম ভবভূতি ভুবনবাসব অত্যুক্ত কবি শ্রীগোবিন্দ॥ ভট্টাচার্য মুকুন্দ মনোহর মাধব চক্রবর্তী গুণ ভারি। শ্রীক্ষেমেন্দ্রবাহিনী পতি কবি সার্বভৌম পণ্ডিত দৈত্যারি॥ অজদ বানীবিলাস সুবন্ধ হি কবি মোটক সারঙ্গ উদার। কেশব ভট্টাচার্য শুভ্র

কবিরাজ মিশ্র সশ্লোক প্রচার॥ জগন্নাথ শ্রীকরাচার্য কবি জগন্নাথ সেন হি সুখদাতি। শ্রীগোবিন্দ মিশ্র পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য পরম সুখগতি॥ শ্রীমঙ্গল বনমালী ভট্টনারায়ণ সর্বানন্দ বিনোদ। রামচন্দ্র দাসাদিক কবিবর নরহরি অন্তরে বিতরহ মোদ ॥ (পত্র ৮ক)

৩৮

জয় প্রভু প্রিয় কবি পরম উদার। শ্রীগোবিন্দ ভাগবত মাধব শঙ্কর ঘোষ ভুবনে পরচার ॥ ধ্রু ॥ নয়নানন্দ মিশ্র যদুনন্দন চক্রবর্তী উদ্ধব হিতকারী। শ্রীঅনন্ত লোচন গুণ ভণব কি সুঘর সুরসিক বৃন্দাবন হারী॥ শ্যামদাস আচার্য্য সুখময় বংশীবদন পরম সুখধাম। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক জনরঞ্জন যাক বাক্য অনুপাম॥ জ্ঞানদাস দৈবকীনন্দন কবি কানু দাস কবিশেখর রায়। ব্যাপি রহল মহি মধুর কীর্তিনব নরহরি দাস নিছক রহু তায়॥ (পত্র ৮ক-৮খ)।

৩৯

জয় জয় কবিবর পরম প্রচার। শ্যামর গৌররসে উনমত চক্রবর্তী গোবিন্দ উদার ॥ ধ্রু ॥ রসিক মুরারি ধন্য হৃত উৎকল দারুণ ভব ভয় ভঞ্জনকারী। কর্ণপূর কবিরাজ সুঘর বলরাম বসন্তরায় দুখহারী॥ শ্রীরাধাবল্লভ কবিভূষণ ঘনশ্যাম যদুনন্দনদাস। রাধানন্দ ধীরবর নয়নানন্দ সুখদ উৎকলে পরকাশ॥ বিদিত চক্রবর্তী শ্রীবিশ্বনাথ পরসাদ মদন শিবরাম। সদানন্দ কবি রায় মনোহর বীরহাম্বীর নিছনি ঘনশ্যাম॥ (পত্র ৮খ)

৪০

জয় জয় কবিবর রসিক সুনিরুপম পরম সুখদ গদ কদন উদার। যো পহুঁ চরিত চারু বরণত অরু বরণ ন করণ করব নহু পার॥ জয় জয় শ্রবণেচ্ছুক জগজনমনরঞ্জন পহুঁক চরিত গত চিত। হোত হোওল নব যো নরহরি হিয় দাহ হরব দূর করব অনীত॥ (পত্র ৮খ)

৪১

জয় জয় ভুবন মঙ্গল গোরা রায়। নাচএ কত নানাছান্দে কি ভাব হিয়ায়॥ পুলকে পূরল তনু অনুপম ছটা। ধরণী উপরে কিএ বিজুরির ঘটা॥ কিবা সে মধুর মুখে সুমধুর হাসি। অমিয়া উগারে যেন শরদের শশী॥ গোরারূপ

নিরখি নিতাই সুখে ভাসে। অদ্বৈত হুংকার করি ফিরে চারিপাশে॥ গদাই চন্দনমালা যতনে পরায়। নরহরি ঘনঘন চামর ঢুলায়॥ হরিদাস সঘনে বোলএ হরি হরি। ধরিতে না পারে হিয়া শ্রীবাস মুরারি॥ গোবিন্দ মাধব সে মুকুন্দ বাসু গায়। গৌরীদাস আদি খোল করতাল বায়॥ সংকীর্তনে উনমত এ ভূমি আকাশ। এ রসে বঞ্চিত দীন **ঘনশ্যামদাস**॥ (পত্র ২১ক)।

৪২

ওহে দয়াময় গদাধর শ্রীনিবাস। বক্রেশ্বর স্বরূপ পদ্মনাভ হরিদাস॥ নরহরি দাস গদাধর ধনঞ্জয়। মুকুন্দ মাধব বাসু শ্রীমান সঞ্জয়॥ ওহে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি রামানন্দ। গৌরীদাস জগদীশ শ্রীজগদানন্দ॥ ওহে শ্রীসুবুদ্ধি মিশ্র রূপ-সনাতন। ভট্টযুগ রঘুনাথ পতিত পাবন॥ শ্রীজীব রাঘব লোকনাথ কাশীশ্বর। গঙ্গাদাস চিরঞ্জীব শ্রীরামশংকর॥ ওহে গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রিয়গণ। তো সভার গুণে ঝুরে এ তিন ভুবন॥ সংকীর্তন সুখের সায়রে ভাসি নিতি। ঘুচাইলা জগতের যতেক দুর্গতি॥ দন্তে তৃণ ধরি কহে **ঘনশ্যামদাস**। প্রভু সহ সভে পূর্ণ কর অভিলাস॥ (পত্র ২১খ-২২ক)

৪৩

অপরূপ গোরা বিনোদিয়া। কেবা সিরজিল রূপ কত সুধা দিয়া॥ সুমধুর মুখে মৃদু হাস। কুলবতী সতীর ধরম করে নাশ॥ কিবা দুটি দীঘল নয়ান। চাহনি বিষম তাতে কে ধরে পরাণ॥ কপালে তিলক ভালো সাজে। উপমা দিবার ঠাঁই নাহি জগমাঝে॥ দুটি বাহু আজানুলম্বিত। গলে বনমালা তায় ভ্রমরাবেষ্টিত॥ হিলিতে দুলিতে চলি যায়। **নরহরি** নিছনি সে রাঙ্গা দুটি পায়॥ (পত্র ২২খ)

৪৪

অতি অপরূপ গোরাচান্দ। জগৎ জনের মনফান্দ॥ কনক কেতকী দল দুরে। রূপ দেখি কেবা নাহি ঝুরে॥ ভুরুধনু বিষম সন্ধানে। হিয়া বিন্ধে নয়ানের বাণে॥ জিতি কত চান্দের মণ্ডল। ও মুখ করএ ঝলমল॥ আজানুলম্বিত বাহু শোভা। কুলবতী সতী মনোলোভা॥ পরিসর বুকের মাধুরী। দেখিয়া মজিল **নরহরি**॥ (পত্র ২৩ক)

৪৫

গৌর শশধর থিরজ ধ্বংসন কনক নবনিত অঙ্গ। চারু চাঁচরচিকন চিকুর নেহারি মুরুছে অনঙ্গ॥ বিকচ সরসিজ পুঞ্জ আনন মধুর মধু ঝুরু হাস॥ তরুণি-কুল-কুল লাজ ভঞ্জন বংক নয়ন বিলাস॥ গঞ্জি কুঞ্জর করভ করবর বলনি বাহু বিশাল। কণ্ঠে লোল সুললিত অলিকুল মিলিত মালতি মাল॥ প্রসর উরু নিরূপম কুযোদর ভুবনমোহন জানু। দাস নরহরি পহুঁক পদতলে উদিত কি এ নব ভানু॥ (পত্র ২৩খ)

৪৬

গৌরতনু অনুপাম। কনক নবনীত গরবভরহর মুরুছে তহিঁ কত কাম॥ বদনে মৃদু মৃদু হাস। অমিয় ঝরঝর ঝরত শত শত শরদশশী পরকাশ॥ অরুণ নয়ন উজোর। বিপুল সুললিত বক্ষ চাহনি যুবতি-ধৃতি-ধন-চোর॥ চিকন চাঁচব কেশ। ভুলল সুব নরনারী হেরইতে মঞ্জু নিরুপম বেশ॥ বাহু যুগল বিশাল। গঞ্জি কুঞ্জর করভ করযুগ জানুলম্বিত ভাল॥ বক্ষ প্রসর সুঠান। মল্লি মালতি মালে মণ্ডিত লেত কুলবতী প্রাণ॥ মৃদুল কটি তটখীণ। টুটি পরু পট তরল নব নব সিংহে কি এ মদহীন॥ চরণ কমল সুভাঁতি। লুবধ ঘন ঘনশ্যাম মধুকর নিরুত রহু মধু মাতি॥ (পত্র ২৩খ)

৪৭

মরি মৈরা যাই গোরা রূপের বালাই লৈয়া। কুন বিধি সিরজিল কত সুধা দিয়া॥ ধ্রু॥ দলিত কুঙ্কুম কনক কেতকী তড়িত জিনি তনু কাঁতি রে। বদন শশধর মদন মদহর বদন মোতিম পাঁতি রে॥ কুটিল কুন্তল বলিত মালতি মালে অলিকুল মাতি রে। ভালে তিলক সুললিত লোচন ভঙ্গি কত শত ভাঁতিরে॥ ভুজগভুজ যুগ জানু লম্বিত প্রসর নিরুপম ছাতিরে। নাভি সরসৈ বালতনুরুহ কটি সুসিংহন জাতিরে॥ চারু পদতল অরুণ-মণিনখ নিকর সুভগ হাতিরে। দাস নরহরি পহুক বেসম জাএ কুলবতী জাতিরে॥ (পত্র ২৩খ-২৪ক)

৪৮

দেখ দেখ নালো সই গোরা গুণনিধি। করুণায় আনি মিলাঅল কোন বিধি॥ ধ্রু॥ কান্তি কাঞ্চন কঞ্জকেতকী চম্পকাবলী গঞ্জিতে। মঞ্জুমৃধমৃদু হাসরঞ্জিত পুঞ্জবিধু মদ ভাঞ্জতে॥ তিমির জলধর মরকতাঞ্জন কিরণ কচচয়

লম্বিতে। ভালে মলয়জ তিলক ঝলকত তরুণিবৃন্দ বিড়ম্বিতে॥ মকর কুণ্ডল লসতশ্রুতিযুগ গণ্ডমণ্ডল মণ্ডিতে। ভড়ি ভঙ্গিম ভঙ্গ নবীন অনঙ্গ ধনুমদ খণ্ডিতে। নাসিকাশুক চঞ্চু চারু বিলোল লোচন মোহিতে। বিম্ব অধর সুমোতি দশনক জ্যোতি জগৎ-বিমোহিতে। কম্বু কন্দর বক্ষ বিলসত মাল কুসুম সুবাসিতে। ভুজগ ভুজ গজশুণ্ডদণ্ডিক রাঙ্গুলি কুল নাশিতে॥ বম্বু রোদর জানু নিরুপম চরণতল তিমিরাতিতে। নখনিকরমণি নিছনি নরহরি ভুলল ভুবন নেহারিতে॥ (পত্র ২৪ক)

৪৯

নটবরবর বয়স কিশোর রসিক শেখর গোরা। জিনি পাঁচবান সর্বাঙ্গ সন্ধান অখিল পরাণচোরা॥ রূপে কেবা না ভুলে। কুলবতী না রহয়ে কুলে। কুমকুমতড়িত হেম নবনীত নিন্দই চম্পক ফুলে॥ ধ্রু॥ চাঁচর চিকুর রুচি রুচি কর দলিত কাজর জিনি। ভালে সুবলিত অলকাললিত যেন বিলোলিতফণি॥ শোহে তিলক ভালে গোরোচনা চন্দন মিশালে। শ্রবণে কুণ্ডল করে ঝলমল কত না ভঙ্গিতে হালে॥ ভুরুযুগভাতি মধুগন্ধে মাতি যেন ভৃঙ্গপাঁতি শোহে। কঞ্জারুণঘন গঞ্জি সুলোচন চাহনি ভুবন মোহে॥ মুখে মধুর হাসি শুধা বরিখএ রাশি বাশি। কত শত শত নির্মল শরৎ চন্দ্রমাগরব নাশি॥ কনক নূপুর দর্প করু দূর গণ্ড সুমেদুর ছটা। কি মাধুরী সার নাসিকা সুচাব জিনি উপমার ঘটা॥ কিবা দশন শোভা কুন্দমুক্তা উড়বৃন্দ ক্ষোভা। বিম্বওষ্ঠাধর মধ্যে নিরন্তর দীপ্ত চারু নেত্র লোভা॥ অদভুত কন্দর কম্বু জিনিবর বক্ষ পরিসর তাহে। নানা পুষ্পহার দোলে অনিবার ভ্রমর ঝঙ্কার জাহে॥ নাভি শরগভীর রোমাবলী কি শৈবাল থির। কটিতট খীণ সিংহমদহীন তহি নীল চিন চীর॥ করভ কুঞ্জর করমৃদুতর ভুজ জানু পরসিএ। উর ঝল-মলি হেমস্তম্ভ দলি উলটি কদলী কিএ॥ চারু চরণ ছান্দে কেবা কি বর্ণিব পদ্ম ধান্ধে। নরহরি ভণ নখমণিগণ হেরি কে ধৈরজ বান্ধে॥ (পত্র ২৪ক-২৪খ)

৫০

দেখহ নটবর বরজ কিশোর। মরকত নীল দলিতাঞ্জন জলদ পুঞ্জ জিনি বরণ উজোর॥ নিরমল মঞ্জু বদন ঘন ঝলকত শশধর গরব খরব তহি হোতি। দামিনী-দাম দরপ ভরভঞ্জন হসইতে লসই সুদশনক জ্যোতি॥ কো বিহি

কতহি সাধে নিরমাঅল ভাঙ্‌ভঙ্গি জনু ধনুআ ধুলান। কুটিল কটাখ নয়ন তট সঞ্চরু নিখিল যুবতি হৃদি ভেদল বান॥ শিরে শিখিপিঞ্ছ খচিত শ্রুতি কুণ্ডল টলমল অলক তিলক ছবি ভারি। চুম্বই মুরলী কলিত কর-কিশলয় কত কত কোটি মদন মদহারি॥ চিবুক চারু নিরুপম মধুরাধর কম্বু কণ্ঠে মণি মোতিম মাল। কুঞ্জর করভ শুণ্ড জিনি ভুজ যুগ অঙ্গদ বলয় বিরাজিত ভাল॥ চামী কর কর নিকর নিভাম্বর কটিতট খীণ লীন ভেল তায়। জানুযুগল জন-রঞ্জন **নরহরি** নিছনি নিরত তরুণারুণ পায়॥ (পত্র ২৫ক)

৫১

অঞ্জন জলদ পুঞ্জ রুচি গঞ্জই শিরিশ কুসুম জিনি মৃদুল তনু। হাস মিলিত মুখমণ্ডল ঝলকত শরদ সুধাকর নিকর জনু॥ পেখহ শ্যাম সুখর সুখ সদনা। অমল কমলদল দলন বিলোচন চাহনি বঙ্ক মদন মদকদনা॥ ধ্রু॥ কুন্তল কুটিল অলক কুল চঞ্চল ভাল তিলক শ্রুতি কুণ্ডল ঝলকে। কুঞ্জর করভ শুণ্ড মদ খণ্ডন ভুজযুগ মঞ্জু বলয় ছবি ঝলকে॥ বলি বনমাল প্রসর উরবিলসিত গীমসুসিংহ গরব ভর হরণে। কটিতট ভঙ্গি ভুবন জনরঞ্জন **নরহরি** নিছনি রুচিরতরচরণে॥ (পত্র ২৫ক)

৫২

পেখহ নটবর নাগররাজ। বঙ্কিম চূড়ে চারু শিখিপিঞ্ছ সুকুসুম বলিত অলি অলক সুসাজ॥ ধ্রু॥ চন্দনবিন্দু ইন্দুমদমরদন ভাল সুভগ ভুরু বঙ্ক উজোর। লোচন বঙ্ক বিশাল বলিত শ্রুতি কুণ্ডল ঝলক গণ্ডচিত চোর॥ নাসা খগপতি চঞ্চু চরকি রহু মোতিম তরলিত পরশি নিশাস। কুলবতীকুল কুলধরম বিমোচন মঞ্জুবদনে মৃদু বঙ্কিম হাস॥ কুন্দদশন রসনাছবি নিরুপম বিলসত বদনে বংশীবর বঙ্ক। বঙ্কিমগীম ভুজগ ভুজ বঙ্কিম কর কিশলয় হিয় হরই নিশঙ্ক॥ পরিসর উর মরকত কপাটমণি কঞ্জজটিত বর বঙ্কিম মাল। নাভিগভীর বঙ্ক মৃদু কটিতট পীতবসন লস কিঙ্কিনি জাল॥ রাম কদলী দলি ললিত জানু জনরঞ্জন বলনী কি বঙ্ক সুঠাম। নূপুর বিরচিত বঙ্কচরণাম্বুজ অরুণিমনখর নিছনি **ঘনশ্যাম**॥ (পত্র ২৫ক-২৫খ)

৫৩

জগজনরঞ্জন কঞ্জচরণযুগ রঞ্জিতমণি মঞ্জীর মঞ্জুতর। সিংহ গরবভর ভঞ্জন কটিতট স্বর্ণসূত্র ঝলকত অতি সুন্দর॥ পেখহ বরজ কিশোর সুনটবর। বলি

বনমাল ললিত উরুলম্বিত গুঞ্জত পুঞ্জ পুঞ্জতহি মধুকর॥ ধ্রু॥ ঝরই অমিয় মুখ মিলিত হাস মৃদু নিন্দই কত শত শরদ নিশাকর। চলত শ্রবণতট কুটিল বিলোচন কুলবতী-কুল কুললাজ ধিরজ হর॥ ভুরু যুগ ভুজগ ভাল তিলকালক মোড় মুকুট সুনটক নাহি পটতর। দামিনী বসন লসত জল ঘন ঘনশ্যাম নিছনি নবভঙ্গি মুরলীকর॥ (পত্র ২৫খ)

৫৪

পেখহ শ্যামভুবনজনরঞ্জন। তনুরুচিনীল জলদ দলিতাঞ্জন॥ অমল কমল দল লোল বিলোচন। কুলবতী যুবতী ধরমধৃতি মোচন॥ দশন কুন্দ মৃদু বদন চন্দ্রবর। হাস অমিয়া রস বরষত ঝরঝর॥ ভাঙ ভুজঙ্গ ললিত কচ কুঞ্চিত। ভাল তিলক কুণ্ডল শ্রবণাঞ্চিত॥ বলি বনমাল বিটংক পরশিপদ। কুঞ্জর কর জিনি মঞ্জুল ভুজযুগ॥ মধুর ত্রিভঙ্গিম মুরলী অধরধর। বিলসত নরহরি হৃদএ নিরন্তর॥ (পত্র ২৫খ)

৫৫

নিরমল হাস মিলিত মুখচান্দ। অখিল ভুবনজন লোচন ফান্দ॥ দেখহ শ্যামরস রূপ। কো সিরজিল কিএ মনমথ ভূপ॥ ধ্রু॥ কঞ্জ নয়নে নব কুটিল কটাখ। মুরুছি পড়ত তহিঁ কুলবতী লাখ॥ ঝলকত ভাল অলক কুল জ্যোতি। শিরে শিখিপিঞ্ছ খচিত মণি মোতি॥ পহিরল বসন তড়িতঘন ভাঁতি। বলি বনমালে ভ্রমরকুল মাতি॥ পূরই মুরলী ত্রিভঙ্গিম ঠাম। মুগধল তহিঁ এ দাস ঘনশ্যাম॥ (পত্র ২৫ক-২৬ক)

৫৬

দেখ দেখ নালো রূপ নয়ান ভরিয়া। সিরজিল কুন বিধি পরাণ ধরিয়া॥ধ্রু॥ শ্যামতনু ঘন দলিত অঞ্জন নীলকুবলয় নিন্দিতে। চারু কচ কুসুমাঞ্চিত তহি তহি লুবধ মধুপ সুগন্ধিতে॥ তিলক মলয়জ দলিত কুমকুম ভাল অলক বিভূষিতে। নয়ন কুটিল কটাখ খর শর ভৃঙ্গ ভ্রমর সু ভূষিতে॥ শ্রবণে কুণ্ডল গণ্ড মরকত মুকুর গরব বিভঞ্জিতে। নাসিকালস মোতিমঞ্জন বদন বিধুগণ গঞ্জিতে॥ কম্বু কন্দর রুচিরতর উর হারমণিময় মণ্ডিতে। বলয় বলিত সুচারু ভুজযুগ করভ করমদ খণ্ডিতে॥ উদর নিরুপম নাভি তনুরুহ তরুণী-হৃদয় বিমোহিতে। নবীন কেশরী গরবভরহর খীণ মধ্য সুশোহিতে॥ পীত

অংশুক সরস পহিরণ জগজনমন হারিতে। ভুলল নরহরি নূপুরাঞ্চিত চরণভঙ্গি নেহারিতে॥ (পত্র ২৬ক)

৫৭

দলিত অঞ্জন তনুরুচিঘন তড়িত বসন শোহে। পুরই মুরলি সুমুখরতিরি ভঙ্গিতে ভুবন মোহে॥ চূড়াটালনি বামে অলিগুঞ্জে তহি ফুল দামে। বিচিত্র সে চূড়ে শিখিপিঞ্ছ উরে কি নব রঙ্গিম ঠামে॥ চারু গোরচন তিলক-চন্দন অলকাবেষ্টিত ভালে। ভৃঙ্গ পাঁতি ভুরু নেত্র পদ্ম চারু চাহনি কি রস টালে॥ কিবা মোহন ছান্দে সুধা বরিষে বদনচান্দে। মন্দ মন্দ হাসে দশন প্রকাশে কে না পড়ে সে না ফান্দে॥ কীর চঞ্চু জিতি নাসা লসে মোতি সুচারু চিকুর ছটা। শ্রবণে কুণ্ডল গণ্ড ঝলমল ভুলে কুলবতী ঘটা॥ কণ্ঠে কৌস্তুভ ভ্রাজে হেরি মদন মরএ লাজে। বক্ষ পরিসর অতি মনোহর নাভি সরসিজ সাজে॥ মত্ত করিকর গঞ্জি ভুজবর করাঙ্গুলি অনুপমা। কটিতটখীণ উরু যুগপীন জগতে না দেখি সমা॥ মঞ্জু চরণ কঞ্জে জগজন ধৈর্য্য ভর ভঞ্জে। নখর নিকর জিনি নিশাকর নরহরি হিয় রঞ্জে॥ (পত্র ২৬ক)

৫৮

দেখ ভুবনমোহিনী রাই। জিনি হেম নব নবনীত তনু তুলনা দিবারে নাই॥ ধ্রু॥ পিঠে দোলে সুললিত বেণী। কি কাম গরাসে শিরে আরোহএ ফণা পসারিয়া ফণি॥ ভুরু বঙ্কিম কি নব ধনু। অঞ্জনে রঞ্জিত খঞ্জন নয়ন চাহনি বিশিখ জনু॥ হাসি মাখা সুমুখের ছটা। কমল কানন বিকশিত কিবা শারদ শশীর ঘটা॥ কুচ উচ কি চুচুক ভাঁতি। কনক কমল পরি যনু যুগ ভ্রমর রৈয়াছে মাতি॥ চারু বলয়া কঙ্কন করে। মন্দার চম্পক কলি করাঙ্গুলি হেরি কে পরাণ ধরে॥ মাজা নবীন কেশরী জিনি। রুচির নিতম্ব ভারে ভাঙ্গে তেঞি বেঢ়ল কিঙ্কিনি মণি॥ সদা নূপুর বাজএ পায়। নরহরি মন মনরঞ্জন ভঙ্গিমা কি দিব উপমা তায়॥ (পত্র ২৭ক)।

৫৯

নবীন কিশোরী রসময় গোরী ভোরি কি ভুবনে সমা সুরনারিগণ গুণে মনে মন নিরখি নন্দিত রমা॥ কিবা ভঙ্গি সুশোভা জগজনমননেত্র লোভা। কেবা সিরজিল কি সুধা সিঞ্চিল এবা কি আনন্দ লোভা॥ শিরিস কুসুম জিনিমৃদুতর তনু অনুপম ছটা। পহিরে বসন নীল বিলসন তড়িতে কি

ঘনঘটা॥ শিরে সুন্দর বেণী তাহে উপমা কি ভুজঙ্গিনী। তহি মল্লিফুল লুব্ধ অলিকুল বিরচি বিচিত্রমণি॥ সিঁথাএ সিন্দুর ভানু মদদুর মলয়জ ইন্দু সাজে। মৃগমদ বিন্দু মেঘ খণ্ড নিন্দু ভালে সুঅলকা ভ্রাজে॥ ভুরু ধনু-ধুনানে কেবা কি রূপে জিয়য়ে প্রাণে। অঞ্জনে রঞ্জন খঞ্জন নয়ন চাহনি কি শর হানে॥ গণ্ড সুনির্মিত শ্রুতি ভূষাঞ্চিত কস্তুরি চিবুকচারু। নাসায়ে বেসর দোলে নিরন্তর ধৈর্য্য না রাখয়ে কারু॥ মুখে মধুর হাসি মকরন্দ ঢালে রাশি রাশি। কি সুষমাকর বিকচ পুষ্কর পুঞ্জ গর্বভর নাসি॥ কনক মৃণাল জিনি ভুজজাল বলয়া কঙ্কন করে। কণ্ঠে বিলসয় নানা রত্নময় মালা বিলোলিত উরে॥ কিবা বক্ষ সুষমা উচ কুচ যুগ নিরুপমা। তহি সু আবৃত অতি সু চিত্রিত কঞ্চুকি কি মনোরমা॥ নাভি সরোবর চারু কৃশোদর কিঙ্কিনি কত না ভাঁতি। নিতম্ব মণ্ডল করে ঝলমল উরু রামরম্ভা জিতি॥ মঞ্জু চরণ কঞ্জে ঘন ঘনশ্যাম মনোরঞ্জে। নূপুর ভূষিত নখে উড়ু জিত যাবক অরুণ গঞ্জে॥
(পত্র ২৭ক-২৭খ)

৬০

দেখ দেখ রাই-রূপ নয়ান ভরিয়া।না জানি কে সিরজিল পরাণ ধরিয়া॥ ধ্রু॥

কনক পংকজ পুঞ্জ জিনি তনু মঞ্জুবেশ বিরাজই। কুটিল কুন্তল বেণী ফণি মণি সিঁথে সিন্দুর ভ্রাজই॥ ভাল মলয়জ বিন্দুমৃগমদ অলককুল অলি সোহএ। বদন কমল সুহাসরসময় দশন জগত বিমোহএ॥ নাসিকা শুকচঞ্চুজিত ওষ্ঠাধরারুণ রঞ্জিতে। ভ্রু লতালস লোল লোচন মীন খঞ্জন গঞ্জিতে॥ শ্রবণ চক্রসলাক কুণ্ডল চণ্ডকরমদ খণ্ডিতা। গণ্ডঝলক সুচিবুক কণ্ঠহি মাল মণিময় মণ্ডিতা॥ মৃদুল ভরকর বলয় কঙ্কণ মুদ্রিকাঙ্গুলি ভূষিতে। চারু উচ কুচ কলস সম্পুট করক দরপ বিদূষিতে॥ ত্রিবলি বলিত সুনাভি নিরুপম লোম কি মধুর ভাঁতিয়া। নবীন কেশরী গরবহর কটি বেঢ়ি কিঙ্কিনি পাঁতিয়া॥ করভ কুম্ভ নিতম্ব আবৃত নীলবসন কি ঘনঘটা। উলট কদলী বিনিন্দি উরুযুগ জানুগুল্ফ কি ছবি ছটা॥ বিমল চরণ সুনখ নিশাকর নিরত অমিয় সুসিঞ্চই। বলিত মণি মঞ্জীর তহি ঘনশ্যাম জিউ নিরমঞ্ছই॥ (পত্র ২৭খ)

৬১

দেখহ বৃষভানু কুমরী ভঙ্গি ভুবন মোহই। কনক কঞ্জ পুঞ্জতড়িত চম্পক কুসুম বিদলিত তনুমৃদুতর শিরিস কুসুম নিন্দি কি নব সোহই॥ ধ্রু॥ কুন্তলঘন

তিমির বরণ চামরচয় গরবহরণ বেণী বিপুল ভুজগ ভাঁতি কিএ কাহুক দংশই। তরুণারুণ দলন জ্যোতি সিঁথি সিন্দুর চমক হোতি কুণ্ডলযুগ শ্রবণ গণ্ড মণ্ডন দ্যুতি ধ্বংসই ।। ভ্রুবল্লরি হরই চয়ন খঞ্জন মৃগ মীন নয়ন নাসা শুকচঞ্চু বলিত বেসর দর দোলই। ইন্দুনিকর নিন্দি বদন মোতিম কুল কুন্দ রদন ঝলকত লহু হাস অমিয় ভাব কি পিকু বোলই॥ মৃগমদচিবুকে স্থলসত জলজে জনু ভৃঙ্গ বসত সুন্দর ক্রম কণ্ঠমাল লম্বিত চিত রঞ্জই। উচ কুচ জিনি করক বেল কঞ্চুকি ছবি অধিক দেল ললিতোদর ত্রিবলি নাভি উপমাগণে গঞ্জই॥ কৌনে গঢ়ল ভুজ মৃণাল কঙ্কনমণি-বলয় ভাল কর-কিশলয় কলিত মুদ্রিকাগণ ঘন সাজই। সিংহগরব হর কটিতট পহিরল চীন নীলিমপট নটকত নীবিবন্ধ সরস রসনা তহি ভ্রাজই॥ মনমথ রথ চক্র দ্বিরদকুম্ভজিত নিতম্ব বিরদ কি মধুর উরদেশ উলট রম্ভামদ ভাগই। চারু চরণ যাবক যুত মঞ্জুলমণি নূপুর রুত নখর নিকর তারক রুচি **নরহরি** হিয় জাগই ।। (পত্র ২৭খ-২৮ক)

৬২

গোরা নাচে কি মধুর বেশে। মজায় যুবতি জাতি সে দীঘল কেশে॥ রূপের ছটায় হরে হিয়া। থির হৈতে নারে কেউ বারেক চাহিয়া॥ চারিপাশে চায় কত রঙ্গে। অবিরল পুলক ঝলকে প্রতি অঙ্গে॥ হরি হরি বোলে কি না সুখে। অমিয়ার ধারা যেন বহে চান্দ মুখে॥ প্রিয় পরিকর করে ধরি। সুরধনীতীরে পহুঁ চলে ধীরি ধীরি॥ নয়নের জলে ভাসি যায়। **নরহরি** না বুঝে এ কি ভাব হিয়ায়॥ (পত্র ২৯ক)

৬৩

ভাল অঙ্গে নাচে মোর শচীর দুলাল। সব অঙ্গে দোলয়ে চন্দন বনমাল॥ বিশাল হৃদয়ে গজমুকুতার হার। পদতলে তাল উঠে নূপুর ঝংকার॥ ছন্দ বিছন্দে কত জানে অঙ্গ ভঙ্গি। নদীয়ানগরে নাই এতবড় রঙ্গী॥ কিন্নর করএ শিক্ষা শুনি মৃদুগান। গন্ধর্ব তাণ্ডব হেরি ধরএ ধিয়ান।। পংকজ সঙ্কোচ পায় দেখিয়া নয়ানে। হাসিতে বিজুরির ছটা পডএ দশনে॥ বান্ধুলি জিনিয়া রাঙ্গা ওষ্ঠখানি হাস। ওরূপ হেরিয়া কান্দে **নরহরি দাস**॥ (পত্র ২৯খ)

৬৪

কলিমদ মরদন গৌরকিশোর। নাচত পুরুব প্রেমরসে ভোর॥ প্রিয় পরিকর বর পরম উলাস। নিরখে চারু মুখ মধুরিম হাস॥ বাঅত খোল

ধমক করতাল। কম্পই খিতি পদতলে ধরু তাল ॥ পামর পতিত পুরল মনকাম। বঞ্চিত রহল ঘনশ্যাম ॥ (পত্র ২৯খ)

৬৫

আজু সুরধনীতীরে সুন্দর গৌর নৃত্যবিভোর। ফাগুবিন্দু সুগন্ধি চন্দন চর্চিতাঙ্গ উজোর ॥ ভাল ঝলকত তিলক অতুলিত ললিত কুন্তলভার। শ্রবণ কুণ্ডল গণ্ড মণ্ডিত ভাঙ ভঙ্গি অপার ॥ লোল লোচন কঞ্জ মঞ্জু ময়ঙ্ক জিতি মুখ জ্যোতি। তরুণ অধর সুহাস মৃদু মৃদু দন্ত নিন্দই মোতি ॥ বাহু কনক মৃণাল মনমথ দমন বক্ষ বিশাল। চারু রচিত বিচিত্র চঞ্চল কণ্ঠে মালতি মাল ॥ খীণ কটিতট জটিত কিঙ্কণি পহিরে বসন সুচার। চরণ নূপুর রণিত নিরুপম সরস সকল সিংহার ॥ হেরি অপরূপ রূপ পরিকর মগন গুণ নহু অন্ত। ঝাঁঝ মুরজ মৃদঙ্গ বাজই গাঅএ বাগবসন্ত ॥ শুনত সুরগণ গগণমণ্ডলে থিরজ ধরই না পারি। ধাই চলু চহু ওব সব নদীয়ানগর নরনারী ॥ হোত জয় জয়কার জগভরি উমডি প্রেমপ্রবাহ। ভণত নরহরি ধন্য কলিযুগ বিলসে গোকুল নাহ। (পত্র ৩০ক)

৬৬

ভুবন পাবন গোরাচান্দ। অখিল লোকের মন ফান্দ ॥ নাচে পহু প্রেমের আবেশে। অরুণ নয়ানে জলে ভাসে ॥ ভুজ তুলি হরি হরি বোলে। পতিতে ধরিয়া করে কোলে ॥ নিজরসে সভারে ভাসায়। চারিপাশে পারিষদ গায় ॥ সুকোমল অঙ্গ আছাড়িয়া। গড়ি যায় ধুলায় পড়িয়া ॥ দেখিয়া সকল জীব কান্দে। নরহরি হিয়া নাহি বান্ধে ॥ (পত্র৩০ক-৩০খ)

৬৭

আজু অপরূপ রঙ্গে নাচত গৌর অপরূপ রঙ্গিয়া। দৃমিকি দৃমিকি মৃদঙ্গ বাওত গাঅএ সকল সুসঙ্গিআ ॥ কোটি মনমথ নিন্দি নব নব বিপুল পুলক বিরাজই। চারু পহিরণ চীন অংশুক বিবিধ ভূষণ সাজই ॥ অরুণ লোচণ কঞ্জ ডগমগ ভঙ্গি ভুবন মাতাঅএ। মঞ্জু বদনময়ংক ঝলমল হাসরস বরষাঅএ ॥ চপল মালতী মাল পদতলে তাল ধরু কত ভাঁতিয়া। পতিত পামরে প্রেম াবতরই উলস নরহরি ছাতিয়া ॥ (পত্র৩১ক)

৬৮

কলিমদমত্ত মতঙ্গজমরদনে গৌরসিংহ নাচত নদীয়ায়। জয় জয় রব সব

ভুবন বিয়াপিত অখিল লোক মিলি চৌদিকে চায়॥ গায়ত পরম প্রবল প্রিয় পরিকর কিন্নর তুরগম তাল তরঙ্গ। বাজত মধুর মৃদঙ্গ দৃমি কি দৃমি দাঁ দাঁ দৃমিকট থিকট খিলঙ্গ॥ কম্পই ধরণী ধরত পদপংকজ ডগমগ অঙ্গভঙ্গি অনুপাম। লোচন তরুণ অরুণ রুচি গঞ্জই চাহনি চারু চমকে কত কাম॥ শশধর নিকর নিন্দি মুখ মাধুরী হাসত মধুরিম অমিয় উগারি। প্রেমবিতরি **নরহরি** পহুঁ পামরে করই কোরে ভুজ যুগল পসারি॥ (পত্র৩১ ক)

৬৯

নাচে গোরা নব রঙ্গিয়া। পুলক বলিত সুললিত তনু নিরত হিয় উমংগিয়া॥ ধ্রু॥ অমল কমল দল সুলোচন চপল প্রেম তরঙ্গিয়া। হাসি হাসি সুধা রাশি বরিষএ ভুজ যুগ ভাল রঙ্গিয়া॥ টলমল খিতি পদ তল তালে জিতল গতি মাতঙ্গিয়া। অভিনব নানা ভাঁতি ঘন ভণে থিকট ধিধি খিলঙ্গিয়া॥ পরিকর চারিপাশে ভাসে সুখে মৃদঙ্গ বায় মৃদঙ্গিয়া। ভুবনমোহনগুণ গণ গায় **নরহরি** পহু সঙ্গিয়া॥ (পত্র ৩১খ)

৭০

আজু কি আনন্দ নাচে গোরা। অখিল ভুবন মনচোরা॥ যেদিকে নয়ানকোণে চায়। সেদিগ প্রেমেতে বহি যায়॥ ও চান্দবদন নিরখিয়া। কুলবতী না ধরএ হিয়া॥ দুবাহু তুলিয়া যবে চলে। তা দেখি কে জীএ মহীতলে॥ কি ভঙ্গিমা সে কমল পায়। ভকত ভ্রমর ভুলে যায়॥ খেণে খেণে পুলকিত অঙ্গ। **নরহরি** না বুঝ এ রঙ্গ॥ (পত্র ৩১খ)

৭১

শ্রীশচীতনয় নবদ্বীপ চান্দ। অখিল ভুবন জন লোচন ফান্দ॥ নিরুপম ভাব ভূষণ প্রতি অঙ্গে। পুলক বলিত অতি ললিত তরঙ্গে॥ ঝরই অমিয়রস হসইতে থোর। পিবইতে উনমত ভকত চকোর॥ ডগমগ অরুণ নয়ানে বহে বারি। কো অছু ধৈরজ ধরব নেহারি॥ খসই বসন ঘন পহিরই তায়। তহি নব ভঙ্গি তরুণী মুরুছায়॥ ভূষণ বিবিধ চঢ়াঅই অঙ্গ। মনমথ কোটি দরপ করু ভঙ্গ॥ অনুখন নবনব নটন বিভোর। নিজগুণে সঘন পতিতে দেই কোর॥ ধনি ধনি কলিযুগে অতুল বিলাস। গায়এ বিমলযশ **নরহরি দাস**॥ (পত্র ৩১খ-৩২ক)

৭২

নাচত গৌর-কিশোর। সুরধনীতীরে উজোর॥ কত কত পরিকর সঙ্গ। উনমত কীর্তন রঙ্গ॥ নিজপর কাহু ন জান। প্রেমরতন করু দান॥ নিরুপম ভাবে বিভোর। অরুণ নয়ানে ঝরু লোর ॥ কহি কত গদগদ বাণী। ধরই গদাধর পানি॥ ঘন ঘন কাঁপএ অঙ্গ। **নরহরি** কি বুঝব রঙ্গ॥ (পত্র ৩২ক)

৭৩

সুরধনীতীরে গৌরগুণমণিয়া। নটন বিভোরএ দিবস রজনিয়া।। ধ্রু॥ বিপুল পুলক কুল ভূষণে ভূষণিয়া। অভিনব ভঙ্গিম ভুবন মোহনিয়া॥ ডগমগ লোচন অরুণ বরণিয়া। বরিযে জন জলদ মদ মরদনিয়া॥ বিতরে পতিতে পহু প্রেম রতনিয়া। **নরহরি** ভণই শ্রবনী ধনী ধনিয়া॥ (পত্র ৩২ক)

৭৪

ভাবে গরগর গৌরসুন্দর ভকতমণ্ডলী মাঝেরে। কনক ভূধর গরবহর তনু বিপুল পুলক বিরাজ রে॥ বিবিধ সুঘটন নটন পণ্ডিত তালে পদতল লোল রে। মদন মরদন বদনে ঘন ঘন ভণই হরি হরি বোল রে॥ অধম দূরগত পতিত পামরে হেরি ধরি করি কোরে রে। প্রেমে অতি উমতাই অবিরত সিচই লোচনলোরে রে॥ হরই বলি কলি কলুষ পলছনে ঐছে নহু অবতার রে। **দাস নরহরি** পহুক করুণ বিলাস ভুবন বিথার রে॥ (পত্র ৩২ক)

৭৫

অভিনব গৌরকিশোর। অখিল ভুবন চিত চোর॥ ধ্রু॥ করুণাময় অবতারী। গুণগণ গণই না পারি॥ অনুখন ভাবে বিভোর। অরুণ নয়নে বহে লোর॥ পরিকর চৌদিগে ঘেরি। অনিমিখ দিঠে রহু হেরি॥ বলিকলি তাপ বিনাশী। প্রেমভকতি পরকাশি॥ পুরই জনমন আশ। বঞ্চিত **নরহরিদাস**॥ (পত্র ৩২খ)

৭৬

ভাবের আবেশে গোরা হিলিঢুলি চলে। ধরিতে না পারে হিয়া ভাসে আঁখিজলে॥ সঘনে কাঁপএ তনু অনুপম ছটা। দেখি লাজে নহে থির বিজুরির ঘটা॥ ও চান্দবদনে সদা হরি হরি বোলে। নিজপর না জানে

সভারে করে কোলে ॥ যাচিয়া দুলহ প্রেম রতন বিলায়। নরহরি বিপাকে বঞ্চিত ভেল তায় ॥ (পত্র ৩২খ)

৭৭

যামিনি-দমন-দেহ ঘন কাঁপি। দুরগত দুখিত দেখি ভুজে ঝাঁপি ॥ ভাবে বিভোর গৌরগুণধাম। ভকতি রতন বিতরই অবিরাম ॥ ধ্রু ॥ ধরি পরিকর কর কহইতে বাত। ধূসর ধূরি ধরণী গড়ি যাত ॥ গরগর হিয় পতি বিরহিত ভেল। গলই নয়নজল মহি বহি গেল ॥ করুণা শুনি থির রহই না পারি। কান্দই অখিল ভুবন নরনারী ॥ নিশি দিশি এছে প্রেমপরকাশ। না পায়ল পরশ এ নরহরিদাস ॥ (পত্র ৩২খ)

৭৮

গোরা পহু পিরিতি মুরতি। কি ভাবে বিভোর দিবারাতি ॥ নিজপর কিছুই না জানে। জগত মাতায়ে প্রেমদানে ॥ কান্দে অতি করুণ করিয়া। আঁখি জলে ভাসি যায় হিয়া ॥ মুকুন্দ মুরারি হরিদাস। কান্দিয়া ফিরএ চারিপাশ ॥ যে বারেক গোরাপানে চায়। কান্দিয়া সে ধরণী লোটায় ॥ সকলে ডুবিল এই রসে। না পরশে নরহরি দাসে ॥ (পত্র ৩২খ)

৭৯

গৌর হরল ভুবন তাপ। মেটল বলি কলিক দাপ ॥ প্রেমে বিবশ দিবসরাতি। নটনে বিপুল উলস ছাতি॥ পহু চহুদিশ ভকত বেরি। অনিমিখ দিঠে রহল হেরি ॥ ভুবনমোহন মধুর দেহ। হরষে বরষে পুরুব লেহ ॥ সঘনে বয়নে অমিয় ঢারি। নয়ন জলদে জল বিথারি ॥ নরহরি ভণ কি নব নাহ। বিলসে কি রসে নদীয়া মাহ ॥ (পত্র ৩৪ক)

৮০

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ। পাতিল কি নব প্রেমের ফান্দ ॥ কেহো এড়াইতে নারয়ে তাহে। মজিল সকল ভুবন যাহে ॥ কিবা সে করুণা প্রকাশ করি। কান্দে দুরগত পতিত হেরি ॥ নরহরি প্রাণজীবন প্রভু। হেন অবতার না হয় কভু ॥ (পত্র ৩৬খ)

৮১

প্রভু মোর নিতাই অদ্বৈত দয়াময়। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমালয় ॥ শ্রীবাসাদি প্রিয় পারিষদগণ সঙ্গে। ধন্য কলিযুগে বিহরয়ে নানা রঙ্গে ॥

সংকীর্তন সুখেতে মাতায় ত্রিভুবন। দীনে দেই ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেমধন॥ শুনিয়া করুণা নরহরি পড়ু ধান্ধে। সোঙরি সোঙরি গুণ কেবা নাহি কান্দে॥ (পত্র ৩৬খ)

৮২

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচান্দ নিত্যানন্দ অদ্বৈত গুণের নিধি। ধন্য এ অবনী ধনী কলিযুগ আনি মিলাঅল বিধি॥ বেদ অগোচর চারু লীলা হেন করুণা না শুনি কানে। দেবের দুলভ প্রেম মহাধন বিতরে অধমজনে॥ কান্দিয়া কান্দায় ত্রিজগত নাচি নাচায় কত না সাধে। কেবা আছে হেন হেন গুণ গণ শুনিয়া ধৈরজ বান্ধে॥ আনের কি কথা ঝুরে পশুপাখি পাষাণ গলিয়া যায়। নরহরি কিবা করম বিপাকে বঞ্চিত সে রাঙ্গা পায়॥ (পত্র ৩৬খ)

৮৩

গৌর নিত্যানন্দ আনন্দের কন্দ অদ্বৈত সুন্দর মোর। সংকীর্তনরসে দিবানিশি ভাসে সুখের নাহিক ওর॥ গদাধর নরহরি বক্রেশ্বর শ্রীবাসস্বরূপ-সঙ্গে। মুরারি শংকর দাস গদাধর গৌরীদাস নাচে রঙ্গে॥ মাধব মুকুন্দ বাসু রামানন্দ গোবিন্দ আনন্দে গায়। সে গতি সুচারু শুনিতেই দারু পাষাণ গলিয়া যায়॥ খোল করতাল বাজএ রসাল মহীঅমঙ্গল নাশে। হেন রঙ্গ রীতি কি কলি সুকৃতি কহে ঘনশ্যামদাসে॥ (পত্র ৩৬খ-৩৭ক)

৮৪

গোরা অপরূপ নব যৌবন রঙ্গ। পুলকিত সঘনে তড়িত জিতি অঙ্গ॥ সুমধুর অধরে মিলিত মৃদু হাস। ভণই ন ভণই মধুরতর ভাস॥ চলই ন চলই চরণ দুইচারি। কতহি ভঙ্গি সঞে চকিত নেহারি॥ অবনত ভাঙ্ রহই মুখ মোরি। নরহরি পহু জনু মুগধিনী গোরি॥ (পত্র ৩৭ক)

৮৫

নবীন বয়স গোরা রায়। ভাবের তরঙ্গ কত তায়॥ কিবা চান্দ মুখে মৃদু হাসি। অমিয়া বরিষে রাশি রাশি॥ বিপুল পুলক ভাল সাজে। মরম কহিতে নারে লাজে॥ না জানিয়ে কাহার কথায়। পদ দুই চারি চলি যায়॥ আঁখি কোণে কিবা সে চাহনি। অবনত ভুরু কাম ফণি॥ নরহরি পহু বলিহারি। যেন কুল মুগুধিনী নারী॥ (পত্র ৩০ক)

৮৬

বিলসত গৌর কনক জিনি অঙ্গ। যৌবন আধ অধিক ভেল রঙ্গ॥ ভুরু

যুগ ভঙ্গি মদন ধনু জিত। নয়ন কটাক্ষ বিশিখ বিপরীত॥ অবনত বয়ন হসত পুন গোই। ভণই বচন কছু প্রগলভ হোই॥ তিলে তিলে বিপুল পুলক অনুপাম। বুঝব কি ভাব ভণই **ঘনশ্যাম**॥ (পত্র ৩৭ক)

৮৭

গৌরবরণ উজোর। বেকত যৌবন থোর॥ ভাবে ভরল হি গাত। ভণই কৈছন বাত॥ হসত বয়ন ছিপাই। নয়ন মন মুরুছাই॥ ঝলকে বিপুল সুবেশ। বিথুরি চাঁচর কেশ। নিরত রঙ্গিম দীঠ। লাগি গতি অতি মীঠ॥ সোই সুবদনী চন্দ। হেরি **নরহরি** ধন্দ॥ (পত্র ৩৭ক)

৮৮

পুরণ তরুণ বয়স বরবেশ। মনমথ গরব খবর ছবিলেশ॥ বিলসত গৌর কমলদল দীঠ। প্রগলভ ভাবে বচনভেল মীঠ॥ ভুরুযুগ ভঙ্গি ভুবন মনহারী। হাসত কত শত রঙ্গ বিথারি॥ উলসিত সঘন গমন গজজিত। **নরহরি** পহুঁক গোরি সমরীত॥ (পত্র ৩৭খ)

৮৯

তরুণ বয়স রসের গোরা। তরুণিগণের পরাণচোরা॥ কিবা সে সুবেশ চাঁচর চুলে। ভুরুর ভঙ্গিতে কেবা না ভুলে॥ বদনে মদন গরব নাশে। অমিয়া বরিষে মধুর হাসে॥ লোচন খঞ্জন চাহনি চারু। তাহে কি ধৈরজ রাখয়ে কারু॥ ভাবেতে বিভোর না বাঁধে থেহা। পুলকিত হেম তড়িত দেহা॥ নিরুপম রীতি কহএ কত। **নরহরি** ভণে সে ধনী মত॥ (পত্র ৩৭খ)

৯০

রসময় গৌর রমণি মন ফান্দ। মনমথ গরব হরণ মুখ চান্দ॥ কুমকুম কনক দমন মৃদু দেহ। অবিরল পুলক বলিত নহু থেহ॥ নিরজনে রহি গহি পরিকর পাণি। ভাবে মগণ ঘন ভণে মৃদুবাণী॥ জাহ সজনি জাহা গোকুল নাহ। আনবি তুরিত মিলব ইহ ঠাঁহ॥ হিম করকিরণে রজনী উজিয়ারি। হেরইতে জিউ কি করই হামারি॥ কহি ইহ বাণী পহিরে পীতবাস। মরম কি সমুঝব **নরহরি দাস**॥ (পত্র ৩৭খ)

৯১

দেখ গৌর গোকুল নাহ। ভাবে গরগর ভরল অনুখণ পুলক ভরু হিয়

যাহ॥ ঘন ভণত মৃদু মৃদু বাণী। তুরিতে সখী ঘনশ্যাম পিয় পয় জাহ মঝুহিয় জানি॥ হম রহল তুয়াপথ ছোই। ঐছে আয়বি কুঞ্জে যব নগচন্দ্র উদয় না হোই॥ ইহ কহ অতি অকুলাত। দাস নরহরি পহুক ললিত বিলাস বুঝইন যাত॥ (পত্র ৩৭খ)

৯২

ভাবে গরগর গোরা গুনমণি ভণএ মধুর কথা। হেদে হে বিশাখা সখি রাখ প্রাণ যাহ সে নাগর যথা॥ তুমি সুচতুরা চারুচাতুরিতে সাধিবে সকল কাজ। এত কহি চাহি চারিপাশে হাসি বাসএ অধিক লাজ॥ ক্ষেণেক বিরমি পুন কহে কুঞ্জে অহি সে পরাণপিয়া। সে চান্দ বদনে নিরুপম হাসি নিরখি জুড়ায় হিয়া॥ ইহা বলি চলে পদ দুই চারি চরণ ভঙ্গিমা ভালে। নরহরি পহু নয়ান নাচনে কি জানি কি রস ঢালে॥ (পত্র ৩৭খ)

৯৩

শরদ নিশাকর সমুদিত ভেল। চহুদিশ চারু কিরণে ভরি গেল॥ শীতল মলয় পবন বহু মন্দ। বিকশিত কুসুম বিপিন ভরু গন্ধ॥ নিরমল রজনী হেরি নবনাহ। ভাবে ভরল হিয় অতুল উছাহ॥ লহু লহু কুহু বহু গায়ব গীত। নাচব যমুনা পুলিন পুণীত॥ বাঅব যন্ত্র ভণত ইহবাত। পেখল সুনছল রহই ন জাত॥ তেজি ভবন চলু পদ দুই চারি। চঞ্চল নয়ন সুচকিত নেহারি॥ সকুচই গমনে কোউ নাহি সঙ্গ। মোতিম বসনে অগোরই অঙ্গ॥ গৌর কিশোরী লখই নাহি জাত। নরহরি বুঝব কি মরমক বাত॥ (পত্র ৩৮ক)

৯৪

গৌর গোকুল চন্দ্র সুন্দর নিন্দি কাঞ্চন কাঁতি। লোচনাঞ্জন লোল লোকত কামিনীকুল মাতি॥ কোটি মন্মথ গর্ব ভঞ্জন মঞ্জু মুখ মৃদু হাস। ভাবে ভেল বিভোর নিরজলে ভণত লহু লহু ভাষ॥ শরদ যামিনী যামিনীকর কিরণ করয বিথার। কানু কালিন্দী তীরে ভেটব বেগি রচ এ সিংহার॥ ঐছে কহি হিয় হোত উলসিত তলব বহত ন থির। দাস নরহরি পাণি পকরি পধারি সুরধনী তীর॥ (পত্র ৩৮ক)

৯৫

ভাবে ভরল গৌরচন্দ্র নিরখি শরদ যামিনী। পুলক বলিত ললিত দেহ

দমকত জনু দামিনী॥ মন্দ মন্দ হসত লসত দশন কুন্দ পাঁতিয়া। চলব কুঞ্জে মিলব কান কতহিঁ কতহিঁ ভাঁতিয়া॥ ডগমগ পগ ডগ ভরু সুখ সায়রে অবগাহই। চঞ্চল মৃগ লোচনে চহু ওর চকিত চাহই॥ কি মধুর পরিধের বসন ভীষণ মণি শোহএ। নিরুপম নবভঙ্গি নিরত নরহরি মনমোহএ॥ (পত্র ৩৮ক)

৯৬

হেম দমন রুচি রুচির কলেবর। পুলক বলিত অতি ললিত ভঙ্গি ভর॥ নিরুপম নিরত ভাবভরে গরগর। ভণই কি ঋতু হেমন্ত মধুরতব॥ রজনী উজর বরষ তহি মহিমকর। চলব নিকুঞ্জে মিলব নব নটবর॥ ঐছল কহিগহি পিয় পরিকর কর। ঠৌকি ঠৌকি পপ ধরত ধরণীপর॥ অমল কমল দিঠে তরল নিরন্তর। লহু লহু হসত অমিয় ঝরু ঝর ঝর॥ ওঢ়ই ঘন ঘন শ্বেত বসনবর। নরহরি ধন্দ চরিত লখি পহু-কর॥ (পত্র ৩৮ক)

৯৭

ভাবে ভেল ভোর পহু গৌরগুণ ধাম। হেরি হেমন্ত ঋতু রজনী অনুপাম॥ পহিরে ভূষণ বিপুল পুলক ভরু দেহ। বিধু উদয় নহত যব যব তবহি তজি গেহ॥ ধরত পগ ধরণীপর তরল অনিবার। মুখর মণি নূপুর নিবারি ঝনকার॥ কমল দল দলন দিঠে ঘুমি চহুতর। ঝাঁপি তন তড়িত ঘন বসন ছবি জোর॥ হসত মৃদু দশনদ্যুতি নহই পরকাশ। লাজ ভয় দূরি ভণত ন মধুর ভাষ॥ জহ্নুনন্দিনীতীর করত পরবেশ। দাস নরহরি ন সমুঝত চরিত লেশ॥ (পত্র ৩৮ক)

৯৮

গৌর সুন্দর নবকিশোর। কনক রুচি রুচির তনু তরুণী মনচোর॥ হেরি হেমন্ত ঋতু রাতি। ভাবভরে হসত মৃদু উলসে ভরু ছাতি॥ কোন সমুঝব চরিত লেশ। বৈঠি নিরজনে বিরচি মধুরতর বেশ॥ চলু নিজ ভবন চলু থোরি। করই অভিসার জনু রমণিমণি গোরি॥ লাজ ভয় ভৈল উপনীত। চারু চঞ্চল নয়ন চলই চহু ভীত। দাস নরহরি গহিক পাণি। করু কত মনোরথ ন কহই কছু বাণী॥ (পত্র ৩৮খ)

৯৯

ললিত শিশির ঋতু নিশি উজিয়ার। হিমকর হিম ঘন সমীর তুষার॥

যামিনী পহর যব হি রহি যাত। তবে পহু ভাবে ভণই মৃদু বাত॥ এ সখি সুতল গুরুজন মোর। অবহি চলব যাঁহা বরজ কিশোর॥ আগে চলহ তুহুঁ পথহুঁ নিহারি। কহি ইহ বচন চলই পদচারি॥ সময় উচিত কিএ মধুর সিংহার। গৌর গোরি কোউ লখই না পার॥ সুরধনী তীরে করত পরবেশ। নরহরি বুঝব কি উলস অশেষ॥ (পত্র ৩৮খ)

১০০

রসময় গৌব কিশোর। অনুখণ ভাবে বিভোর॥ শিশির রজনী আন্ধিয়ার। হেরইতে হরষ অপার॥ শীতে কনক তনু কাঁপি। নীলবসন ঘন ঝাঁপি॥ চকিত চাহি চহু ওর। তেজি ভবন চলু থোর॥ নহত দশন পরকাশ। ভএ না ভণই মৃদু ভাষ॥ কি নব চরিত অনুপাম। পহুক নিছনি ঘনশ্যাম॥ (পত্র ৩৮খ)

১০১

শিশির ঋতু রজনী পহু পেখি নহু থির। বিরচি নব বেশ চলু সুরসরিত তীর॥ ঝলকত সুঅঙ্গ জিনি কনক নব নীত। হসত মৃদু লসত মুখ শরদবিধু জিত॥ চপল লোচন যুগল চলই চহু ওর। ললিত নব ভঙ্গি মনমথ মরম চোর॥ ধরত পগ ধীরগতি লাজ ভয় ভুরি। মধুর মঞ্জীর বর যতনে করু দুরি॥ ভণত পিয় পাণি গহি মধুরতব ভাস। আজু বিহি সদয় সব সফল অভিলাস॥ ঐছে বহু ভাঁতি ভণ চরিত অনুপাম। গৌর পহু গৌরি ইহ বুঝল ঘনশ্যাম॥ (পত্র ৩৮খ)

১০২

উজর রজনী রজনীকর কিরণে। উগরই সৌরভ মলয় সমীরণে॥ বিকসিত কুসুম ভ্রমর ঝঙ্করই। কুহু কত পিকু পঞ্চম শর ভরই॥ ললিত বসন্ত সময় ধনি ধনিয়া। ভাবে বিভোর গৌর গুণমণিয়া॥ মৃদু মৃদু হাসি ভণই মৃদু বচনা। তুরিত সুবেশ করহ সখি রচনা॥ বিলসিত কুঞ্জে কানুসহ অবহি। ঐছে ভণই ন বিরমি চলু তবহি॥ কতহি রঙ্গে নরহরি কর ধরই। জনু নব গোরি গরবে অভিসারই॥ (পত্র ৩৮খ-৩৯ক)

১০৩

মধুর বসন্ত রজনী আন্ধিয়ার। কুজত কুহু কুহু পিক অনিবার॥ রসময় গৌর ধরই নহি থেহ। ভাবে ভরল পুলকাইত দেহ॥ ঘন ঘন ভণই কি

শুভখণ আজ। ভেটব ঝট নট নাগর রাজ ॥ ঐছে ভণত চলু পদ দুই চারি। **নরহরি** পহুক চরিত বলিহারি ॥ (পত্র ৩৯ক)

১০৪

আজু সরস বসন্ত ঋতু নিশি নিরখি গৌর কিশোর। কনক দরপণ দেহ পুলকিত ললিতভাবে বিভোর ॥ ভুবনমোহন বেশ বিরচই বৈঠি নিরজন মাহ। পকরি সহচর পাণি ঘন ঘন ভণই ভেটব নাহ ॥ লেহ কুসুম পরাগ ফাগু সুগন্ধি চন্দন পংক। ঐছে ভণি মৃদু হসত নিরুপম লসত বয়ন ময়ঙ্ক ॥ চপল লোচনে চাহি পহু দিশ চলই গতি অতি পোরি। **দাস নরহরি** নিছনি জনু অভিসরই নয়ন কিশোরী ॥ (পত্র ৩৯ক)

১০৫

গ্রীখম রজনী উজোর। শশধব কিরণে ভরল চহুতর ॥ বিকশত কুসুম অপার। গুঞ্জত পুঞ্জ ভ্রমর অনিবার ॥ ভাবে বিহ্বল পহু ভেল। ভণই সঘনে অবরহই না গেল ॥ এ সখি চল আগুয়ান। তুরিতে নিকুঞ্জে মিলাঅহ কান ॥ দূরকর বিবিধ সুবেশ। মালতি কুসুমে রচহ মঝু কেশ ॥ চন্দন চরচহ গাত। চুঅত ঘরম না বসন সুহাত ॥ ঐছন ভণি বহু বাণী। তেজল ভবন নূপুর গহি পানি ॥ **নরহরি** রঙ্গ নেহারি। গৌর কি গোরি লখই নাহি পারি ॥ (পত্র ৩৯ক)

১০৬

গ্রীখম ঋতু বহু মলয় সমীর। নিশি আন্ধিয়ারি কুহকে পিকু কীর ॥ গৌর সুঘর বর পরম উলাস। কি বুঝব নব নব ভাব বিলাস ॥ মৃগমদে লেপই তনু অনিবার। যতনহি ঘর সঞে হোত বাহার ॥ চলই কুসুমবন গমন সুছন্দ। হেরি চরিত **নরহরি** রহু ধন্ধ ॥ (পত্র ৩৯ক)

১০৭

গৌরচন্দ্র সুন্দর সুখকন্দ হৃদয় চোর। গ্রীখম ঋতু রাতি নিরখি ভাবে পরম ভোর ॥ পুলকাবলি বলিত দেহ দামিনী জিতি কাঁতি। ঝলকত নব ললিত বেশ.........পাঁতি ॥ চঞ্চল যুগ লোচন ধৃতি মোচন মৃদু হাস। উপজত হিয় লাজ ভুরি ভণত মধুর ভাস ॥ ঘুমল সব লোক কুঞ্জে কানু............। ....ঐছন ভণি ভবন তেজি চলু **নরহরি** সঙ্গ ॥ (পত্র ৩৯ক)

১০৮

বর্ষাঋতু রজনী শশি কিরণে উজিয়ার। (নি) কুজত শিখি ক্রৌঞ্চ পিকু মধ্যম পরচার॥ হেরি সময় সুন্দর শচিনন্দন নহু থেহ। ভাবে ভেল বিভোর বিপুল পুলকাবলি দেহ॥ বেশ বিরচি বন্ধুরবর দরপনে অবলোকি। হাসত মৃদু দন্তকিরণ নিকসত নাহি রোকি॥ ধরি পরিকর পানি তরল লোচন ছবি ধাম। তেজল নিজ ভবন ভুরি ভঙ্গিম অনুপাম॥ ঘন ঘন ভণ মধুর বাণী মিলব নব নাহ। এ সখি গুরু দুরজন ভয় উপজত হিয় মাঝ॥ ঐছে ভণত ভরু ডগপগ নূপুর রবরারি। ধনি সুরধনী তীরে বিলসে **নরহরি** বলিহারি॥ (পত্র ৩৯খ)

১০৯

ভাবে বিভোর গৌরগুণমণিয়া। শিরিস কুসুম তনু হেম বরণিয়া॥ মরকত মণিময় ভূষণ বিলসে। নীল কমল কর গহই সুউলসে॥ মৃদু মৃদু হাসি নয়ন সঞ্চরই। মনমথ কোটি গরভবর হরই॥ বর্ষাঋতু রজনী আঁধিয়ারে। তেজি ভবন চলু সুরধনী ধারে॥ নিকসত তেজ উপজে বহু শংকা। ঝাঁপি বসনঘন বয়ন ময়ঙ্কা॥ কতহিঁ ভঙ্গি সঞে পগযুগ ধরই। **নরহরি** ভণ কি গোরি অভিসরই॥ (পত্র ৩৯খ)

১১০

জলধর ঘোর গগনে ঘন গরজত ঝরঝর বরষত বারি। চমকত বিজুরি কুহকে শিখি ডাহুক কঠিন রজনী আন্ধিয়ারি॥ ভাবে বিভোর গৌর দ্বিজরাজ। পুলক বলিত তনু ললিত বেশ লস উলস উথলে হিয় মাঝ॥ ধ্রু॥ গোপনে ভবন তেজি অতি তুরিতহি গহিন বিপিনে চলি যাত। ধরইতে চরণ ধরণীতলে পিছলই ফণি মণি পথ দরশাত॥ চাহই চহুদিশ চকিত কো উজলি ঘরসঞে হোত বহার। অপরূপ রীত নিরখি **নরহরি** ভণ গোরি কি করু অভিসার॥ (পত্র ৩৯খ)

১১১

পূণিম রজনী উজিয়ারি। শশধর কিরণে বিথারি॥ পহু নব ভাবে বিভোর। সঘনে ভণই হসি থোর॥ সজনি মিলব নব নাহ। ঐছে ভণত বহু চাহ॥ সময় উচিত রচি বেশ। উপজত উলস অশেষ॥ অন্তর তরল ন থেহ।

ত্বরিত তেজি নিজ গেহ॥ নরহরি বুঝব ন রীত। চলত চাহি চহু ভীত॥ (পত্র ৩৯খ)

১১২

কুহু নিশি নিরখি ভাবে পহু ভোর। অলখিত ভবন্ তেজি গতি থোর॥ অপরূপ বেশ বসন অনুপাম। চাহনি ঠমকে মুরুছে কত কাম॥ খণে বহু লাজ খণহি ভয় মানি। খণে খণে ভণই কতহি মৃদুবাণী॥ কুসুমবিপিনে চলু নরহরি সঙ্গ। বুঝ ন এ ধনি অভিসার কি রঙ্গ॥ (পত্র ৪০ক)

১১৩

আজুক রঙ্গ কহই নহি জাত। ভাবে বিভল পহু উলসিত গাত॥ সুরধনী-তীরে তরুণ তরুবেলী। পহিল রজনী তহি চলই এ কেলি॥ চপল নয়ন ঘন চকিত নেহারি। চহু দিশ জনু নব কমল বিথারি॥ বুঝব কি নরহরি ললিত বিলাস। গোরি গমন কি এ কানুক পাশ॥ (পত্র ৪০ক)

১১৪

দিনমণি তাপে তপত মহী হোই। ঘরসাঞে বাহির চলই ন কোই॥ ঐছ সময় পহু গৌর কিশোর। ভাবে ভরল তনু পুলক উজোর॥ চহুদিশ চকিত পথ হেরি। সুরধনী তীরে গমন তহি বেরি॥ ভণ ঘনশ্যাম কি ললিত বিহার। জনু অনুরাগিনী করু অভিসার॥ (পত্র ৪০ক)

১১৫

ঝাঁপল দিনকর কিরণ তুষার। হোঅল জনু দিন নিশি আন্ধিয়ার॥ উলসিত গৌর কমলদল দীঠ। অনুখণ বঙ্ক বিলোকন মীঠ॥ তেজল গেহ গহনে চলি যাত। ঘন ঘন বসনে অগোরত গাত॥ ভণ ঘনশ্যাম চরিত চিত চোরি। জনু অনুভব অভিসারিণী গোরি॥ (পত্র ৪০ক)

১১৬

গগনে গরজে ঘন পাঁতি। ঝাঁপল দিনমণি কাঁতি॥ ঝরঝর ঝরু জলধার। চহুদিশ ভেল আন্ধিয়ার্॥ আজু কি অপরূপ রঙ্গ। ভাবে ভরল পহু অঙ্গ॥ ধৈরজ ধরই ন জাত। হি এ উপজাত কত বাত॥ বসনে তড়িত তনু ঝাঁপি। ঘর সঞে নিকসত কাঁপি॥ ঘন ঘন চকিত নেহারি। চলু কি এ কুলবতী নারী॥ পৈঠল সুরধনীতীর। পুলকিত হৃদয় অথির॥ নরহরি কত অনুমানি। পাঅল নিধি কি ন জানি॥ (পত্র ৪০ক)

১১৭

কনক মুকুর জিনি বরণ উজোর। অখিল ভুবন জন লোচন চোর ॥ গোকুল জীবন গৌর দ্বিজরাজ। অপরূপ ভাব বেকত গেল আজ ॥ হাসত লহু লহু উলস অশেষ। কতহি রঙ্গে বিচরই নিজ বেশ ॥ ঝলকত গেহ অতুল জগমহি। যতনহি শেজ বিছায়ত তাহি ॥ ভণই বিনোদবচন অনিবার। ঘন ঘন পেখই ভবন দুয়ার ॥ কো সমুঝব নব ভঙ্গি অনেক। নরহরি কহ কি গোরি পরতেক ॥ (পত্র ৪০ক)

১১৮

ভাবে ভরল শচীনন্দন দেহা। কম্পই তনুমন তনকন থেহা ॥ দিঠে জল বহই কহই মৃদুভাষে। কাহে না য়াঅল পিয়া মঝু পাশে ॥ কয়লু সুবেশ `বিফল সব ভেলা। হেরইতে পন্থ রজনী বহি গেলা। কুঞ্জ কুটির দহন সম দহই। কহ ঘনশ্যাম কৈছে হিয় মহঈ ॥ (পত্র ৪০ক-৪০খ)

১১৯

পিরিতি মুরতি গোরা বিধু। যার লাগি ঝুরএ কুলের কুলবধূ ॥ সুরধনী-তীরে নিরজনে। না জানিএ কিভাবে বিভোর খেণে খেণে ॥ কাঁপে হেম নবনীত দেহা। তিলে আধ যতনে ধরিতে নারে থেহা ॥ গদগদ কহে আধবাণী। কেনে না আইল পিয়া পোহাইল রজনী ॥ এত কহি চারিদিগে চায়। নয়ানের জলে মুখ বুক ভাসি যায় ॥ নরহরি প্রবোধিতে নারে। তিলে তিলে বাঢে তাপ হিয়ার মাঝারে ॥ (পত্র ৪০খ)

১২০

গরগর ভাবে গৌর দ্বিজরাজ। মনমথ কোটি মথন তনু সাজ ॥ বঙ্ক নয়নে পথ চকিত বিলোকি। উপজত রোশ মনহি মন রোকি ॥ ঘন ঘন ভণই ভঙ্গি সএ বাত। নাহ গমন কিএ শুভ পরভাত ॥ যা সঞে সুখে নিশি কয়ল নিবাস। তুরিত যাহ পুনঃ তাকর পাশ ॥ ভেল মঝু ভাগ দরশ হাম কেল। ভণি ইহ বাণী মৌন গহি লেল ॥ অবনত আনন্দে তেজই নিশাস। নরহরি কি বুঝব এ নব-বিলাস ॥ (পত্র ৪০খ)

১২১

ভাবে ভোরা গোরা গুণমণি। দুটি আঁখি মুদিয়া কহএ মৃদুবাণী ॥ কেনে বঁধু আইলা বিহানে। যেখানে বঞ্চিলা নিশি যাহ সেই খানে ॥ আহা মরি সে

কেমন নারী। কিবা বনাইলে বেশ দেখিতে না পারি॥ এত কহি থির নহে হিয়া। ছাড়এ নিশাস নরহরি পানে চাঞা॥ (পত্র ৪০খ)

১২২

অভিনব নটবর গৌর কিশোর। রহই ন থির বহই দিঠে লোর॥ বারিজ বদন নিবসনত মাথ। নিবদয় বিহি কি ভাবে ভরু গাত॥ নিসসই সঘনে ভণই মৃদু ভাষ। বঞ্চল পিয় হিয় মিটল হুলাস॥ ঐছে কহই না সহই হিয় দাহ। নরহরি পহু মূরুছই মহী মাহ॥ (পত্র ৪০খ)

১২৩

আজু অবনত বদনে বসি। কিভাবে ভাবিত নদীয়ার শশী॥ হেম জিনি তনু কাজর পারা। মুখ বাহি পড়ে আঁখের ধারা॥ সঘনে কহে কি করিছে হিয়া। বুঝিলাম মোনে বঞ্চিল পিয়া॥ কি করিব বিধি সাধিল বাদ। ঘুচাইল সব মনের সাধ॥ ধিক ধিক জিয়া কি কাজ আর। এত কহি হিয়া ধরিতে ভার॥ আনলের সম নিশাস বহে। নরহরি পহু মূরুছি রহে॥ (পত্র ৪০খ)

১২৪

কাঞ্চনবরণ হরণ তনু গোরা। নিরত অথির কি ভাবে ভেল ভোরা॥ ভণই সে কানু পড়ল পগ যব হি। ঐছে কুমতি হাম নাহে বিনু তব হি॥ না শুনলু বিনতি বিরস ভই গেলা। মো সব গুণত গড়ই হিয় মেলা॥ বিহি কিএ সফল করব মঝু নয়না। পুন কি হেরব নরহরি পহুঁ বয়না॥ (পত্র ৪০খ)

১২৫

ভাবে গরগর গোরা হিয়া। ঘনঘন কহে ফিরি গেল প্রাণপিয়া॥ হায় হায় কি কাজ করিনু। কহিল কত না কথা তাহা না শুনিলু॥ ধিক ধিক কি কাজ জীবনে। সে ভূমে লোটায় তাহা না দেখি নয়নে॥ এত কহি তাপিত অন্তরে। নরহরি পহুঁ নিশসই বারে বারে॥ (পত্র ৪০খ-৪১ক)

১২৬

ভাবে অবশ তনু পুলক ন ধেহ। হোত মলিন খীণ কাঞ্চন দেহ॥ জাগই নিশি দিন মন নহু পাস। অবনত বয়নে তেজই ঘন শাস॥ খণে কহে কানু গমন দূরদেশ। গাঅই খণে তছু তরিত অশেষ॥ খনে রহু নিচল বচন গতি মন্দ। নরহরি ঐছে চরিত হেরি ধন্ধ॥ (পত্র ৪১ক)

১২৭

আজু ভাবে বিয়াকুল গোরা। তনুখানি খীণ মলিন সুচারু লোচনে ঝরএ লোরা॥ সে যে জাগিয়া পোহায় নিশি। অনত বিরত অবনত শির বিরস বদনশশী॥ কত কহে গদগদ কথা। দূরদেশে পিয়া হিয়া দগধয়ে ধিক এ জীবন বৃথা॥ এত কহি থির নাহি বান্ধে। বিপরীত দশা বিধি ঘটাঅল হেরি **নরহরি** কান্দে॥ (পত্র ৪১ক)

১২৮

পহু কি ভাবে বিভোর। পুলক বলিত সুললিত তনু জনু তপত কনক উজোর॥ চান্দ মুখে মৃদু হাস। মদন মদভর হরণ মঞ্জু সুকঞ্জ নয়ান বিলাস॥ ভণত বচন বিশেষ। তোরি কুসুম সুবাসপিয় মধু বে (?) গিরি রচহ বেশ॥ ঐছি কহি বহি যাত। মুদিত ঘন **ঘনশ্যাম** শ্রুতি ভরি সুনত সুমধুর বাত॥ (পত্র ৪১ক)

১২৯

কাঁচা হেম বরণিয়া গোরা। নবযুবতি পরাণ চোরা॥ চারু লোচন ভঙ্গিমা ভালে। মৃদু হাসিতে অমিয়া ঢালে॥ কিবা ভাবে আউলাইছে দেহা। তিল আধ না ধরিএ থেহা॥ কারে কহে আধ আধ ভাষে। ওহে বৈসহ আমার পাশে॥ এই বান্ধহ কুন্তল ভারা। গলে পরাহ কুসুম হারা॥ দুটি নয়ানে কাজর দিয়া। ভালে চিত্র বিরচহ পিয়া॥ ইহা কহিতে উলাস যত। **নরহরি** তা কহিবে কত॥ (পত্র ৪১ক)

১৩০

আজু এ নদীয়া বিনোদ গোরা। উলসে বিলসে কিরসে ভোরা॥ আধ আধ কারে কহ এ ছলে। আইস আইস ওহে কদম্ব তলে॥ বারেক দাঁড়াও ত্রিভঙ্গ হৈয়া। এত কহি হাসি রহ এ চাঞা॥ কিবা সে ভুরুর চালনি চারু। সরম ভরম না রাখে কারু॥ অঙ্গ ভঙ্গি করে কত না ছান্দে। তাহে মনমথ পড়এ ধান্ধে॥ **নরহরি** পহুঁ রূপের ছটা। হেরি মুরুছয়ে যুবতি ঘটা॥ (পত্র ৪১ক)

১৩১

কামিনীমোহন তনুখানি থির দামিনী দমন ছটা। শিরিস কুসুম জিনি সুকোমল ঝলকে পুলক ঘটা॥ গোরা উলসে রসের ভরে। লোচন চালনি

চারু চাতুরিতে কেবা বা ধৈরজ ধরে ।। বদনে মদন মুরুছয়ে মৃদু বচন ভণয়ে হাসি। ওহে প্রাণ পিয়া হিয়া কি করএ সুনাহ মোহন বাঁশি ।। এত কহি চারু শ্রুতিপাতে গানে বনের হরিণী যেন। জানিলু নিচয় নরহরি পহুঁ সে নব রঙ্গিণী যেন ।। (পত্র ৪১ক)

১৩২

আজু কি নব রঙ্গ পহুক পুলকে ভরল গাত। মধুর মধুর হস ইহ রসে কহই মধুর বাত ।। বংশী বিবরে ধরব বয়ন বয়নে বয়নে (মেলি ?) । .... গরবাঁহি ঐছে ভণত নিরব ভেলি ।। চাহই যুগ বঙ্ক নয়নে মনমথমদ হারি। মঞ্জুল ভুজ ভঙ্গি করই কুঞ্জর কর বারি।। সম্বর বব অম্বরে থল (?) কুঞ্চিত কচ ভার। নরহরি হেরি ধন্দ গৌর গোরি কি অবতার ।। (পত্র ৪১খ)

১৩৩

গৌরবিধু বিধুবদনে মধুরিম হাসি বস লেহি পাত। লোল লোচন কোণে অনুখণ কত হি রস বরখাত ॥ ভণত মৃদুমৃদু বাণী পকরহ পানি গোকুল চন্দ। ভ্রমণ করব সু কুসুম কাননে ঐছে কহু বহু ছন্দ ॥ চলত পদ দুই চাবি চৌকে নিহারি চহু দিস খোর। অঙ্গ ভঙ্গি অনঙ্গ মদভব হারি রঙ্গে বিভোর ॥ খদ··· কুন্তল জাল মালতি মাল কছু না সমহারি। দাস নরহরি মানি মন ইহ সোই নব সুকুমারী ॥ (পত্র ৪১খ)

১৩৪

আজু উলসে বিলসে গৌর সুন্দর শশিবদনা। ঝলকত তনু তড়িত থির পহিরণ নব জলদ চীর চারু চরিত ভূষণ মণি মনমথ মদ কদনা ॥ কহু নহু নহু কবহু কোর না চলু চরণ মোর ঐছে ভণত হসত মন্দ লসত কুন্দবদনা। উমাগত জনু গরবি গোবি লোচনযুগ পলক ছোরি চাহত কত ভাঁতি কি নরহরি পহু রস সদনা ।। (পত্র ৪১)

১৩৫

সুরধনীতীরে সুবাস কুসুম কাননে বিলসে গোরা। মনমথমদ ভাঙ্গএ সে নব ভঙ্গিতে ভুবন ভোরা ॥ আজু না জানি এ কোন রঙ্গ। সঘনে পুলক কুল উলসিত বসনে ঝাঁপএ অঙ্গ ॥ ধ্রু ।। জলদ লোচন কোণে কত ভাঁতি পহনি কি মধু মাখা। মুখবিধু সুধা ঝরএ হাসিতে পরাণ না যায় রাখা ।। ভণে আধ

বাণী কি পুছ সজনি রজনী গোঙাহু সুখে। **নরহরি** প্রাণ পিয়া পিরিতি কি কহিতে পারিয়ে মুখে॥ (পত্র ৪১খ)

১৩৬

গোরা মুখে কি মধুর হাস। কুলবতী সতীর ধরম করে নাশ॥ কি ভাবে ভাবিত হঞা চায়। আঁখি কোণে কত না মদন মুরুছায়॥ কহে মৃদু মৃদু আধ বাণী। কত না আদরে গিয়া পোহাইল রজনী॥ কহিতে পুলকে ভরে দেহা। **নরহরি** পহু না ধরিতে পারে থেহা॥ (পত্র ৪১খ)

১৩৭

কনক কেশর পারা গোরা। অনুখণ কি না রসে ভোরা॥ না জানি কি আঁখি কোণে চায়। সঘনে বসন ঝাঁপি যায়॥ কহএ সুখের নাহি ওর। পিয়া সে পিরিতি জানে মোর॥ এত কহি হাসে লহু লহু। উলসিত **নরহরি** পহু॥ (পত্র ৪১খ) পুথি খণ্ডিত

গীতচন্দ্রোদয় সম্পর্কে নরহরির মতামত বিষয়ক পদাবলী

১৩৮

পরম সাদর হৃদয় সাধুপদ ধ্যান করি রচব কছু করব সংগ্রহ ললিত গীত। গীতচন্দ্রোদয় গ্রন্থাখ্য শ্রবণ মন হারী গায়ক বিবর্দ্ধব অধিক প্রীত॥ ক্ষেমি অপরাধ পরিশোধহ সুরসিক জন জানি বালক মুরুখ করহ মঝু হিত। **দাস নরহরি ঘনশ্যাম** মম নাম যুগ ভণ্ড সমহ মন সমুঝই কাব্যরীত॥ (পত্র ৮খ)

১৩৯

গীতচন্দ্রোদয় গ্রন্থ অনুপাম। সুগম সংখ্যেপ চিত চিন্ত অবিরাম॥ ন করু পরকাশ লখি বিমুখ দুখ ধাম। জোড়ি কর করত পরিহার **ঘনশ্যাম**॥ (পত্র ৮খ)

১৪০

গীতচন্দ্রোদয় গ্রন্থ রসধাম। অষ্টামৃতাতিশয় শোহে অনুপাম॥ রসিক জন সঙ্গ অতি রঙ্গ হিয় হেরি। ভণত **নরহরি** অমিয় পিবহ বহু বেরি॥ (পত্র ৯ক)

ব. বি. / ন. চ. (২) /৪১-২০

১৪১

কি কহব পুন পুন কহই না হোয়।' হেরহ করুণ নয়নে পুন মোয়॥ ক্ষেমহ দোষ পুরহ.........আশ। চরণে মিনতি করু **নরহরি দাস**॥ (পত্র ৯ক)

১৪২

গীতচন্দ্রোদয় ('সংকীর্তন রসবর্দ্ধন' নাম)

(পাঠবাড়ী পুথি নং ২০৩০।১৪) পুথিতে প্রাপ্ত নতুন পদ ১টি :

পেখলু পহুক কাহে ইহ ভাঁতি। তিলে তিলে মলিন হোত অতি বিপরীত সে নব কনক কঞ্জ জিতি কাঁতি॥ চিন্তা নিকর কম্প সম্পাসন তনু মন অনতন বহু ধৃতি লেশ। অম্বর অরুণ স্বেদজলে সিঞ্চিত সঘন নিশাস নিরখি নিজ কেশ॥ ভণইতে বচন নীরব পুন তৈখনে চলইতে চরণ থকিত ভই গেল। করু কত যতন ভোজন নাহি ভাঅত পলছন শয়ন স্বপন সম ভেল॥ আসন বিহীন ধরণীতলে লোটত শাঙন ঘন সম ঝরয়ে নয়ান। **নরহরি** পামরি রসাক সমৃথারব (?) মরি মরি কো হেরি ধরব পরাণ॥ (পত্র ১১খ, পদ নং ২৭)

১৪৩

ভক্তিরত্নাকর (পাঠবাড়ী পুথি ২৩৪১।২৪) পুথির প্রারম্ভে উল্লিখিত :

নিশি অবসানে জাগিয়া ভবনে বসি প্রভু গুরুদেব। প্রিয় পরিকরে অতি সুআদরে চরণ কমল সেব॥ দন্তধাবনাদি সারি সুবাসিত সলিলে সিনান করি। আহ্নিকাদি ক্রিয়া সমাধি তখনে জলযোগ বিধি সারি॥ পূর্বাহ্নে বৈষ্ণব সকল লইয়া ভোজন তখন কৈলো। আচমন করি তাম্বুল খাইয়া কিঞ্চিত শয়ন ভেলো॥ মধ্যাহ্নে পুষ্পের উদ্যানে বসিয়া ভকত গণেরে লৈয়া। হরি-কথালাপে হয়েন মগন নরলীলা মনে হইয়া॥ অপরাহ্ন কালে বৈষ্ণবের মেলে পুরাণ পাঠন করি। সন্ধ্যার সময়ে বিষ্ণুর আলয়ে বসি সন্ধ্যাক্রিয়া সারি॥ প্রদোষে গোরস পক্কান্নাদি সহ ভোজন ভবনে কৈলো। ক্ষণ এক সুতি বাহির প্রাঙ্গণে কীর্তনে মগন হৈলো॥ নিশায়ে সকল বৈষ্ণব সহিতে সুখে সংকীর্তন করি। পুনঃ নিজ গৃহে শয়ন আনন্দে ভণে **দাস নরহরি**॥ (পত্র ১ক)

খ. নবাবিষ্কৃত অপ্রকাশিত পদাবলী (অন্যত্র প্রাপ্ত)
(সন্দিগ্ধ)

১৪৪

দেখ সখি কানুক রঙ্গ। রাইক বেশ বনায়ত অভিমত নিরখি নিরখি প্রতি অঙ্গ॥ ধ্রু॥ যাবক রচইতে সচকিত লোচন পদ সঞে বয়ন সঞ্চার। অধর-রাগ সঞে বুঝি অনুভব করু কোন অধিক উজিয়ার॥ চরণ বিভূষণে মণিগণ উজর শ্যাম মূরতি পরতেক। হেরব লাখ নয়ানে অনুমানিএ অতয়ে সে ভেল অনেক॥ কিএ প্রতিবিম্ব দন্ত সঞে নিজ তনু চরণ নিছনি পরকাশ। সম্বর বৈরি বিজয় বেকত ভেল কহ ঘনশ্যামর দাস॥ ('কীর্তনানন্দ' পাঠবাড়ী পুথি ২৬৫৪৮, পত্র ৯৩খ-৯৪ক)।

১৪৫

উঠিয়া বিধুমুখি রজনী প্রভাত দেখি চমকিএ দিগ নেহারে। বিহান দেখিয়া ধনি মনে বিষাদ গুণি তুরিতহি জাগাও বন্ধুরে॥ ওঠ বলি প্রাণনাথ শ্যাম অঙ্গে দিএ হাথ ঘন ফুকরিএ বিনোদিনী। শুন শুন নাগর নিন্দহ পরিহর অবগত হইল যামিনী॥ উঠল গোকুলবাসী মনে মনে হেন বাসি তবে ত হইবে পরমাদ। তাহে ননদিনী ঘরে মোর ছন্দে সদা ফেরে অবরোধে সাধে কত বাদ॥ কি জানি পাপ লোকে যদি হেন কালে দেখে অনরথ হইবে তখন। কহে দাস নরহরি অলস সম্বরি ঝাট হরি করহঁ চেতন॥ ('পদমেরু': বিশ্বভারতী পুথি ৯৫০, পত্র ৪২খ, পদসংখ্যা ২৪০)।

১৪৬

মাতল কীর্তনরসে গৌর গদাধর। পুলকে ভরল অঙ্গ সব কলেবর॥ স্বরূপের ধরি কোমর কর ঝাঁপি। হা হরি করি কত সব তনু কাঁপি॥ পুন কহে গোরাচাঁদ প্রলাপ করিয়ে। কোথা গেল গদাধর আমারে ছাড়িএ॥ পূরব দুখঞ সোধর হেরিএ। বেঢ়িত রিদয় তার গুণ স্মোরিএ॥ কহিতে কহিতে পহু ভেল মুরুছায়। নরহরি কহে এই কোন প্রমুদায়॥ ('পদমেরু': পত্র ১০৩খ, পদসংখ্যা ৫৭০)।

১৪৭

কেন বা বিষাদ এত কর বিনোদিনী। সে যে বন্ধুয়া তোর একুই পরাণি॥ যদি কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধে জগত বেপিত। তোর অঙ্গ পরিমলে কানু সে

মোহিত॥ যদি বা বদনে তোর শ্যাম নাম কয়। রাধা নাম তার নিজ মন্ত্র মুরলিতে গায়॥ যদি বা তোমার মন শ্যামপানে ধায়। সে যোগী থেয়ানে থাকে মাধবী তলায়॥ কোটি চন্দ্র জিনি কৃষ্ণ অঙ্গ নিরমল। তোর অঙ্গ পরশনে হয় সে শীতল॥ চল অভিসারে রাই বিলম্বে কি কাজ। কহে নরহরি আর না সহে বেয়াজ॥ ('পদমেরু' : পত্র ১০৭ক-খ, পদসংখ্যা ৬০৫)।

১৪৮

পুরুব স্মোরিঞা গোরা রায়। মন দুখে করে হায় হায়॥ শঠ সঞে পিরিতি করিনু। মনের আগুনে পুড়ে মনু॥ এমন পিরিতি নাহি জানি। কেবল দুখের হয় খণি॥ গোপিভাবে কহে গৌরহরি। তহি পুছই নরহরি॥ ('পদমেরু' : পত্র ১১৪ক, পদসংখ্যা ৬৩৭)।

১৪৯

গদাধর গৌরাঙ্গ কুতুহলি। পারিষদগণ সব মেলি॥ পাশায় আসক হৈল মন। নিজগণে বৈসে দুই জন॥ কহে পহু কি পণ ইহার। হারি জিতি আছএ বেভার॥ গদাধর কহেন গোঁসাই। হারি জিনি পুন এই পদ চাই॥ হাসি গোরা ধরিলেন সারি। নরহরি দূরেতে নেহারি॥ ('পদমেরু' : পত্র ১১৮খ, পদসংখ্যা ৬৬৪)।

১৫০

পেখলুঁ গৌরচন্দ্র অনুপাম। যাচত যাক তুল নাহি ত্রিভুবনে ঐছে রতন হরিনাম॥ ধ্রু॥ যো একসিন্ধু সো বিন্দু না যাচই পরবশ জলদ সঞ্চার। মানস অবধি রহত কল্পতরু না অপার॥ যছু চরিতামৃত শ্রুতিপথে সঞ্চরু হৃদয় সরোবরপুর। উমড়ই নয়নে অধম মরু ভ্রমহি হোয়ত পুলক অংকুর॥ নামহি যাক তাপ সব মেটই তাহে কি চান্দ উপাম। কহ ঘনশ্যাম দাস নাহি হোয়ত কোটি কোটি এক ঠাম॥ ('পদমেরু' : পত্র ৫৮খ, পদসংখ্যা ৩২৮)।

১৫১

কাহে বিয়োগি ধনি রাই। শ্যাম নিওরে হাম যাই॥ আনি মিলাওব কান। ইথে কিছু না ভাবিহ আন॥ যোগিনী হইবে কাহে লাগি। তুয়া

লাগি সোই বিয়োগি॥ তবহু চলল সহচরি। মিলল যাহা সে মুরারি॥ কহে সখি কতো পরবন্ধ। নাগর মানএ ধন্ধ॥ চলল রসিকবর শ্যাম। যনি যাহা করএ বিশ্রাম॥ মিলল দোঁহে এক ঠাই। শ্যাম কোরে বৈঠল রাই॥ দোঁহে হেরি দোঁহ উল্লাস। ভণে ঘনশ্যামর দাস॥ ('পদমেরু' : পত্র ১১১ক, পদসংখ্যা ৬১৫)।

১৫২

প্রেমের ভাই নিতাই আলি রে। তুমি মোর দেহ ব্রজবাস রে॥ ব্রজ দরশন বিনু না রহে আমার তনু প্রাণ কাঁদে করিব সন্ন্যাস রে॥ আমি যাব বৃন্দাবন রাখিতে গোপিকার মান তুমি থাক শ্রীগৌড়মণ্ডলে। না কহিও মায়ের আগে গৌর বৃন্দাবন যাবে শুনি মায়ে লাগিবে তরাশ॥ নিতাই বলেন সঙ্গে যাব প্রভু বলে না লইব তুমি থাক শ্রীগৌড়মণ্ডলে। দুই ভাই বৈরাগী হল্যে জীব কে তরাবে কল্যে কে আর লওয়াবে হরিনাম রে॥ তুমি থাক গৌড়দেশে ভাসাইয় প্রেমরসে ঘরে ঘরে দিহ হরিনাম। প্রভু কহে নিত্যানন্দ সব জীব হল্য অন্ধ কেহো ত না পায় কৃষ্ণনাম॥ এই নিবেদন তোরে দুটি নয়ানে দেখিবে যারে কৃপা করি দিয় হরিনাম। কত পাপী দুরাচার নিন্দুক পাসণ্ড আর কেহ যেন বঞ্চিত না হয়। শমন করিতে ভয় যেন জীবে না হয় সুখে যেন কৃষ্ণনাম লয়॥ রসে অঙ্গ ঢর ঢর গৌরকিশোর বর নাম তার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এসব নিগূঢ় কথা কহিতে লাগয়ে ব্যথা ভক্ত বিনু না জানয়ে অন্য॥ দ্বাপর যুগে শ্যাম কলিযুগে গৌরাঙ্গ গর্গমুনি ভাগবতে লেখি। মনে করি অনুমান শ্যাম হল্যা গৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণ তনু তার মাখি॥ অন্তরেতে শ্যাম তনু বাহিরে গৌরাঙ্গ তনু অপরূপ অদভুত লীলা। রাই সঙ্গে খেলাইতে কুঞ্জরস বিলাসিতে অনুরাগে শ্যাম হল্য গোরা॥ কহিবার কথা নয় কহিলে কী জানি হয় না কহিলে মনে পাই যে তাপ। হেন অনুমান করি গৌরাঙ্গ হৃদয়ে ধরি শ্রীনরহরি করয়ে বিলাপ॥ ('বিশ্বভারতী' পুথি ৫২১, পত্র ১)।

১৫৩

সখা, রাধানাম কে কহিলে আগে। শুনইতে মন ভাগে॥ সখা কাহে কহিলে রাধা নাম। শুন মহা নাহি লাগে আন॥ কহ কহ মনু প্রাণরূপ। বুঝিলাম অমিয়ার রূপ (কূপ)॥ হেরইতে আঁখি কবে আশ। কহে ঘনশ্যামর দাস॥ (বিশ্বভারতী পুথি ২২১৭)।

১৫৪

দুঁহুঁকর সরস রভস রস কন্দল শুনইতে রঙ্গন দেবী। কহল তোহারে করুণ হেরি কাঁপয়ি কুলরমণী করু সেবি॥ সুন্দরি সমুঝহ মরম বিচারি। বুঝই শ্যামরমণরণ পণ্ডিত ভাগল মানই হারি॥ ধ্রু॥ তুহুঁ আস আসই কেরহি আনলি দেয়লি কাম কামান। পহিলহি মান তিখন সর সান্ধসি জো সেবি অন্তর হান॥ পুনবতী মদন সমর যদি পেখিয়ে বুঝিয়ে জিত অজিত। নহে সখি মাহ কাহ রতি লম্পট জানব তুহুঁ রণভীত॥ তেজল মান মদন সর হানলি আকুল কয়লহি কাহ্নু। ভুজযুগ নাগ পাশে করু বন্ধন সাখি কয়ল ঘনশ্যাম॥ (বিশ্বভারতী পুথি ২৯৮৭, পত্র ৯খ, পদ ২)।

১৫৫

দুঁহুঁ দুঁহুঁ ভুজযুগে দুঁহুঁ তনু বান্ধল হৃদ হৃদে মুখে মুখ মেলি। সখিগণ মেলি সুমঙ্গল বাঁওত নহি নাগরি করু কেলি॥ সজনি অপরূপ দুঁহুঁক চরিত। শ্যামর গোরি একু ভেল দুঁহুঁ তনু কলহ প্রেম-বিপরীত॥ রতিরণে রসবতী আলসে ঘুমাওল শ্যাম সুনাগর কোর। মরকত জড়িত কিয়ে মণি কাঞ্চন সহচরি হেরি বিভোর॥ কি কহব বিহিক চরিত অতি সঠপল রজনী করব অবসান। কোকিল কেকি কাকু করি বোলব কি করব তব ঘনশ্যাম॥ (বিশ্বভারতী পুথি ২৯৮৭, পত্র ৯খ-১০ক, পদ ৩)।

১৫৬

যুগল পিরিতি কোথা উপজিল পিরিতি বলিব কারে। সে কেমন বরণ কিসের গঠন কেমন আকার ধরে॥ ভাবের হৃদয়ে আনন্দ নন্দন প্রেম-বিনোদিনী রাধা। দোঁহা দরশনে দোঁহার মিলন দোঁহ প্রেমগুণে বাঁধা॥ বিচ্ছেদ না হয় একোই হৃদয়ে এমতি পিরিতি নেহা। জলের সহিতে রাধার মিলন এমতি একোই লেহা॥ মধুর [মধুর] যুগল করিল বিধি নিরমিল তায়। ভাব কৃষ্ণ প্রেম রাধা দোঁ হয়েন দোঁহার মিলন হয়॥ ভাবেতে প্রেমেতে মিলন হৈলে হয় সে একুই অঙ্গ। কহে নরহরি পিরিতি মাধুরী কখন না হয় ভঙ্গ॥ (বিশ্বভারতী: ৫৩১নং পুথি, ২নং পদ, পত্র ১ক)।

১৫৭

আজু বৃষভানুপুরে আনন্দ উদয়। প্রতি ঘরে ঘরে সভে দেয় জয় জয়॥ শুনি বৃষভানু সুতা দেখিবারে আসি। কীর্তিকামন্দিরে সভে রহিল প্রবেশি॥

কীর্তিকার কোলেতে কনকলতা হেরি। আনন্দে কাহার অঙ্গে পড়ে কোন নারী॥ সব লোক বলে ধন্য ধন্য কীর্তিকা। মরমে লাগ্যাছে নাম থুইব রাধিকা॥ কহে ঘনশ্যামদাস মনে হয় আস। বৃষভানুপুরে আজু চাঁদের প্রকাশ॥ (বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের নম্বরহীন একটি খাতার আকারযুক্ত পুথি। পত্র ১১খ-এর ১নং পদ)।

১৫৮

চতুর হইয়া করিব কাজ। নাগর রাখিব হৃদয় মাঝ॥ ……আসিয়া করিবে কোর। রূপ নিরখিয়া হইবে ভোর॥ সপনে সুতিলে যাহার সঙ্গে। চুরি চাতুরি তাহার রঙ্গে॥ ……দেখিয়া হানয়ে কটাক্ষবাণে॥ কহে নরহরি সাধন রীত। চমকি চমকি উঠয়ে চিত॥ (বিষ্ণুপুর ৬৩২, পত্র ৩, পদসংখ্যা ৮)।

১৫৯

…গ্রহ বলিয়া কহয়ে কথা। দুজনা বসিয়া পরি আলতা॥ সোনার কাঁচলি পরায় অঙ্গে। দুজনে বসিয়া… …..সঙ্গে॥ এরূপ ওরূপ নেহারি তায়ে। মনের আনন্দে মন পুলি জায়ে॥ সমান বিক্রম সমান অঙ্গ। সে…… সমান রঙ্গ॥ দুজনে পূজয়ে মান-সরোবরে। নরহরি কহে দেখিনু তারে॥ (বিষ্ণুপুর ৬৩২, পত্র ৩, পদসংখ্যা ৯)।

১৬০

সে রূপ হেরয়ে রূপ সে ঠায়ে। সে রূপ দেখিয়া মন পুলি জায়ে॥ সে রূপের রূপ দেখয়ে অঙ্গে। সঘনে ডুবয়ে তাহার সঙ্গে॥ দেখিয়া যাদের তা দেবি… ..। সমুদ্র হইতে করিলা পার॥ পাথারে ভাসায়ে তরণী হাসায়ে। ফুলের নৌকা ডুবিল বাতাসে॥ গর গর করে……দেহি। বিপট হইয়া সরয়ে সেহী॥ নরহরি কহে দেবির পায়ে। সিংহাসন মাঝে দেখিনু তায়ে॥ (বিষ্ণুপুর ৬৩২, পত্র ৩, পদসংখ্যা ১০)।

১৬১

………মাঝারে ফুটিল ফুল। কে জানে তাহার কতেক মূল॥ নাসায়ে পশিল ফুলের গন্ধ। ধাইয়া ভ্রমরা পাইল আনন্দ॥ ফুলের মধু গলয়ে যত। একমুখে তাহা বলিব কত॥ পঞ্চরস তাহে গলিয়া পড়ে। চতুর ভ্রমরা

তাহা না ছাড়ে॥ ও পদ পংকজে যার আস। নরহরি তার দাসের দাস॥ (বিষ্ণুপুর ৬৩২, পত্র ৩, পদসংখ্যা ১১)।

১৬২

শুনহে রসিকমণি। তোমারে কহিয়ে আমি॥ সারাদিন ফির বনে। ধেনু লৈয়া স্থানে স্থানে॥ যেমন যাইছে দুঃখে। পিরিতি করহ সুখে॥ শুনি নরহরি ভাবে। নাগরের অনুরাগে॥ (ববাহনগর পাঠবাড়ী পুথি ২৬৩১। ২৬৩, পত্র ৪খ, পদসংখ্যা ২৭)।

গ. (এক) নবদ্বীপপরিক্রমা

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৫৩৩, ১৬৭০নং এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৪৮০ সংখ্যক পুথির পাঠ মিলিয়ে আদর্শ পুথি হিসেবে পরিষদেব ১৬৭০ সংখ্যক পুথির পাঠ উদ্ধৃত হলো।

পত্র ১খ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবন্যপুরন্দব। মামপাহি গৌবগোবিন্দ ভক্ত প্রাণপতে প্রভোজ॥

জয় জয় গৌরগোবিন্দ। ব্রহ্মাদি আরাধয়ে ও চরণাববিন্দ॥ ভক্তপ্রিয় পরম উদার। লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণনাথ নদীয়ার॥ জয় জয় শ্রীনিত্যানন্দ হলধর। জয় জয় ভক্তিদাতা অদ্বৈত ঈশ্বর॥ জয় জয় পণ্ডিত গদাধর। জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভুর পরিকর॥ (৮) প্রিয়গণ লৈয়া গৌর বায়। বিলসয়ে পরম আনন্দে নদীয়ায়॥ যে দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতারে। সেই কলিযুগে গৌর প্রকট বিহরে॥ বৃন্দাবনে নিত্যলীলা যৈছে। নবদ্বীপে পরম দুর্লভলীলা তৈছে॥ লীলাস্থলী যত নদীয়ায়। ব্রহ্মাদি দেব তার অন্ত নাহি পায়॥ (১৬)

সকল বৈষ্ণব আজ্ঞা কৈল মো মূর্খেরে। নদীয়ার কিছু লীলাস্থলী বর্ণিবারে॥ বৈষ্ণবের আজ্ঞা বলবান। যে কিছু কহিয়ে তাহা আস্বাদে ভাগ্যবান॥ নবদ্বীপেব প্রশস্ত প্রকার। পঞ্চম স্কন্ধেতে লিখিআছে টীকাকার॥ (২২)

জয় জয় নদীয়া নগর। নবদ্বীপে বেষ্টিত মনোহর॥ যৈছে ছয় তথ্যের বিচার। কৃষ্ণ কৃষ্ণ রূপ গুর্বাদিক পঞ্চ আর॥ নবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম।

পৃথক পৃথক কিন্তু হয়ে এক গ্রাম ॥ যৈছে রাজধানী কোন স্থান। যদ্যপি অনেক তথা হয় এক নাম॥ নদীয়ার অন্তর্ভুক্ত যত। সে সব গ্রামের নাম কে কহিব কত॥ (৩২)

শ্রীসুরনদীর পূর্বতীরে। অন্তর্দ্বীপাদি চতুষ্টয় শোভা করে॥ জাহ্নবীর পশ্চিম কূলেতে। কোল দ্বীপাদিক পঞ্চ বিখ্যাত জগতে॥ যদ্যপিহ শাস্ত্রে নিরূপয়। তথাপিহ নবদ্বীপ গোপ্য অতিশয়॥ প্রভুর যেরূপ ব্যবহার। তৈছে তার ধাম অন্যে নারে জানিবার॥ নদীয়া নির্জনে গৌরহরি। নিজ প্রয়োজন সাধে অতি গোপ্য করি॥ যৈছে কেহো পরম গোপনে। ভোঞ্জে নানা দ্রব্য না দেখয়ে অন্যজনে॥ নানারসাস্বাদে প্রভু তৈছে। কোন জনে লখিতে নারয়ে গোপ্য ঐছে॥ ভক্ত অনুগ্রহ যারে হয়। নবদ্বীপ নদীয়ার নাথ সে জানয়॥ নবদ্বীপ ভক্তের জীবন। নানা বিধা ভক্তি যাথে দীপ্ত অনুক্ষণ ॥৫০॥ নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর। যথা জন্ম হৈল কৃষ্ণ (২ক পত্র) চৈতন্য প্রভুর॥ মায়াপুর মহিমা কে জানে। কহি এবে নবদ্বীপ বেষ্টিত তাহানে॥ মায়াপুর যোগপীঠ স্থান। দেব মুণীন্দ্রাদি যাকে করে সদা ধ্যান॥ ইহার যে দিকে হয় যাহা। বাহুল্যের ভয়ে তেঞি না বর্ণিল তাহা॥ নবদ্বীপ প্রদেশে যে গ্রাম। সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে ভিন্ন নহে নাম॥ কলিতে যদ্যপি বিপর্যয়। তথাপি কিঞ্চিত তাতে অনুভব হয়॥ কলিতে যে ভক্তে কৃপা কৈল। তথা সে প্রসঙ্গ অনুসারে নাম হৈল॥ কথেক হইল লুপ্ত প্রায়। রহিল কতেকস্থান প্রভুর ইচ্ছায়॥ কহি পরিক্রমার প্রকার। এ মণ্ডলাকার যাথে আনন্দ সভার॥ মায়াপুর করিধা দর্শন। ক্রমেতে ভ্রমহ যাথে ভ্রমে বিজ্ঞগণ॥ (৭০)

প্রথমে দেখহ আতঃপুর। অন্তর্দ্বীপ নাম যার মহিমা প্রচুর॥ পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন তথা। কহিল ব্রহ্মার আগে অন্তরের কথা॥ এই হেতু অন্তর্দ্বীপ নাম। বিস্তারিব সে সব প্রসঙ্গ ভাগ্যবান॥ ১ ॥ (৭৬)

সীমলিয়া গ্রাম তারপরে। শ্রীসীমন্ত দ্বীপ পূর্বে কহয়ে যাহারে॥ তথা প্রভু পদে করি নতি। করিল ধারণ ধূলা সীমন্তে পার্বতী॥ শ্রীসীমন্ত দ্বীপ নাম ঐছে। বিস্তারিব কেহো পার্বতীর কৃপা যৈছে॥ ২ ॥ (৮২)

গাদিগাছা গ্রাম এবে কয়। গোদ্রুম-দ্বীপাখ্য পূর্বে সুখের আলয়॥ সুরভী রহিয়া বৃক্ষতলে। করিল প্রভুরে স্তুতি মাথে নেত্রজলে॥ এই হেতু গোদ্রুমদ্বীপ কয়। বর্ণিব বিশেষ করি কোনো মহাশয়॥ ৩ ॥ (৮৮)

শ্রীমাজিদা গ্রাম নাম এবে। পূর্বে মধ্যদ্বীপ নাম কহে ঋষি সভে॥ ঋষি প্রতি করি দৃষ্টিপাত। মধ্যাহ্ন কালেতে প্রভু হইল সাক্ষাত॥ ঐছে মধ্যদ্বীপ নাম তার। ঋষি প্রতি যৈছে কৃপা হইব বিস্তার॥ ৪ ॥ (৯৪)

ব্রাহ্মণপুখরা পুণ্যগ্রাম। ব্রহ্মণ পুষ্করয়োবতী পূর্বনাম॥ ব্রাহ্মণের জানি মনকথা। আইলেন আনন্দে পুষ্করতীর্থ তথা॥ এ প্রসঙ্গ অতি সুমধুর। পুষ্করের দ্বারে কৃপা হইল প্রভুর॥ তদুপরি হাটডাঙ্গা ইন্দ্রাদিদেব উচ্চস্থানে। বসাইল হট্ট প্রভুর চরিত্র কথনে॥ উচ্চহট্ট নাম যে প্রকারে। সে সব প্রসঙ্গ ব্যক্ত হইব কারু দ্বারে॥ (১০৪) [২খ পত্র] কুলিয়া পাড়পুর গ্রাম। পূর্বে কোলদ্বীপ পর্বতাখ্যানন্দ ধাম॥ প্রভুপ্রিয় ভক্ত কোলদ্বীপে। পর্বতের প্রায় দেখা দিল কোলরূপে॥ কোলদ্বীপ নাম এই মতে। অত্যন্ত নিগূঢ় কথা আছে যে ইহাতে॥ কোল শব্দে শ্রীবরাহ প্রভু। এমান দয়াল কি হইবেক কভু॥ ৫ ॥ (১১২)

সমুদ্র গড়ি গ্রাম পরচার। সমুদ্র গড়িয়া নাম পূর্বেতে ইহার॥ সমুদ্র প্রভুর দরশনে। গঙ্গাশ্রয় করিয়া আইসে হর্ষ মনে॥ ইথে অতি কৌতুক প্রচার। বর্ণিলেন পরম আনন্দে গ্রন্থকার॥ চাঁপাহাটি গ্রাম মনোরম। পূর্বে নাম চম্পাহট্ট খ্যাতি নিরুপম॥ কিনিয়া চম্পক পুষ্প রঙ্গে। বিষ্ণু পূজে বিপ্র ভাসি প্রেমের তরঙ্গে॥ বিপ্র বিষ্ণু পূজাযে প্রবীণ। বর্ণিবেন কেহো যৈছে প্রভু প্রেমাধীন॥ রতুপুর গ্রাম মুখ হয়। ঋতুদ্বীপ নাম পূর্বে কেবা না জানয়॥ বসন্তাদি ঋতু সে না বেশে। বাড়ায় প্রভুর সুখ অশেষ বিশেষে॥ ছয় ঋতু সদা মূর্তিমান। ঋতুদ্বীপ লীলা সে বর্ণয়ে ভাগ্যবান॥ ৬ ॥ (১৩০)

শ্রীবিদ্যানগর পুণ্যস্থান। বৃহস্পতি আসিয়া কৈল বিদ্যাদান॥ বিদ্যার প্রভাব নানা মতে। অবিদ্যা ঘুচয়ে সেই গ্রাম দর্শনেতে॥ তদুপরি গ্রাম জাহ্নুনগর। পূর্বে জাহ্নুদ্বীপ নাম কহে বিজ্ঞবর॥ তথা তপ কৈল জহ্নু মুনি। হইল সাক্ষাত শ্রীচৈতন্য চিন্তামণি॥ জাহ্নুদ্বীপ অতি রম্যস্থান। যে করে দর্শন সে পরম ভাগ্যবান॥ ৭ ॥ (১৪০)

মাউগাছি গ্রাম কে না জানে। মোদদ্রুমদ্বীপ পূর্বে কহয়ে ইহানে॥ রামচন্দ্র বনবাসকালে। পাইল পরম মোদ বসি বৃক্ষতলে॥ পূর্বে ছিল রামবটস্থান। কলিতে হইল লোপ জানে ভাগ্যবান॥ জানকী লক্ষ্মণসহ রাম। যৈছে মোদ পাইল সে প্রসঙ্গ অনুপাম॥ ৮ ॥ (১৪৮)

(৩ক পত্র) তদুপরি শ্রীবৈকুণ্ঠপুর। যে গ্রাম দর্শনে সুখ বাঢ়য়ে প্রচুর॥ প্রভু নারায়ণ মহারঙ্গে। দিলেন দর্শন প্রিয় ভক্তে লক্ষ্মী সঙ্গে॥ নারায়ণ পীঠস্থান ছিল। প্রভুর ইচ্ছায় তাহা সঙ্গোপন হৈল॥ তথাতে কৌতুক অতিশয়। বর্ণিবেন কেহো এ প্রসঙ্গ প্রেমোদয়॥ এবে মাতাপুর কহে লোক। পূর্বে মহৎপুর নাম নাশে দুঃখশোক॥ মহৎশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির। বনবাসে আসি তথা হইলেন স্থির॥ মহৎপুর মধ্যে রম্যস্থান। পঞ্চবট ছিল পূর্বে হৈল অন্তর্দ্ধান॥ দ্রৌপদী সহিত পঞ্চ ভাই। পাইলা পরমানন্দ বসিয়া তথাই॥ মহৎপুর প্রসঙ্গ মধুর। বিস্তারিব যারে কৃপা হইব প্রভুর॥ গঙ্গাপূর্ব ধারে রাহুপুর। রুদ্রদ্বীপ নাম পূর্বে মহিমাপ্রচুর॥ যথা রুদ্র নিজগণ সনে। করিলা নর্তন মহাপ্রভুর কীর্তনে॥ রুদ্রদ্বীপ কৌতুক অপার। কেহো বর্ণিবেন ইহা করিয়া বিস্তার॥ ৯॥ (১৭২)

তারপর আছে পুণ্যগ্রাম। বেলপুখরিয়া পূর্বে বিল্বপক্ষ নাম॥ একপক্ষ পূজি বিল্বদলে। প্রভু প্রিয় হৈলা বিপ্র শিব কৃপাবলে॥ যৈছে কৈল শিবের অর্চন। যৈছে প্রভু প্রিয় হৈলা হইব বর্ণন॥ (১৭৮) সুবর্ণবিহার এই হয়। পশ্চাত কহিব যৈছে এথা বিলসয়॥ সুবর্ণবিহার নাম যার। তথা গৌরাঙ্গের অতি অদভুত বিহার॥ গৌরচন্দ্র দেখি সবে কয়। সুবর্ণপ্রতিমা কি কীর্তনে বিলসয়॥ সুবর্ণবিহার নাম ঐছে। কেহো বিস্তারিব প্রভু বিহরয়ে যৈছে॥ (১৮৬) ঐছে নানা স্থান সর্বোপরি। আপনা মানহ ধন্য পরিক্রমা করি॥

অন্তর্দ্বীপ হইয়া মায়াপুরে। পাবে সহজ জগন্নাথ মিশ্রের মন্দিরে॥ মায়াপুর প্রভাব অপার। বিবিধ প্রকার প্রচারিল টীকাকার॥ নবদ্বীপ মধ্যে স্থিত যত। একমুখে তাহা কেবা কহিবেক কত॥ তার মধ্যে কহিয়ে প্রধান। চিলাডাঙ্গা পাটডাঙ্গা আদি রম্যস্থান॥ (১৯৬)

যৈছে গৌর সর্ব (৩খ পত্র) শিরোমণি। তৈছে তার ধাম মহামহিমা বাখানি॥ যৈছে গৌর কৃষ্ণে নাহি ভেদ। তৈছে নবদ্বীপ বৃন্দাবন কহে বেদ॥ গৌরকৃষ্ণ ভেদবুদ্ধি যার। ধামদ্বয়ে ভেদবুদ্ধি করয়ে সে ছার॥ নবদ্বীপে কেহো কিছু কয়। যে যাহা কহয়ে তাহা অন্যথা না হয়॥ গোলোক মথুরা কহে কেহো। পরব্যোম শ্বেতদ্বীপ কহে সত্য সেহো॥ সকল সম্ভবে এথা ঐছে। সর্বাবতারময় গৌরচন্দ্র যৈছে॥ নিত্যধাম নদীয়ানগর। যথা প্রেম ভক্তি

নিত্য নিত্য পরিকর॥ প্রকটাপ্রকট দুই রূপে। বিহরয়ে ভাগ্যবন্ত দেখে নবদ্বীপে॥ (২১২)

অষ্টক্রোশ নদীয়া প্রমাণ। শোর অবধি বিধি করিল নির্মাণ॥ ধাপী বহু তড়াগ সুন্দর। নির্মল শীতল জলে পূর্ণ সরোবর॥ জাহ্নবীর তট মনোরম। বারকোণাঘাট তথি অতি অনুপম॥ শোভে পূর্বে পঞ্চ শিবালয়। পার্বতী গণেশ আদি ক্ষেত্র পালাদয়॥ জাহ্নবী পুলিন শোভা অতি। বন উপবন বৃক্ষলতা নানা ভাঁতি॥ বিবিধ প্রকাব পশু পক্ষ। নানা পুষ্পে ভ্রময়ে ভ্রমর লক্ষ লক্ষ॥ (২২৪)

পদ্মপ্রায় নদীয়ার রীত। কভু ত সংকীর্ণ কভু হয় বিস্তাবিত॥ দূরে রহি কোন কোন ভক্ত। প্রভুকে দেখিতে চলে চলিতে অশক্ত॥ সে সময়ে শ্রীধাম আনন্দে। হয়েন সংকীর্ণ শীঘ্র দেখিতে গৌরচন্দ্রে॥ শ্রীসংকীর্তনাদি (৪ক পত্র) সময়েতে। হয়েন বিস্তাব লোক অসংখ্য যাহাতে॥ সংকীর্ণ বিস্তার ঐছে হয়। বুঝিব কি অন্যে অন্যে একরূপে নিরখয়॥ (২৩৪)

শ্রীধামের অচিন্ত্য প্রভাব। ধামেব কৃপা হৈলে সে সকল হয়ে লাভ॥ হেন দিন হবে কি আমাব। দেখিব প্রভুর তথা অদ্‌ভুত বিহার॥ অতি উচ্চ কল্পতরু তলে। বিলসিব দিব্য সিংহাসনে কুতুহলে॥ ভুবনমোহন বেশ তায়। জগত করিব আলো রূপেব ছটায়॥ প্রভুব দক্ষিণে নিত্যানন্দ। বামে গদাধর আগে শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র॥ শ্রীবাসাদি ভক্ত চাবি পাশে। প্রভু মুখচন্দ্রে নেত্র অর্পিব উল্লাসে॥ সবে পুষ্প ভূষণে ভূষিত। সভার অঙ্গেতে চারু চন্দন চর্চিত॥ নানা সেবা করিব সকলে। মোরে কি চামর সেবা দিব সেইকালে॥ প্রভু ঐছে রঙ্গ প্রকাশিব। সহাস্যবদনে সর্ব সম্মুখে রহিব॥ এ হেন কৌতুক নবদ্বীপে। দেখি কি জুড়াব আঁখি রহিয়া সমীপে॥ ওহে পদ্মাবতীর তনয়। তোমার করুণা হৈলে সব সিদ্ধ হয়॥ ওহে প্রভু অদ্বৈত ঈশ্বর। নবদ্বীপে বাস মোরে দেহো নিরন্তর॥ ওহে গদাধর শ্রীবাসাদি। এই কর নদীয়া ধেয়াই নিরবধি॥ কি বলিব ওহে বন্ধুগণ। সদা নবদ্বীপে যেন করিয়ে ভ্রমণ॥ নবদ্বীপে অনুরাগ যার। জন্মে জন্মে সেই সঙ্গী হউক আমার॥ নদীয়াবিমুখ যে পামর। তার সঙ্গ নহে যেন জন্ম জন্মান্তব॥ নদীয়া ভ্রমিতে যেহো কহে। তার সঙ্গ বিচ্ছেদ কখনো যেন নহে॥ (২৩৮)

নবদ্বীপ ধাম শ্রেষ্ঠ অতি। যার যৈছে সাধ্য সে ভ্রময়ে নিতি নিতি॥ কেহো

অষ্টক্রোশ পর্যটয়। কেহো বা ষোড়শ ক্রোশ আনন্দে ভ্রময়॥ কেহো পঞ্চ যোজন ভ্রমণে। পায়ে মহানন্দ লীলাস্থলী সন্দর্শনে॥ কেহো ভ্রমে দ্বাদশ যোজন। বিংশতি যোজন কেহো করয়ে ভ্রমণ॥ যার যৈছে ইচ্ছা নাহি পার। (৪থ পত্র) চিন্তামণি ভূমি গৌড়মণ্ডল বিহার॥ (২৭৮)

গণসহ শ্রীশচীতনয়। যারে কৃপা করে তার ইথে নিষ্ঠা হয়॥ ইহাতে বিশ্বাস নাহি যার। সে পাপীর কোনোকালে নাহিক নিস্তার॥ করুণা করহ গৌরহরি। অতি দীন হঞা যেন পরিক্রমা করি॥ যথাযথ ভক্তের আলয়। দেখিতে সে স্থান যেন মহা আর্তি হয়॥ তথা প্রভুভক্তের গমন। মহানন্দে করি যেন সে সব দর্শন॥ কিবা নিবেদিব প্রভু পায়। নিবেদিতে না জানিয়া উপজে হিয়ায়॥ তোমার ভক্তের শ্রীচরণে। বিকাইয়া রহি যেন জীবনে মরণে। এই কৃপা কর জীব প্রতি। শ্রীনবদ্বীপ ধামেতে হউক গাঢ় রতি॥ (২৭৪)

নরহরি কহে বারবার। সদা যেন গাই পরিক্রমা নদীয়ার॥ (২৭৬ চরণ)

ইতি শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা সমাপ্তা॥

গ. (দুই) 'নরোত্তমবিলাস'

(পাঠবাড়ী পুথির নং ২৩৩৬।২১ অতিরিক্ত পাঠ : কবির আত্মবিবরণী অংশ)

নরোত্তমবিলাসের বিভিন্ন মুদ্রিত সংস্করণ ও অন্যান্য পুথিগুলি ১২শ বিলাসেই সম্পূর্ণ। আলোচ্য পুথিতে ১২শ বিলাস সম্পূর্ণ হবার পর নিম্নোক্ত অংশটি পাওয়া গিয়েছে। এই অংশে গ্রন্থকারের পিতৃগুরু বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, পিতা জগন্নাথ ও তাঁর নিজের সম্পর্কে পরিচয় লিখিত হয়েছে।

পত্র ৩১ খ

ওহে বিজ্ঞগণ শুন হইয়া সদয়। এবে কিছু আপনার দিয়ে পরিচয়॥ করুণার সিন্ধু কৃষ্ণ চৈতন্যাবতারে। হইলুঁ বিমুখ মুঞি গেলুঁ ছারখারে॥ তাঁর ভক্ত কৃপা মোরে হইল দুর্লভ। ভক্তকৃপা বিনা প্রভু না হয় সুলভ॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু ভক্তের জীবন। ভক্ত বিনা প্রভুর অন্যত্র নাই মন॥ ভুবন পাবন সে প্রভুর ভক্ত যত। নিরুপম মহিমা কহিবে কেবা কত॥ (৩০) অসংখ্য প্রভুর ভক্ত অন্ত কে বা করে। জগত ছাইল সে ভক্তের পরিকরে॥ প্রভু প্রিয়

পার্ষদ গোস্বামী লোকনাথ। যাঁহার চরিত্র চারু জগতে বিখ্যাত॥ তাঁর প্রিয় শিষ্য নরোত্তম প্রেমময়। যাঁর খ্যাতি জগতে ঠাকুর মহাশয়॥ তাঁর শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী। পরম পণ্ডিত যেঁহ প্রেমভক্তি মূর্ত্তি॥ তাঁর শিষ্য চক্রবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণচরণ। প্রেমময় রামকৃষ্ণাচার্যের নন্দন॥ (২০) শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী শিষ্য তাঁর। সর্বাংশে প্রবীণ অতি শুদ্ধ ভক্তি যাঁর॥ তাঁর প্রিয় শিষ্য বিশ্বনাথ দয়াময়। যাঁর জন্মকালে হৈল সবার বিস্ময়॥ (২৪)

জন্মঘরে তেজঃপুঞ্জ অগ্নির সমান। ক্ষণেক থাকিয়া তাহা হৈল অন্তর্দ্ধান॥ বালক দেখিয়া সুখ বাঢ়িল সভার। মধ্যে মধ্যে বালকের দেখে চমৎকার॥ দেবগ্রামবাসি লোক সতত আসিয়া। বক্ষে করি রাখে কেহ না দেয় ছাড়িয়া॥ (৩০) শ্রীঅন্নপ্রাশন নামকরণ সময়। হইল যে রঙ্গ তাহা কহিল না হয়॥ কথোদিন পরে হৈল শ্রীচূড়াকরণ। শ্রীযজ্ঞোপবীত স্কন্ধে শোহে বিলক্ষণ॥ সর্বত্রবিদিত প্রশংসয়ে সর্বজনে। অল্পকালে বিচক্ষণ হৈলা ব্যাকরণে॥ সঙ্গি সহ ব্যাকরণ চর্চা করে সুখে। দিগ্বিজয়ী গমন শুনিল কারু মুখে॥ দেবগ্রামী পণ্ডিতের যাঁরে হৈল ভয়। তারে বিশ্বনাথ অনায়াসে কৈল জয়॥ হইল সুখ্যাতি ইথে লজ্জা বহু পাইলা। ভ্রাতা অতি বিজ্ঞ সুখে লজ্জা নিবারিলা॥ (৪২)

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তিন সহোদর। রামভদ্র জ্যেষ্ঠ সর্বশাস্ত্রজ্ঞ সুন্দর॥ রামভদ্র মধ্যম ভ্রাতার সহিতে। যথা শিষ্য হৈলা তাহা কহিয়ে ক্রমেতে॥ শ্রীচৈতন্য প্রিয় গোপালভট্ট নাম। প্রভু প্রেমময় মূর্তি আনন্দের ধাম॥ শ্রীভট্টের প্রিয় শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য। সর্বত্র বিদিত যাঁর অলৌকিক কার্য॥ (৫০) আচার্যের শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ। যাঁর গুণ গায় সুখে বৈষ্ণব সমাজ॥ যার ভেদবুদ্ধি নরোত্তম কবিরাজে। তার সর্বনাশ প্রভু করেন অব্যাজে॥ শ্রীনিবাস নরোত্তমে ভেদবুদ্ধি যার। সে পাপীর কোনকালে নাহিক নিস্তার॥ এবে কোন কোন পাপী ভেদবুদ্ধি করে। এ হেতু লিখিনু এথা দুঃখিত অন্তরে॥ শ্রীকবিরাজের শিষ্য হরিরামাচার্য। যেঁহ রামকৃষ্ণ আচার্যের জ্যেষ্ঠ আর্য॥ (৬০) শ্রীহরিরামের পুত্র শ্রীলগোপীকান্ত। পিতার সেবক যেঁহ পরম সুশান্ত॥ শ্রীগোপীকান্তের শিষ্য রামভদ্র হন। রামভদ্র সকল শাস্ত্রেতে বিচক্ষণ॥ শ্রীগোপীকান্তের পৌত্র শ্রীল মনোহর। শ্রীগোপীকান্তের শিষ্য সর্বাংশে সুন্দর॥ শ্রীরামভদ্রের পুত্র শ্রীল রামনিধি। শ্রীমনোহরের শিষ্য গুণের অবধি॥ শ্রীমনোহরের

পুত্র শ্রীনন্দকুমার। হইল পিতার শিষ্য অতি শুদ্ধাচার॥ (৭০) শ্রীরাম-নিধির পুত্র শ্রীনৃসিংহ নাম। নন্দকুমারের শিষ্য চেষ্টা অনুপাম॥ মোর ইষ্টদেব শ্রীনৃসিংহ চক্রবর্তী। জন্মে জন্মে সে চরণ সেবি এই আর্তি॥

পূর্বে যে কহিলুঁ তাহা অল্পে জানাইলুঁ। শ্রীরামভদ্রের গুণ বর্ণিতে নারিলুঁ॥ মধ্যম শ্রীরঘুনাথ পরম পণ্ডিত। সদা হর্ষ দেখি কনিষ্ঠের ভক্তিরীত॥ কনিষ্ঠ শ্রীবিশ্বনাথ নবীন বয়েস। সে দেখি বারেক তার আনন্দ অশেষ॥ (৮০) পুত্র বাৎসল্যেতে সদা পিতার উৎসাহ। আজ্ঞা কৈল জ্যেষ্ঠ পুত্রে করাই বিবাহ॥ মাতার আজ্ঞাতে বিশ্বনাথে বিভা দিলা। বৈরাগ্য দেখিয়া মনে চিন্তাযুক্ত হৈলা॥ শ্রীমদ্ভাগবত পড়িবারে আজ্ঞা দিল। পাঠ সাঙ্গ হৈলে জ্যেষ্ঠ সমীপে আইল॥ নিবেদয়ে কহি কিছু যদি আজ্ঞা পাই। তেঁহ কহে পুনঃ পঢ়ো পডা হয় নাই॥ যেঁহ পড়াইল তেঁহ কহে বারবার। ঞিহ কি পড়িতে পঢ়া হইল আমার॥ (৯০) বিশ্বনাথ শ্রীজ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা পাঞা। পুনঃ পড়ি ভ্রাতা আগে রহে দাঁড়াইয়া॥ ভ্রাতা জিজ্ঞাসিতে বিশ্বনাথ নিবেদয়। যাই যে শ্রীবৃন্দাবনে যদি আজ্ঞা হয়॥ শুনি রামভদ্র কহে মহানন্দ মনে। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হৈল এতদিনে॥ সেইক্ষণে বিশ্বনাথ বিদায় হইলা। প্রকারে মাতায় কহি বৃন্দাবনে গেলা॥ (৯৮)

সর্বত্র ভ্রমিয়া কৈল রাধাকুণ্ডে বাস। ব্রজবাসি বৈষ্ণবের হইল উল্লাস॥ তথা শ্রীমুকুন্দ দাস নামে শ্রীবৈষ্ণব। পঞ্চালদেশীয় শ্রেষ্ঠ বিপ্রকুলোদ্ভব॥ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রে তাঁর অনন্য ভকতি। কে কহিতে পারে যৈছে রাধাকৃষ্ণে রতি॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর স্থানে। হৈলা মগ্ন গোস্বামীর গ্রন্থ অধ্যয়নে॥ কৈল বহু সেবা কবিরাজ গোস্বামীর। তাঁর অপ্রকটে হৈলা অত্যন্ত অস্থির॥ কথোদিন পরে বিশ্বনাথেরে পাইয়া। জুড়াইল দারুণ দুঃখেতে দগ্ধ হিয়া॥ (১১০) শ্রীমুকুন্দদাস সর্বপ্রকারে দয়াল। গুরুকৃষ্ণবৈষ্ণবদ্বেষির মাত্র কাল॥ ভক্তি অঙ্গ যাজনেতে পরম প্রবীণ। নিরন্তর আপনাকে মানে অতি দীন॥ বর্ণিলেন লীলাগ্রন্থ কিছু শেষ ছিল। বিশ্বনাথ দ্বারে তাহা পূর্ণ করাইল॥ কৃপা করি অনেকের কৈল বিদ্যাদান। কথোদিনে রাধাকুণ্ডে হইল নির্যান॥ তেঁহ বিনা কার কার জন্মিল দুর্মতি। তৈছে সেই পাষণ্ডের হইল দুর্গতি॥ সে সব প্রসঙ্গ হেথা নারি বিস্তারিতে। বিস্তারিতে বহির্মুখ প্রকাশ গ্রন্থেতে॥ (১২২)

কথোদিনে বিশ্বনাথ শ্রীকুণ্ড হইতে। গৌড়ে গেলা শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞামতে॥ শ্রীগুরুদেবের কৈল চরণ বন্দন। তেঁহ যৈছে কৃপা কৈল না হয় বর্ণন॥ একদিন দেবগ্রামে লোকের কথায়। বিশ্বনাথে কহে অতি মধুর ভাষায়॥ বিবাহ করিয়া তুমি গেলা বৃন্দাবন। অগ্য পত্নীসহ রাত্রে করহ শয়ন। (১৩০) বিশ্বনাথ ঐছে গুরুদেবের আজ্ঞাতে। চলিলেন পত্নীসহ শয়ন করিতে॥ শ্রীবিশ্বনাথের পত্নী পরম সুন্দরী। বসিয়া আছেন শয্যা বেশাদিক করি॥ বিশ্বনাথ গিয়া করি মৌনাবলম্বন। শুইতে শয্যায় পত্নী করিল শয়ন॥ বিকাররহিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। যৈছে তাঁর স্পর্শ নহে কৈল তৈছে রীতি॥ গুরু আজ্ঞা পত্নীসহ করিতে শয়ন। শুতিয়া করিলা সুখে শ্রীনাম কীর্তন॥ (১৪০) রজনী প্রভাতে জীর্ণ কম্বল উঢ়িয়া। বাসায় আসিয়া করিলেন প্রাতঃক্রিয়া॥ সবার বিস্ময় শুনি ঐছে রাত্রি বাস। শিষ্য জিতেন্দ্রিয় ইথে ইষ্টের উল্লাস॥

পুনঃ ইষ্টদেব কার কথা না শুনিলা। বিশ্বনাথ ইষ্ট সেবি নিকটে রহিলা॥ শ্রীমদ্ভাগবত ইষ্টদেবে লিখি দিল। লিখনের কালে অতি কৌতুক হইল॥ যথা বসি ভাগবত লিখে বিশ্বনাথ। তথা সূর্যাতাপে ছায়া হয় অকস্মাৎ॥ (১৫০) একদিন এক সরোবর সন্নিধানে। বসিয়া লিখেন পুথি ছায়াহীন স্থানে॥ লিখিতে লিখিতে প্রেমানন্দ মগ্ন হৈলা। হইল যে মেঘবৃষ্টি কিছু না জানিলা॥ যানে চড়ি যায় সে গ্রামের জমিদার। কিছুদূরে থাকিয়া দেখয়ে চমৎকার॥ শ্রীবিশ্বনাথেব চতুর্দিকে বৃষ্টি হয়। বিশ্বনাথ অঙ্গে বারিবিন্দু না স্পর্শয়॥ যত্নে প্রণমিয়া জমিদার গেলা ঘরে। বৃষ্টি সমাধান হৈল কতক্ষণ পরে॥ শ্রীবিশ্বনাথের বাহ্য হৈল কতক্ষণে। (পত্র ৩২খ) সেই দিন লেখা পূর্ণ দিলা গুরু স্থানে॥ সেই জমিদার এই কথা ব্যক্ত কৈল। শ্রীবিশ্বনাথের মহা লজ্জা উপজিল॥ (১৬৪)

গুরু আজ্ঞা লৈয়া পুনঃ আইলা বৃন্দাবন। মহাহর্ষ হৈলা বৃন্দাবনবাসিগণ॥ করিলেন বাস রাধাকুণ্ড সমীপেতে। বর্ণিলেন বহু গ্রন্থ ব্যাপিল জগতে॥ কৈল ভাগবতের টিপ্পনী মনোহর। শ্রীগীতার টিপ্পনী নাহিক যার পর॥ (১৭০) শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূর টীকাতে। প্রকাশিলা যে চাতুর্য্য বুঝে সে পণ্ডিতে॥ স্বপ্নচ্ছলে কৃষ্ণচৈতন্যের আজ্ঞা হৈল। গোবর্ধন কন্দরাতে বসি টীকা কৈল॥ শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের টীকাতে। করিল ব্যাখ্যান বহু দুষ্টের

নিমিত্তে ॥ শ্রীজীবের বাক্য দুরাশয় না বুঝয়। তত্ত্ববাক্য আনি সব লীলাতে স্থাপয় ॥ শ্রীরূপের অনুগত শ্রীজীব গোস্বামী। তাঁহার কৃপায় স্ফূর্তি হয় যে আপনি ॥ (১৮০) হেন শ্রীজীবের বাক্য বুঝে কোন জন। শ্রীবিশ্বনাথ শ্রীজীব মতে ভিন্ন নন ॥ শ্রীরূপের মনোবৃত্তি তাহে প্রকাশিল। শ্রীরাধিকাগণসহ বহু কৃপা কৈল ॥ শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতাদিক কাব্য গণে। বর্ণিল যে সব মহানন্দ আস্বাদনে ॥ বর্ণিতেই গ্রন্থাখ্য চৈতন্যরসায়ন। স্বপ্নচ্ছলে মহাপ্রভু করয়ে বারণ ॥ ওহে বিশ্বনাথ চৈতন্যরসায়নে। বর্ণিবা পৃথক কিছু করিয়াছ মনে ॥ (১৯০) কলিযুগে মোর এই অদভুদ বিহার। অনেকে জানিবে যাথে মোর চমৎকার ॥ মোর লীলারসে মগ্ন মোর ভক্তগণ। আস্বাদয়ে নানামতে করিয়া বর্ণন ॥ যে যৈছে রূপ বর্ণিব সে সব তৈছে হয়। না কর সন্দেহ এ পরমানন্দময় ॥ ঐছে কত কহি বিশ্বনাথে কৃপা করি। হইলেন অদর্শন প্রভু গৌরহরি ॥ বিশ্বনাথ জাগিয়া দেখয়ে রাত্রি শেষ। ব্যাকুল হইয়া দৈন্য করয়ে অশেষ ॥ (২০০) প্রভু অনুগ্রহে ধন্য মানি আপনায়। নিরন্তর প্রভুর চরিত্র সুখে গায় ॥ শ্রীচৈতন্যরসায়নে বর্ণিতেন যাহা। না হইল গ্রন্থ পূর্ণ না বর্ণিল তাহা ॥ প্রভুর কীর্তনে মত্ত হৈয়া নিরন্তর। বর্ণিলেন গীত সে দিবস মনোহর ॥ কে কহিতে পারে তাঁর সাধন প্রক্রিয়া। যে দেখে বারেক সে জুড়ায় নেত্র হিয়া ॥ শ্রীগোকুলানন্দ শ্রীবিগ্রহ মনোহর। তাঁর পরিচর্যাতে আনন্দ নিরন্তর ॥ শ্রীগোকুলানন্দ প্রাপ্ত যৈছে বিশ্বনাথে। সে অতি অপূর্ব কথা কহি সংক্ষেপেতে ॥ (২১২)

পরম সুশান্ত বিজ্ঞ এক ব্রহ্মচারী। মথুরা আইল তীর্থ প্রদক্ষিণ করি ॥ শ্রীগোকুলানন্দের সেবায় সদা রত। তাঁর যৈছে ক্রিয়া তা কহিবে কেবা কত ॥ একদিন স্বপ্নচ্ছলে শ্রীগোকুলানন্দ। ব্রহ্মচারী প্রতি কহে হাসি মন্দ মন্দ ॥ বৃন্দাবনে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী যথা। তাঁরে সমর্পহ মোরে লৈয়া যাহ তথা ॥ (২২০) রজনী প্রভাতে ব্রহ্মচারী মহানন্দে। বিশ্বনাথে সমর্পয়ে শ্রীগোকুলানন্দে ॥ বিশ্বনাথ কহে কহ সেবা অধিকারী। মোরে সমর্পহ কেন বুঝিতে না পারি ॥ ব্রহ্মচারী কহে মোরে হইল আদেশ। বিশ্বনাথ কহে এথা পাইবেন ক্লেশ ॥ আপনি করহ সেবা আমার কথায়। শুনি ব্রহ্মচারী গেলা আপন বাসায় ॥ পুনঃ শ্রীগোকুলানন্দ হইয়া সদয়। ব্রহ্মচারী প্রতি পুনঃ স্বপ্নে নিবেদয় ॥ (২৩০) পুনঃ প্রাতে লৈয়া মোরে যাবে তাঁর স্থানে। লইবেন

তেঁহো আমি কহিব তাঁহানে ॥ ব্রহ্মচারী প্রাতঃকালে প্রভুর আজ্ঞায়। বিশ্বনাথ পাশে চলে উল্লাস হিয়ায় ॥ এথা শ্রীগোকুলানন্দ আনন্দ আবেশে। স্বপ্নে বিশ্বনাথ প্রতি কহে মৃদুভাষে ॥ ওহে বিশ্বনাথ তুমি না ভাবিও মনে। আপন ভক্ষণ দ্রব্য আনিব আপনে ॥ যৈছে তৈছে যদি মোর সেবা কর তুমি। তাহাতেই পরম আনন্দ পাব আমি ॥ (২৪০) ব্রহ্মচারী অদ্য মোরে লইয়া আসিবে। তুমি সেবা করিলে তেঁহো মহানন্দ পাবে ॥ এত কহি অতি অনুগ্রহে কৈল কোলে। শ্রীবিশ্বনাথের নিদ্রাভঙ্গ হেনকালে ॥ হইল ব্যাকুল যৈছে কহিতে না পারি। হেনকালে আইলা তৈথিক ব্রহ্মচারী ॥ শ্রীগোকুলানন্দে অতিসুখে সমর্পিল। বিশ্বনাথ ঐছে সেবা সুখে মগ্ন হৈল ॥ (২৪৮)

কোন কোন দিন মহা উৎসব বিধানে। দাস গোস্বামীর গোবর্দ্ধন শিলা আনে ॥ যথা হৈতে আনেন তা কহি সংক্ষেপেতে। এ অতি অপূর্ব কথা শুনহ যত্নেতে ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু গোবর্দ্ধন শিলা। যত্নে রঘুনাথ দাস গোস্বামীরে দিলা ॥ শ্রীদাস গোস্বামী সেবা কৈল যে প্রকারে। যে আনন্দ হৈল তাহা কে কহিতে পারে ॥ দাস গোস্বামীর অপ্রকটে যত্ন মতে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিমগ্ন সেবাতে ॥ কবিরাজ গোস্বামী অপ্রকট হৈলে। শ্রীমুকুন্দ সেবা কৈলা ভাব প্রেম জলে ॥ (২৬০) কথোদিনে শ্রীমুকুন্দ দাস সেবা করি। যাঁরে সমর্পিল তাহা কহিয়ে বিস্তারি ॥ লোকনাথ প্রিয় শ্রীঠাকুর নরোত্তম। তাঁর শিষ্য চক্রবর্তী গঙ্গানারায়ণ ॥ (পত্র ৩৩ক) গঙ্গানারায়ণের দুহিতা বিষ্ণুপ্রিয়া। শ্রীগোবিন্দ সেবারসে সদা হর্ষ হিয়া ॥ তাঁর কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়া ভক্তি মূর্তিমতী। রাধাকুণ্ডবাসী ঠাকুরাণী যাঁর খ্যাতি ॥ গৌড়ে হৈতে ব্রজে গিয়া সর্বত্র ভ্রমিল। নিয়ম করিয়া রাধাকুণ্ডে বাস কৈল ॥ (২৭০) শ্রীমুকুন্দ দেখি তাঁর সুচরিত। নিরন্তর প্রশংসে হইয়া হরষিত ॥ মুকুন্দদাসের অতি প্রাচীন সময়। ভোজনে অরুচি হইল উদরাময় ॥ কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরাণী ঐছে পথ্য দিল। হইল ভোজনে রুচি রোগ শান্ত হৈল ॥ মুকুন্দ করিয়া দৈন্য কহে বারে বারে। মাতার সমান স্নেহ করিলা আমারে ॥ কৃষ্ণে যে তোমার ভক্তি কি জানিব আমি। গোবর্দ্ধন শিলা রসে যোগ্য হও তুমি ॥ (২৮০) এত কহি গোবর্দ্ধন শিলা তাঁরে দিলা। অল্পদিনে শ্রীমুকুন্দ অপ্রকট হইলা ॥ গোবর্দ্ধন শিলা সেবা করে ঠাকুরাণী। যৈছে তাঁর প্রীতি তাহা

কহিতে না জানি ॥ শিলায় সাক্ষাত দেখে ব্রজেন্দ্রনন্দন। যে দিন যে রঙ্গ তাহা না হয় বর্ণন ॥ (২৮৬)

শ্রীঠাকুরাণীর ক্রিয়া কহা নাহি যায়। নিরন্তর হরিনাম যাঁহার জিহ্বায় ॥ তেঁহো কৃপা কৈলে পূর্ণ হয় অভিলাষ। তাঁর স্থানে অপরাধ হৈলে সর্বনাশ ॥ (২৯০) রূপ কবিরাজ যথা অপরাধ কৈল। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তে মৃত্যু হৈয়া ভূত হৈল ।। যদ্যপি এ অন্যত্র কহিব বিবরিয়া। তথাপি কহিয়ে এথা সংক্ষেপ করিয়া ॥ উত্তমকুলেতে জন্ম অতি শিষ্টাচার। গুরুকৃপা তাঁহারে কহিয়ে শিষ্য যাঁর ॥ শ্রীচৈতন্যপ্রিয় লোকনাথ কৃপাময়। তাঁর শিষ্য শ্রীলনরোত্তম মহাশয় ॥ তাঁর শিষ্য চক্রবর্তী গঙ্গানারায়ণ। তাঁর শিষ্য চক্রবর্তী শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥ (৩০০) তাঁর শিষ্য রূপ কবিরাজ গৌড় হৈতে। শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে গেলেন ব্রজেতে ॥ গুরু কৃষ্ণ এক এথে সুদৃঢ় বিশ্বাস। গুরু আজ্ঞা লৈয়া কৈল রাধাকুণ্ডে বাস ॥ পূর্বে ব্যাকরণ আদি অধ্যয়ন। শ্রীভাগবত আদি পড়িতেই হৈল মন ॥ গুরু আজ্ঞা লৈয়া শ্রীমুকুন্দ দাস স্থানে। করিল আরম্ভ ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়নে ॥ শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্তী গৌড়ে আইলা। রূপ দাসগোস্বামী গ্রন্থাদি পড়িলা ॥ (৩১০) প্রেমভক্তি রসাস্বাদে সদা মগ্ন হৈল। শ্রীকুণ্ড নিবাসী সবে দেখি সুখ পাইল ॥ শ্রীমুকুন্দ কথো দিনে করি বিদ্যাদান। অপ্রকট হৈল কি আশ্চর্য ক্রিয়া তান ॥ তাঁর অপ্রকট হৈলে কথোদিন পরে। অপরাধ কৈল কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী দ্বারে॥ একদিন ভাগবত পাঠারম্ভ কালে। আইলেন কুণ্ডবাসী বৈষ্ণব সকলে ॥ সবাকার মান্যা কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরাণী। তেঁহ আইলেন মনে মহা সুখ মানি ॥ (৩২০) সবে মহানন্দে তাঁর সম্মান করিল। রূপ কবিরাজ কিছু আদর না কৈল ॥ তথাপিহ তাঁর কিছু না জন্মিল মমে। বসিলেন হর্ষ হৈয়া শ্রীকথা শ্রবণে ।। রূপ কবিরাজ ঠাকুরাণী প্রতি কয়। এককালে দুই কর্ম কৈছে যুক্তি হয় ।। অতিশয় আর্তি দেখি নাম গ্রহণেতে। শ্রীভাগবত শ্রবণ বা হয় কি রূপেতে ।। ঠাকুরাণী কহে এই অভ্যাস জিহ্বার। শ্রবণের বাধা ইথে না হয় আমার ।। (৩৩০) শুনি ক্রোধাবেশে রহিলেন রূপদাস। সেইক্ষণে রূপের হইল সর্বনাশ ॥ প্রথমেই হেয় বুদ্ধি শ্রীগুরু দেবেতে। তৈছে কৃষ্ণ চৈতন্য বিগ্রহ বৈষ্ণবেতে ॥ পরম দুর্লভ ভক্তি পথে হৈল হীন। না রহিল সে প্রেমাবেশে কিছু চিন ॥ সর্ব প্রকারেও বড় মানি আপনারে। অজ্ঞত্রেও অপরাধ উপার্জন করে ॥ করিতে পৃথক মত হৈল মহা আর্তি। অন্যে

বহির্মুখ পথে করায় প্রবৃত্তি॥ (৩৪০) ঘুচিল সে তেজ দেহাগ্নি হীন অন্ধার। আপনার জানে হৈল কুষ্ঠের সঞ্চার॥ কিছুদিনে ব্যক্ত হৈল বহির্মুখ ক্রিয়া। লাঘব প্রযুক্ত গৌড়ে গেল পলাইয়া॥ কপট রূপেতে গেলা ইষ্টদেব স্থানে। তথা ব্যক্ত হৈল লজ্জা পাইল আপনে॥ রূপ কবিরাজ গুরুত্যাগি এই কথা। সর্বত্র ব্যাপিল সবে কহে যথা তথা॥ হইল লাঘব গৌড়ে নারে স্থির হৈতে। উৎকলে প্রবেশ কৈল খুরিয়া গ্রামেতে॥ (৩৫০) তথা কুষ্ঠরোগে দেহ খণ্ড খণ্ড হৈল। পাইয়া অত্যন্ত ক্লেশ কথোদিনে মৈল॥ ভূত হইয়া কোন জনে করিয়া গ্রহণ। জানাইল অপরাধে হইলুঁ এমন। যদি কহ যোগ্য হৈয়া কেন এ আচরে। তাহে কহি বৈষ্ণবাপরাধে কিনা করে॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে॥ "বৈষ্ণবের স্থানে হয় ক্ষুদ্র অপরাধ। মহা মহা প্রেমির প্রেমেতে পড়ে বাদ॥" ঐছে গ্রন্থকার ইহা বিস্তারি বর্ণিল। বৈষ্ণবাপরাধ ফল সীমা জানাইল॥ (৩৬০) বৈষ্ণবাপরাধে যে হৈল সাবধান। জগতের মাঝে সেই মহা ভাগ্যবান॥ প্রসঙ্গে একথা এথা অল্পে জানাইলুঁ। কৃষ্ণ-প্রিয়া দেবীগুণ বর্ণিতে নারিলুঁ॥ যৈছে তাঁর ব্রজবাসী বৈষ্ণবেতে প্রীত। যৈছে সর্বজীবের চিন্তয়ে সদা হিত॥ পরদুঃখে দুঃখী যৈছে যৈছে কুণ্ড বাস। শ্রীনামকীর্তনে যৈছে উপজে উল্লাস॥ যৈছে গণ সহ কৃষ্ণ চৈতন্যেতে রতি। তৈছে তাঁর মন গোবর্ধন শিলা প্রতি॥ যৈছে পরামর্শ রাধা কৃষ্ণের কৌতুকে। এ সব বিদিতে বিজ্ঞ আস্বাদয়ে সুখে॥ (৩৭২)

হেন কুণ্ডবাসী ঠাকুরাণী বিশ্বনাথে। মধ্যে মধ্যে শিলা সেবা করান সাক্ষাতে॥ গোবর্দ্ধন শিলা শোভা কহন না হয়। অদ্যাপি গোকুলানন্দ পাশে বিলসয়॥ শ্রীঠাকুরাণীর স্নেহপাত্র চক্রবর্তী। কহিতে কি জানি তাঁর নিরুপম কীর্তি॥ ওহে ভাই যে প্রভুর ধর্ম রক্ষা কৈল। গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব দ্বেষির দণ্ড দিল॥ অতি নিরপেক্ষ স্বধর্মেতে নিষ্ঠা যাঁর। এমন দয়ালু কি হইতে আছে আর॥ (৩৮২)

শ্রীবিশ্বনাথের নাম শ্রীহরিবল্লভ। গীতের আভোগে ব্যক্ত কহে বিজ্ঞ সব॥ বিশ্বনাথে কেবা না আদরে বৃন্দাবনে। সদা ভক্তি রসে মগ্ন লৈয়া শিষ্যগণে॥ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী শিষ্য কৈল যত। সকলেই হইলেন মহাভাগবত॥ বৃন্দাবন হৈতে যবে গৌড় দেশে আইলা। সেই কালে বিপ্র জগন্নাথে শিষ্য কৈলা॥ জগন্নাথ বিপ্রের আনন্দ অতিশয়। পাইয়া ঠাকুর বিশ্বনাথ পদাশ্রয়॥ হইল

বিবাহ পূর্বে তাহে নাহি মন। অল্পকালে কৈলা বহু তীর্থ পর্যটন॥ কৃষ্ণে প্রীতি অতি পতিব্রতা ভার্যা তাঁর। স্বামীর চরণ বিনা না জানয়ে আর॥ অকস্মাৎ বিপ্র জগন্নাথ দেশে আইলা। সংক্ষেপে জানাই যৈছে গৃহেতে রহিলা॥ নিরন্তর প্রভু পাদপদ্ম আরাধয়। না ভায় সংসার সদা উদ্বিগ্ন হৃদয়॥ (৪০০) যাঁহার আজ্ঞায় স্থিতি করিলেন ঘরে। তাহা কিছু কহি এই প্রসঙ্গানুসারে॥

প্রভু নিত্যানন্দ হাড়ো ওঝার নন্দন। রাঢ়ে একচক্রা গ্রামে যাঁহার ভবন॥ শ্রীসুন্দরামল বন্দিঘাটি গাঁই তেঁহ। করিলা উজ্জ্বল শ্রীনিতাইর পিতা যেঁহ॥ প্রভু নিত্যানন্দ বলদেব ভগবান। রামভদ্র বীরভদ্র দুই পুত্র তান॥ একদিন প্রণমিয়া নিত্যানন্দ রামে। অল্পকালে রামভদ্র গেলেন স্বধামে॥ (৪১০) বীরভদ্র প্রভুর হইল পুত্র ত্রয়। জ্যেষ্ঠ শ্রীগোপীজনবল্লভ দয়াময়॥ মধ্যম তনয় রামকৃষ্ণ গুণসিন্ধু। কনিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র পতিতের বন্ধু॥ প্রভু গোপীজন-বল্লভের পুত্র ত্রয়। জ্যেষ্ঠ রামনারায়ণ গুণের আলয়॥ শ্রীরামলক্ষ্মণ হন মধ্যম সন্তান। কনিষ্ঠ শ্রীরামগোবিন্দাখ্য দয়াবান॥ প্রভুবংশে বিখ্যাত এ শ্রীরামলক্ষ্মণ। যাঁহার প্রতাপে কাঁপে পাষণ্ডির গণ॥ (৪২০) তাঁর শিষ্য শ্রীলক্ষ্মণদাস কৃপাবান। পরম বৈরাগ্য মহা প্রভাব তাঁহান॥ তেঁহ জগন্নাথ গৃহে স্থিতি করাইলা। হইব সুসন্তান বর প্রদান করিলা॥ তাঁর আজ্ঞামতে গৃহে করিলেন বাস। কথোদিন পরে হৈলা অত্যন্ত উদাস। বৃন্দাবনে গিয়া কৈল শ্রীগুরু দর্শন। গুরু আজ্ঞামতে গৃহে কৈল আগমন॥ পুনঃ কথোদিন পরে বৃন্দাবন আইলা। ভক্তিরসে মত্ত ব্রজে ভ্রমণ করিলা॥ (৪৩০) ইষ্ট অদর্শনে অতি ব্যাকুল হইয়া। গোঙাইলা কথোদিন কান্দিয়া কান্দিয়া॥ মাঘ পূর্ণিমার শেষ রজনী সময়ে। অপ্রকট হৈতে প্রভু চরণ চিন্তয়ে॥ সে সময় মোরে অল্প নিদ্রা আকর্ষিল। নির্লজ্জ হইয়া কহি স্বপ্নে যে দেখিল॥ (৪৩৬)

বিপ্র জগন্নাথ আগে এক ভৃত্য সঙ্গে। আইলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী রঙ্গে॥ পরিধেয় বস্ত্র শুভ্র সুক্ষ্ম সুনির্মল। চন্দন তিলক চারু ললাট উজ্জ্বল॥ (৪৪০) তুলসীর মালা গলে পরম সুন্দর। অতি স্থূল নহে চম্পকাভা কলেবর॥ কিবা ভ্রূদ্বয় নাসা নয়ন যুগল। কি আশ্চর্য গণ্ডগ্রীবা বদন মণ্ডল॥ কিবা বাহু বক্ষ কটি জানু পদদ্বয়। কিবা সে পরম ভঙ্গি উপমা না হয়॥ দেখিতে সে শোভা মোর কি হইল চিতে। ঝরয়ে নয়নে জল নারি নিবারিতে॥ মোরে যে কহিল

মৃদু হাসিয়া হাসিয়া। কহিতে না আইসে মুখে উমড়য়ে হিয়া॥ (৪৫০) তেঁহ নিজ শিষ্য জগন্নাথে লৈয়া সঙ্গে। অদর্শন হৈলা দুঃখ পাইলুঁ নিদ্রাভঙ্গে॥

হেন জগন্নাথের নন্দন মুঞি ছার। না বুঝিলুঁ ভক্তিমর্ম হৈলুঁ কুলাঙ্গার॥ আজন্ম করিলুঁ পাপ অপরাধ যত একমুখে তাহা আমি কহিব বা কত॥ মুঞি মহাদুরাচার জানে সর্বলোকে। মজিল সংসার ঘোর বিষয় নরকে॥ আমার দুর্গতি দেখি বৈষ্ণব গোসাঞি। অনুগ্রহ করিয়া নিলেন নিজ ঠাঁঞি॥ (৪৬০) শ্রীমহাশয়ের চারু বিলাস বর্ণিতে। মোরে আজ্ঞা কৈল মুঞি হীন সর্বমতে॥ শুনি মো মূর্খের মনে আনন্দ বাঢ়িল। নরোত্তমবিলাসসাখ্য গ্রন্থ আরম্ভিল॥ শ্রীবৈষ্ণব আদেশে এ করিল বর্ণন। করি পরিশোধন করহ আস্বাদন॥ বৈষ্ণব গোসাঞির কৃপামতে বৃন্দাবনে। মাঘে গ্রন্থ পূর্ণ হৈল পৌর্ণমাসী দিনে॥ মোর দুই নাম **ঘনশ্যাম নরহরি**। নরোত্তম বিলাস বর্ণিলুঁ যত্ন করি॥ (৪৭০)

ইতি নরোত্তমবিলাস গ্রন্থ সম্পূর্ণ॥

পরিশিষ্ট—ঘ

অদ্বৈত বিলাস : নরহরি ভণিতার একটি খণ্ডিত পুথি

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম আশা করি।
অদ্বৈত বিলাস কহে দাস নরহরি॥

'নরহরি দাস' ভণিতাযুক্ত 'অদ্বৈতবিলাসে'র দুটি খণ্ডিত পুথি আছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে। (ক) ২৬৫নং—১-১৫ পত্র। ১ম বিলাস সম্পূর্ণ (৬৫২ চরণ), ২য় বিলাসের অধিকাংশ (৫৩৭ চরণ)। (খ) ২৮৮৬ নং—১ম ও ২য় বিলাস (৫৫২ চরণ) সম্পূর্ণ, ৩য় বিলাসের কিয়দংশ (৩৩৬ চরণ)। ২৬৫নং পুথিই পণ্ডিতদের আলোচনায় উল্লিখিত; দ্বিতীয়টি অন্য কারো নজরে পড়ে নি। এই পুথিতে আমরা নতুন অংশ পেয়েছি ৩৫১ চরণের পাঠ

(২য় বিলাসের ১৫ চরণ, খণ্ডিত ৩য় বিলাসের ৩৩৬ চরণ)। পুথি দুটিতে খুব একটা গরমিল নেই।

প্রথম বিলাসে শ্রীচৈতন্য ও ৮০ জন বৈষ্ণবের বন্দনা, কবির দৈন্যোক্তি, অদ্বৈত-তত্ত্ব, অদ্বৈতের পিতৃমাতৃ পরিচয় ও জন্ম বিবরণ। দ্বিতীয় বিলাসে অদ্বৈতের অন্নপ্রাশন ; বালক অদ্বৈত মুখে গৌর নাম উচ্চারণ ও প্রসাদী-অন্ন গ্রহণের মহিমা ব্যাখ্যা, জনৈকা ধনলোভী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীকে বালক কর্তৃক কৃষ্ণ-নামের মাধ্যমে ধনপ্রদান। বালকের ভাগবত শিক্ষা ও ভাবাবেশ। খণ্ডিত তৃতীয় বিলাসে সরোবরতীরে সঙ্গীসাথী নিয়ে বালকের গৌরবিগ্রহ পূজা, ভাবাবেগবশতঃ হুংকার ও গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা কথন। এরপর পুথিখণ্ডিত।

'অদ্বৈতবিলাস' সর্বপ্রথম সুধীসমাজের দৃষ্টিতে আনেন বীরেশ্বর প্রামাণিক।[১] অবশ্য দীনেশচন্দ্র সেনও তাঁর গ্রন্থে এই পুথি-রচয়িতার সবিশেষ প্রশংসা করেছেন।[২] জে. সি. ঘোষ 'অদ্বৈতবিলাস'-কারকে 'ভক্তিরত্নাকর' প্রণেতা বলেই অনুমান করেন।[৩] কিন্তু হরিদাসদাস,[৪] অসিতকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়[৫] ও রবীন্দ্রনাথ মাইতি[৬] পুথিটির প্রামাণিকতা, বিশেষতঃ প্রাচীনত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

প্রাপ্ত পুথিতে গ্রন্থকর্তা দাস-নরহরির কোনো পরিচয় নেই। তিনি বলেছেন যে, 'শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম' হৃদয়ে ধারণ করে 'সাধু আজ্ঞায়' গ্রন্থটি লিখছেন (অবশ্য কবি এই গুরু বা বৈষ্ণব বা সাধু ব্যক্তিদের নাম করেন নি)। দ্বিতীয়তঃ কবি নিজেকে 'পাপিষ্ট', 'অতি দুরাচার', 'লজ্জাহীন', 'অকিঞ্চন,' 'মহামূর্খ' বলে অভিহিত করেছেন। তৃতীয়তঃ কবি প্রথমাবধি 'গ্রন্থবাহুল্যের ভয়ে' সন্ত্রস্ত, 'অন্যগ্রন্থে' বিস্তৃত বর্ণনার বারংবার তাই দোহাই দেন। এই লক্ষণগুলি ভক্তিরত্নাকর প্রণেতা নরহরি-ঘনশ্যামের গ্রন্থেই লক্ষ্য করা যায়। তা ছাড়া ভক্তিরত্নাকরে বিবৃত অদ্বৈত জীবনীটির সঙ্গে বর্তমান পুথির অনেক

---

১. সাহিত্য পত্রিকা (১৩১১), পৃঃ ২৩৫।

২. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, (২য় সং), পৃঃ ৩৮২।

৩. Bengali Literature (Oxford University Press, 1948), p. 53.

৪. গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য, (২য় সং), পৃঃ ৯৬ [দ্বিতীয় খণ্ড]।

৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, (৩য় খণ্ড, ১ম সং), পৃঃ ৬৬০।

৬. হরিচরণদাসের অদ্বৈতমঙ্গল, (ব. বি. ১৩৬৬), ভূমিকা, পৃঃ ১৪।

স্থানে কাহিনীগত এমনকি চরণে চরণে হুবহু মিল আছে। যেমন, নাভা-কুবের প্রসঙ্গ (পুথি. ৫ম পত্র : ভক্তি ২০৯ পৃ), অদ্বৈততত্ত্ব বর্ণনা (৮ক : ২১০ পৃ.), অদ্বৈতের জন্মবৃত্তান্ত (৭খ : ২১০ পৃ.)। শব্দবাক্য চরণের এমন হুবহু মিলকে নকল বলাই উচিত। এই সব লক্ষণাদি দেখে স্বাভাবিক ভাবেই মনে হবে যে অদ্বৈতবিলাস'কার 'নরহরি' ও 'ভক্তিরত্নাকর' প্রণেতা 'নরহরি' অভিন্ন ব্যক্তি।

কিন্তু 'অদ্বৈতবিলাসে' এমন কিছু কিছু অজ্ঞতার পরিচয় আছে, মাঝে মাঝে এমন কিছু অসমর্থিত ও অনৈতিহাসিক আজগুবি তথ্য আছে, যা নরহরি-ঘনশ্যামের রচনা হতেই পারে না। যেমন,

এক। অদ্বৈতের পিতামহের নাম নৃসিংহ। ভক্তিরত্নাকর বা অন্যান্য গ্রন্থে এতথ্যটি আছে। কিন্তু আশ্চর্য যে, এটি 'অদ্বৈতবিলাসে' নেই। ভক্তিরত্নাকরে মাত্র ১৬৮ চরণে[৭] যদি অদ্বৈতজীবনীর সব জ্ঞাতব্য তথ্যই প্রদত্ত হয়, সেই একই লেখক অদ্বৈতের পরিপূর্ণ একটি জীবনী লিখতে বসে তাঁর পিতামহের নামটিই লিখতে ভুলে যেতে পারেন কি? নরহরি-ঘনশ্যামের ঐতিহাসিক সংস্কার আলোচনা কালে দেখেছি,[৮] তিনি খুব সতর্ক ভাবে তথ্য সংগ্রহ ও গ্রন্থে তথ্য সন্নিবেশ করেন, সব তথ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উত্থাপন করেন, তথ্যগত মত পার্থক্য থাকলে সকল মতই তিনি উল্লেখ করেন, কোথাও কোন তথ্য কম মনে হলে, নিজের সংগ্রহ থেকে সেটি প্রদান করেন। অথচ হরিচরণদাসের 'অদ্বৈত-মঙ্গল' রচনার অনেক পরের কবি এবং ইতিহাসনিষ্ঠ জীবনীকার নরহরি-ঘনশ্যামের রচনার এমন মারাত্মক অজ্ঞতার পরিচয় কুত্রাপি নেই।

দুই। অন্যান্য অদ্বৈতজীবনীগুলিতে অদ্বৈতের পিতামাতা ভাইবোনদের সুবিস্তৃত পরিচয় আছে। অদ্বৈতবিলাসে প্রসঙ্গটি যেন এড়িয়ে যাবার প্রচেষ্টা হয়েছে। এই যে জ্ঞাতব্য বিষয়ের অপূর্ণতা তা নরহরি-ঘনশ্যামের রচনায় দেখি না।

তিন। অদ্বৈতবিলাসে বর্ণিত কাহিনীগুলি অন্যত্র মেলে নি। এমন কি এগুলির কোন রকম ভিত্তি নেই, গালগল্প ছাড়া এগুলির অন্য মূল্য নেই। এমন আজগুবি তথ্যের অকারণ সন্নিবেশ নরহরি-ঘনশ্যামের জীবনী গ্রন্থে দুর্লভ।

---

৭. ৫ম তরঙ্গের ২০৩৬-৯৬ নং চরণ, ১২শ তরঙ্গের ৩৭৫৩-৫৪, ৩৭৬৬, ৩৭৮৬-৮৯নং চরণ।

৮. 'বৈষ্ণব জগৎ' অংশ দ্রষ্টব্য।

তথ্যসংগ্রহ, রচনারীতি, কাহিনী কথন ও কবির মানসিকতা বিচার করলে 'অদ্বৈতবিলাস'কে নরহরি চক্রবর্তীর রচনা বলে গ্রহণ করা যাবে না।

মনে হয় কোনো অজ্ঞাতকুলশীল নরহরি ভক্তিরত্নাকর সামনে রেখে, স্থানে স্থানে হুবহু নকল করে নিজের কল্পনাযোগে 'অদ্বৈতবিলাস' রচনায় ব্রতী হয় এবং সম্ভবতঃ তিনি গ্রন্থটি সমাপ্তও করে যেতে পারেন নি ॥

পরিশিষ্ট—ঙ

'ভক্তিরত্নাকরান্তে গ্রন্থকারলেশসূচক'

[এ অংশ আছে পাঠবাড়ীর (ক) 'ভক্তিরত্নাকর' (২৩৪১।২৪ নং) পুথির ১৫৪ক-১৫৬ক পত্রে। রচনাটি এখানেরই 'নরোত্তমবিলাস' (২৩৩৬।২১) পুথির শেষেও (পত্র ৩৩খ-৩৫খ) দেখা যায়। এটি পুথি দুটির অনুলেখক আনন্দনারায়ণ মৈত্র ভাগবতভূষণ ('দীনানন্দ') মহাশয়ের রচনা। এতে গ্রন্থকার-নরহরি চক্রবর্তীর সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদ পয়ার ছন্দে বিবৃত হয়েছে।]

১৫৪ক : শুনহ শ্রীশ্রোতাগণ দয়ার সাগর। কহয়ে কিঞ্চিত দীনানন্দ এ পামর ॥ বন্দ শ্রীমন্নরহরি রসুয়া ঠাকুর। যাঁহার স্মরণে তিন পাপ যায় দূর ॥ বাল্যাবধি ইঁহার চরিত্র মনোহর। সর্বশাস্ত্রে নিপুণ পণ্ডিত বিজ্ঞবর ॥ ক্ষেত্র বৃন্দাবনে যাঁর বিখ্যাত চরিত্র। ধর্ম সংস্থাপন করি ভ্রমিলা সর্বত্র ॥ (৮)

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ভক্তিরসময়। যাঁহার চরিত্রে ভক্ত সদানন্দ হয় ॥ স্বপ্নে দেখা দিয়া তেঁহো কৈল উপদেশ। ভাগবত গোস্বামীর গ্রন্থাদি বিশেষ ॥ প্রত্যক্ষে পড়িল আর কত শত স্থানে। সর্বত্র পাইল বহু আদর আপনে ॥ নবদ্বীপ ক্ষেত্র বৃন্দাবন আদি ধাম। যাতায়াত করে সদা নাহিক বিশ্রাম ॥ ভজনে আগ্রহ দেখি বৈষ্ণব সকল। কহিল গোবিন্দ সেব হইব সফল ॥ বিপ্র বংশে জন্ম বাল্যাবধি সদাচার। আকৌমার ব্রহ্মচর্য্য নাহি যার পর ॥ (২০) তথাপি আপনে দৈন্য মানি দুরাচার। কহয়ে সেবায় মোর নাহি অধিকার ॥ সবে কহে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তেঁহ। কৃপাকরি মো সবারে কহিলেন যেঁহ ॥ সেকালে তোমার অতি বাল্যাবস্থা হয়। কহিল দেখিও জগন্নাথের তনয় ॥ বৃন্দাবনে গোবিন্দেরে সেবি ঘনশ্যাম। পুরাইবে মোর মনে আছে যেবা কাম ॥

তোমরা সকলে তারে জানিবা আপন। তাহার নিকটে সবে করিবা শ্রবণ ॥ (৩০) নৃত্যগীত বাদ্য বিদ্যা ভক্তি শাস্ত্র আর। পরিচর্যা কর্মপাক বিবিধ প্রকার ॥ এ সব বিদ্যায় তেঁহ মহা বিজ্ঞবর। লক্ষ নামগ্রাহি ভক্তি অঙ্গেতে তৎপর ॥ এই মত হবে মোর নরহরি দাস। তাহারে তোমরা সব দিবা যে আশ্বাস ॥ এই তাঁর বাক্যে মোরা ভাবি দিবারাতি। নরহরি কবে আসি রাখিবে কিরিতি ॥

শ্রীলক্ষ্মণদাস কহে শুন ঘনশ্যাম। তুমি যে জন্মিবে পূর্বে মোরা জানিতাম ॥ (৪০) চক্রবর্তী আজ্ঞা লৈয়া তোমার পিতায়। গৃহবাস করাইলুঁ গৌরাঙ্গ ইচ্ছায় ॥ তাহাতে জন্মিলা তুমি বাপ নরহরি। এতদিন আছি মোরা তোর পথ হেরি ॥ এবে স্থির হৈয়া ব্রজে গোবিন্দ সেবহ। তোমার পিতার এই আছিল আগ্রহ ॥ শ্রীরামলক্ষ্মণদেব মোর ইষ্ট হন। স্বপ্নাদেশে তিনি মোরে এই কথা কন ॥ শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাপাত্র নরোত্তম। গঙ্গানারায়ণ তাঁর শিষ্য অনুপম ॥ (৫০)

১৫৪খ : তাঁর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচরণ প্রেমময়। তাঁর শিষ্য শ্রীরামচরণ সদাশয় ॥ তাঁর প্রিয় শিষ্য এই বিশ্বনাথদেব। গৌরনিত্যানন্দাদ্বৈতে জানয়ে অভেদ ॥ বৈষ্ণব সেবন আর নাম সংকীর্তন। রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা প্রেমরসায়ন ॥ ভক্তি অঙ্গ আছে যত জগতে বিদিত। এ সকলে বিশ্বনাথ সদা সাবহিত ॥ দেখিছ সাক্ষাতে তুমি কি কহিব আর। বিশ্বনাথ গুণ বহু হইবে প্রচার ॥ (৬০)

শ্রীবিশ্বনাথের শিষ্য বিপ্র জগন্নাথ। ভক্তিরসে মত্ত সদা সর্বত্র বিখ্যাত ॥ পানিশালা পাশে এই রেঙাপুর গ্রাম। এথাই বৈসয়ে বিপ্র তীর্থে অবিশ্রাম ॥ আগ্রহ করিয়া তাঁরে গৃহেতে স্থাপিবা। তাহার সন্তান এক রতন পাইবা ॥ বৈষ্ণব মণ্ডলে তাঁর হইবেক ধ্বনি। নরহরি ঘনশ্যাম ভ্রমিবে অবনী ॥ শ্রীরাধা গোবিন্দদেবে সেবি বহুকাল। শ্রীনিবাসাদির গুণ বর্ণিবে রসাল ॥ (৭০) বিশ্বনাথ দিবে তাঁরে সব নিজ শক্তি। যথা যাইবেক এ স্থাপিবে প্রেমভক্তি ॥ এই প্রভু আজ্ঞা মাথে করিবে ধারণ। তোমার জনকে বর দিলুঁ সেইক্ষণ ॥ তথাতে জন্মিলা বাপ ওহে নরহরি। তোমার ভাগ্যের কথা কহিতে কি পারি ॥ এসব চৈতন্যদাসগণের আজ্ঞায়। গোবিন্দে সেবহ বাপ না করিহ ভয় ॥

এত শুনি নরহরি অধোমুখ করি। কান্দয়ে সে উচ্চৈস্বরে ফুকরি ফুকরি ॥ (৮০) ওহে নাথ বিশ্বম্ভর পতিত পাবন। ওহে নিত্যানন্দ প্রভু দয়ার ভবন ॥

হা হা শ্রীঅদ্বৈতদেব কৃপাসিন্ধু মূর্তি। হা হা গদাধর প্রভু প্রভু নিজ শক্তি ।। হা হা হরিদাস হে শ্রীবাস বক্রেশ্বর। মুকুন্দ মুরারী নবদ্বীপ পরিকর ।। কোথা গেলা প্রভুগণ হৈলা অন্ধকার। হেনকালে জন্ম কেন লভিলুঁ মু ছার ।। কৃপার সমুদ্র মোর প্রভু শ্রীনিবাস। শ্যামানন্দ রামচন্দ্র নরোত্তম দাস ।। (৯০) এ সব গৌরাঙ্গগণ প্রকট যখন। তখন নহিল মোর এ দুঃখী জনম ।। হা হা বিধি কিবা কৈল কি হইল হায়। কোথা গেল মোর চক্রবর্তী মহাশয় ।। বৃন্দাবনে কুঞ্জে কুঞ্জে যার গুণ শুনি। সে হেন হারানু মুঞি পাঞা চিন্তামণি ।। এইখানে প্রভু মোর বিশ্বনাথদেব। হা হা রূপ সনাতন বলি করে খেদ ।। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট বলিয়া কান্দয়। ভট্ট রঘুনাথ দাস রঘুনাথ ছয় ।। (১০০) তোমরা ছাড়িয়া মোরে গেলা কোথাকারে। না দেখিলুঁ মুঞি এই প্রকট বিহারে ।। তোমরা সকল বিনা শ্রীগৌরাঙ্গ গুণ। এ হেন দুঃখীরে কেবা করাবে শ্রবণ ।। না শুনিলুঁ সে না মুখ অমৃত বচন। না দেখিলুঁ সেই সব কমলচরণ ।। গৌরাঙ্গ ললিত লীলা শুনি কার কাছে। মোর রূপসনাতন সদা এই যাচে ।। এ সব বিলাপ করি কান্দে বিশ্বনাথ। দেখিলুঁ শুনিলুঁ কত পিতার সাক্ষাৎ ॥ (১১০) এ হেন দয়াল প্রভু মোরে ছাড়ি গেল। না সেবিনু সে না পদ রহি গেল শেল ।। এ সকল পদাম্বুজে বঞ্চিত হইলুঁ। জন্মিয়া এবার মুঞি কিবা কর্ম কৈলুঁ ।। আপতিত উদ্ধারক গৌরাঙ্গ আমার। বিশ্বনাথ পাদপদ্ম দেখাব কি আর ।। মোর তাত নাথ বিশ্বনাথ মহাশয়। বিশ্ব পালিলেন তেঁহ হইয়া সদয় ।। অযাচকে প্রেমভক্তি রত্ন কৈল দান। সর্বত্র নোয়ালো (?) গৌরকৃষ্ণ ভগবান ।। (১২০) নিজ পত্র শেষ মোরে দিয়া দয়াময়। বলে কৃপাকর শ্রীঠাকুর মহাশয় ।। ওহে শ্রীবৈষ্ণবগণ করি নিবেদন। কৃপা করি মোর মাথে ধর শ্রীচরণ ।। তোমা সবা পদে যেন বঞ্চিত না হই। বিশ্বনাথ পাদপদ্ম দেখিবারে চাই ।। এত কহি কান্দিতে কান্দিতে ভূমে পড়ি। গোপেশ্বর সমীপেতে যান গড়াগড়ি ।। তাঁহার ক্রন্দন শুনি বৈষ্ণব সকল। হা গৌরাঙ্গ বলি সবে প্রেমায় বিহ্বল ।। (১৩০) কম্প অশ্রু আদি যে যে সাত্ত্বিক বিকার। নরহরি দেহে সব হইল সঞ্চার ।। ক্রমেতে হইল মূর্চ্ছা যেন প্রাণ নাই। বেড়িয়া বসিল সব বৈষ্ণব গোসাঞি ।।

সেই মূর্চ্ছাকালে বিশ্বনাথ দয়াময়। নরহরি প্রতি কহে অলক্ষিতাশয় ।। ওহে বাপ নরহরি কেন খেদ কর। এই দেখ নিত্যানন্দ গৌর গদাধর ॥ অদ্বৈত

শ্রীবাস আদি যত প্রভুগণ। শ্রীনিবাসাচার্য্য রামচন্দ্র নরোত্তম॥ (১৪০) গণসহ গৌরাঙ্গ বিলসে সংকীর্তনে। তোর গুরু নৃসিংহ নাচয়ে তার বামে॥ আর কিবা চাহ বাপ দেখ নেত্র ভরি। এই তোর পিতা জগন্নাথে সঙ্গে করি॥ নাচিয়ে কীর্তন মাঝে শুন ঘনশ্যাম। ঐ দেখ নাচে প্রভু নিত্যানন্দ রাম॥ এই লেহ চামর করহ তুমি তাঁরে। এই সে গৌরাঙ্গ নাথ দিতে নিতে পারে॥ এত শুনি নরহরি করয়ে চামর। নয়নে ঝরয়ে জল অত্যন্ত কাতর॥ (১৫০) হাসি হাসি নিত্যানন্দ কহে বিশ্বনাথে। ইহাবে পাইলে কোথা কহত আমাকে॥ বিশ্বনাথ নৃসিংহ ঠাকুর কোলে ধরি। এ ভৃত্যের ভৃত্য প্রভু কিংকর তোমারি॥ শ্রীরামচন্দ্রের গণ বলি নিত্যানন্দ। কহিল এ নরহরি দাস প্রেমকন্দ॥ এত কহি গৌরাঙ্গ চরণে ধরি দিল। তব শ্রীনিবাসের এই গণ য়ে বাঢ়িল॥ হাসিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র অদ্বৈতে মিলায়। অদ্বৈত বোলয়ে মুঞি কেও নাহি হায়॥ (১৬০) এই গদাধর দেখ গৌর প্রেম রাশি। ইঁহারে সেবিলে মিলে নদীয়ার শশী॥ গদাধর কহে মোরে ছাড বিড়ম্বন। লোটাইয়া ধর এই শ্রীবাসচরণ॥ শ্রীবাস কহয়ে ঐ রূপ সনাতন। সকলে করয়ে হয়ে ভক্তি বিতরণ॥ রূপসনাতন আগে পড়ি নরহরি। কান্দয়ে গৌরাঙ্গ বলি ফুকরি ফুকরি॥ হাতে ধরি সনাতন শ্রীভট্টেরে দিল। শ্রীগোপালভট্ট শ্রীজীবে সমর্পিল॥ (১৭০) শ্রীজীব ধরিয়া দিল শ্রীনিবাস হাতে। আচার্য দিলেন কবিরাজের সাক্ষাতে॥ ক্রমে গুরুগণ নৃসিংহে সমর্পিল। চক্রবর্তী শ্রীনৃসিংহ নিত্যানন্দে দিল॥ নিত্যানন্দ বলে এবে পাইলাম সুখ। না দেখিয়ে আমি গুরু বিমুখের মুখ॥ (১৭৬)

১৫৫ক : বিমুখি সে দূরে থাক সঙ্গে নাহি যায়। মোর এই প্রভুপদ না পায় সে ছার॥ গুরু অনাদরি এক দুরাচার হৈল। মোর বীর দেখে ঐ তোরে তেয়াগিল॥ (১৮০) এত কহি নরহরি মস্তক ধরিয়া। গৌরপাদপদ্ম দিল তোমার বলিয়া॥ শ্রীশচীনন্দন তাঁর শিরে পদ ধরি। কহবে কি দেখিবা হে বল নরহরি॥ নরহরি কান্দে বিশ্বনাথ মুখ চাঞা। অমূল্য রতন ধর শ্রীচরণ পাঞা॥ চক্রবর্তী হাসি তবে কহে ধীরি ধীরি। দেখিবেক যাহা তাহা পাইল নরহরি॥ শ্রীরূপাদি গণ কভু না মাগয়ে অন্য। কেবল চাহয়ে মাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥ (১৯০) এই কবিকর্ণপূর তব শিষ্য হয়। বর্ণিল নাটকগ্রন্থে অদ্বৈত আশয়॥ ভালমন্দ মোরা কিছু নাহি জানি প্রভু। যেন তব নাম রূপ না ভুলিয়ে কভু॥ বিশ্বনাথ বাক্য শুনি নিত্যানন্দাদয়। বলয়ে রে বিশ্বনাথ

তোর জয় জয়। এতেক শুনিয়া প্রভু গৌরকৃপাময়। দেখ নরহরি মোর প্রতিজ্ঞা যে হয়। দেখয়ে শ্রীঘনশ্যাম নব বৃন্দাবনে। রাধাশ্যাম দোঁহে শোভে রত্নসিংহাসনে॥ (২০০) গোপ গোপী সখা সখী যার যেই ভাব। মাতাপিতা দাস দাসী আদি এই সব॥ যথা স্থানকালে সবে করয়ে সেবন। বৃন্দাবনে শোভে কিবা মদনমোহন॥ শ্রীমধুমঙ্গল বলদেব শ্রীসুবল। করে নানাভাঁতি সেবা প্রেমায় বিহ্বল॥ যতেক দেখিল তাহা কহা নাহি যায়। জানে সেই নরহরি যাহার হিয়ায়॥ শ্রীরাধার ভাবে কৃষ্ণ পরম বিহ্বল। রাধাপ্রেম আস্বাদিব কহে অনর্গল॥ (২১০)·········

১৫৫খ: দেখয়ে সে দুই এক শ্যাম গৌররায়॥ (২৬০) দেখিতে দেখিতে দেখে নবদ্বীপলীলা। পুনর্বার সেইরূপ সকলে মিলিলা॥ (২৬২) ব্রজ নবদ্বীপ লীলা দেখি নরহরি। কিছু বাহ্য পাই কান্দে ফুকরি ফুকরি॥ এইরূপ অহোরাত্র তথাই আছিলা। যে ছিল বৈষ্ণব আর আসিয়া মিলিলা॥ পুনঃপুনঃ সকলে প্রবোধে ঘনশ্যামে। কভু নাচে কভু কান্দে কভু ঝুমে ঝামে॥ দেখিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দ পাইল। বলে বৃন্দাবনে প্রেম পুনঃ প্রকটিল॥ (২৭০) শ্রীলক্ষ্মণদাস তাঁরে কোলে করি কয়। বল বাপ নরহরি হইয়া সদয়॥ কি মতে গৌর রূপ প্রেমরসে মাতি। রাধাকৃষ্ণ লীলা আর দোঁহার পিরিতি॥ শুনিয়া শ্রীনরহরি তাঁর পদ ধরি। কিছুমাত্র নাহি বলে কান্দে গোঁ গোঁ করি॥ ভাবেতে বুঝিল সব বৈষ্ণব সমাজ। শ্রীলক্ষ্মণদাস যাহা বলিল অব্যাজ॥ সকল বৈষ্ণব বলে ওহে নরহরি। এই দেখ আসিয়াছে গোবিন্দ কাণ্ডারী॥ (২৮০) ইহার সঙ্গেতে চল আমরাও যাই। শ্রীরাধাগোবিন্দ দেবে প্রণাম জানাই॥ এতেক কহিয়া সবে চলিলা সত্বর। দেখয়ে গোবিন্দদেব কৃপা রত্নাকর॥ সকলে প্রণমি কহে শ্রীগোবিন্দ দেবে। এই নরহরি যেন তব পদ সেবে॥ এত কহিতেই রাধাগোবিন্দ গলার। খসিয়া পড়িল মালা কিবা চমৎকার॥ সকল বৈষ্ণব তবে জয়ধ্বনি করি। এই মালা লহ ওহে বিপ্র নরহরি॥ (২৯০) গোবিন্দ দর্শনমাত্রে কান্দে অবিরাম। বাহ্যজ্ঞান নাহি ভাবাবেশ ঘনশ্যাম॥ সকল শ্রীভক্তগণ জয় জয় দিলা। নরহরি গলে সবে মালা পরাইলা॥ প্রত্যেক বৈষ্ণব পদধূলি লৈয়া শিরে। নরহরি দাঁড়াইলা গোবিন্দ মন্দিরে॥

নিজ নিজ স্থানে সব বৈষ্ণব চলিলা। নরহরি শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে রহিলা॥ এত সব বল পাই নরহরি দাস। তথাপি না যান কভু গোবিন্দের পাশ॥ (৩০০)

অঙ্গন মার্জন আর বহিঃপ্রক্ষালন। চন্দন শ্রীতুলস্যাদি পুষ্পাবচয়ন॥ বাহিরে থাকিয়া করে চামর ব্যঞ্জন। একলা করয়ে কর্ম যেন দশ জন॥ তৃণ-কাষ্ঠে আহরণ আপনে করয়। আপনার দৈন্যভাবে সদা দূরে রয়॥ শ্রীপূজারিগণ তাঁরে মহাশংকা করে। তেঁহ সে সকলে পূজে প্রণয় আদরে॥ পূজারী সকল স্তুতি করিয়া কহয়। যেবা কর তুমি তাহা উপযুক্ত নয়॥ (৩১০) তেঁহ কহে মো অধম নাহি অধিকার। ইহা যে করিয়ে সেও কৃপা তো সবায়॥ এইরূপে কথোদিন পরিচর্যা করে। সকলের কর্ম করি সকলে আদরে॥ দেখিয়া শ্রীনরহরি রীতি সর্বজন। রাত্রি দিবা সর্বত্রে কহয়ে তার গুণ॥

একদিন রাত্রিযোগে নরহরি দাস। মানসে করয়ে গোবিন্দের পাকরস॥ খেচরান্ন পায়সান্ন বিবিধ প্রকার। পক্কান্ন মিষ্টান্ন স্থূপ ব্যঞ্জন অপার॥ (৩২০) দধি দুগ্ধ নবনীতে মাঠা শিখরিনী। এ সব করিয়া পাত্রে ধরিলা আপনি॥ শ্রীরাধাগোবিন্দদেবে সব খাওয়াইল। নরহরি মনে বহু আনন্দ বাড়িল॥ খাইয়া গোবিন্দদেব কহয়ে হাসিয়া। ভাল ভাল নরহরি তুমি ত রসুয়া॥ এমন পাকের ক্রম শিখিলা বা কোথা। আমারে না খাওয়াইয়া কেন পাও ব্যথা॥ বলিতে বলিতে প্রভু অন্তর্ধান হৈল। কান্দি নরহরি দেখে নিশি পোহাইল॥ (৩৩০)

সেকালে শ্রীজয়পুরে রাজা ভক্তরাজ। স্বপ্নাদেশে শ্রীগোবিন্দে দেখিল অব্যাজ॥ গোবিন্দ হাসিয়া কহে শুন মহারাজ। বৃন্দাবনে আসি দেখ বৈষ্ণব সমাজ॥ আর এক কৌতুক তোমারে কিবা কব। লহ মোর ভুক্তাশেষ খেচরান্ন সব॥ নরহরি নামে এক গৌড়িয়া ব্রাহ্মণ। মানসে খাওয়ালো মোরে করিয়া রন্ধন॥ আমার মন্দিরে থাকে বহিঃসেবা করে। আমি তার পাকে ভুঞ্জি এ আশা অন্তরে॥ (৩৪০) দৈন্যভাবে তেঁহ তাহা না করয়ে কভু। মধ্যে মধ্যে তাঁর অন্ন খাই আমি তবু॥ তুমি তথা গিয়া তাঁরে যতন করিয়া। করাহ আমার জন্য পাকাদিকক্রিয়া॥ নিশি শেষে রাজা এই দেখিয়া স্বপন। জাগিয়া গোবিন্দ বলি নেত্র উন্মীলন॥ সম্মুখে দেখয়ে এক স্বর্ণপাত্র ভরি। ভাজি শাক অম্লাচার দধি সু খেচরি॥ দেখিয়া করয়ে রাজা অষ্টাঙ্গ প্রণাম।

১৫৬ক : পরিক্রমা করে নেত্রে ধারা অবিরাম॥ (৩৫০) রাণী আদি সকলে দেখিয়া প্রণমিলা। যত্ন করি সেই প্রসাদান্ন যে রাখিলা॥ পাত্রমিত্র আদি যেবা ভাগবতগণ। সে সবে লইয়া তাহা করিলা ভক্ষণ॥ অলৌকিক

স্বাদু গন্ধে সবে মত্ত হৈলা। স্বপ্নাদেশ কথা সবে রাজা শুনাইলা॥ প্রসাদ পাইয়া সবে সাজিলা সত্বর। রাজ্ঞী আদি সকলে চলিলা হর্ষান্তর॥

গিয়া ব্রজপুরে বহু প্রণাম করিয়া। মন্দিরে প্রবেশে কোথা নরহরি কৈয়া॥ (৩৬০) গোবিন্দে প্রণমি সবে বসিয়া অঙ্গনে। ঘনশ্যাম আসি দাঁড়াইলা সন্নিধানে॥ সবে কহে এই নরহরি মহাশয়। স্বগণ সহিত রাজা তাঁরে প্রণময়॥ তিনি অতি সংকুচিত হৈয়া একভিতে। সকলে প্রণাম করে যথাবৎ রীতে॥ শুনিয়া রাজার বার্তা সকলে আইল। ব্রজবাসী বৈষ্ণবের মহানন্দ হৈল॥ সবাকারে বারে বারে প্রণমি রাজার। অন্তরে হইল অতি আনন্দ অপার॥ (৩৭০) কান্দিতে কান্দিতে রাজা কহে সর্বজনে। গোবিন্দের কৃপাবধি এই সে ব্রাহ্মণে॥ ইঁহার পাচিত অন্ন গোবিন্দ খাইল। অবশেষ কিছু মোরে তাহারি যে দিল॥ তাহাই খাইয়া মোরা মাতিলা সকলে। গোবিন্দ আজ্ঞায় ব্রজে আইলুঁ কেবলে॥ সবে কহে নরহরি পাক নাহি করে। রাজা কহে পাক করে অন্তরে অন্তরে॥ সকল বৈষ্ণব ঘনশ্যাম মুখ দেখে। ঘনশ্যাম অধোমুখে প্রণমে প্রত্যেকে॥ (৩৮০) তবে রাজা আদি সবে আজ্ঞা যদি কৈল। শ্রীঅঙ্গনে নরহরি লুটিতে লাগিল॥ শ্রীলক্ষ্মণদাস বৃদ্ধ করে ধরি তুলে। উঠ উঠ বাপ মোর এই মাত্র বলে॥ উঠিয়া শ্রীনরহরি প্রণমি তাঁহায়। শ্রীগোবিন্দদেব পাকালয়ে তবে যায়॥ ভক্তিরসে বিবিধ প্রকার পাক কৈল। নানা যত্নে শ্রীগোবিন্দেরে ভোগ লাগাইল॥ শ্রীকুণ্ড শ্রীগোবর্ধন বাসী সবে আইলা। সকলে অঙ্গনে বসি প্রসাদ পাইলা॥ (৩৯০) স্বাদু গন্ধে আহ্লাদিত হইয়া সকলে। ধন্য ধন্য নরহরি এই মাত্র বলে॥ কেহ কেহ হাসিয়া বোলয়ে শুন বাপ। কিবা সে আশ্চর্য এ তোমার শুভ পাক॥ ভাল হে পাচক তুমি পরম প্রবীণ। এইমত পাক তুমি কর প্রতিদিন॥ আর এক পাক তুমি করিবা অচিরে। শ্রীনিবাস নরোত্তম রসের ভাণ্ডারে। সেই স্বাদে মাতিব অনেক ভক্তগণ। গানাদি রচিবা সে অপূর্ব রসায়ন॥ (৪০০) এত কহি জয় ধ্বনি দিয়া সে সকলে। মুখ ভরি নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ বলে॥

ত্রিভাগ বয়স এইরূপ পাক কৈল। গোবিন্দ সেবায় নিত্য সন্তোষিত হৈল॥[১] যৈছে সেবা আরত্রিক পাকাদিক কর্ম। যৈছে ব্রতনিয়মাদি ভাগবতধর্ম॥ করিল করাইল যত কহা নাহি যায়। সকল সুসিদ্ধি হয়

১-১ক. এই পাঠ 'নরোত্তমবিলাস' পুথিতে (পত্র ৩৫খ) নেই।

গৌরাঙ্গ কৃপায় ॥[১ক] তারপর উপবীত ত্যাগ তেঁহো কৈল। অযাচক হৈয়া ব্রজে ভ্রমণ করিল ॥ মধ্যে মধ্যে গোবিন্দ মন্দিরে কিছু খান। কভু মহা-প্রসাদাদি তাঁহারেও দেন ॥ (৪১২)

বহু গ্রন্থ রচিলেন গোবিন্দ আজ্ঞায়। গৌরচরিত্রচিন্তামণ্যাদি গ্রন্থাদয় ॥ অনুরাগবল্লী[২] আর ভক্তিরত্নাকর। কি অপূর্ব বর্ণিলেন নাহি যার পর ॥ মত সংস্থাপন জন্য আর গ্রন্থ কৈল। বহির্মুখপ্রকাশ[৩] তার নাম যে হইল ॥ শ্রীনরোত্তমবিলাস করিল বর্ণন। এ সব শুনিয়া ভক্ত কর্ণরসায়ন ॥ (৪২০) সব গ্রন্থ মধ্যে শ্রীমদ্‌ভক্তিরত্নাকর। বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হৈল বৃহত্তর ॥ শ্রীনিবাস চরিত্র আর পৃথক বর্ণিল। সেই গ্রন্থে তাঁর শাখাগণ বিস্তারিল ॥

এ মহাশয়ের বাক্যে যে না পায় সুখ। তাহারে জানিবে গৌর পথে বহির্মুখ ॥ (৪২৬) এই সব কথা কেহো নাহি শুনে কানে। এত দয়া থাকিতেও মরিল বিবরে (?) ॥ ধিক ধিক সে সব পাপীর জন্ম কর্ম। না বুঝিল যেই জন গৌরদত্ত ধর্ম ॥ ইঁহার চরিত্র মুই বর্ণিতে কি জানি। যেন তেন বাক্যে মাত্র শোধি এ পরাণি ॥.........ওহে প্রভু নরহরি রসুয়া ঠাকুর। বনয়ারি সঙ্গ মোর না করাবে দূর ॥[৪] অনেক প্রয়াসে এই গ্রন্থ লিখিলাম। সহায় তাঁহার পিতা শ্রীবৈষ্ণবধাম ॥

---

২. এই নামে একটি গ্রন্থ মনোহরদাসের লেখা (স. মৃণালকান্তি ঘোষ)। নরহরিও এই নামে কোনো নিবন্ধ রচনা করতে পারেন। তবে এ বিষয়ে কোনো প্রমাণ নেই।

৩. এই গ্রন্থ এ পর্যন্ত মেলে নি। তবে নরহরি স্বয়ং এটির নাম করেছেন আত্মবিবরণীতে (১২২নং চরণ)।

৪. এই পাঠ নরোত্তমবিলাসের পুথিটিতে নেই।

গ্রন্থপঞ্জী

(দুইখণ্ডে ব্যবহৃত একান্ত উল্লেখ্য পুথি, মুদ্রিত গ্রন্থ প্রভৃতি)

এক ॥ হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি

(প্রথমে রচয়িতার নাম, পরে পুথির নাম, বন্ধনীতে অনুলিপিকাল,
শেষে পুথির নম্বর)

১. শ্রীশ্রীপাঠবাড়ী গৌরাঙ্গগ্রন্থমন্দিরে সংরক্ষিত পুথি

নরহরি	ভক্তিরত্নাকর (১২৬৪ বঙ্গাব্দ) ২৩৪১/২৪,
	নরোত্তমবিলাস (১২৬৪ বঙ্গাব্দ) ২৩৩৬/৪১,
	গীতচন্দ্রোদয়-মঙ্গলাচরণ ২৫৩৪/৩,
	গীতচন্দ্রোদয়-সংকীর্তনরসবর্ধন ২০৩০/১৪,
	গৌরপরিকরগণের সূচক ২৬১২/২৩৬,
	গোপালভট্ট ও লোকনাথদাসের সূচক ২৬০৯/২৩৭,
	নামামৃতসমুদ্র ৩০০৭/৭৪,
	ছন্দঃসমুদ্র ৪৫১/ন
	ছন্দঃপ্রকাশ ৪৫০/৮
গৌরসুন্দর দাস	কীর্তনানন্দ (১১৭৩ বঙ্গাব্দ) ২৬৫৪/২৮
ঘনশ্যাম কবিরাজ	গোবিন্দরতিমঞ্জরী ২৫৫৮/৫
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী	ক্ষণদাগীতচিন্তামণি ২৬১৫/২৪গ
বৈষ্ণবদাস	পদকল্পতরু ২৫৮৪/১১
রাধামোহন	পদামৃতসমুদ্র ২৬৫৩/২৭
বিভিন্ন কবি	পদাবলী ২৫৩১/২৬ ড, ২৬৩০/ন

২. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত

নরহরি	অদ্বৈতবিলাস ২৬৫, ২৮৮৬ ; নরোত্তমবিলাস ২৮০০, ২৮০১, ৩০৪৬ ;
	নবদ্বীপপরিক্রমা ১৫৩৩, ১৬৭০ ; বৈষ্ণবনামামৃত-সমুদ্র ২৮৯১
ঘনশ্যাম কবিরাজ	গোবিন্দরতিমঞ্জরী ২৫৯৭, ২৯৬০
বিভিন্ন কবি	পদাবলী ২৬৫, ৯৬৮ ; সূচক ৯৮২

৩. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুথি বিভাগে সংরক্ষিত

নরহরি	নবদ্বীপপরিক্রমা ৬৪৮০,
বিভিন্ন কবি	পদাবলী ৩২৫, ৩২৭, ৩৩৩, ৩৩৮, ২০৮০, ৪২৬৯, ৪৪৫৮, ৬৫৯৮, ৬৭১২

৪. বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনে সংরক্ষিত

বিভিন্ন কবি	পদমেরু ৯৫০, পদাবলী ২৮১, ৫২১, ৫৩১, ৬৭২, ৭৫০, ১১১২, ১২৬৫, ২২১৭, ২৯৮৭

৫. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুরশাখায় সংরক্ষিত

বিভিন্ন কবি	পদাবলী ৪৬৫, ৫৩৪, ৬৩২, একটি নম্বরহীন চৌকো পুথি

দুই ॥ মুদ্রিত প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থ

(ক্রমান্বয়ে রচয়িতার নাম, গ্রন্থের নাম, সম্পাদক বা প্রকাশকের নাম, বন্ধনীতে প্রকাশকাল)

নরহরি	ভক্তিরত্নাকর : বহরমপুর ১ম সং (৪৬২ গৌড়াব্দ). গৌড়ীয়মিশন ২য় সং (১৯৬০ খ্রীঃ)
	নরোত্তমবিলাস : বহরমপুর ১ম সং (১৮৯৩ খ্রীঃ), বসুমতী ৩য় সং ১৯৩৫ খ্রীঃ)
	গীতচন্দ্রোদয়-পূর্বরাগ : হরিদাস দাস (৪৬২ গৌরাব্দ)
	গৌরচরিত্রচিন্তামণি : হরিদাস দাস (৪৬১ গৌরাব্দ)
	ছন্দঃসমুদ্র : হরিদাস দাস
	পদ্ধতিপ্রদীপ : হরিদাস দাস
	নামামৃতসমুদ্র : হরিদাস দাস
	সংগীতসারসংগ্রহ : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ (১৯৫৬ খ্রীঃ)
	ব্রজপরিক্রমা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (১৩১২ বঙ্গাব্দ)
	নবদ্বীপপরিক্রমা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ	চৈতন্যচরিতামৃত : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
কৃষ্ণদাস	ভক্তমাল : বসুমতী সং (৪৬৪ গৌরাব্দ)
গোপীজনবল্লভ দাস	রসিকমঙ্গল : গোপালগোবিন্দদেব গোস্বামী (৪৫৫ গৌরাব্দ)
গৌরীসুন্দর দাস	কীর্তনানন্দ : বনওয়ারীলাল গোস্বামী
ঘনশ্যাম কবিরাজ	গোবিন্দরতিমঞ্জরী : হরিদাস দাস (৪৫৯ গৌরাব্দ)
জয়ানন্দ	চৈতন্যমঙ্গল : এশিয়াটিক সোসাইটি (১৯৭১ খ্রীঃ)
দীনবন্ধু দাস	সংকীর্তনামৃত : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)
নিত্যানন্দ দাস	প্রেমবিলাস : যশোদানন্দন তালুকদার (১৩২০ বঙ্গাব্দ)
প্রেমদাস	বংশীশিক্ষা : ভাগবতকুমার গোস্বামী (১৩৩১ বঙ্গাব্দ)
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী	ক্ষণদাগীতচিন্তামণি : বৃন্দাবন সং (১৩১৫), বিমানবিহারী সং (১৩৬৯)
বৈষ্ণব দাস	পদকল্পতরু : (৪ খণ্ড) সতীশচন্দ্র রায় সম্পাঃ

বৃন্দাবন দাস	চৈতন্যভাগবত : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
রামগোপাল দাস	রসকল্পবল্লী : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৩)
রাধামোহন দাস	পদামৃতসমুদ্র : বহরমপুর ১ম সং (১২৮৫)
রাধামোহন সেন	সংগীততরঙ্গ : হরিমোহন মুখোপাধ্যায় (৩য় সং)
হরিচরণ	অদ্বৈতমঙ্গল : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৬)

তিন ॥ প্রাচীন পদাবলীর আধুনিক সংকলন গ্রন্থ

(সংকলকের নাম, গ্রন্থের নাম, বন্ধনীতে প্রকাশনা)

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	বিদ্যাপতির পদাবলী (বসুমতী ২য় সং), চণ্ডীদাসের পদাবলী (বসুমতী ২য় সং), গোবিন্দদাসের পদাবলী (বসুমতী ১ম সং), জ্ঞানদাসের পদাবলী (বসুমতী ১ম সং)
কানাইলাল শীল	পদকল্পলতিকা (১৩৩৭)
কালিদাস নাথ	কীর্তনগীতরত্নাবলী (১৩২৩)
খগেন্দ্রনাথ মিত্র	যাদবেন্দ্র পদাবলী (ক. বি. ১৯৫৬)
খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার	বিদ্যাপতির পদাবলী (১৩৫৯)
খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী	পদামৃতমাধুরী ১ম-৪র্থ খণ্ড (১৩৩৮-৪৯)
চারুচন্দ্র রায়	সংগীতসারসংগ্রহ ১ম (১৩০৬), ৩য় (১৩০৮)
জগবন্ধু ভদ্র	গৌরপদতরঙ্গিণী (১ম সং ১৩১০)
দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ	বৈষ্ণবগীতাঞ্জলি ১ম, ২য় খণ্ড
দুর্গাদাস লাহিড়ী	বৈষ্ণবপদলহরী (১৩১২)
নগেন্দ্র গুপ্ত	বিদ্যাপতির পদাবলী (১৩১৬)
নীলরতন মুখোপাধ্যায়	চণ্ডীদাসের পদাবলী (১৩২১)

নরহরি চক্রবর্তী

বিমানবিহারী মজুমদার	গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ (১৩৬১), চণ্ডীদাসের পদাবলী (১৩৬৭), জ্ঞানদাস ও তাহার পদাবলী (১৩৭২), পাঁচশত বৎসরের পদাবলী (১৩৬৮), ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য (১৩৬৮)
ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য	বলরামদাসের পদাবলী (১৩৬২)
মণীন্দ্রমোহন বসু	দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী (১৩৪৫), সহজিয়া সাহিত্য (১৩৩২)
মালবিকা চাকী	বাসু ঘোষের পদাবলী (১৩৬৮)
মৃণালকান্তি ঘোষ	গৌরপদতরঙ্গিনী ২য় সং (১৩৪০), বাসু ঘোষের পদাবলী (১৩১২)
যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য	রায়শেখরের পদাবলী (ক. বি.)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	পদরত্নাবলী (১২৯২)
রমণীমোহন মল্লিক	চণ্ডীদাস (১৩১২), জ্ঞানদাস (১৩০২)
রাজেন্দ্রলাল মিত্র	পদামৃতসিন্ধু (১৩২৯)
সতীশচন্দ্র রায়	অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী (১৩২৭)
সন্তোষকুমার কুণ্ডু	বাসুদেব ঘোষের পদাবলী (১৩৬৮)
সুনীতিকুমার ও হরেকৃষ্ণ	চণ্ডীদাসের পদাবলী (১৩৪১)
হরেকৃষ্ণ ও শ্রীকুমার	জ্ঞানদাসের পদাবলী (১৩৬৩)
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	বৈষ্ণবপদাবলী (১ম সং ১৩৬৮)

চার ॥ আলোচনা গ্রন্থ

(গ্রন্থকার, গ্রন্থনাম, প্রকাশকাল)

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ১ম খণ্ড (১ম সং), ২য় খণ্ড (১ম সং), ৩য় খণ্ড (১ম সং) ; প্রাচীন বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য (১৩৬২)
আনন্দ মোহন বসু	বাংলা পদাবলীর ছন্দ (১৩৬২)

উমা রায়	গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসের অলৌকিকত্ব (১ম সং)
কালিদাস রায়	পদাবলী সাহিত্য (ক. বি. সং)
খগেন্দ্রনাথ মিত্র	কীর্তন, কীর্তনগীতিপ্রকাশিকা
গোপেশচন্দ্র দত্ত	কৃষ্ণযাত্রা ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১ম সং)
গৌরগুণানন্দ ঠাকুর	শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব (১৩৬১)
জনার্দন চক্রবর্তী	শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্য সংস্কৃতি (ক. বি. ১ম সং)
দীনেশচন্দ্র সেন	বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১ম সং (১৯০১), ৮ম সং
পঞ্চানন মণ্ডল	পুঁথি পরিচয় ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড (বিশ্বভারতী সং)
বাসন্তী চৌধুরী	বাংলার বৈষ্ণব সমাজ সংগীত ও সাহিত্য (১৯৬৮)
বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়	সাহিত্যদর্পণ, চৈতন্যচরিতামৃত (ভূমিকাংশ)
বিমানবিহারী মজুমদার	শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (২য় সং)
ভূদেব চৌধুরী	বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ১ম খণ্ড (১৯৬৫)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্ররচনাবলী ১৩শ খণ্ড (জন্ম শতবার্ষিক সং ১৩৬৮)
রবীন্দ্রনাথ মাইতি	চৈতন্যপরিকর (১৯৬২)
রাধাগোবিন্দ নাথ	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা (১৩৩৯)
শশিভূষণ দাসগুপ্ত	শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ : দর্শনে ও সাহিত্যে (২য় সং)
শংকরীপ্রসাদ বসু	মধ্যযুগের কবি ও কাব্য (২য় সং)
শুকদেব সিংহ	শ্রীরূপ ও পদাবলী সাহিত্য (১৯৬৭)
সতী ঘোষ	প্রত্যক্ষদর্শীর কাব্যে শ্রীচৈতন্য (১ম সং)
সতীশচন্দ্র রায়	পদকল্পতরু ৫ম খণ্ড (১৩০৮)
সুকুমার সেন	বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ (৪র্থ সং), অপরার্ধ (২য় সং), প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী, মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ, বঙ্গভূমিকা
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	রাগ ও রূপ, উত্তর ভাগ (১৯৬১), পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস ১ম খণ্ড (১৯৭০), ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস ১ম, ২য় (১ম সং)

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় শব্দকোষ (১ম, ২য়)
হরিদাস দাস শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (১ম-৪র্থ খণ্ড)
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পদাবলী পরিচয় (১৩৫৯), গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা (১ম সং) বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া (১ম সং)

পাঁচ ॥ ইংরেজী গ্রন্থ

Dinesh Ch. Sen The Vaisnava Literature of Mediaeval Bengal (1917), Chaitanya and His Companions (1917)
H. C. Roy Choudhury Early History of the Vaisnava Sects.
Sukumar Sen A History of Brajabuli Literature (1935)
Susil Kumar De Early History of Vaisnava Faith & Movement (1942)
Sasibhusan Dasgupta Obscure Religious Cult (Firma 2nd Ed)

ছয় ॥ সাময়িক পত্র

আনন্দবাজার (১৩৬৯ শারদীয়া) —'পদকর্তা হরিবল্লভ' : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
গৌরাঙ্গমাধুরী (১৩৩৭, ৬ষ্ঠ-১০ম সংখ্যা)—'নরহরি বিলাস ঠাকুরের পদাবলী'
দেশ ১৯. ৬. ১৯৭৫—'শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি নবদ্বীপ' ৯. ৮. ১৯৭৫ এবং ১৬. ৮. ১৯৭৫ (প্রবন্ধটির সমালোচনা)
প্রগতি ২৪. ৬. ১৯৭৪—'কয়েকটি প্রাচীন পুথি' : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ১৩০৮ (১ম, ৩য় সংখ্যা)—'প্রাচীন পুথির বিবরণ' ১৩১১ (১ম)—'বৈষ্ণবসাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের ধারা'

বিষ্ণুপ্রিয়া (৪০৫ গৌরাব্দ)—'বিশ্বনাথ চক্রবর্তী'

ভারতবর্ষ (১৩৫১, আষাঢ়)—'বৈষ্ণবাচার্য বিশ্বনাথ'

সাহিত্য (১২৯৯ আশ্বিন-মাঘ)—'ঘনশ্যাম দাস'

নির্দেশিকা